দাম দিয়ে কিনেছি এই বাংলা

দাম দিয়ে কিনেছি এই বাংলা
দাম দিয়ে কিনেছি এই বাংলা

জাফর ইমাম, বীর বিক্রম

লে. কর্নেল জাফর ইমাম, বীর বিক্রম

১৯৪৭ সালের ১৩ ডিসেম্বর ফেনী জেলার ফুলগাজী থানাধীন নোয়াপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম অ্যাডভোকেট শেখ ওয়াহিদ উল্লাহ চৌধুরী। তিনি ১৯৬৭ সালের এপ্রিল মাসে ৯ এফ.এফ. রেজিমেন্ট-এ কমিশন লাভ করেন। একাত্তরের মার্চে তিনি কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট-এ অবস্থানরত ২৪ এফ.এফ. রেজিমেন্ট হতে বিদ্রোহ করে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। তিনি ছিলেন ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রতিষ্ঠাতা অধিনায়ক ও বিলোনিয়া সাব-সেক্টর কমান্ডার। মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য ও বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য তিনি 'বীর বিক্রম' উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৭৬ সালে সেনাবাহিনী থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

সামরিক বিশেষজ্ঞ ও গবেষক।

গেরিলা ও সম্মুখ যুদ্ধের তীব্রতায় পুরো বাংলাদেশের রণাঙ্গন ছিল উত্তপ্ত। গঙ্গাসাগর সালদানদী, মন্দবাগ, হিলি, কমলপুর, জামালপুর সাতক্ষীরা কানাইঘাটসহ আরো অনেক রণাঙ্গনের পাশাপাশি বিলোনিয়া রণাঙ্গন অত্যন্ত উত্তপ্ত একটি রণাঙ্গন। একাত্তরের ফেনী-বিলোনিয়া ছিল একটি উত্তপ্ত রণাঙ্গন– যুদ্ধের শুরু থেকে শেষ অবধি। প্রায় ১০০ বর্গমাইলের এই এনক্লেভটির স্ট্রাটেজিক গুরুত্বের কারণে ফেনী-বিলোনিয়া ছিল আমাদের এবং পাকিস্তানিদের জন্য মর্যাদার লড়াই ক্ষেত্র। জুন মাসের প্রথমার্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ জেনারেল আবদুল হামিদ খান এখানে আসেন নিজেই যুদ্ধের দিক নির্দেশনা দিতে। মিত্র বাহিনীর ৪ কো-কমান্ডার লে. জেনারেল সগত সিং এবং তার ২৩ মাউন্টেন ডিভিশনের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং মে. জেনারেল আর. ডি. হীরা উদ্বিগ্ন ছিলেন বিলোনিয়ার দখল নিয়ে। আমাদের ছিলেন অপেক্ষাকৃত দুইজন অত্যন্ত জুনিয়ার অফিসার ২নং সেক্টর কমান্ডার মেজর খালেদ মোশাররফ এবং ফেনী-বিলোনিয়া রণক্ষেত্রের টাস্ক ফোর্স কমান্ডার ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম আর তার আ-বু সাহসের এক দঙ্গল সহযোদ্ধা। তারাই এবং তারাই ক্যাপ্টেন জাফর ইমামের অধিনায়কত্বে অর্থাৎ ১০ম ইস্ট রেজিমেন্ট-এর সৈনিক এবং গণযোদ্ধারা পর্যুদস্ত, পরাভূত এবং পরাজিত করে ফেনী-বিলোনিয়ায় যুদ্ধরত পেশাদার পাকিস্তানি সেনাদের। মিত্র বাহিনীর আর্টিলারি অবশ্য অসামান্য ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফায়ার সাপোর্ট প্রদান করেছিল। যুদ্ধরত ২৪ এফ এফ রেজিমেন্ট-এর সব অফিসার ও সৈনিক যুদ্ধবন্দি হয় ক্যাপ্টেন জাফর ইমামের কাছে, ২৫ মার্চের অব্যবহিত পূর্বে যে ইউনিটে তিনি চাকরিরত ছিলেন।

দাম দিয়ে কিনেছি এই বাংলা
জাফর ইমাম, বীর বিক্রম

প্রকাশক
ঐতিহ্য
রুমী মার্কেট ৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড
বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

প্রকাশকাল
ফাল্গুন ১৪২২
ফেব্রুয়ারি ২০১৬

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মুদ্রণ
ঐতিহ্য মুদ্রণ শাখা

মূল্য
ছয়শত পঞ্চাশ টাকা

DAM DIYE KINECHI AI BANGLA by
Jafar Imam, Bir Bikram
Published by Oitijjhya
Date of Publication : February 2016

E-mail: oitijjhya@gmail.com

Price: Taka 650.00 US$ 15.00
ISBN 978-984-776-264-7

উৎসর্গ

শ্রদ্ধেয়া
"মা"
মরহুমা আজমিরি বেগম
ও
সহধর্মিণী
নূর মহল বেগম নয়ন

লেখকের কথা

বাংলাদেশের অভ্যুদয় হাজারো বছরের বাঙালির জীবনের শ্রেষ্ঠ ঘটনা বা অর্জন বললেও অত্যুক্তি হবে না। অনেক রক্ত ও ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত এই স্বাধীনতা। আজ এই স্বাধীনতা আমাদের অন্যতম জাতীয় ঐতিহ্য– একটি বাস্তবতা। হঠাৎ করে এ যুদ্ধ শুরু হয়নি। দীর্ঘ সংগ্রামের পথ পাড়ি দিয়ে আমরা মুক্তিযুদ্ধে পদার্পণ করেছিলাম। এ অহংকার ও গর্ব নিয়ে আমরা শহিদদের স্বপ্ন বাস্তবায়নে এগিয়ে চলছি। নয় মাস যুদ্ধে এত অল্প সময়ের মধ্যে দেশ স্বাধীন হওয়াতে অনেকে এই অর্জনের বিশালতা ও গুরুত্ব অনুধাবন করতে এখনও ব্যর্থ। মনে রাখতে হবে কেউ দয়া বা করুণা করে এ স্বাধীনতা দান করেনি। অনেকের এখনও ধারণা ব্রিটিশ সরকার ২০০ বছর শাসন, শোষণের পর দয়া করে পাক-ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন তথা করুণা করেছিলেন আসলে তা সত্য নয়। ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহে হাজার হাজার বাঙালি রক্ত ঝরিয়েছিল। ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধেও হাজার হাজার বাঙালি জীবন উৎসর্গ করেছিল। কিছু বিশ্বাসঘাতকের চক্রান্তে সেদিন বানচাল হয়ে গিয়েছিল বাঙালির স্বপ্ন– একারণেই ইংরেজরা শাসন করল প্রায় ২০০ বছর। এ বিশ্বাসঘাতকদের প্রেতাত্মার কালো ছায়া এখনও বাংলাদেশের অনেক ক্ষেত্রে বিচরন করে রয়েছে। প্রায় ২৪টি বছরের পাকিস্তানিদের শাসন শোষণ, নির্যাতন ও চরম বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে বাঙালিদের দীর্ঘ মুক্তি সংগ্রামের সফলতা এনে দিয়েছিল এই মুক্তিযুদ্ধ। বাংলার জনপদে এখনও শহিদদের রক্তের দাগ শুকায়নি। শুকায়নি স্বজনহারাদের চোখের জল। এখনও আমরা শুনতে পাই শহিদদের আর্তনাদ।

বাঙালির হৃদয়ে তাদের অনুভূতিতে অনুরণিত ন্যায় বিচার, সমতা, অসাম্প্রদায়িকতা, সামাজিক ঐক্য ও সাংস্কৃতিক প্রেরণার ভিত্তিতে একটি দেশ গড়ার স্বপ্নসাধ ছিল তাদের। তাই দীর্ঘদিনের বাঙালির লালিত বাসনা সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য অকাতরে তাদের এ জীবন উৎসর্গ পৃথিবীর ইতিহাসে এক বিরল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

পরিতাপের সাথে লক্ষ করছি যে, আমাদের দীর্ঘদিনের মুক্তির সংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সঠিক মূল্যায়নের অভাবে ইতিহাস পূর্ণাঙ্গরূপে লাভ করেনি। তাই আমার স্মৃতির পাতা থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করছি। আমি আরো লক্ষ করেছি যে, রাজনৈতিক কারণে অনেক বিষয় এত বেশি বিতর্কিত হয়ে উঠেছে যে আমাদের বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হচ্ছে। যদিও

অনেক তথ্য আজও আমাদের অজানা তা সত্ত্বেও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস জানার সবার অধিকার রয়েছে।

আমি এই বইতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর আমার মতামত তুলে ধরার চেষ্টা করছি। ইতিহাস গবেষক ও লেখকেরা তাদের নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গির আঙ্গিকে বিচার বিশ্লেষণ করবেন। আমার মূল্যায়ন সঠিক ও নিখুঁত এ দাবি না করে বলব আমি আলোচনা সমালোচনার জন্য কিছু চিন্তার খোরাক দিয়ে গেলাম মাত্র। আমার ভুল ভ্রান্তি সবাইকে ক্ষমার চোখে দেখার অনুরোধ রইল। সর্বশেষে আমি বলব, মুক্তিযুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস জানার এই প্রয়াস সাঁতরিয়ে একটা মহাসমুদ্র পাড়ি দেওয়ার একটি দুঃসাহসী উদ্যোগ বটে। মনে হয় আমরা এখনও তীরে অবস্থান করছি। আমাদের পথ চলা এখনও অনেক বাকি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাই হোক আমাদের সবার প্রেরণার মূল উৎস। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শাণিত আগামী প্রজন্ম গড়ে তুলতে এবং জাতিকে দেশপ্রেমে উজ্জীবিত করতে আমরা সকলে আন্তরিকভাবে সক্রিয় থাকব। ইতিহাস বর্তমান ও ভবিষাৎ প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণ করা সবার নৈতিক কর্তব্য। এই দায়িত্ব পালনে আমাদের ব্যর্থতার কোনো অবকাশ নেই। মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস হারিয়ে গেলে আমাদের চেতনা হবে বিলুপ্ত এতে একদিন আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হুমকির সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেবে।

মুক্তিযুদ্ধের গৌরব গোটা জাতির পরম অর্জন। এই অর্জনকে ধারণ ও লালন করবে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। আজ আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের উজ্জ্বল আত্মত্যাগ ও বীরত্বের ইতিহাস সঠিকভাবে তুলে ধরতে আরো সচেষ্ট হতে হবে। সবশেষে আমি বলব– মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় ইতিহাসকে আরও সমৃদ্ধ করার জন্য ব্যাপক পরিসরে গবেষণা অব্যাহত রাখতে হবে যেন আমরা একটি সঠিক ও নির্ভুল ইতিহাস বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে উপহার দিয়ে যেতে পারি। সফল হোক আমাদের এই মহতী উদ্যোগ। আমাদের সবাইকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত রাখার দীপ্ত শপথ নিতে হবে।

জাফর ইমাম, বীর বিক্রম
jafar.imam71@gmail.com

কৃতজ্ঞতা

আমি এই বই লিখতে গিয়ে মতিউর রহমানের সম্পাদিত 'একাত্তরের বীরযোদ্ধা'; Anthony Mascarenhas-এর লেখা 'A Legacy of Blood' যা মোহাম্মদ শাহ্জাহান বাংলা অনুবাদ করেন 'বাংলাদেশঃ রক্তের ঋণ' নামে, কর্নেল (অব.) মোহাম্মদ সফিউল্লাহ বীর প্রতীক-এর লেখা 'মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম' কাজী সাজ্জাদ আলী জহিরের (বীর প্রতিক) 'মুক্তিযোদ্ধা শহিদ ক্যাপ্টেন আফতাব কাদের, বীর উত্তম'; Lt. General A.A.K Niazi-এর লিখিত বই 'The Betrayal of East Pakistan'; Siddiq Saliq-এর লেখা বই 'Witness to Surrender'; বিগ্রেডিয়ার এ.আর. ছিদ্দিকীর লেখা 'East Pakistan The Endgame'; Archer K Blood রচিত 'The Cruel Birth of Bangladesh'; G.W. Chowdhury রচিত 'The Last Days of United Pakistan'; পীর হাবিবুর রহমানের 'পোয়েন্ট অব পলিটিক্স'; Lt. Colonel (Retd) Quazi Sajjad Ali Zahir (Bir Protik)-এর লিখা 'The Return of a Hero'; Lt. Col. Zakir Hussain (Rtd)-এর 'The Veterans of Yesteryears'; 'যুদ্ধ করেছি বিজয় এনেছি' লেখক : গোলাম মোস্তফা এবং আরো অনেক বই পড়েছি।

মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়ার লেখা বই শ্রেষ্ঠ সময়ের কথা; বিহঙ্গের ডানা; শারমিন আহমদের লেখা তাজউদ্দিন আহম্মদ নেতা ও পিতা; আলহাজ মোঃ ফখরুল ইসলামের লেখা মুক্তিযুদ্ধে বৃহত্তর নোয়াখালি বইগুলো পড়ে দেখলাম এগুলো যথেষ্ট তথ্য সমৃদ্ধ– বিশেষ করে মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়ার লেখা বইগুলোতে প্রচুর তথ্য রয়েছে। তার বইগুলোর তথ্য আমার খুব ভালো লেগেছে। এ বইগুলো থেকে আমি অনেক তথ্য এবং সহযোগিতা নিয়েছি। এই বইগুলোর লেখকদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ এবং ঋণী।

আমি আরো কৃতজ্ঞ ও ঋণী থাকব 'The Blood Telegram'-এর লেখক Gary J. Bass, '১৯৭১ : ভিতরে বাইরে'-এর লেখক এ.কে খন্দকার ও মুক্তিযোদ্ধা এনায়েত রাব্বি (সহকারী খালেদ মোশাররফ)-এর কাছে।

সূচি

মুক্তিযুদ্ধ ও চেতনা পত্রিকায় প্রকাশিত আমার লেখা

ফেনী–বিলোনিয়া যুদ্ধ

পরিশিষ্ট

আলোকচিত্র

দাম দিয়ে
কিনেছি
এই বাংলা

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও স্মৃতিচারণ

আমি ১৯৬৬ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগদান করি। ১৯৭০ সালে ক্যাপ্টেন পদমর্যাদায় অফিসার হিসেবে আমি ৯ম এফ এফ পদাতিক রেজিমেন্টে কর্মরত ছিলাম। তখন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) রাজনৈতিক অঙ্গন ছিল উত্তপ্ত। ৬ দফা আন্দোলন, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানসহ '৭০ এর নির্বাচনকে ঘিরে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে (বর্তমান পাকিস্তান) সর্বত্র চলছিল নানা ধরনের জল্পনা-কল্পনা। আমরা সেদিন পাকিস্তানের বৃহত্তম সেনানিবাস লাহোর ও পিন্ডির মাঝামাঝি খারিয়ান সেনানিবাসে অনেক বাঙালি অফিসার ছিলাম। যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনায় নির্মিত এই সেনানিবাসে আমি যে ব্লকে থাকতাম সেখানে অনেকের মধ্যে আমরা ৪-৫ জন বাঙালি অফিসার এক সাথে থাকতাম। তারা হলেন– ক্যাপ্টেন সালেক (বীর উত্তম), ক্যাপ্টেন আকবর হোসেন (বীর প্রতীক), ক্যাপ্টেন আনোয়ার ও আমি নিজে। আমরা যখন প্রায়ই একত্রিত হতাম, তখন আমরা বঙ্গবন্ধুর নের্তৃত্বে পরিচালিত বাঙালিদের আন্দোলনের স্বপক্ষে আলাপ-আলোচনা করতাম। ঐ সেনানিবাসসহ পাকিস্তানের অন্যান্য সেনানিবাসে অবস্থানরত বাঙালি অফিসাররা/সৈনিকরা আমাদের প্রতি পাকিস্তানিদের বৈষম্য সম্পর্কে আলোচনা করে তৎকালীন চলমান আন্দোলনের পক্ষে কথা বলত। তবে এই আলাপ-আলোচনা ছিল খুব ঘরোয়া পরিবেশে সীমাবদ্ধ। তার পরেও পাকিস্ত ানি সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা সংস্থা আমাদের অনেকের ব্যাপারে গোপনীয় প্রতিবেদন দিয়েছিলেন। ক্যাপ্টেন আকবর ও ক্যাপ্টেন সালেকসহ আমরা যখন ঘরোয়াভাবে গোপনীয়ভাবে আলোচনা করতাম তখন তাঁরা পাকিস্তানের বৈষম্যমূলক আচরণের তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করতেন। আমরা তিন জন তখন থেকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান বর্তমানে বাংলাদেশে বদলি হয়ে আসার জন্য মনস্থির করে কৌশলে নানা ধরনের চেষ্টা তদবির শুরু করেছিলাম। আমার ইউনিটের অধিনায়ক আমার বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে (এ. সি. আর) ঐ বছরে রিপোর্টে উল্লেখ করেছিলেন– "This officer has got a trend of

provincialism in his mind. He can slip off the track any time if not guided properly."

আমার সি.ও একজন পাঠান ছিলেন। পাঞ্জাবিদদেরকে খুব একটা ভালো চোখে দেখতেন না। আর আমার এ.সি. আর রিপোর্টটি যদি সামরিক হেডকোয়ার্টার পিন্ডিতে পাঠাত তাহলে আমার চাকরি থাকত না। আমার সি.ও আসলে একজন বড় মনের লোক ছিলেন। আমি তাকে অনেকটা কাকুতি-মিনতি করে বুঝিয়ে বললাম- এ রিপোর্টের পরিণতি। তিনি এক পর্যায়ে আমাকে কিছু উপদেশ দিলেন যে সামরিক বাহিনীতে চাকরিরত অবস্থায় যেন কোনো রাজনীতি না করি অর্থাৎ কোনো পক্ষ বিপক্ষ না নিই এবং অহেতুক কোনো আলোচনা-সমালোচনায় জড়িত না হই। তিনি আমার এ. সি. আর এর ভাষা পরিবর্তন করে নতুন এ, সি, আর দিলেন আমার স্বাক্ষরের জন্য। সেদিন আমি তাকে অনুরোধ করে এসেছিলাম আমাকে যেন পূর্ব পাকিস্তানে বদলির জন্য তিনি সুপারিশ করেন। '৭০-এর শেষের দিকে আমরা সবাই পূর্ব পাকিস্তানে বদলি হয়ে আসলাম। আমার পোস্টিং ছিল কুমিল্লায়। '৭০-এর শেষ থেকে নিয়ে '৭১ এর ২৫ মার্চ পর্যন্ত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আমাদের প্রতি তথা বাঙালিদের প্রতি তাদের বৈষম্যমূলক আচরণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। আমরা এও লক্ষ করলাম সেনাবাহিনীতেও ভেতরে ভেতরে তারা গোপনীয়ভাবে একটি পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। তারা বাঙালি অফিসারদেরকে তখন থেকে বাঁকা চোখে দেখছিল এবং কড়া গোয়েন্দা নজরদারিও চালিয়ে যাচ্ছিল। পুরো মার্চ মাস ব্যাপী আমরা দেখেছি তারা যেন এক যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমার রেজিমেন্টে আরো দুইজন বাঙালি অফিসার ছিলেন। তার মধ্যে ক্যাপ্টেন মাহবুব (বীর উত্তম) মার্চের মাঝামাঝি ছুটিতে গিয়ে আর ফিরে না এসে প্রথমে দিনাজপুরে পরে প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টের সাথে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং প্রথম বেঙ্গলের সাথে কানাইঘাটের যুদ্ধে শহিদ হন। কানাইঘাটে যেখানে তাকে সমাধিস্থ করা হয়েছে সে স্থানের নাম রাখা হয়েছে মাহবুবনগর। আমি পাকিস্তান আর্মির ২৫ মার্চ ক্রেক ডাউনের কয়েকদিনের মধ্যে ঢাকা পুরান এয়ারপোর্ট থেকে পালিয়ে ক্যাপ্টেন আকবর, ক্যাপ্টেন সালেক, আমিনুল হকসহ আমরা ৪ জন পদাতিক অফিসার মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। আমার এ বইয়ের "রণাঙ্গনের এক প্রান্তর" অধ্যায়ে বিস্তারিত রয়েছে।

যখনই চেতনার কথা চিন্তায় আসে, তখনই স্মৃতির পাতায় ভেসে আসে সেই যুদ্ধকালীন দিনগুলো। সেদিন বাংলার দামাল ছেলেরা জীবন বাজি রেখে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আর আমি তাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছি, রণাঙ্গনে তাদের নের্তৃত্ব দিয়েছি।

লক্ষ্য একটাই দেশকে শত্রুমুক্ত করে স্বাধীনতা অর্জন করব। তাই এ যুদ্ধ ছিল আমাদের গর্ব ও অহংকারের। আমরা চেয়েছিলাম নিজেদের হাতে দেশকে গড়ে তুলব। যেখানে থাকবে না কোনো হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণে উদ্বুদ্ধ হয়ে জাতি দলমত নির্বিশেষে এক কাতারে দাঁড়িয়েছিল। (স্বাধীনতা বিরোধীরা ছাড়া)। বঙ্গবন্ধু সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে আহ্বান জানিয়েছিলেন, শত্রুর মোকাবেলায় পাড়ায় পাড়ায় আওয়ামী লীগের নের্তৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তুলতে। এই মন্ত্রে দীক্ষিত বাঙালি জাতি চূড়ান্ত বিজয় অর্জনে তাঁর নের্তৃত্বে একটি স্বপ্ন বাস্তবায়নে সংকল্পবদ্ধ ছিল। তারই অনুপ্রেরণায় যুদ্ধের দিনগুলোতে আমরা হাজারো মায়ের কান্না, শিশুর আর্তনাদ ও বোনের হাহাকারের শোধ নিতে শত্রুর মোকাবেলা করেছিলাম। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নিষ্ঠুর বর্বরতা ইতিহাসখ্যাত চেঙ্গিস খানের বর্বরতাকেও হার মানিয়েছিল। যে কারণে মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধজয়ের সংকল্প আরও তীব্রতা লাভ করেছিল। গোটা বাংলাদেশই তখন ছিল রণাঙ্গন। আমরা গেরিলারা যখন শত্রু নিধনে দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিলাম, তখন পাকিস্তানি ও তাদের দোসরদের নিরীহ বাঙালির উপর চালানো অত্যাচারের করুণ চিত্র মুক্তিযোদ্ধাদের শত্রু আক্রমণে আরও বেপরোয়া করে তুলত। আরও শাণিত করত আমাদের যুদ্ধজয়ের চেতনা।

সেদিন আমরা বাংলার মাঠে-ঘাটে, নদীতে, রাস্তার পাশে পড়ে থাকতে দেখেছি নীরিহ বাঙালি কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, -নারী-বৃদ্ধ ও শিশুর অগণিত পরিত্যক্ত লাশ। এ ছিল পাকিস্তান হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসরদের নির্মম নির্যাতনের এক বেদনাদায়ক চিত্র। দেখেছি স্বজনহারাদের অসহায় আর্তনাদ ও আহাজারি। মা-বোনের চোখে দেখেছি নির্বাক অশ্রু। এর মধ্যেই এরাই মুক্তিযোদ্ধাদের দিয়েছিল খাদ্য-বস্ত্র-আশ্রয় ও সহায়তা। সেদিন মা-বোনেরা জায়নামাজে বসে দু'হাত তুলে দোয়া ও নিভৃতে অশ্রু বিসর্জন করেছিলেন। একটা অপারেশন শেষ করার কিছু দিন পর আমরা যখন আবার ওই এলাকায় যেতাম, তখন খবর নিয়ে জানতে পারতাম, পাক হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসররা ওই এলাকায় কারো বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে, কোথাও মা-বোনদের ওপর অত্যাচার চালিয়েছে, কোথাও বা উঠিয়ে নিয়ে গেছে তাদের। এর পাশাপাশি চালিয়েছিল গণহত্যা। এটা ছিল তখন গোটা বাংলাদেশে তাদের নিত্যনৈমিত্যিক অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতার দৃশ্য। তাই কত বীরের রক্তধারা, কত মায়ের অশ্রু, হাজারও বোনের হাহাকার, শিশুর আর্তনাদ আর এতিমের ঝাপসা দৃষ্টিতে আচ্ছন্ন হয়ে আছে এই ত্যাগের সংগ্রামী ঐতিহ্য।

প্রতিরোধ যুদ্ধ কিন্তু ২৫ মার্চ রাত থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। সেদিন ইপিআর, পুলিশ, মুজাহিদ, আনসার ও সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যারা, ছাত্র জনতা, কৃষক, শ্রমিক তথা সর্বস্তরের জনগণ একাকার হয়ে কোনো পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়াই নিজ নিজ এলাকায় দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ছিল প্রেরণার মূল উৎস। এ প্রতিরোধ যুদ্ধের ধারাবাহিকতায় প্রায় দু'সপ্তাহ সময়কালের মধ্যে একই উদ্দীপনা ও বুক ভরা সাহস ও শপথ নিয়ে পদার্পণ করল পরিকল্পিত স্বাধীনতা যুদ্ধের মূল পর্বে।

গেরিলা কায়দায় অ্যামবুশ, রেইড, গ্রেনেড অ্যাকশন, অনেক সময় সম্মুখ আক্রমণ সংঘবদ্ধভাবে বেড়েই চলছিল। আমার নের্তৃত্বে বৃহত্তম নোয়াখালীর (ফেনী, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর) গেরিলা ও সম্মুখ যুদ্ধের কিছু বিবরণ এ বইয়ের "রণাঙ্গনে এক প্রান্তর "অধ্যায়ে উল্লেখ রয়েছে।

রণাঙ্গনে সকল শহিদদের আমি এখনও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। শহিদদের স্বপ্নসাধ এখনও বাংলাদেশে পুরো বাস্তবায়িত হয়নি। আমরা সহযোদ্ধারা এখনও তাদের আর্তনাদ শুনতে পাই। তারা সেদিন আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলে গিয়েছিল " আমরা আমাদের বর্তমানকে উৎসর্গ করলাম, তোমাদের ভবিষ্যতের জন্য– ঘরে ফিরে গিয়ে সবাইকে একথা শুনাবে।" এই শহিদদেরও একটি ভবিষ্যৎ ছিল। তাদেরও পরিবার-পরিজনকে নিয়ে সুখী সমৃদ্ধ জীবন-যাপনে একটি লালিত বাসনা ছিল। তারা দেশকেও ভালোবাসত, নিজের হাতে নিজের দেশকে স্বপ্নের মতো গড়ে তুলবে– এই ছিল তাদের প্রত্যাশা। "মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি, মোরা একটি মুখের হাসির জন্য অস্ত্র ধরি"–এই ছিল তাদের দৃপ্ত শপথ। আজ তারা আমাদের মাঝে নেই, তাই স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে, আমাদের নিজের বিবেকের কাছে এই শহিদদের অর্পিত দায়িত্ব ও তাদের স্বপ্নসাধ আমরা কতটুকু বাস্তবায়ন করতে পেরেছি। সামাদ ছিল একজন ছাত্র। তার নের্তৃত্বে প্রশিক্ষিত ৫ জন মুক্তিযোদ্ধার একটি দল অক্টো/নভেম্বরের দিকে বিলোনিয়া রণাঙ্গণে আমার নিকট রিপোর্ট করে। আমি তাদেরকে ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে অন্যান্য গণযোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুত করি। ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সশস্ত্র বাহিনী, পুলিশ, আনসার, ইপিআর, মুজাহিদ মিলে প্রায় ২ হাজার যোদ্ধা ছিল। আমার অধিনায়কত্বে ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে পাইনোওনিয়ার প্লাটুনসহ শত শত গণযোদ্ধা ছিল। সেদিন আমি সামাদকে দেখেছি সব সময় হাসিমুখে থাকতে, তবে দায়িত্ব পালনে সে ছিল নির্ভীক এক সাহসী দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। আমি যখন কোনো শত্রুর অবস্থান রেকির জন্য যেতাম অনেকের মধ্যে আমি সামাদকেও নিয়ে যেতাম। প্রায়ই অবসরে তার সাথে কুশল বিনিময় করতাম। একদিন সে আমাকে বলেছিল– বাড়িতে তার বাবা-

মায়ের সাথে এক ছোট বোন ও এক ভাই আছে। বাড়ি তার সেনবাগ। তার আশা ছিল যুদ্ধ শেষে সে ফিরে যাবে তার বাবা-মা ও আদরের ছোট ভাই বোনের কাছে। যুদ্ধে যোগদানের জন্য মা-বাবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসার সময় তারা তাকে জড়িয়ে ধরে দোয়া করেছিল এবং বাড়ি ছেড়ে আসার প্রাক্কালে তার ছোট ভাই-বোনেরা তাকে হাত নেড়ে বিদায় জানিয়েছিল। রণাঙ্গনে আলাপকালে সেদিন সে আমাকে অগ্রিম দাওয়াত দিয়ে রেখেছিল এবং আবদার করে অনেক আগ্রহ সহকারে বলেছিল, স্যার– যুদ্ধ শেষে আপনি আমাদের বাড়িতে আসবেন। আমি তাকে কথা দিয়েছিলাম। তার কিছু দিন পরে আমাদের দ্বিতীয় বিলোনিয়া যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগ মুহূর্তে কয়েকজন সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য ও গণযোদ্ধাদের সাথে সামাদকে পশুরাম ও চিতোলিয়ার শত্রুর অবস্থান রেকি/পরিদর্শন করার জন্য পাঠানো হয়েছিল। শত্রুর অবস্থানের কাছাকাছি পৌছার আগেই এ রেকি দলটি শত্রুর পক্ষের এ্যাম্বুসে পড়ে। শুরু হয় চারদিক থেকে গোলাগুলি। সামাদ তার দলের বাকি সদস্যদেরকে বাঁচানোর জন্য তার নিজ অবস্থান থেকে কাভারিং ফায়ার দিচ্ছিল। অ্যাম্বুসে শত্রু পক্ষের অনেকেই হতাহত হয়েছিল। সামাদের অসাধারণ সাহসী ভূমিকায় আমাদের রেকি দলের বাকি সদস্যরা কাভারিং ফায়ারের বদৌলতে সেদিন বেঁচে গিয়েছিল। তখন বাকিরা কিছুটা কৌশলগত অবস্থান পরিবর্তন করে শত্রু পক্ষকে সম্পূর্ণভাবে ঘায়েল করতে সক্ষম হয়েছিল। শত্রু পক্ষের আশপাশের ঘাঁটি থেকে আগত আরেকটি দলের আক্রমণের মুখে পড়ে। সামাদ তাদেরকেও প্রতিহত করার জন্য শেষ পর্যন্ত লড়ে গিয়েছিল এবং বীরত্বের সাথে লড়তে লড়তে শেষ বিদায় নিল। সামাদের আর ফিরে যাওয়া হলো না মা-বাবার কোলে, চিরতরের জন্য বঞ্চিত হলো তার ভাই-বোন তার আদর থেকে।

আসলে যুদ্ধের সময়কালে প্রায় রণাঙ্গনে আমাদের অনেক সংরক্ষিত রেকর্ড ধ্বংস বা হারিয়ে গিয়েছিল। যে কারণে আমি অনেক খুঁজেও তার সন্ধান পাইনি। প্রায় তিন যুগ অতিবাহিত হওয়ার পরে সামাদের এক চাচার সাথে আমার পরিচয় হয়, সে সুবাদে তিনি আমার মুখ থেকে যুদ্ধের নোয়াখালীর বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক শহিদদের বিবরণ মন দিয়ে শুনেন। কিছুক্ষণ নীরব থেকে তিনি আমাকে খুব মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করলেন– স্যার আপনি সেনবাগের সামাদকে চিনতেন? জবাবে আমি বললাম – আপনি কি করে তাকে চিনেন! (তিনি সামরিক বাহিনীর একজন প্রাক্তন কর্মকর্তা ছিলেন) তিনি আমার থেকে সামাদ সম্পর্কে বিস্তারিত শুনে বললেন – স্যার, এ সেই আপনার সামাদ। তিনি আরো বললেন– এখন তার বাবা-মা কেউ বেঁচে নেই। তারা অনেকদিন ধরে তার পথ চেয়ে আসার অপেক্ষায় ছিল। দুঃখিনী মা-বাবা তাকে না দেখেই চলে গেলেন। তার ছোট ভাই-বোন

এখনও জীবিত আছেন। সামাদের ছবিটি আঁকড়ে ধরে এখনো তারা নিভৃতে কাঁদে। হয়তো যে কোনো মুহূর্তে তাদের ভাই বাড়ির আঙিনায় এসে তাদের নাম ধরে ডাকবে। এ আশা বুকে নিয়ে তারা এখনও আমরা দেখা করতে গেলে তারা অশ্রুসজল নয়নে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। তার চাচা আমাকে বলল- স্যার সামাদের নামে তার নিজ এলাকায় একটি লাইব্রেরি/একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা যায় না? সামাদ ছিল অবিবাহিত যুবক। পুরো বাংলাদেশে এ ধরনের হাজার হাজার গণযোদ্ধা শহিদ সামাদ রয়েছে। এদের মধ্যে শহিদের খাতায় অনেকের নাম উঠেছে, অনেকের নাম এখনও তালিকাভুক্ত হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। এদের মধ্যে ৮০-৯০ শতাংশই ছিল গণযোদ্ধা। এদেরকে এখন যদি শহিদ ভাতা দেওয়া হয়, অনেক ক্ষেত্রে তা ভোগ করার আজ কেউ নেই। তাই এদের স্মৃতি ধরে রাখার জন্য তাদের নিজ নিজ এলাকায় স্মৃতিস্তম্ভ বা অন্য কোনো মহতী উদ্যোগ নেওয়া যায় কিনা সে ব্যাপারে এখনও আমাদের করণীয় রয়েছে।

শহিদ হাবিলদার নুরুল ইসলাম (বীর বিক্রম)

ফেনীর মুন্সিরহাট যুদ্ধে মুক্তারবাড়ি পুকুর পাড়ে আমার বাঙ্কারের পাশে আরেকটি বাঙ্কারে ছিলেন হাবিলদার নুরুল ইসলাম। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে একজন চৌকস সেনাসদস্য ছিলেন। এ যুদ্ধে আমরা ফেনী শহরের উপকণ্ঠে শহরের দিকে মুখ করে পরিখা খনন করে ৩-৪ মাইল দীর্ঘ নিজস্ব ডিফেন্স গড়ে তুলেছিলাম। আমাদের লম্বা এই ডিফেন্সের সামনের দিকে ৮০০ গজ পর্যন্ত ঘন মাইন্ড ফিল্ড গড়ে তুলেছিলাম। প্রায় দু'মাসের ও অধিককাল আমরা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর মুখোমুখি তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত ছিলাম। এ যুদ্ধে পাকিস্তান তাদের ট্যাংকবহর আর্টিলারি থেকে নিয়ে আমাদের অনেক পিছনে হেলিকপ্টার থেকে কমান্ডো অবতরণসহ অনেক রণ-কৌশল ব্যবহার করেছিল। তারা এ সময়ের মধ্যে ৯-১০ বার আমাদেরকে ট্যাংকসহ সম্মুখ আক্রমণ করেছিল। তারা যখন সম্মুখ আক্রমণে আমাদের মাইন্ডফিল্ডে ঢুকে পড়ত তখনই মাইনগুলো খৈইয়ের মতো ফুটত। আমাদের সম্মুখে ৩-৪ মাইল ডিফেন্স থেকে তখন অন্যান্য অস্ত্রের সাথে গর্জে উঠত এলএমজিও এসএমজি। আমার বাঙ্কার থেকে অদূরে পুকুরের এক কোনায় ছিল সমান্তরাল রেখা বরাবর হাবিলদার নুরুল ইসলাম এর এলএমজির পোস্ট এবং পাশে ছিল সার্জেন্ট সাহাবউদ্দিনের আরেকটি এলএমজি পোস্ট। দু'পক্ষ থেকে আবার চলত কাউন্টার আর্টিলারি ফায়ার। এ দু'মাসের অধিককাল সময়ে এই আক্রমণগুলোতে পাকিস্তানের ৩০০শোর অধিক হতাহত হয়েছিল। হাবিলদার নুরুল ইসলাম যখনই সময় পেতেন এবং দু'পক্ষের

আক্রমণ ও ফায়ারিং বন্ধ থাকত তখন তিনি ডিফেন্সের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে বেড়াতেন আর সবার খোঁজ-খবর নিতে এবং সাহস যোগাতেন। একদিন পাকিস্তানিদের তীব্র ও সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে আমাদের পাল্টা আক্রমণ প্রায় প্রতিহত ও পর্যদস্ত হয়ে পড়ে। ঠিক ঐ মুহূর্তে শত্রুপক্ষ নুরুল ইসলাম ও সাহাবউদ্দিনের বাঙ্কার বরাবর অনেক কাছাকাছি চলে আসে তখন নুরুল ইসলাম খুব ক্ষীপ্রতার সাথে তার মোকাবেলা করতে থাকেন। শত্রুপক্ষ পিছনে হটে যেতে বাধ্য হয়। কিছুক্ষণের মধ্যে তাদের বৃষ্টির মতো আর্টিলারি ফায়ার শুরু হয়। এক আর্টিলারি সেলের আঘাতে হাবিলদার নুরুল ইসলামের শরীরের নিচ অংশ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায় এবং অবিরাম রক্তক্ষরণ হতে থাকে। ঐ দিকে পাশে সার্জেন্ট সাহাবউদ্দিন তার একটি পা হারান। হাবিলদার নুরুল ইসলামকে আমার বাঙ্কারের নিচে পুকুরের ঘাটে নিয়ে আসা হয়। তার রক্তক্ষরণে সেদিন সেই ছোট পুকুরের পানি লাল বর্ণ ধারণ করেছিল। নুরুল ইসলাম কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের থেকে চির বিদায় নিয়ে গেলেন। যাওয়ার সময় তিনি কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলে গেলেন স্যার– স্বাধীনতা দেখে যেতে পারলাম না, আপনারা চালিয়ে যান। একটু দূরে আমাকে মসজিদটির পাশে রাখবেন। জয় বাংলা বলে সর্বশেষ কালেমা পড়ে তিনি আমাদের থেকে বিদায় নিলেন। আমরা সবাই তাকে বশিকপুর গ্রামের মসজিদের পাশে সমাধিস্থ করি।

গণযোদ্ধা শহিদ কচি

হাবিলদার ইউনুছসহ যাচ্ছিল এক অ্যাম্বুস অভিযানে। এই প্লাটুনের কমান্ডার ছিল গণযোদ্ধা শাখি। তারই প্লাটুন হাবিলদার ছিল ইউনুছ। কোম্পানি কমান্ডার ছিল ক্যাপ্টেন মোখলেছুর রহমান। সেদিন এ প্লাটুনটি ভারতীয় সীমান্তের পাশে বাংলাদেশের সিলোনিয়া নদী অতিক্রম করে ঘোষাইপুর গ্রাম হয়ে ফুলগাজির নিকটবর্তী তাদের টার্গেটে যাওয়ার কথা। এ প্লাটুনে প্রায় বেশিরভাগ ছিল গণযোদ্ধা/মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযোদ্ধা মোসলেউদ্দিন কচি ফেনী কলেজের ২য় বর্ষের ছাত্র ছিল। তার সাথে আরো ছিল মুক্তিযোদ্ধা (ছাত্র– মানিক, আজিজ আরো অনেকে)। নদী অতিক্রম করার পরে টার্গেটে পৌঁছার আগেই ফুলগাজির ঘোষাইপুর গ্রামে পাকিস্তানিদের এক অ্যাম্বুসের মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে যায়। তখন দু'পক্ষের মধ্যে শুরু হয় তুমুল গোলাগুলি। যেহেতু মুক্তিযোদ্ধারা সবাই ছিল ফেনীর ছেলে তাই ঐ এলাকা তারা চিনত। এ সংঘর্ষ শুরু হয় মধ্যরাতে এবং চলে ভোর পর্যন্ত। এ অভিযানে মুক্তিযোদ্ধারা চার ভাগে বিভক্ত ছিল। কচির সাথে যারা ছিল, যেহেতু এলাকার ভৌগোলিক অবস্থান জানা ছিল, তারা রাতে অন্ধকারে ক্রলিং করে সুবিধাজনক অবস্থান থেকে শত্রুর একটা অংশকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস

করে দেয়। রাত তখন প্রায় শেষ হয়ে আসছিল। কচির গ্রুপটি কৌশলগতভাবে স্থান পরিবর্তন করে তার প্লাটুনের বাকিরা যেন শত্রুর অবরোধ থেকে নিরাপদে বেরিয়ে আসতে পারে সেজন্য কভারিং ফায়ারের মাধ্যমে শত্রু পক্ষের উপরে চাপ সৃষ্টি করে। ভোরে তার প্লাটুনের বাকি তিন গ্রুপ ভোরের মধ্যে অবরোধ থেকে বেরিয়ে সিলোনিয়া নদী অতিক্রম করে ভারত সীমান্তে ভারতীয় গাবতলী এলাকায় চলে আসে। এর মধ্যে আমাদের পক্ষ থেকে শত্রুর ওপর আর্টিলারি ফায়ার শুরু করি যেন কচি গ্রুফ নিরাপদে আসতে পারে। কচি গ্রুপ ও তাদের পক্ষ থেকে ফায়ার করতে করতে নিরাপদ অবস্থানে চলে আসে। তখনও কচি শত্রুর ওপরে তার ফায়ার অব্যাহত রাখে যেন তার সঙ্গীরা নিরাপদে নদী অতিক্রম করতে পারে। তার বাকি সঙ্গীরা নিরাপদে নদী অতিক্রম করে ফেলল কিন্তু কচি শেষ মুহূর্তে নদী অতিক্রম করার সময় শত্রু পক্ষের ব্রাশ ফায়ারে চরমভাবে আহত হয়। তার সঙ্গীরা কচিকে আহত অবস্থায় সীমান্তের নিরাপদ স্থানে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়। এ খবর শুনে আমি রণাঙ্গনের অন্য প্রান্ত থেকে ছুটে আসি তখনও কচি জীবিত ছিল। আমি এসে কচিকে সান্ত্বনা দিলাম এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করলাম। এরই মধ্যে প্রচুর রক্তক্ষরণে কচি আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে আসল এবং ঘণ্টা খানেকের মধ্যে আমাদের থেকে চির বিদায় নিয়ে গেল। পরে আমরা তাকে সীমান্ত সংলগ্ন কালা পীর মাজারের কাছে সমাহিত করি।

শহিদ এয়ার আহম্মদ (বীর বিক্রম)

নভেম্বরের অন্ধকার শীতের রাত। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। হিমেল হাওয়ায় গাছের পাতায় যেন একটি শরীরী শব্দ সৃষ্টি হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল সমস্ত রাতটা যেন কোনোকিছুর প্রতীক্ষায় আছে। রাত আনুমানিক ১০-৩০ মিনিট। আমাদের অনুপ্রবেশের কাজ শুরু হলো। আমরা এমন একটা এলাকা ঘেরাও করার অভিযানে নেমেছি যার তিন দিকই ছিল ভারত-সীমান্ত দ্বারা বেষ্টিত। আমরা তাই ভারতের এক প্রান্তের সীমান্ত থেকে পরশুরাম-চিথলিয়ার মাঝ দিয়ে অগ্রসর হয়ে ভারত-সীমান্তের অপর প্রান্ত পর্যন্ত অবরোধ করার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমাদের এ অবরোধ যদি সফল হয় তবে শত্রুরা সহজেই ফাঁদে আটকা পড়বে।

অবরোধের কাজ শুরু হলো। অন্ধকার রাতে মুহুরী নদী ও ছিলনিয়া নদীর কোথাও বুকপানি, কোথাও কোমরপানি, কোথাওবা পিচ্ছিল রাস্তার বাধা পেরিয়ে এগিয়ে চলেছি সবাই। সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা! অন্ধকার রাত। সামান্য কাছের লোককেও ভালো করে দেখা যাচ্ছিল না। কমান্ডার হিসেবে সবাইকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত করে আমাদের নির্ধারিত গন্তব্যস্থানে পৌঁছানো সত্যই কষ্টকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তবুও সব বাধাকে তুচ্ছ করে আমরা এগিয়ে চললাম এবং সাথে

সাথে আমি আমার দলের অন্যান্য অফিসারদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চললাম। প্রথমে মুহুরী নদী অতিক্রম করল লে. মিজানুর রহমানের নের্তৃত্বে 'বি' কোম্পানি' ও লে. দীদারের নের্তৃত্বে 'ডি' কোম্পানি। লে. মোখলেসুর রহমান সমর্থনের দায়িত্ব পালন করছিলেন। এই দুই কোম্পানির পরে ১০ম ইস্ট বেঙ্গলের হেডকোয়ার্টার কোম্পানি ও ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট থেকে আগত ক্যাপ্টেন হেলাল মোরশেদের নের্তৃত্বে আর একটি কোম্পানিসহ আমি নদী অতিক্রম করে সবাই পূর্বর্নির্ধারিত এলাকায় অবস্থান গ্রহণের উদ্দেশ্যে যাত্রা অব্যাহত রাখি। ওই দিকে লে. ইমাম-উজ-জামান-এর নের্তৃত্বে 'এ' কোম্পানি চিথলিয়া ঘাঁটি বরাবর রেজিমেন্টের সদর দপ্তর ও ২য় ইস্ট বেঙ্গলের কোম্পানির সঙ্গে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রসর হতে থাকে। নিঃশব্দ হয়ে সবাই অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পথ চলছি। কারো মুখে কোনো কথা নেই। শত্রুরা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারল না যে ওদেরকে জালে আটক করার জন্য আমরা এগিয়ে আসছি। শত্রুরা যদি আমাদের এ অনুপ্রবেশ টের পায় তবে আমাদের সমস্ত পরিকল্পনাই বানচাল হয়ে যাবে, কারণ যুদ্ধক্ষেত্রে গোপন অনুপ্রবেশ যদি অপরপক্ষ টের পায় তবে পরিকল্পিত অভিযান সফল করা সম্ভব হয় না। আমরা আরও অনেক পথ এগিয়ে এলাম। তবে অন্ধকার রাতে নির্ভুল পথে এগিয়ে যাওয়া সত্যিই বেশ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার ছিল। এ ছাড়া আরও একটা ভয়ের সম্ভাবনা ছিল। শত্রুপক্ষের লোকেরা রাতে বিভিন্ন জায়গায় পেট্রোলিং-এ ছিল। তাদের খপ্পরে পড়াও বিচিত্র ছিল না। সে ভয় আমাদের অমূলক ছিল না। আমরা যখন রেলওয়ে ও কাঁচা রাস্তার কাছাকাছি এগিয়ে এলাম তখনই দেখলাম শত্রুপক্ষের ডিউটিরত একটি দল রেললাইন ধরে সামনের দিকে এগিয়ে আসছে। আমরা সন্তর্পণে লুকিয়ে গেলাম--– কেউবা রাস্তার আড়ালে, কেউবা জমিনের আইলের আড়ালে। ওরা কিছুই টের পেল না। নিশ্চিত মনে গল্প করতে করতে চলে গেল, বিপদ কেটে গেল। এদিকে রাত বাড়ছে। আমি তাড়াতাড়ি আমার কোম্পানি কমান্ডারদের সাথে যোগাযোগ করলাম। ওরা জানাল, সব ঠিক আছে। ওরা নিরাপদেই অবরোধের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ভোর হবার বেশি বাকি নেই। আমরা আমাদের নির্ধারিত স্থানে হাজির হলাম এবং এর ফলে শত্রুদের পরশুরাম ও বিলোনিয়া ঘাঁটি পুরোপুরি আমাদের অবরোধের মাঝে আটকা পড়ল।

শত্রুদের চিথলিয়া ঘাঁটির দিক থেকে যাতে কোনো প্রকার আক্রমণ না আসতে পারে তার জন্য আমরা প্রতিরোধ গড়ে তুললাম। ভোর হয়ে আসছিল। আমরা প্রতিরোধের সকল ব্যবস্থা শেষ করতে লাগলাম। বাঙ্কার খোঁড়ার কাজ শুরু হলো এবং অন্যান্য সব ব্যবস্থাও করতে লাগলাম। পথশ্রমে ও ক্ষুধার তাড়নায় সবাই ক্লান্ত। তবুও বিশ্রামের সময় নেই। ভোরের আলো ফুটবার আগেই

প্রতিরোধের কাজ শেষ করতে হবে। তাই প্রাণপণে সবাই কাজ করতে লাগলাম। ভোর হলো। আমরাও সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে গেলাম। শত্রুরা আমাদের অবরোধের মাঝে। এই সফলতার খবরটা জেনারেল হীরাকে জানাতে ইচ্ছে হলো। ওয়্যারলেসে জেনারেল হীরাকে জানালাম যে, শত্রুকে আমরা পুরোপুরি জালে আটকিয়েছি। খবরটা শুনে জেনারেল হীরা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। ধন্যবাদ দেবার সময় খুশিতে তাঁর কথা আটকে যাচ্ছিল। আমি আমার চ্যালেঞ্জে জিতেছি বললে জে. হীরা ব্যক্তিগতভাবেও আমাকে প্রচুর ধন্যবাদ জানালেন। এদিকে ভোরের আলোয় চারদিক আলোকিত হয়ে উঠছিল। ভোরের আলোয় চারদিকে ভালো করে দেখতে লাগলাম। তারপর বুঝতে চেষ্টা করলাম যে, শত্রুরা আমাদের অনুপ্রবেশ টের পেয়েছে কি না। কিন্তু না, তা বোঝার কোনো উপায় নেই, চারদিক নীরব। কোথাও মানুষের কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছিল না।

বিলোনিয়া থেকে রেললাইনের সাথে সমান্তরালভাবে একটি কাঁচা রাস্তাও চলে এসেছে ফেনী পর্যন্ত। এই রাস্তার পাশেও আমাদের বেশ কিছু বাঙ্কার গড়ে উঠেছে। বাঙ্কারে বসে সবাই সামনের দিকে চেয়ে আছি। বেশ কিছু সময় কেটে গেল। হঠাৎ দূর থেকে একটা ট্রলির আওয়াজ অস্পষ্ট শুনতে পেলাম। শব্দটা চিথলিয়ার দিক হতেই আসছে বলে মনে হলো। রেললাইন ও রোডের কাছের বাঙ্কারে যারা ডিউটিতে ছিল তাদের মধ্যে হাবিলদার এয়ার আহাম্মদ ছিল খুবই সাহসী। যুদ্ধের প্রথম থেকেই সে আমাদের সাথে থেকে নির্ভীকভাবে লড়াই করে আসছিল।

ট্রলিটা এগিয়ে আসছে। সবাই প্রতীক্ষায় বসে রইল। আস্তে আস্তে ট্রলির শব্দটা আরও কাছে এগিয়ে আসছে। আমরা পরিষ্কারভাবে দেখতে পেলাম, কয়েকজন সৈন্য বেশ কিছু অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে এগিয়ে আসছে। ওরা নিশ্চিন্ত মনেই আসছে। ওরা বুঝতে পারেনি যে ওদের শত্রু এত কাছে রয়েছে।

এক-দুই-তিন। সেকেন্ডের কাঁটা ঘুরতে লাগল। ট্রলিটা একেবারে কাছে এসে গেল। এয়ার আহাম্মদ ও তার সঙ্গীদের হাতের অস্ত্রগুলো একসঙ্গে গর্জে উঠল। মুহূর্তের মধ্যে জায়গাটা ধোঁয়ায় ঢেকে গেল। অনবরত ফায়ারিং-এর শব্দে চারদিক মুখরিত হয়ে উঠল। শত্রুরা অনেকেই পালাতে চাইল, কিন্তু আমরা তা সম্ভব হতে দিলাম না। একজন শত্রুও প্রাণে বাঁচতে পারল না। আনন্দে এয়ার আহাম্মদ ও তার সঙ্গীরা 'জয় বাংলা' ধ্বনি দিয়ে চিৎকার করে উঠল। উত্তেজনায় ও আনন্দে ওদের সারা শরীর কাঁপছিল। ফায়ারিং-এর শব্দ শুনে চিথলিয়া ও পরশুরাম ঘাঁটির শত্রুরা মনে করল, তাদের ট্রলিটা হয়তোবা মুক্তিবাহিনীর কোনো গেরিলা দলের

হাতে পড়েছে। প্রকৃত অবস্থাটা তারা কিন্তু তখনও বুঝতে পারেনি। তখন দু'দিক থেকেই শত্রুরা আক্রমণ শুরু করল।

শত্রুর ফায়ারিং শুরু হওয়ার কিঞ্চিৎ আগেই এয়ার আহাম্মদ আনন্দে বাঙ্কার ছেড়ে উঠে দৌড়ে গেল অদূরে পড়ে থাকা শত্রুদের মৃত অফিসারটির কাছে। গোলাগুলির সম্ভাবনার কথা সে যেন মুহূর্তের জন্য ভুলে গেল। অফিসারের পকেট থেকে সে পিস্তলটি উঠিয়ে নিল। তারপর তাকে টেনে নিয়ে আসতে লাগল নিজ বাঙ্কারের দিকে। ঠিক তখনই শত্রুদের চিথলিয়া ঘাঁটির দিক থেকে একটি বুলেট এসে বিঁধল এয়ার আহাম্মদের মাথায়। চোখের সামনেই দেখতে পেলাম ওর শরীরটা যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেল। ঢলে পড়ল বাঙ্কারের মুখে। রক্তে ঢেকে গেল ওর জয়ের আনন্দে উদ্দীপ্ত মুখটা। নিজের প্রাণ দিয়ে এয়ার আহাম্মদ শত্রুদের ঘায়েল করেছে। কিন্তু এর শেষ দেখে যাওয়া তার কপালে রইল না।

৬ নভেম্বর দিবাগত রাতে ফেনীর মাঝামাঝি স্থানে উত্তরে চিতলিয়া ও দক্ষিণে চন্দনার ভেতর দিয়ে আমি ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিকদের নিয়ে অনুপ্রবেশ করি। শীতের সে রাতে গভীর বর্ষণ ও বজ্রপাত হচ্ছিল। আমরা চিতলিয়া, গুতুমা, সলিয়া, ধনিকুণ্ডা, চন্দনা এলাকায় একটি অভূতপূর্ব এবং বিস্ময়কর প্রতিরক্ষা অবস্থান গ্রহণ করি। একটি প্রতিরক্ষা উত্তর দিকে মুখ করে (যেদিকে পাকিস্তানি ২৪ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রেজিমেন্ট) অপরটি দক্ষিণ দিকে অর্থাৎ ফেনীর দিকে মুখ করে (যেদিকে ১৫ বালুচ রেজিমেন্ট)। পাকিস্তানিরা সকল অর্থেই অকার্যকর হয়ে পড়ে। পরাজয় ছাড়া তাদের আর কোনো পথ খোলা ছিল না। ১০ নভেম্বর ১৫ বালুচের একজন ক্যাপ্টেন ৭২ জন সৈন্যসহ আত্মসমর্পণ করে।

মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল তখন শিখরে। এখন দক্ষিণে ফুলগাজি, মুন্সিরহাট, বন্দুয়া হয়ে ফেনী দখল করা। আমাদের হারুন সব সময়, সব কিছুতেই সিরিয়াস। লেখাপড়ায়, নামাজে-কালামে তার বিশেষ মনোযোগ। কাজকর্মে তো বটেই, কথাবার্তায়ও সে সাবধানী। সবই করে সে ভেবেচিন্তে। মন্দ কিছুর জন্য তার জন্মই হয়নি। অযথা বেশি ঝুঁকি নিতে মানা করে বন্ধুদের। বলে, মরেই যদি যাস, তবে আরেকটা যুদ্ধ করবি কীভাবে?

ফেনীমুখী অগ্রাভিযানের আগে প্রথম কাজ পাকিস্তানের পুঁতে যাওয়া পথের মাইন অপসারণ করা। হারুন তার কমান্ডার গোলাম মুস্তাফাকে বলে, মুতিরহাট হয়ে যখন যাব, তখন একটা মিনিট আমাকে দিয়ো। একটু মাকে দেখে আসব। মুস্তাফা হাসিমুখে সায় দেয়। গ্রামের কাঁচি, খুন্তি দিয়ে মাইন তোলা। প্রায় সবই পিণ্ড! নন-ডিটেক্টেবল অ্যান্টি-পারসোনাল মাইন। সেদিনই (১০ নভেম্বর) চিতলিয়া রেলস্টেশনের লাইনের ওপর বিকট শব্দে একটি মাইন বিস্ফোরিত হয়। রেল

লাইনের পাথরগুলো গুলির বেগে ছুটে গিয়ে আহত করে সহযোদ্ধা মুস্তাফা, শহিদসহ আরও অনেককে। তারা রক্তাক্ত হয়। দেখা যায় হারুন 'মা– রে, অ-মা' বলে চিৎকার দিয়ে চিতিয়ে পড়ে আছে। ডান পায়ের গোড়ালি ওপর থেকে উড়ে গেছে। পায়ের উপরের অংশের মাংস চিরে ঝুলে আছে। সেদিনই তাকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ফিল্ড হসপিটালে ভর্তি করা হয়। ১২ নভেম্বর তাকে স্থানান্তরিত করা হয় মুক্তিযোদ্ধাদের নির্মিত হাসপাতাল বিশ্রামগঞ্জের বাংলাদেশ হাসপাতালে। হারুনের পায়ে গ্যাংগ্রিন হয়ে যায়।

হারুনের নিয়তিতে মায়ের শেষ দর্শন ছিল না। হারুন মারা যায় বহু কষ্টভোগের পর। কবে, আমরা জানি না।[১]

---

১ মেজর কামরুল ইসলামের লিখিত বই "শ্রেষ্ঠ সময়ের কথা"

বিলোনিয়ায় পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর প্রথম আত্মসমর্পণ

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে আত্মসমর্পণপর্বে পৌঁছাতে বাঙালিকে অনেক রক্ত দিতে হয়েছে। অদম্য সাহস আর অসামান্য ত্যাগের মানসিকতা সম্বল করে নামা সেই যুদ্ধে ফেনীর বিলোনিয়ায় পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণ ছিল স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নধারীদের জন্য আশাজাগানিয়া খবর। তুমুল এক যুদ্ধ শেষে ১০ নভেম্বর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ৭২ জন সৈনিক আত্মসমর্পণ করেছিল।

সেই যুদ্ধে নের্তৃত্ব দিয়েছিলেন বাঙালি সেনা কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কর্নেল জাফর ইমাম। প্রচলিত যুদ্ধরীতির বাইরে গিয়ে সাজানো হয়েছিল রণকৌশল।

জাফর ইমাম গতকাল সোমবার প্রথম আলোকে বলেন, একাত্তরের নয় মাসে বিলোনিয়ার পাশাপাশি সালদা নদী, হিলি, গঙ্গাসাগর জামালপুরসহ অনেক সম্মুখযুদ্ধ হয়েছিল। সেসব যুদ্ধের রণকৌশল এখনও ভারত-বাংলাদেশের সামরিক স্কুলে পড়ানো হয়। তিনি বলেন, যারা রণাঙ্গনে সম্মুখ ও গেরিলা যুদ্ধ করেছেন, তাদের মাধ্যমে যুদ্ধের সঠিক ইতিহাস নতুন প্রজন্মকে জানানোর এখনও সুযোগ আছে।

বিলোনিয়া এলাকাটি ফেনী জেলার পরশুরাম উপজেলায়। ওপারে ভারতের ত্রিপুরা। বর্তমানে এটি একটি স্থলবন্দর। ওপারের জায়গাটির নামও বিলোনিয়া।

একাত্তরের যুদ্ধক্ষেত্র বিলোনিয়া উত্তর-দক্ষিণে দৈর্ঘ্য ১৬ মাইল আর পূর্ব-পশ্চিমে প্রস্থে ছয় মাইল। এলাকাটি তিন দিক দিয়ে ভারতঘেরা। দেখতে অনেকটা উপদ্বীপের মতো। এর ভেতর দিয়ে উত্তর-দক্ষিণে বয়ে গেছে মুহুরী নদী।

দেশের ভেতরে একটি দপ্তর স্থাপনের জন্য মুক্তিবাহিনীর শীর্ষ কমান্ডাররা বিলোনিয়াকে বেছে নিয়েছিলেন। এখানে দুটি বড় যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। প্রথম যুদ্ধটি হয় জুন-জুলাই মাসে; প্রায় দেড় মাস স্থায়ী হয়। তাতে ৩৭ জন মুক্তিযোদ্ধা শহিদ হন। পাকিস্তান বাহিনীর ৩০০ জন হতাহত হয়। পরে মুক্তিবাহিনী কৌশলগত কারণে দুই মাইল পেছনে গিয়ে মুহুরী নদীর তীরে ঘাঁটি করে।

দ্বিতীয় যুদ্ধটি ছিল ভয়াবহ। এর অনুপুঙ্খ বর্ণনা পাওয়া যায় যুদ্ধে অংশ নেওয়া লেফটেন্যান্ট কর্নেল জাফর ইমাম, মেজর জেনারেল ইমাম-উজ-জামান ও

মেজর জেনারেল গোলাম হেলাল মোরশেদ খানের লেখায়। তিনজনই বীর বিক্রম খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা।

বিলোনিয়া যুদ্ধ নিয়ে এই তিনজনসহ তাঁদের বেশ কয়েকজন সহযোদ্ধার স্মৃতিকথা প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন বই ও সংকলনে। তাতে ওই যুদ্ধের অনুপুঙ্খ বর্ণনা ফুটে উঠেছে। ১৯৭১ সালের ৫ নভেম্বরকে আক্রমণের দিন ঠিক করে প্রস্তুতি নিয়েছিল মুক্তিবাহিনী। ৪ নভেম্বর মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে রাতের অন্ধকার ফুঁড়ে মুক্তিবাহিনী ঢুকে পড়ে অপারেশন এলাকায়। সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট মিজানের নের্তৃত্বে ব্রাভো কোম্পানি এবং সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট দিদারের নের্তৃত্বে চার্লি কোম্পানি প্রথমে অগ্রসর হয়। চার্লি কোম্পানির পেছনে ছিল ক্যাপ্টেন মোরশেদের নের্তৃত্বাধীন দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গলের একটি কোম্পানি। এর পেছনে ছিলেন এই যুদ্ধের অধিনায়ক মেজর জাফর ইমাম। লেফটেন্যান্ট ইমাম-উজ-জামানের নের্তৃত্বাধীন আলফা কোম্পানি মুহুরী নদীর পূর্ব পাড়ে ধনিকুণ্ডা এলাকায় অবস্থান নেয়। এই দলগুলো শত্রুর প্রতিরক্ষা অবস্থান ফাঁকি দিয়ে মুহুরী নদী পার হয়ে সলিয়ায় যায়। এই সলিয়াতেই হয়েছিল সম্মুখযুদ্ধ, যেখানে একটি স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করা হয়েছে।

৬ নভেম্বর সকালে একটি রেল-ট্রলিতে করে পাঁচজন জওয়ানসহ পাকিস্তানি একজন অফিসার সলিয়ার দিকে যাওয়ার সময় ব্রাভো কোম্পানির হাবিলদার এয়ার আহাম্মদের এলএমজির আওতায় চলে আসে। মুহূর্তেই এয়ার আহাম্মদ ট্রলিটি ঝাঁজরা করে ফেলেন। সব পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। এয়ার আহাম্মদ এতই উত্তেজিত হয়ে পড়েন যে তিনি পরিখা ছেড়ে ট্রলির দিকে ছুটতে থাকেন। ইতোমধ্যে পাকিস্তান সেনাবাহিনী প্রতি-আক্রমণ করে এবং এয়ার আহাম্মদ শহিদ হন। এয়ার আহাম্মদের রক্তের ওপর দিয়ে চলা সেই যুদ্ধ কয়েক দিন মাত্র স্থায়ী হয়। ক্ষুদ্রাস্ত্র, মর্টারের গোলা, ১০৬ মিমি রিকয়েললেস রাইফেল, জঙ্গিবিমান নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েও শেষরক্ষা হয়নি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর।

ভারতীয় ৮৩ মাউন্টেন ব্রিগেড সীমান্ত বরাবর সমবেত ছিল। কিন্তু ৯ নভেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তান সেনাবাহিনী প্রতিরোধ করে যাচ্ছিল। এ অবস্থায় যৌথ বাহিনী সর্বাত্মক ও সমন্বিত আক্রমণে যায়। তুমুল যুদ্ধের পর পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করেন। ১০ নভেম্বর ভোর নাগাদ সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয় বিলোনিয়া। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ২০০ জন হতাহত হয়। দুজন অফিসারসহ ৭২ জন পাকিস্তানি সৈনিক আত্মসমর্পণ করে মুক্তিবাহিনীর কাছে।[১]

---

১ দৈনিক প্রথম আলো ১লা ডিসেম্বর ২০১৫

ফেনী জেলার শালধর যুদ্ধ

বর্তমান ফেনী জেলার পরশুরাম উপজেলার চিথলিয়া ইউনিয়নে শালধর বাজার অবস্থিত। সাকির প্লাটুন ১০ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কিছু সৈনিক নিয়ে পশ্চিম দিক থেকে পাকসনোদের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত শালধর সীমান্ত ফাঁড়িটি আক্রমণ করে। এ যুদ্ধে প্রায় ৫০ জনের মতো পাক-সেনা নিহত হয়। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে দাউদ মিয়া, পিতা আব্দুস সামাদ, গ্রাম-সলিয়া এই যুদ্ধে শহিদ হন। তাদের মৃতদেহ পাওয়া যায়নি। অনবরত একদিন ও এক রাতে যুদ্ধ চলার পর দুই দিনের জন্য শালধর বাজার এলাকা শত্রুমুক্ত হয় এবং মুক্তিযোদ্ধারা 'জয় বাংলা' ধ্বনি দিয়ে শালধরে স্বাধীন বাংলার পতাকা ওড়ায়। দুইদিন পর পাকসেনারা পুনরায় সংগঠিত হয়ে শালধর দখল করে মালিপাথর গ্রামের ২১ জনকে লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করে এবং সমগ্র মালিপাথর গ্রামে আগুন ধরিয়ে দেয়।[১]

মতিনের প্রত্যাখ্যান

১৯৭৪ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জনাব ভুট্টো বাংলাদেশ সফরে আসেন তখন আমি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রভোস্ট মার্শাল এর দায়িত্বে ছিলাম। OC-MP ক্যাপ্টেন মতিন চৌধুরী। আমার উপর নির্দেশ আসল ভুট্টোকে মিলিটারি পুলিশ Escort দেওয়ার জন্য। আমি OC-MP ক্যাপ্টেন মতিন এর সাথে এই ব্যাপারে আলাপ করি। সে বলল আমরা মুক্তিযোদ্ধা অফিসার হিসেবে Escort দেওয়া নৈতিকভাবে উচিত হবে না। আমি তার সাথে একমত হলাম। এটা ছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বহিঃপ্রকাশ।

**** আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য গর্ব ও অহংকার এই স্বাধীনতা যুদ্ধ। এই স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনাকে আমাদের সব কিছুর বিনিময়ে সর্বদা সমুন্নত রাখতে হবে এবং এ ব্যাপারে থাকতে হবে আপসহীন ভূমিকা। আমরা অনেক সময় এ চেতনাকে খুঁজে বেড়াই। আজও অনেকে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের বছরকে গণ্ডগোলের বছর বলে। মুক্তিযুদ্ধকে বিতর্কিত করার জন্য নানা ধরনের দুরভিসন্ধিমূলক উক্তি করে থাকেন। অনেক সময় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে অনেক মীমাংসিত বিষয়ে আমরা নিজেরাই বিতর্কে জড়িয়ে পড়ি। এর ফলে আমাদের চেতনার ঐক্যে অনেক সময় ফাটল সৃষ্টি হয়। রাজনৈতিক কাঁদা ছোড়া ছুড়ির কারণে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিগুলোর মধ্যে পরস্পরের প্রতি

---

১ আলহাজ মোঃ ফখরুল ইসলামের লিখিত বই "মুক্তিযুদ্ধে বৃহত্তর নোয়াখালী"

শ্রদ্ধাবোধ, সহমর্মিতা ও ধৈর্যের অভাব দেখা যায়। স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বাধীনতা পক্ষের সব শক্তির সমন্বয়ে একটি বৃহত্তম জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির কোনো বিকল্প নেই। এ জন্য হয়তো আমাদেরকে আরো অনেক দূর পথ চলতে হবে। শুধু সতর্ক থাকতে হবে কোনো অবস্থায় জাতি যেন আমাদের কোনো ভুলের কারণে বিভক্ত হয়ে না পড়ে। আমাদের মধ্যে অনেক সময় আমরা দেশপ্রেমের ঘাটতি দেখি। আর এ ঘাটতি থাকলে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনা কোনোদিন বিকশিত হবে না। অনেক সময় খুব সূক্ষ্মভাবে একটি বিষয় আমরা প্রায় লক্ষ করে থাকি যে এক শ্রেণির লোক নিজেদেরকে প্রো-পাকিস্তানি মনে করে। আবার পাকিস্তানের সমালোচনা করলে এরা মনে খুব আঘাত পায়। একইভাবে আরেক শ্রেণি নিজেদেরকে প্রো-ভারতীয় মনে করে এরা আবার ভারতের বাড়তি সমালোচনা করলে ক্ষুব্ধ হয়। আসলে সবাইকে হতে হবে আমাদের দেশের পক্ষে। অর্থাৎ প্রো-বাংলাদেশি। দেশপ্রেম ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এ চিন্তা-চেতনা ও উপলব্ধিতে একদিন উদ্ভাসিত করবে। আরেকটি বিষয় আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই যে, ইতিহাসে যার যেটা প্রাপ্য তা অনেক সময়ে রাজনৈতিক কারণে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সঠিকভাবে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়। এটা শুধু আমাদের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি করে না চেতনার ঐক্য সৃষ্টির পথেও অন্তরায় সৃষ্টি করে। আমরা প্রায় লক্ষ করি বিশেষ করে টেলিভিশন টকশোগুলোতে অনেকে বঙ্গবন্ধুকে বঙ্গবন্ধু না বলে শুধু শেখ মুজিব বলেন। জিয়াকে শহিদ জিয়া উল্লেখ করেন আর বঙ্গবন্ধুকে প্রয়াত বা মরহুম বলে আখ্যায়িত করেন। বিভিন্ন চ্যানেলগুলোও তাদের কোনো করণীয় আছে বলে মনে করেন না। এ সার্বিক আচরণটি অত্যন্ত দুঃখজনক এবং আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের পরিপন্থি বলে আমি মনে করি। বঙ্গবন্ধুকে খাটো করে দেখার এ প্রবণতা ঘরোয়া পরিবেশে অনেকে স্বীকার করে তাদের নেতাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যভাবে সমালোচনা করার কারণে তারা প্রকাশ্যে বঙ্গবন্ধু বলে না। এরা এটাও মনে করে এ ধরনের আচরণ করলে তারা তাদের দলীয় আনুগত্য আরো বেশি প্রমাণ করতে পারবে। এর বিপরীতে অন্যেরা মনে করে বাড়তি সমালোচনা করতে পারলে তারাও তাদের দলের মধ্যে আনুগত্য আরো বেশি দৃশ্যমান করতে পারবে। এ যেন এক প্রতিযোগিতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি মনে করি, এক্ষেত্রে দুই পক্ষেই নৈতিক অবক্ষয়ের পরিচয় দিয়ে থাকে। ইতিহাস বিকৃতির দিকে কারো কোনো খেয়াল নেই। এ ব্যাপারে সব পক্ষের মধ্যে একটি সুন্দর সমঝোতা সৃষ্টি হওয়া উচিত। এখান থেকে আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম শিখবে এবং ভবিষ্যতে স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে এগিয়ে যাবে।

স্বাধীনতার ৪৩ বছর পরে এসে মুক্তিযোদ্ধাদের বড় চাওয়া-পাওয়া তাদের অবদানের স্বীকৃতি ও যথাযথ সম্মান। আমরা যদি জাতির সামনে সঠিকভাবে ইতিহাস তুলে ধরতে ব্যর্থ হই তাহলে, মুক্তিযোদ্ধাদের সত্যিকারের অবদানের স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠিত হবে না। তাই অনেক মুক্তিযোদ্ধা বলে থাকেন, আমাদের অবদানের স্বীকৃতিই যদি না থাকে তাহলে কে আমাদের সম্মান দেখাবে?

মাত্র কয়েকদিন আগে পরশুরাম উপজেলার একজন মুক্তিযোদ্ধা বললেন, আমাদের উপজেলার বাবুর্চি কাশেম যুদ্ধকালে ক্যাম্পে রান্নবান্না করতেন। সেই সুবাদে তাকে মুক্তিযোদ্ধা সনদ দেওয়া হয়েছে। এটি তার প্রাপ্য। কারণ, সেও একজন মুক্তিযোদ্ধা। কিন্তু সম্প্রতি তিনি নিজেকে সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে দাবি করছেন এবং বলছেন, আমি একটি চাইনিজ রাইফেল দিয়ে যুদ্ধ করেছি।

এখানে লক্ষণীয়– প্রথমত, তিনি এই মিথ্যা তথ্যের মাধ্যমে ইতিহাসকে বিকৃতি করছেন। পাশাপাশি সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানের প্রতি অসম্মান দেখাচ্ছেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা-উপজেলায়, এই ধরনের আরও কিছু নজির থাকতে পারে। অনেক অঞ্চলে অনেকের এমন মনগড়া (সাজানো/কাল্পনিক) কাহিনির প্রতিবাদ করার হয়তো কেউ থাকে না। এ ব্যাপারে আমাদের সবাইকে সজাগ থাকতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের সঠিক সংজ্ঞা নির্ধারণ, তালিকা প্রণয়নসহ নিজ নিজ অঞ্চলে সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী লিপিবদ্ধ করে মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে সংরক্ষিত রাখা যায়। একই সাথে প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধার যুদ্ধকালীন অবদানের পৃথক বিবরণী মন্ত্রণালয়ের অনলাইনে সবার জন্য যেন উন্মুক্ত থাকে। এতে করে কোন মুক্তিযোদ্ধা কোন পর্যায়ে কী অবদান রেখেছিলেন সেটা জাতি নির্দিষ্টভাবে জানতে পারবে। এই উদ্যোগ আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সঠিক তালিকা ও ইতিহাস প্রণয়নে অনেকাংশে সাহায্য করবে। সর্বোপরি আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অঞ্চলভিত্তিক যুদ্ধের ইতিহাস জানতে পারবে এবং এই চেতনায় উজ্জীবিত থাকবে।

মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানের স্বীকৃতির সাথে তাদের অধিকার, মর্যাদা ও সম্মানের সম্পৃক্ততা রয়েছে। অনেক মুক্তিযোদ্ধা অনেক সময় আবেগপ্রবণ হয়ে বলেন, বছর ঘুরে বিজয় দিবস (১৬ ডিসেম্বর), স্বাধীনতা দিবস (২৬ মার্চ) এলেই আমাদের অনেকেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা মনে করি। অথচ সারা বছর নীরব থাকি। মুক্তিযোদ্ধা আজু আমাকে সম্প্রতি বললেন, স্যার, আমাদের দেশ থেকে অন্য দেশে বিশেষ করে ভারতে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান অনেক বেশি। এটা কি আপনি জানেন? আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, একথা কেন বলছ? (সে ক্যান্সারের রোগী। চিকিৎসার জন্য প্রায়ই তাকে ভারতে যেতে হয়)। উত্তরে সে বলল, সম্প্রতি আমি বোম্বে টাটা মেমোরিয়াল হসপিটালে গিয়েছিলাম। আমি যে

চিকিৎসকের কাছে গিয়েছিলাম, তার সাক্ষাৎ পেতে সিরিয়াল দিয়ে মাসখানেক অপেক্ষা করতে হয়। আমি নিজেকে বাংলাদেশের একজন মুক্তিযোদ্ধা উল্লেখ করে তার কাছে আমার নাম-ঠিকানা পাঠালাম। তার ব্যক্তিগত সহকারী আমাকে বললেন, আপনার দেওয়া টেলিফোন নম্বরে ফোন করে সাক্ষাতের তারিখ ও সময় জানিয়ে দেওয়া হবে। তারপরও আমি সেখানে ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করলাম। এর মধ্যে তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং সহকারীকে বললেন, আজ আমি আর কোনো রোগী দেখব না। বাকিদেরকে কালকে আসতে বলবে। আমি ওনার চেম্বারে যাওয়ার সাথে সাথে উনি আমার সাথে কুশল বিনিময় করলেন এবং চিকিৎসার বিষয়ে পরে আলোচনা করবেন বলে আশ্বস্ত করলেন। তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আপনি বাংলাদেশ থেকে আগত একজন মুক্তিযোদ্ধা, আপনাকে দেখে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, আমাদের দেশের প্রায় ৮ হাজারের বেশি সেনাবাহিনীর অফিসার ও সৈন্য বাংলাদেশের রণাঙ্গনে হতাহত হয়েছিল। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আপনার কাছ থেকে যুদ্ধকালীন রণাঙ্গনের কাহিনি জানার খুব আগ্রহ রয়েছে। আমরা দু'জনে এ ব্যাপারে দীর্ঘ সময় ধরে আলাপ করেছি। তিনি আমাকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে যে সম্মান দেখিয়েছিলেন, এতে আমি অভিভূত হয়েছি। আমি যে তার কাছে চিকিৎসা নিতে গিয়েছিলাম কিছু সময়ের জন্য আমি একেবারেই তা ভুলে গিয়েছিলাম। এরপর তিনি আমার রোগের বিবরণ শুনলেন এবং আমাকে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন। বললেন, আপনি পরবর্তীতে যখনই আসবেন টেলিফোন করে আমার কাছে সরাসরি চলে আসবেন। আপনার থাকা বা অন্য কোনোরূপ সমস্যা হলে আমাকে জানাবেন।

আমি তখন মুক্তিযোদ্ধা আজুকে বললাম, আসলে ভারতে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের এখনও অনেক সম্মান দেখানো হয়। ২০১৩ সালের ১৬ ডিসেম্বর আমি লিডার অব দ্য ডেলিগেশন হিসেবে ৭১ জন মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়ে গিয়েছিলাম কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম সেনানিবাসে। সেখানে তৎকালীন ভারতীয় পূর্বাঞ্চলীয় সামরিক কমান্ডার লে. জেনারেল দালবির সিং আমাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। অভ্যর্থনাস্থল আর্মির সামরিক অডিটোরিয়মের ভেতর। মাঠের ভেতর সর্বত্রই ছিল বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি সংবলিত প্ল্যাকার্ড। সেখানে সেদিন এক আনন্দঘন পরিবেশ বিরাজ করছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষ থেকে আমার বক্তব্যের পরে লে জে দালবির সিং (দেশটির বর্তমান সেনাপ্রধান) তাঁর ভাষণে মুক্তিযুদ্ধে আমাদের অবদানের কথা তুলে ধরে প্রশংসা করলেন এবং 'জয় বাংলা, জয় হিন্দ' বলে তার বক্তব্য শেষ করলেন। মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি তাদের যে স্বীকৃতি ও সম্মান তার ভাষণে সেদিন তারই প্রতিফলন আমরা দেখেছি।

ভাষণের পরে এক পর্যায়ে তিনি খুব উৎফুল্ল হয়ে আমাকে বললেন, মনে পড়ে? একাত্তরের এটা তোমাদের রণাঙ্গনের শ্লোগান ছিল। তাই বক্তব্যের শেষে 'জয় বাংলা' বলেছি। তখন আমি তাকে ধন্যবাদ জানাই। সেদিন অনুষ্ঠান শেষে আমরা নিজেদের মধ্যে আলাপ করছিলাম। তখন সবাই স্বীকার করল, আমরা বাঙালিরা সব সময় সবকিছু অতি তাড়াতাড়ি ভুলে যাই। কেউ মনে করিয়ে দিলে তবেই মনে পড়ে। এটা অতি সত্য। আমি তখন তাদের বললাম, একাত্তরে রণাঙ্গনসহ বাংলাদেশের সর্বত্র 'জয় বাংলা' শ্লোগান ছিল সবার মুখে মুখে। যখন ভারতের সাধারণ মানুষসহ সেনাবাহিনীর সদস্যদের সাথে দেখা হতো তখন আমরা উভয় পক্ষই 'জয় বাংলা' বলে কুশল বিনিময় করতাম। স্বাধীনতার পরপর আমরা যখন বিভিন্ন দেশ সফরে গিয়ে গর্বের সাথে পরিচয় দিতাম, বাংলাদেশ থেকে এসেছি, তখন তারা বলত, Bangladesh, Sheikh Mujib, Sheikh Mujib. সে সফরে আমার ডেলিগেশনের সদস্যদের মধ্যে অনেক চাকরিরত ও রিটায়ার্ড বিগ্রেডিয়ার জেনারেল ছিলেন। এছাড়াও বিশিষ্ট জনদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক আবদুল মান্নান (বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান), চিফ প্রসিকিউটর হান্নান সাহেব, মিসেস খালেদ মোশাররফ ও তার মেয়েসহ (বর্তমানে এমপি) আরও অনেকে।

যুদ্ধ চলাকালে ও তৎপরবর্তী সময়ে আমরা যে চেতনায় একাকার ছিলাম, সেই চেতনায় আজ কেন ফিরে যেতে পারি না? অনেক মুক্তিযোদ্ধা এখনও অভিমান করে বলেন, মুক্তিযোদ্ধা তথা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান হিসেবে জাতির কাছ থেকে আমাদের প্রাপ্য সম্মানটুকু অন্তত পাওয়া উচিত।

কিছু মুক্তিযোদ্ধা অফিসার– যারা একাত্তরের ৩ নভেম্বর মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফের নের্তৃত্বে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে খন্দকার মোশতাককে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করেছিলেন, তাদের অনেকের সাথে আমার প্রায় সময়ই দেখা হয়। তারা ছলছল চোখে যখন হতাশ কণ্ঠে প্রশ্ন করেন, বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারী মোশতাক গংদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ক্ষমতাচ্যুত করাটাই কি আমাদের অপরাধ ছিল? আপনিও তো সেদিন আমাদের সাথে ছিলেন। আমরা দীর্ঘদিন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার ও ডিএফআই সেলে বন্দী ছিলাম। আর কিছুদিন বিলম্ব হলেই চলমান কোর্ট মার্শালের বিচার সমাপ্তির মাধ্যমে আমাদের ফাঁসি কার্যকর করা হতো।

'৭৬ সালের মার্চের প্রথম সপ্তাহে মেজর হাফিজ উদ্দিন, ক্যাপ্টেন হাফিজ উল্লা, ক্যাপ্টেন হুমায়ুন কবির, মেজর ইকবাল ও ক্যাপ্টেন তাজ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কমান্ডো স্টাইলে গণভবনে বন্দী অবস্থা থেকে পালিয়ে (তখন মুহূর্তে

গণভবনে বেজে উঠেছিল সতর্কতামূলক সাইরেন, শুরু হলো চারদিকে সার্চ লাইটের মাধ্যমে অনুসন্ধান) যাওয়ার মুহূর্তে নিরাপত্তারক্ষীরা বৃষ্টির মতো গুলিবর্ষণ করছিল। এর মধ্যেই তারা দৌড়ে গণভবনের লন অতিক্রম করে ৯ ফুট উঁচু দেয়াল, এর উপরে তারকাঁটার বেড়া ডিঙিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তারা ঢাকা থেকে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ফার্স্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। ফার্স্ট বেঙ্গলের প্রথম বিদ্রোহের সময় মেজর হাফিজ উদ্দিন ছিলেন নের্তৃত্বে। বাকি অফিসাররাও সবাই ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা। ফার্স্ট বেঙ্গলের জোয়ান সৈনিকদের কাছে তারা মেজর জেনারেল খালেদের অভ্যুত্থানের কারণ ব্যাখ্যাসহ তাদের প্রতি জিয়াউর রহমানের অন্যায় আচরণের কথা তুলে ধরেন। ফার্স্ট বেঙ্গল এই মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি তাদের সমর্থন ও সহানুভূতি ব্যক্ত করে। পরের দিন জিয়াউর রহমানের পক্ষে তৎকালীন সেনাপ্রধান হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ এ ব্যাপারটি সমাধানের জন্য ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ছুটে যান। কিন্তু এরশাদ সেদিন বিফল হয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। '৭৬ সালের সম্ভবত ২/৩ মার্চ জিয়াউর রহমান নিজেই সরাসরি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ফার্স্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে যান। ওইদিন দিনভর আলোচনার পরও তিনি মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের সাথে কোনো সমঝোতায় পৌঁছাতে পারেননি। দেশের সেই চরম ক্রান্তিকালে তিনি সেদিন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় রাতযাপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। পরের দিন সকালে তিনি মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের সাথে এই মর্মে সমঝোতায় আসেন যে, জিয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া ত্যাগ করার আগেই ঢাকায় ডিএফআই সেলে বন্দী কর্নেল মালেক, কর্নেল জাফর ইমাম, কর্নেল গফফার এবং ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী কর্নেল সাফায়েত জামিলসহ এয়ারফোর্স অফিসার লিয়াকত, ইকবাল গংদের মুক্তির নির্দেশ দেওয়া হবে। পরে তাই করা হলো। ঢাকায় আমাদের মুক্তি দেওয়া হলো। এরপর জিয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ঢাকায় আসেন। '৭৬ সালে মার্চের প্রথম সপ্তাহে এইসব নাটকীয় ও রহস্যাবৃত ঘটনা ঘটছিল। এইসব কাহিনি জাতি হয়তো এখনও পুরোটা জানে না।

৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানে জড়িত আমার সাথি ওয়ালি (সম্ভবত উইং কমান্ডার ছিলেন) ও লিয়াকত (সম্ভবত স্কয়াড্রন লিডার ছিলেন) সম্প্রতি আমাকে আক্ষেপ নিয়ে বললেন, ৪৩ বছর হয়ে গেল স্যার, আমরা এখনও পেনশন বা অন্য কোনো সুবিধা পাচ্ছি না, এখনও আমাদের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করা হয়নি। মুক্তিযুদ্ধে আমাদের অবদান এবং বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে করা আমাদের অভ্যুত্থান কি ইতিহাসে চিরদিন অবমূল্যায়িত অবস্থায়ই থেকে যাবে। অভ্যুত্থান করে ক্ষমতা দখলকারীরা হবে হিরো, আর আমরা জিরোই থেকে যাব– এটাই কি স্বাধীনতার চেতনা? '৭৫ সালে ৩ নভেম্বর স্কয়াড্রন লিডার লিয়াকত তার যুদ্ধবিমান নিয়ে

ঢাকার আকাশে বিশেষ করে বঙ্গভবনের উপর ফ্লাইওভার করছিলেন এই জন্য যে, কর্নেল ফারুক, রশিদের কোনো সৈন্য বা ট্যাঙ্কবহর যেন হুমকি সৃষ্টি করতে না পারে। সব কিছু আমাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল।

সেদিন তাঁরা আমাকে আরও বললেন, মোশতাকের নির্দেশে সেদিন চার জাতীয় নেতাকে জেলখানার ভেতরে হত্যা করা হয়েছিল, হত্যার আগমুহূর্ত পর্যন্ত আমরা কেউই ব্যাপারটি জানতাম না। তবে এদেরকে কী পরিস্থিতিতে, কেন এবং কারা দেশত্যাগের অনুমতি দিয়েছিল অথবা সেই মুহূর্তে পরিস্থিতির আলোকে এর আর কোনো বিকল্প ছিল কিনা এটা এখনও আলোচনার দাবি রাখে।

লিয়াকত আমাকে আরও বললেন, আমরা একটি অংশ এই সিদ্ধান্তের সাথে একমত ছিলাম না। অনেকে আবার ঘাতকদের বহনকারী প্লেনটি উড্ডয়নের পরে উত্তেজিত হয়ে বলছিলেন, আমাদের যুদ্ধবিমানের মাধ্যমে এই প্লেনটিকে আকাশেই ধ্বংস করে দেওয়া হোক। তখন খবর নিয়ে আমরা জানলাম, ততক্ষণে তাদের বহনকারী প্লেনটি বাংলাদেশের আকাশ অতিক্রম করে রেঙ্গুনের আকাশে ঢুকে গেছে। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে দেশপ্রেমিক খালেদ মোশাররফের মন্থর গতি ও তার কিছু ভুল সিদ্ধান্তের কারণে তাকে বড় ধরনের মাসুল দিতে হয়েছিল। তবে তার প্রাথমিক সফলতার কারণেই মোশতাককে অপসারণ করে সায়েমকে প্রেসিডেন্ট করা গিয়েছিল। সার্বিক পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে এই সামরিক অফিসাররা আমাকে বললেন, স্যার আমরা সব আমলেই (বিএনপি, আওয়ামী লীগ বা এরশাদ সরকার) লক্ষ করেছি, পুলিশ, সশস্ত্র বাহিনী, বেসামরিক আমলাসহ আরও যারা আগের আমলে বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, পরবর্তী সরকার ক্ষমতায় আসার পর তাদের মধ্য থেকে নিজেদের পছন্দের ব্যক্তিদের চাকরিতে বহাল, পদোন্নতি দিয়ে অবসরে পাঠানোসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেছে। পরিস্থিতি বিবেচনায় এগুলো হয়তো সঠিক সিদ্ধান্ত। আমাদের ব্যাপারটি এদের বিষয়গুলো থেকে অনেক বেশি গুরুত্বের দাবি রাখলেও, আজ আমাদের পক্ষে কথা বলার কেউ নেই। আজও অনেক মুক্তিযোদ্ধা আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে তাদের ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে আছেন। অথচ আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে সবাই এক হওয়ার কথা বলি। খালেদ মোশাররফের নের্তৃত্বে ৩রা নভেম্বর অংশগ্রহণকারী যারা খুনি মোশতাক গংদেরকে জীবন বাজি রেখে ক্ষমতাচ্যুত ও অপসারণ করেছিল বিলম্বে হলেও সব বিতর্কের ঊর্ধ্বে এই জাতীয় বীরদেরকে স্বীকৃতি ও যথাযথ সম্মান দেখানো উচিত।

অনেকেই আক্ষেপ করে বলেন, স্বাধীনতার এত বছর পরেও আমরা আমাদের প্রাপ্য সম্মান ও মর্যাদার ব্যাপারে হতাশ। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সব শক্তির মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সহমর্মিতা ও চেতনার ঐক্য সৃষ্টি করতে

হবে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে যেন আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম চিরদিন ধারণ ও লালন করতে পারে সেজন্য মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস বিভিন্ন শ্রেণির পাঠ্যক্রমে সম্প্রসারিত আকারে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। বিষয়টি এমনভাবে করতে হবে যেন, বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ না হয় এমনকি সরকার পরিবর্তন হলেও পাঠ্যক্রম থেকে এ বিষয়টি পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দেখা না দেয়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ওপর সবাইকে থাকতে হবে আপসহীন। এছাড়া দেশের প্রত্যেকটি স্কুল-কলেজে প্রতিদিনের ক্লাস শুরুর আগে জাতীয় সংগীত গাওয়ার আগে যেন স্বাধীন বাংলা বেতারে পরিবেশিত একটি দেশাত্মকবোধক গানের কিছু অংশ পরিবেশন করা হয়। এতে আমাদের কোমলমতি ছেলে-মেয়েরা স্বাধীনতার চেতনায় আরো উজ্জীবিত হবে।

’৭১-এর মার্চে ইয়াহিয়ার নাটকের শেষ দৃশ্য ও ১১ সেক্টর/ K S Z ফোর্স/বিমান ও নৌবাহিনী

’৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধ আমাদের গর্ব ও অহংকার। এই যুদ্ধ বাঙালি জাতির স্বকীয় ঐতিহ্য, নিজস্ব সত্তা প্রতিষ্ঠা তথা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে শত্রুমুক্ত করে সবাই মিলে নিজের হাতে নিজের দেশকে গড়ার একটি দৃপ্ত শপথ, সর্বোপরি শহিদদের স্বপ্নসাধ বাস্তবায়নে আরো আবেগময় গৌরবোজ্জ্বল একটি অধ্যায়। ’৫২ এর ভাষা আন্দোলন থেকে ’৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান, ’৭০-এর নির্বাচন এ দীর্ঘ মুক্তি সংগ্রামের পথ অতিক্রম করে আমরা পুরো জাতি স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। দীর্ঘ মুক্তির সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ একই সূত্রে গাঁথা; যেন একই টাকার এপিট-ওপিট। দীর্ঘ মুক্তিসংগ্রাম সফল না হলে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হতো না– এটাই বাস্তবতা। দীর্ঘ মুক্তি সংগ্রাম ছিল তৎকালীন পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর আমাদের বাঙালিদের প্রতি সৃষ্ট বৈষম্যের বিরুদ্ধে অধিকার ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। তাদের বৈষম্য ও হিংসার মাত্রা এত চরম ছিল যে, তারা আমাদেরকে সব ব্যাপারে বাঁকা চোখে দেখত, এবং এ অঞ্চলটি (বর্তমান বাংলাদেশ) যেন নিজস্ব সংস্কৃতি/কৃষ্টি ও ঐতিহ্য নিয়ে বিকশিত না হতে পারে, এ ব্যাপারে তারা ছিল সক্রিয়। এর পাশাপাশি আমাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করে রাখাই ছিল তাদের আরেকটি উদ্দেশ্য। তৎকালীন পাকিস্তান সেনাবাহিনীতেও ছিল আমাদের ক্ষুদ্র অংশ। বাঙালি সৈনিক অফিসারদের প্রতি ছিল তাদের বিমাতা সুলভ আচরণ। ১৯৭০ সালে আমি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে ক্যাপ্টেন পদমর্যাদায় চাকরিরত ছিলাম। সেই অবস্থান থেকে লক্ষ করেছি– ’৭০-এর নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নের্তৃত্বে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন এবং পরবর্তীতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার পাকিস্তানিদের তথা ভুট্টো/ইয়াহিয়াদের তাল বাহানা ছিল। তৎকালীন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে ইয়াহিয়ার ষড়যন্ত্রের আভাস পাওয়া গিয়েছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠদের কাছে ক্ষমতা হস্ত ান্তর না করে আমাদেরকে দাবিয়ে রাখার এক গভীর ষড়যন্ত্র চলছিল। বঙ্গবন্ধু এই চলমান ষড়যন্ত্র যে উপলব্ধি করেননি তা নয়। তিনি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ

করে যাচ্ছিলেন, পাশাপাশি এই ষড়যন্ত্রকে সম্পূর্ণভাবে উৎখাত করে তাদের বিশ্বাসঘাতকতার মুখে চরম আঘাত হানার সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এর ইঙ্গিত পাই আমরা তাঁর ৭ই মার্চের ভাষণের মধ্যে। এই ভাষণই আসলে স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোষণা ও যুদ্ধের মূল প্রেরণা শক্তি। এ ভাষণে দলমত নির্বিশেষে সর্বস্তরের জনগণের প্রতি ছিল যুদ্ধের সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশনা। সেনাবাহিনীতে আমরা আরো লক্ষ করলাম– তারাও (পাক-হানাদার বাহিনী) ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। যেন এক যুদ্ধে যাওয়ার প্রস্তুতি। তারা তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বাড়তি সৈনিক ও সমরাস্ত্র আনছিল। তারা আসলে আলোচনা ও সংলাপের নামে সময়ক্ষেপণ করছিল। দূরদর্শিসম্পন্ন আপসহীন নেতা বঙ্গবন্ধু তাদের এই ষড়যন্ত্রের কৌশল বুঝতে পেরেছিলেন বলেই তিনি ৭ই মার্চের ভাষণে বলেছিলেন– "আমি যদি তোমাদেরকে হুকুম নাও দিয়ে যেতে পারি তোমাদের যার যা কিছু আছে তা নিয়ে প্রস্তুত থেকো। শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।"

"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।" অনেকে আজ ইতিহাস বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন– বঙ্গবন্ধুকে যদি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পাকিস্তান মেনে নিত তাহলে স্বাধীনতা যুদ্ধ হতো না বা প্রয়োজন ছিল না। তাদের এই মূল্যায়ন সঠিক নয়। কারণ '৭০-এর নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নের্তৃত্বে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের পর পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী সময়ক্ষেপণ ও তালবাহানা না করে গণতান্ত্রিক ধারায় ও রীতিনীতি অনুযায়ী যদি ক্ষমতা হস্তান্তর করতেন তাহলে, বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতেন। তবে, অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে সংগ্রামের দীর্ঘ পথ আরো কিছুটা অতিক্রম করতে হতো। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বাংলার মানুষের অধিকার সংরক্ষিত রেখে পুরো পাকিস্তানের ওপর তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতেন। তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী উপলব্ধি করলেন– তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান বর্তমান বাংলাদেশ পরোক্ষভাবে সর্বাত্মক বাড়তি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে এবং অঘোষিতভাবে একটি স্বতন্ত্র জাতীয় সত্তা বিকশিত হয়ে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ সময়ের অপেক্ষায় থাকবে। এ পরিস্থিতিতে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলোতে (পাঞ্জাব, ফন্ট্রিয়ার, সিন্ধু, বেলুচিস্তান) একে অন্য থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার আওয়াজ উঠবে। তখনও কিন্তু উল্লিখিত এই প্রদেশ ও অঞ্চলগুলোর ওপর পাঞ্জাব প্রদেশের তথা পাঞ্জাবিদের রাজনৈতিক /অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব একতরফা ছিল। সেই মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করলে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের এই অঞ্চলগুলো থেকেও বৈষম্যের বিরুদ্ধে সেখানকার জনগণ প্রতিবাদী হওয়ার জন্য উৎসাহিত হতেন। এতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান তথা বর্তমান বাংলাদেশ ছাড়া অবশিষ্ট পাকিস্তান ভেঙে টুকরো টুকরো

হয়ে যাবে। এই বাস্তব উপলব্ধিতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী/ভুট্টো গং্রা ক্ষমতা-হস্তান্তর না করার সিদ্ধান্ত '৭০-এর নির্বাচনের পরপরই নিয়েছিলেন। কোনো অবস্থাতেই বঙ্গবন্ধুর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা যাবে না অর্থাৎ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর কর্তৃত্ব দেওয়া যাবে না। এই সিদ্ধান্ত আগ থেকে তারা মনে লালন করে আসছিলেন। সেই জন্য তারা গভীর ষড়যন্ত্রের নীল-নকশা অনুযায়ী আমাদের জাতীয় সত্তা বিকশিত হওয়ার সুযোগ না দিয়ে সর্বক্ষেত্রে পঙ্গু করে তাদের অধীনস্ত একটি কলোনিতে পরিণত করার জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি প্রায়ই সম্পন্ন করে ফেলেছেন। তাই বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রী হলে স্বাধীনতার যুদ্ধ হতো না বা প্রয়োজন ছিল না – যারা বলেন তাদের এই ধারণা বা মূল্যায়ন সঠিক নয়। তারা সংলাপের নামে কালক্ষেপণ, তালবাহানা এবং সর্বোপরি তাদের অনড় অবস্থান বঙ্গবন্ধু বুঝতে পেরেছিলেন বলেই তিনিও দেখলেন – মুক্তিযুদ্ধ অনিবার্য এবং এর বিকল্প আর কিছু নেই। তাই তো তিনি খুব কৌশলে ধাপে ধাপে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি এবং ৭ই মার্চের পূর্ণাঙ্গ ভাষণ ছিল স্বাধীনতা তথা মুক্তিযুদ্ধেরই আহ্বান। তাই উপরে উল্লিখিত বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, বঙ্গবন্ধুকে কখনো তারা প্রধানমন্ত্রিত্ব দিতেন না তাই তিনি প্রধানমন্ত্রিত্ব গ্রহণ করলে এ যুদ্ধের প্রয়োজন ছিল না বা হতো না – এটা সঠিক মূল্যায়ন নয়।

ইতিহাস মূল্যায়নে দেখা যাবে, দীর্ঘ মুক্তির সংগ্রাম ও '৭১-এর যুদ্ধ দুটিই বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতা ও তাঁর নের্তৃত্বে জনগণের ত্যাগের ফসল।

আমি আগেই উল্লেখ করেছি কোনো দিন কোনো অবস্থায় বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানিরা প্রধানমন্ত্রী মেনে নেবে না। এ জন্য তারা ষড়যন্ত্র করছিল এবং ক্ষমতা হস্তান্তর না করে সময় ক্ষেপণের মাধ্যমে তালবাহানা করছিল। তাদের এই সাজানো নাটকের শেষ লগ্নে দৃশ্য অবলোকনে তাদের অনেকদিনের লালিত হীন চক্রান্ত যেমনি ফুটে উঠবে তেমনি পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ সৃষ্টির স্বপ্ন ও দূরদর্শিতা প্রকাশ পায়। নিম্নে ইয়াহিয়া-ভুট্টোর নাটকের শেষ অংশের কিছু চিত্র তুলে ধরলাম।

১লা মার্চ মতিঝিলে হোটেল পূর্বাণীত আওয়ামী লীগের পার্লামেন্টারি পার্টির বৈঠক চলাকালীন সময়ে দুপুর ১টা ৫ মিনিট আকস্মিকভাবে বেতারে প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে ভেসে আসে জনৈক ঘোষকের কণ্ঠস্বর : "পাকিস্তান আজ চরম এবং ভয়াবহ এক রাজনৈতিক সংকটের সম্মুখীন। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান রাজনৈতিক দল পিপলস পার্টি এবং আরও কয়েকটি রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ ৩রা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগাযোগ না করার সংকল্প প্রকাশ করেছে। এছাড়া ভারতের পরিকল্পিত উত্তেজনাকর পরিস্থিতি জাতির সার্বিক

পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তুলেছে। আমি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান পরবর্তী কোনো তারিখের জন্য স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিলাম।"[1]

বাংলার জনসাধারণ গভীর উৎকণ্ঠার ঘোষণা শোনার পর প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। সাথে সাথেই অল্প সময়ের মধ্যে দোকান-পাট, স্কুল-কলেজ, সরকারি-বেসরকারি অফিস, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। সর্বস্তরের মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ মিছিলে ভুট্টো বিরোধী এবং বাংলার স্বাধীনতার দাবিতে রাস্তায় বেরিয়ে আসে। ঢাকা স্টেডিয়ামে পাকিস্তান একাদশ বনাম এমসিসি এর মধ্যে ক্রিকেট খেলা অসমাপ্ত রেখে খেলোয়াড়েরা মাঠ ছেড়ে চলে যায়। অল্পক্ষণের মধ্যে বাঁশের লাঠি, লোহার রড, হাতের কাছে যে যা পেয়েছে তাই নিয়ে হাজার হাজার মানুষ ছুটে আসে হোটেল পূর্বাণীতে। হিংসাত্মক ঘটনার আশংকায় বঙ্গবন্ধু সবাইকে শান্ত করেন।

বিকেল চারটার দিকে এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে হোটেল পূর্বাণীতে শেখ মুজিবুর রহমান আন্দোলন শুরু করার ভবিষ্যৎ কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ২রা মার্চ ঢাকায় এবং ৩রা মার্চ সারা দেশে হরতাল আহ্বান করা হয়। ৩রা মার্চ তিনি পল্টন ময়দানে ভাষণ দেবেন বলেও ঘোষণা দেন। ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় চূড়ান্ত কর্মসূচি ঘোষণা দেবেন বলে তিনি জানান। তিনি আরো উল্লেখ করেন, আমরা যে কোনো পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে সক্ষম এবং সাত কোটি বাঙালির মুক্তির জন্য আমি চরম মূল্য দিতে প্রস্তুত। ষড়যন্ত্রকারীদের শুভ বুদ্ধির উদয় না হলে বাঙালি নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করবে।

পুলিশ ঢাকায় অনেক স্থানে বিক্ষোভকারী জনগণকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার করে। টিভি, রেডিও, টেলিফোন এক্সচেঞ্জসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সশস্ত্র প্রহরার আওতায় আনা হয়। তেজগাঁও বিমান বন্দর সেনাবাহিনী নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয়ার চেষ্টা করলে জনগণের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। সেনাবাহিনীর গুলিতে কয়েকজন নিরস্ত্র মানুষ নিহত হয় এবং অর্ধশতাধিক ব্যক্তি আহত হয়। তা সত্ত্বেও ২রা মার্চ শেখ মুজিব অসহযোগ আন্দোলনের কথা ঘোষণা করেন। সেদিনের প্রচারিত ৩ থেকে ৬ই মার্চ প্রতিদিন ভোর ৬টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত প্রদেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করা হয়। বস্তুত সেদিন হতেই পূর্ব পাকিস্তানের সবকিছুই স্থবির হয়ে পড়ে।

---

১ রেহমান সোবহান, বাংলাদেশের অভ্যুদয়, একজন প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০, পৃ. ৭৭।

২রা মার্চ ঢাকায় সর্বত্র সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। অনেক স্থানে সেনাবাহিনী গুলিবর্ষণ করে এবং অনেকে হতাহত হয়। এ দিন সকালের দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবনে এক বিরাট ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে এত বড় ছাত্র সমাবেশ আর কোনো দিন অনুষ্ঠিত হয়নি। এ সভায় সভাপতিত্ব করেন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী। বেলা দশটার মধ্যেই ছোট বড় মিছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের বটতলা ছাত্র-ছাত্রীতে ভরে যায় এবং অবিরাম স্বাধীনতার বিভিন্ন শ্লোগানে বটতলা মুখরিত হয়ে উঠে। বিভিন্ন দিক থেকে আরো মিছিল আসতে থাকে। বিপুল সংখ্যক ছাত্র ছাত্রীর সমাবেশ হাওয়াতে সভামঞ্চ কলা ভবনের পশ্চিম দিকের সেডে নিয়ে যাওয়া হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান সিরাজ, ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক আবদুল কুদ্দুছ মাখন এবং সহ-সভাপতি আসম আব্দুর রব। শাহজাহান সিরাজ খোলাখুলিভাবেই বাংলার স্বাধীনতার ওপর বক্তব্য রাখেন। রবের বক্তেব্যের সময় স্বাধীন বাংলার মানুষ শ্লোগান দিতে দিতে একটি মিছিল বহন করে আনে সবুজ জমিনের ওপর লাল বৃত্তের মধ্যে হলুদ রঙের পূর্ব বাংলার মানচিত্র আঁকা একটি সুন্দর পতাকা। আ স ম আব্দুর রব ডাকসুর সহ-সভাপতি হিসেবে এই পতাকাটি সর্ব প্রথম স্বাধীন বাংলার পতাকা হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের পশ্চিম পাশের গাড়ি বারান্দার ওপর উত্তোলন করেন। নূরে আলম সিদ্দিকী স্বাধীনতার আন্দোলনকে চূড়ান্ত লক্ষে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। এদিন থেকেই ঢাকা শহরে সান্ধ্য আইন জারি করা হয়। জনতা এই সান্ধ্য আইন ভঙ্গ করে রাস্তায় নেমে আসে। বিভিন্ন জায়গায় গুলি বর্ষণ করা হয়।

৩রা মার্চ সারা পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল পালিত হয়। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগের কর্মসূচির সমর্থনে পল্টন ময়দানে এক বিশাল জনসভা হয়। এ জনসভা জঙ্গিরূপ ধারণ করে। অসংখ্য মানুষ বাঁশের লাঠি, লোহার রড, বল্লম যে যা হাতের কাছে পেয়েছে তাই নিয়ে হাজির হয়। যে কোনো ধরনের অঘটন ঘটে যেতে পারে তা আগে থেকেই উপলব্ধি করতে পেরে বঙ্গবন্ধু পূর্ব কর্মসূচি বর্জন করে এ সভায় এসে উপস্থিত হন। বক্তব্য দিতে আসেন। নূরে আলম সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে সভা শুরু হয়। ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান সিরাজ এ সভাতে সুস্পষ্টভাবে বাংলাদেশকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করেন এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা' গানকে স্বাধীন বাংলার জাতীয় সংগীত, ফ্লাইট সার্জেন্ট জহুরুল হক যিনি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় শহিদ হন তাকে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম শহিদ ঘোষণা দেন ও বিভিন্ন হলের নাম পরিবর্তন করেন। এই দিন মঞ্চে পূর্বদিন ঘোষিত স্বাধীন বাংলার পতাকাও ছিল। বঙ্গবন্ধু

তার ভাষণে জনগণকে শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চালাতে আহ্বান জানান। তিনি তার ভাষণে জানান, আমি আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে আপনাদের সামনে আসতে বাধ্য হয়েছি। ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানেই সব কথা বলব বলে ইচ্ছা ছিল। পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে আজ এ সভায় এসেছি। জানিনা আপনাদের সামনে আর বক্তৃতা করতে পারব কিনা। তাই আজ আমার কর্মসূচি স্পষ্টভাবে আপনাদেরকে নিয়ে দিতে এসেছি। বাঙালিদের ওপর যেভাবে নির্মম হত্যাকাণ্ড চালানো হচ্ছে, তারপর আর স্থির থাকা যায় না। নিরস্ত্র বাঙালিকে এভাবে হত্যা করার মধ্যে কোনো বীরত্ব থাকতে পারে না। এটা কাপুরুষতা ছাড়া আর কিছুই নয়। গতকাল রাতে আমি নিজ কানে মেশিনগানের গুলির শব্দ শুনেছি। এদেশের এ অবস্থা সৃষ্টির জন্য বাংলার মানুষ দায়ী নয়। সাত কোটি মানুষকে হত্যা করা যাবে না। আমাদের মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে লাভ নাই। আমরা মারা গেলেও বাংলার মানুষের স্বাধিকার অর্জিত হবেই। আপনাদের সবাইকে শান্তিপূর্ণভাবে শৃঙ্খলার সাথে দাবি আদায়ের পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। আপনারা হলেন একটি সুশৃঙ্খল স্বেচ্ছা বাহিনী। যে নির্দেশ দিব তা পালন করবেন। মনে রাখবেন আমি বাংলার মানুষের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারি না, বাংলার মানুষের সাথে বেইমানি করতে পারি না। বাংলার মানুষ আমাকে কারাগার থেকে মুক্ত করে এনেছে, আমাকে ভোট দিয়েছে, আমি মরে গেলে আমার আত্মা বাঙালির সুখ সমৃদ্ধি দেখে শান্তি পাবে।

এরূপ অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে একই দিনে (৩রা মার্চ) রাওয়ালপিন্ডিতে প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে এক ঘোষণায় বলা হয় যে, আমাদের সাধারণ লক্ষ্য অর্জনে প্রেসিডেন্ট তার সাধ্যানুযায়ী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে সাহায্য করতে সব কিছু করবেন। শাসনতান্ত্রিক সংকট নিরসনের জন্য জাতীয় পরিষদের সকল পার্লামেন্টারি গ্রুপের নেতাদের কাছে ১০ই মার্চ ঢাকায় এক বৈঠকে মিলিত হবার জন্য জরুরি ব্যক্তিগত আমন্ত্রণলিপি প্রেরণ করেছেন।

শেখ মুজিবুর রহমান প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার এ আমন্ত্রণকে সংবাদপত্রের প্রদত্ত এক বিবৃতির মাধ্যমে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি তার বিবৃতিতে জানান, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও বাংলার অন্যান্য স্থানে যখন ব্যাপকভাবে নিরস্ত্র জনসাধারণকে হত্যা করা হচ্ছে, শহীদের তাজা খুন এখনও রাজপথ থেকে শুকিয়ে যায়নি, অনেক নিহতের লাশ এখনও দাফন করা সম্ভব হয়নি, শত শত আহত লোক এখনও হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করছে, সে সময়ে আগামী ১০ই মার্চ ঢাকায় প্রেসিডেন্টের সঙ্গে রাজনৈতিক নেতাদের এক সম্মেলনে মিলিত হবার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, যাদের দুরভিসন্ধি ও ষড়যন্ত্র নিরস্ত্র ও নিরপরাধ কৃষক, শ্রমিক ছাত্রদের মৃত্যুর জন্য দায়ী। যখন সামরিক প্রস্তুতি অব্যাহত রয়েছে,

সেনাবাহিনীর অস্ত্রের কঠোর ভাষা শোনানো হচ্ছে, সেই অবস্থায় এ আমন্ত্রণ কার্যত বন্দুকের মুখে জানানো হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে এ ধরনের আমন্ত্রণ গ্রহণের প্রশ্নই উঠে না। তাই আমি এ ধরনের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলাম।

৪ঠা মার্চ পিডিপি প্রধান জনাব নুরুল আমিন ১০ই মার্চ প্রস্তাবিত রাজনৈতিক নেতাদের সম্মেলনে যোগদানের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন এবং শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের এ সম্মেলন আহ্বানকে একটি ভ্রান্ত পদক্ষেপ বলে অভিহিত করেন। তিনি অবিলম্বে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকার জন্য প্রেসিডেন্টের প্রতি আহ্বান জানান।

আজও পূর্বের ন্যায় পাকিস্তানে সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। শেখ মুজিব এক বিবৃতিতে সাফল্যজনকভাবে পূর্ণ হরতাল পালিত হওয়ার জন্য জনসাধারণকে অভিনন্দন জানান এবং যে কোনো মূল্যে অধিকার আদায়ের জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান। তিনি আরও নির্দেশ দেন যে, দেশের সমস্ত অফিস শুধু মাত্র বেতন দেয়ার জন্য প্রতিদিন বেলা ২-৩০ থেকে ২ ঘণ্টা করে খোলা থাকবে ও এ সময় পর্যন্ত ব্যাংকগুলো সর্বোচ্চ ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত চেক ভাঙানোর জন্য খোলা থাকবে। তাছাড়া অত্যাবশ্যকীয় সার্ভিসগুলোও হরতালের আওতামুক্ত থাকবে।

৫ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে বাংলার সার্বিক স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রামের পঞ্চম দিনে ঢাকাসহ সারা বাংলায় সকাল থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। কিন্তু এর মধ্যেই সেনাবাহিনী টঙ্গী, খুলনা, রাজশাহী ও চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন স্থানে জনসাধারণের ওপর গুলিবর্ষণ করে। ফলে কয়েকশো লোক নিহত ও কয়েক হাজার লোক আহত হয়। পরিস্থিতির অবনতির জন্য রংপুরে সান্ধ্য আইন জারি হয়।

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু শেষ মুজিবুর রহমান বাংলার সর্বত্র যে হরতাল এবং অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন ৬ই মার্চ তার ছিল শেষ দিন। ঐদিন পূর্বের ন্যায় অত্যাবশ্যকীয় সার্ভিসগুলো হরতালের আওতামুক্ত রেখে সর্বত্র হরতাল পালিত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানসহ বহির্বিশ্বের সঙ্গে সমস্ত টেলিযোগাযোগ বন্ধ করে দেয়া হয়।

৬ই মার্চের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের বেতার ভাষণ। তার বেতার ভাষণের পূর্বে অনেকেরই ধারণা ছিল হয়তো আশাপ্রদ কিছু ঘোষণা হতে পারে। তিনি তার ভাষণে ১০ই মার্চ ঢাকায় সকল পার্লামেন্টারি গ্রুপের নেতাদের সম্মেলনকে পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ কর্তৃক সরাসরি প্রত্যাখ্যানকে বিস্ময়কর ও নৈরাশ্যজনক বলে উল্লেখ করেন। দেশের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে এ দুর্ভাগ্যজনক অচলবস্থা দূর করতে

তিনি অনির্দিষ্টকালের জন্য অপেক্ষা করতে পারেন না। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আগামী ২৫শে মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে। তিনি দৃঢ়বিশ্বাস করেছিলেন তার এই সিদ্ধান্ত সকল রাজনৈতিক নেতাদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাবে। তিনি আরও উল্লেখ করেন, যতক্ষণ তিনি পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীর ও রাষ্ট্রের প্রধান থাকবেন ততক্ষণ তিনি পাকিস্তানের সংহতি, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার নিশ্চয়তা বিধান করবেন।

এইদিন ৬ই মার্চ বেলুচিস্তানের কসাই নামে খ্যাত লে. জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে নিয়োগের ঘোষণা দেয়া হয়। প্রেসিডেন্টের ঘোষণায় আশাপ্রদ কিছু না হওয়ায় দেশের এরূপ সার্বিক পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু প্রস্তাবিত ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে জনসভায় ভাষণ সম্পর্কে নানান জল্পনা কল্পনা শুরু হয়। আওয়ামী লীগের এক অংশ এবং ছাত্রলীগ সম্পূর্ণভাবে বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য বঙ্গবন্ধুকে চাপ দিতে থাকে। অন্যদিকে দক্ষিণপন্থী আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধুকে যে কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখার জন্য চেষ্টা করেন। অপরাহ্ণে আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির এর জরুরি বৈঠক বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে অনুষ্ঠিত হয়। ওয়ার্কিং কমিটির এ গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে দেশের সর্বশেষ রাজনৈতিক এবং ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণ নিয়ে আলোচনা হয়। গভীর রাত পর্যন্ত কোনো প্রকার সিদ্ধান্ত ছাড়াই বৈঠক মুলতবি হয়।

৭ই মার্চ সকালে পাকিস্তানে নবনিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত জোসেফ এস ফারল্যান্ড বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ধানমণ্ডি বাসভবনে সাক্ষাৎ করেন। পর্যবেক্ষকদের মতে এই স্বল্পকালীন গোপন বৈঠকে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পরিষ্কার ভাষায় বঙ্গবন্ধুকে ওয়াশিংটনের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন। তা হলো বাংলার স্বাধীনতা ঘোষিত হলে যুক্তরাষ্ট্র তা সমর্থন করবে না। উল্লেখ্য, ফারল্যান্ড ১৯৬৫ সনে ইন্দোনেশিয়ায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত থাকা অবস্থায় ঐ দেশে কমিউনিস্ট বিদ্রোহ দমনের নামে প্রায় ১৫ লক্ষ নিরস্ত্র মানুষকে হত্য করা হয়েছিল। পাকিস্তানের এহেন অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিসেবে ফারল্যান্ডের নিযুক্তি বাংলার বুকেও এরূপ কোনো হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হতে পারে বলে জনমনে নানান জল্পনা শুরু হয়। এদিন সকালে পুনরায় আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির মুলতবি বৈঠক শুরু হয় এবং বঙ্গবন্ধুর প্রস্তাবিত ভাষণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়। ছাত্র জনতার দাবি অনুযায়ী বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা দেওয়া হবে কিনা এ বিষয়ে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। বঙ্গবন্ধু ভাষণ দিতে যাবার শেষ মুহূর্তে স্থির হয় যে, যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে বঙ্গবন্ধু এককভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন।

বৈঠকের পর চরম জাতীয়বাদী ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ আবার বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কথাবর্তা বলেন এবং সরাসরি বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা দেয়ার জন্য বারংবার অনুরোধ করেন। বেলা দুটোর মধ্যেই লক্ষ লক্ষ লোক জমায়েত হয় রেসকোর্স ময়দানে। সবাই এসেছে যেন বজ্র শপথ নিয়ে। অধিকাংশ মানুষের ধারণা বঙ্গবন্ধু আজকের জনসভায় স্বাধীনতা ঘোষণা দিবেন। বেশ দেরিতে বঙ্গবন্ধু সভাস্থলে আসেন। বেলা ৩টা ২০মিনিটে তিনি সভামঞ্চে আরোহণ করেন।

মাওলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগীশ পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত এবং সংগ্রামী শহিদদের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন। পরে এ ঐতিহাসিক জনসভায় একমাত্র বঙ্গবন্ধু তার বক্তৃতা শুরু করেন।

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণ

ভাইয়েরা আমার!

আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবাই জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর ও যশোরের রাজপথ আমার ভাইয়ের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়– তারা বাঁচতে চায়, তারা অধিকার পেতে চায়। নির্বাচনে আপনারা ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে জয়ী করিয়েছিলেন শাসনতন্ত্র রচনার জন্য। আশা ছিল জাতীয় পরিষদ বসবে– শাসনতন্ত্র তৈরি করব এবং এই শাসনতন্ত্রে মানুষ তাদের অর্থনীতি, রাজনীতি ও সংস্কৃতিক মুক্তি লাভ করবে। কিন্তু ২৩ বছরের ইতিহাস বাংলার মানুষের আর্তনাদের ইতিহাস, রক্তদানের ইতিহাস, নির্যাতিত মানুষের কান্নার ইতিহাস।

১৯৫২ সালে আমরা রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয় লাভ করেও গদিতে বসতে পারিনি। ১৯৫৮ সালে দেশে সামরিক শাসন জারি করে আইয়ুব খান দশ বছর আমাদের গোলাম করে রাখল। ১৯৬৬ সালে ৬দফা দেয়া হলো এবং এরপর এ অপরাধে আমার বহু ভাইকে হত্যা করা হলো। ১৯৬৯ সালে গণ-আন্দোলনের মুখে আইয়ুবের পতনের পর ইয়াহিয়া খান এলেন। তিনি বললেন, তিনি জনগণের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেবেন, শাসনন্ত্র দেবেন– আমরা মেনে নিলাম। তার পরের ঘটনা সকলেই জানেন। ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে আলোচনা হলো। আমরা তাকে ১৫ই ফেব্রুয়ারি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকার অনুরোধ করলাম। কিন্তু মেজরিটি পার্টির নেতা হওয়া সত্ত্বেও তিনি আমার কথা শুনলেন না। শুনলেন সংখ্যা লঘু দলের নেতা ভুট্টো সাহেবের কথা। আমি শুধু বাংলার মেজরটির পার্টির নেতা নই– সমগ্র পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা। ভুট্টো সাহেব বললেন মার্চের প্রথম সপ্তাহে অধিবেশন ডাকতে। তিনি মার্চের তিন

তারিখে অধিবেশন ডাকলেন। আমি বললাম, তবুও আমরা জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যাব এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হওয়া সত্ত্বেও কেউ যদি ন্যায্য কথা বলে আমরা তা মেনে নেব, এমনকি তিনি যদি একজনও হন। জনাব ভুট্টো ঢাকা এসেছিলেন, তার সঙ্গে আলোচনা হলো। ভুট্টো সাহেব বললেন আলোচনার দরজা বন্ধ নয়, আরো আলোচনা হবে। মওলানা নূরানী, মওলানা মুফতি মাহমুদসহ পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য পার্লামেন্টারি নেতা এলেন, তাদের সঙ্গে আলোচনা হলো– উদ্দেশ্য ছিল আলাপ আলোচনা করে শাসনতন্ত্র রচনা করব। তবে তাদের আমি জানিয়ে দিয়েছি যে, ৬ দফা পরিবর্তনের কোনো অধিকার আমাদের নেই, এটা জনগণের সম্পদ।

কিন্তু ভুট্টো সাহেব হুমকি দিলেন। তিনি বললেন, এখানে এসে ডবল জিম্মি হতে পারবেন না। পরিষদ কসাইখানায় পরিণত হবে। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানি সদস্যদের প্রতি হুমকি দিলেন যে, পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিলে রক্তপাত করা হবে, তাদের মাথা ভেঙে দেয়া হবে, হত্যা করা হবে। আন্দোলন শুরু হবে পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত। একটি দোকানও খুলতে দেয়া হবে না।

তা সত্ত্বেও পঁয়ত্রিশ জন পশ্চিম পাকিস্তানি সদস্য এলেন। কিন্তু পয়লা মার্চ ইয়াহিয়া খান পরিষদের অধিবেশন বন্ধ করে দিলেন। দোষ দেয়া হলো বাংলার মানুষকে, দোষ দেয়া হলো আমাকে। বলা হলো আমার অনমনীয় মনোভাবের জন্যই কিছু করা হয়নি।

এরপর বাংলার মানুষ প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠল। আমি শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য হরতাল ডাকলাম। জনগণ আপন ইচ্ছায় পথে নেমে এল। কিন্তু কী পেলাম আমরা? বাংলার নিরস্ত্র জনগণের ওপর অস্ত্র ব্যবহার করা হলো। আমাদের হাতে অস্ত্র নেই। কিন্তু আমরা পয়সা দিয়ে যে অস্ত্র কিনেছি দেশকে রক্ষা করার জন্য, আজ সে অস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে আমার নিরীহ মানুষকে হত্যা করার জন্য। আমার দুঃখী জনতার ওপর চলছে গুলি। আমরা বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যখনই দেশের শাসনভার গ্রহণ করতে চেয়েছে, তখনই ষড়যন্ত্র চলেছে, আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

ইয়াহিয়া খান বলেছেন, আমি নাকি ১০ই মার্চ তারিখে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করতে চেয়েছি তার সাথে টেলিফোনে আমার আলাপ হয়েছে। আমি তাকে বলেছি– আপনি দেশের প্রেসিডেন্ট। ঢাকায় আসুন, দেখুন, আমার গরিব জনসাধারণকে কীভাবে হত্যা করা হয়েছে। আমার মায়ের কোল কীভাবে খালি করা হয়েছে। আমি আগেই বলে দিয়েছি, কোনো গোলটেবিল বৈঠক হবে না, কিসের গোলটেবিল বৈঠক? কার গোলটেবিল বৈঠক? যারা আমার মা-বোনের কোলশূন্য করেছে, তাদের সাথে বসব আমি গোলটেবিল বৈঠকে?

তেরো তারিখে পল্টনে আমি অসহযোগের আহ্বান জানালাম। বললাম, অফিস, আদালত, খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করুন। আপনারা মেনে নিলেন। হঠাৎ আমার সঙ্গে বা আমার দলের সঙ্গে আলোচনা না করে একজনের সঙ্গে পাঁচ ঘণ্টা বৈঠকের পর ইয়াহিয়া খান যে বক্তৃতা করেছেন, তাতে সমস্ত দোষ আমার ও বাংলার মানুষের ওপর চাপিয়ে দিলেন। দোষ করলেন ভুট্টো, কিন্তু গুলি করা হলো আমার বাংলার মানুষকে। আমরা গুলি খাই, দোষ আমাদের, আমরা বুলেট খাই, দোষ আমাদের।

ইয়াহিয়া খান অধিবেশন ডেকেছেন। কিন্তু আমার দাবি, সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে, সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে, হত্যার তদন্ত করতে হবে, আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে তারপর বিবেচনা করে দেখব পরিষদে বসব কি বসব না। এ দাবি মানার আগে পরিষদে বসার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, জনগণ আমাকে সে অধিকার দেয়নি। রক্তের দাগ এখনও শুকায়নি; শহিদের রক্ত মাড়িয়ে ২৫ তারিখ যোগ দিতে যাব না। ভাইয়েরা আমার, 'আমার ওপর বিশ্বাস আছে?' (লাখো জনতা হাত উঠিয়ে হ্যাঁ বলে) আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাইনা; মানুষের অধিকার চাই। প্রধানমন্ত্রিত্বের লোভ দেখিয়ে আমাকে নিতে পারেনি। ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে নিতে পারেনি। আপনারা রক্ত দিয়ে আমাকে ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্ত করে এনেছিলেন। সেদিন এই রেসকোর্সে আমি বলেছিলাম, রক্তের ঋণ আমি রক্ত দিয়ে শোধ করব। মনে আছে? আজো রক্ত দিয়েই রক্তের ঋণ শোধ করতে প্রস্তুত।

আমি বলে দিতে চাই, আজ থেকে কোর্ট-কাচারি, সুপ্রিমকোর্ট, অফিস-আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। কোনো কর্মচারী অফিসে যাবেন না– এ আমার নির্দেশ।

গরিবের যাতে কষ্ট না হয় তার জন্য রিক্সা চলবে, লঞ্চ চলবে, ট্রেন চলবে তবে সেনাবাহিনী আনা-নেওয়া করা যাবে না। করলে যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে তার জন্য আমি দায়ী থাকব না।

সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিমকোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্টসহ সরকারি আধাসরকারি এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলো বন্ধ থাকবে। শুধু পূর্ব বাংলার আদান-প্রদানের জন্য ব্যাংকগুলো দু'ঘণ্টার জন্য খোলা থাকবে। পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে টাকা যেতে পারবে না। বাঙালিরা বুঝে শুনে চলবেন। টেলিগ্রাফ, টেলিফোন বাংলাদেশের মধ্যে চালু থাকবে, তবে সাংবাদিকরা বহির্বিশ্বে সংবাদ পাঠাতে পারবেন।

এদেশের মানুষকে খতম করা হচ্ছে, বুঝে শুনে চলবেন, দরকার হলে সমস্ত চাকা বন্ধ করে দেয়া হবে। আপনারা নির্ধারিত সময়ে বেতন নিয়ে আসবেন।

বেতন যদি না দেয়া হয়, আর যদি একটি গুলি চলে, আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়, তাহলে বাংলার ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল– যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। রাস্তাঘাট বন্ধ করে দিতে হবে। আমরা তাদের ভাতে মারব। আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, যদি আমার সহকর্মীরা না থাকেন, আপনারা সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন।

তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাক, কেউ কিছু বলবে না। গুলি চালালে আর ভালো হবে না। সাত কোটি মানুষকে আর দাবাতে পারবা না। বাঙালিরা যখন মরতে শিখেছে– তখন কেউ তাদের দাবাতে পারবে না।

শহিদদের ও আহতদের পরিবারের জন্য আওয়ামী লীগ সাহায্য কমিটি করছে। আমরা সাহায্যের চেষ্টা করব। আপনারা যে যা পারেন দিয়ে যাবেন। সাতদিনের হরতালে যে সব শ্রমিক অংশগ্রহণ করছেন, কারফিউর জন্য কাজ করতে পারেননি-শিল্প মালিকেরা তাদের পুরো বেতন দিয়ে দেবেন।

সরকারি কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। কাউকে যেন অফিসে দেখা না যায়। এদেশের মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ থাকবে। আপনারা আমার ওপর ছেড়ে দেন– আন্দোলন কীভাবে করতে হয়, তা আমি জানি। কিন্তু হুঁশিয়ার, একটা কথা মনে রাখবেন, আমাদের মধ্যে শত্রু ঢুকেছে, ছদ্মবেশে তারা আত্মকলহের সৃষ্টি করতে চায়। বাঙালি-অবাঙালি, হিন্দু-মুসলমান সবাই আমাদের ভাই, তাদের রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের। রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্র যদি আমাদের আন্দোলনের খবর প্রচার না করে তবে কোনো বাঙালি রেডিও এবং টেলিভিশনে যাবেন না।

শান্তিপূর্ণভাবে ফয়সালা করতে পারলে ভাই-ভাই হিসেবে বাস করার সম্ভাবনা আছে, তা নাহলে নেই। বাড়াবাড়ি করবেন না, মুখ দেখাদেখিও বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

আমার অনুরোধ প্রত্যেক গ্রামে, মহল্লায়, ইউনিয়নে আওয়ামী লীগের নের্তৃত্বে সংগ্রাম কমিটি গড়ে তুলুন। যার যা আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকুন। মনে রাখবেন- রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেব, তবু এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাআল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক ভাষণ সেদিন রেসকোর্সের উত্তাল জনসমুদ্রকে শান্ত করতে সক্ষম হলেও জনগণের মধ্যে কিছুটা হতাশা দেখা দেয়। বেশির ভাগ লোকই বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণা শুনতে চেয়েছিলেন। ৬ই মার্চ রাতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া শেখ মুজিবের সাথে টেলিফোনে দীর্ঘক্ষণ আলাপ করেন। ইয়াহিয়া মুজিবকে

অনুরোধ করেন, এমন পদক্ষেপ গ্রহণ না করতে যেখান থেকে ফিরবার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

একই রাতে (৬ই মার্চ) ইয়াহিয়া শেখ মুজিবকে প্রদানের জন্য একটি টেলিপ্রিন্টার বার্তা পাঠান মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজার কাছে। ঢাকায় অবস্থিত ১৪ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা বার্তাটি শেখ মুজিবের কাছে পাঠিয়ে দেন একজন ব্রিগেডিয়ারকে দিয়ে। বার্তায় বলা হয়– "অনুগ্রহ করে কোনো দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবেন না। আমি শিগগিরই ঢাকায় আসছি এবং আপনার সাথে বিস্তারিত আলোচনা করব। আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আমি আপনার আকাঙ্ক্ষা এবং জনগণের প্রতি দেয়া আপনার প্রতিশ্রুতির পুরোপুরি মর্যাদা দেব। আমার কাছে একটি পরিকল্পনা আছে যা আপনাকে আপনার ৬ দফা থেকেও বেশি খুশি করবে। আমি সনির্বন্ধ অনুরোধ করছি, কোনো দ্রুত সিদ্ধান্ত নিবেন না।"[১]

সেই রাতেই (৬ই মার্চ) শেখ মুজিবের দুজন প্রতিনিধির মাধ্যমে জিওসি বলে পাঠান, "আমি নিশ্চিত, কীভাবে চাপ প্রতিহত করতে হয় মুজিবের মতো একজন জনপ্রিয় নেতা তা ভালোভাবেই জানেন। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে দিয়ে কিছুই করানো যাবে না। তাকে বলবেন, আমি সেখানেই (রমনা রেসকোর্সে) থাকব চরমপন্থীদের আক্রোশ থেকে তাকে রক্ষার জন্য। কিন্তু তাকে এও বলে দেবেন, যদি তিনি পাকিস্তানের সংহতির বিরুদ্ধে কোনো কথা বলেন তাহলে আমি সম্ভাব্য সব কিছুই জড় করব। বিশ্বাসঘাতকদের হত্যার জন্য ট্যাঙ্ক, কামান, মেশিনগান– সবই। প্রয়োজন যদি হয় ঢাকাকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেব। শাসন করার জন্য কিছু থাকবে না, শাসন করবারও কেউ থাকবে না।"

মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজার এ বক্তব্য ছিল বাস্তবে ধমক। এর কিছুই করার ক্ষমতা তার ছিল না। প্রকৃত অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সব কর্তৃত্বই তখন পূর্ব পাকিস্তানে অচল। রেসকোর্সের জনস্রোত ঢাকা সেনানিবাস আক্রমণ করলে এদের হত্যা করতে যত সৈন্য ও গুলি প্রয়োজন হতো তাও তাদের ছিল না। বস্তুত শেখ মুজিবের স্বাধীনতা ঘোষণা তাদের দয়ার ওপর নির্ভরশীল করে ফেলত। নিরন্তর শঙ্কা নিয়ে তারা অসহায়ভাবে ভাষণ শেষ হবার অপেক্ষা করতে থাকে। শেখ মুজিব চাইলে তখন তা পারতেন। মুজিব বিচক্ষণতা আর অসীম ধৈর্যের পরিচয় দিলেন তার বক্তৃতায়। এই বক্তৃতা ঢাকার

---

১ Siddique Sadik, Witness to Surrender, University Press Limited, Dhaka, 1977, Page 52

সামরিক আইন সদর দপ্তরে স্বস্তির বাতাস বইয়ে দেয়। শেখ মুজিব তার বক্তৃতায় দর্শক শ্রোতাদের স্বাধীনতার চৌকাঠে নিয়ে গেলেও একপক্ষীয় স্বাধীনতা ঘোষণা (Unilateraly Declaration of Independance [DUI]) করা থেকে বিরত রইলেন।

বক্তৃতায় তিনি ২৫শে মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের বিষয়ে চারটি শর্ত আরোপ করেন:

এক. সামরিক আইন তুলে নিতে হবে।

দুই. জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

তিন. সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে। এবং

চার. বাঙালি হত্যার কারণ খুঁজে বের করার জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্ত করতে হবে।

৭ই মার্চ ৩টা ৪০ মিনিটে বঙ্গবন্ধু যখন রেসকোর্সে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তখন লে. জেনারেল টিক্কা খান ঢাকা বিমান বন্দরে অবতরণ করেন। লে. জেনারেল সাহবজাদা ইয়াকুব আলী খান, মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা এবং অন্যান্য উচ্চ পদস্থ অফিসাররা তাকে অভ্যর্থনা জানান। এদিনই সন্ধ্যায় লে. জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের সার্বিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে ব্রিফিং দেন বিদায়ী গভর্নর ও পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার লে. জেনারেল ইয়াকুব। ব্রিফিং শেষ হয় রাত ৭টা ৩০ মিনিটে। রাত আটটায় রাওলাপিন্ডিকে জানানো হয় যে, লে. জেনারেল টিক্কা খান দায়িত্ব বুঝে নিয়েছেন। এবার তিনি করোটিতে তিনটি টুপি ধারণ করলেন : গভর্নর, সামরিক আইন প্রশাসক ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার।

৮ই মার্চ থেকে সারা বাংলায় এক ঐতিহাসিক অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। সমগ্র সরকারি, বেসরকারি ভবন, অফিস আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সবখানে স্বাধীন বাংলার পতাকা ও কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়। সব ধরনের যানবাহনে স্বাধীন বাংলার ছোট ছোট পতাকা ও কালো পতাকা লাগানো হয়। বাংলার সবকিছু বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে চলতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তান হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি বিএ সিদ্দিকসহ অন্য বিচারপতিগণ লে. জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে শপথ গ্রহণ করাতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন।

৯ই মার্চ মওলানা ভাসানী ঢাকায় পল্টনে আয়োজিত এক বিরাট জনসভায় বলেন, ১৩ বছর আগে কাগমারী সম্মেলনে 'আসসালামু আলাইকুম' বলেছিলাম। মরহুম শহিদ সোহরাওয়ার্দী অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি হয়েও সেদিন এ কথাগুলো বুঝতে পারেননি। আমি বুঝতে পেরেছিলাম পশ্চিমা কুচক্রিদের দ্বারা

পাকিস্তানে দুই অংশ বিনষ্ট হবে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান অনেক হয়েছে, আর নয়। তিক্ততা বাড়ায়ে আর লাভ নাই। 'লাকুম দীনুকম ওয়ালীয়া দীন', এই নিয়মে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা মানিয়া নেও। শেখ মুজিবুর রহমান আজ ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছে। খামোকা তাকে অবিশ্বাস করবেন না। তাকে আমি ভালো করে চিনি। তাকে আমি রাজনীতিতে হাতেখড়ি দিয়েছি। আমার রাজনীতি জীবনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে ৩১ জন সেক্রেটারির মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমানই শ্রেষ্ঠ সেক্রেটারি ছিল। আপস করলে কাহারও নিস্তার থাকবে না। পূর্ব বাংলা স্বাধীন হবেই।

১৬ ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার গাড়িতে কালো পতাকা উড়িয়ে বেলা ১১ টায় কড়া প্রহরাধীনে প্রেসিডেন্ট ভবনে প্রবেশ করেন। তার সঙ্গে অপর একটি গাড়িতে আওয়ামী লীগের কতিপয় নেতা প্রেসিডেন্ট ভবনের বহির্দ্বার পর্যন্ত আসেন। আড়াই ঘণ্টা ধরে শেখ মুজিবের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান রাষ্ট্রীয় নীতি ও শাসনতান্ত্রিক প্রশ্ন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন।

শেখ মুজিব জানান যে, জাতীয় পরিষদ স্থগিত করার ক্ষেত্রে তার পদক্ষেপের কারণ ব্যাখ্যা করে ইয়াহিয়া তার আলোচনা শুরু করেন। শেখ মুজিব অভিযোগ করেন যে, তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হওয়া সত্ত্বেও তার সঙ্গে পরামর্শ ছাড়া ঐ সিদ্ধান্ত নিয়ে ইয়াহিয়া খান গুরুতর ভুল করেছেন। ইয়াহিয়া বলেন, তিনি বিদ্যমান পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজে পেতে চান।

ভুট্টো করাচিতে বসে হুমকি দিলেন, তার মতামত ছাড়া রাজনৈতিক কোনো কিছু ফয়সালা হলে তা অবশ্যই প্রতিরোধ করা হবে। ১৮ই মার্চ পরামর্শদাতাদের নিয়ে উভয় পক্ষের বৈঠকে কিছুটা সমঝোতা সৃষ্টি হয়। বঙ্গবন্ধুর নের্তৃত্বে আওয়ামী লীগ ৬ দফার দাবিতে কোনো আপস না করেই এক নতুন ফর্মুলা উপস্থাপন করায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া শর্ত সাপেক্ষে তাতে সম্মত হন।

১৮ই মার্চ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বলা হয় :

(১) প্রেসিডেন্সিয়াল ঘোষণায় সামরিক আইন প্রত্যাহার করে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হোক।

(২) কেন্দ্রে প্রথমত ইয়াহিয়া খানের নের্তৃত্বে সরকার থাকতে পারে, কিন্তু প্রদেশগুলোতে অবিলম্বে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সরকার গঠন করবে।

(৩) পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে জাতীয় সংসদের নির্বাচিত সদস্যরা পৃথকভাবে ৬ দফার ভিত্তিতে খসড়া সংবিধানের সুপারিশ করবে এবং জাতীয় সংসদের অধিবেশনে তা চূড়ান্ত করা যেতে পারে।

(৪) কেন্দ্রে ইয়াহিয়া খানের নের্তৃত্বে সরকার থাকার প্রস্তাবে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কিছুটা নমনীয় মনোভাব প্রকাশ করে বলেন, পিপলস পার্টি

আপত্তি না করলে এ ধরনের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। এ আলোচনার ওপর প্রেসিডেন্টের আইন বিষয়ক উপদেষ্টা এ কে ব্রোহী মত প্রকাশ করেন যে, একটা প্রেসিডেন্সিয়াল ঘোষণা দ্বারা ক্ষমতা হস্তান্তর সম্ভব। ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্টস অ্যাক্টে এ ধরনের নজির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

প্রেসিডেন্টের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা এমএম আহম্মদ প্রেসিডেন্টকে জানান, আওয়ামী লীগের ৬ দফা দাবির বৈদেশিক বাণিজ্য, পৃথক মুদ্রা ব্যবস্থা বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক দ্বিধাবিভক্ত করা যায়, তবে এতে পশ্চিম পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। প্রেসিডেন্টের অন্যতম উপদেষ্টা বিচারপতি এ আর কর্নেলিয়াস কোনো মতামত দেননি। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া করাচিতে অবস্থানরত পিপলস পার্টির নেতা ভুট্টোকে আলোচনার অগ্রগতি অবহিত করেন এবং শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে গোপন আলোচনায় যোগদানের জন্য পরদিন ঢাকা আসতে আমন্ত্রণ জানান। ভুট্টো তাৎক্ষণিকভাবে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

১৫ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনার জন্য ঢাকা আসেন। তার সফরসঙ্গী হন জেনারেল আব্দুল হামিদ খান, চিফ অব স্টাফ, লে. জেনারেল এসজিএম এম পীরজাদা, প্রেসিডেন্টের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার এবং তার উচ্চপদস্থ সামরিক সহকর্মীরা। ইয়াহিয়ার এই ঢাকা সফরের তারিখ ও সময় অত্যন্ত গোপন রাখা হয়। ঢাকা বিমানবন্দরে (তেজগাঁও বিমানবন্দর) অভাবনীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। প্রেসিডেন্ট সফরের শিষ্টাচার কোনো বেসামরিক কর্মকর্তা বা মিডিয়াকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। ইয়াহিয়া বিমানবন্দর থেকে সোজা গাড়িতে গভর্নর হাউসে চলে যান। ফার্মগেট ও রাস্তার অন্যান্য অংশে জনগণের স্থাপিত ব্যারিকেড থাকায় ইয়াহিয়ার জন্য একটি ছোট হেলিকপ্টার (Allouette-ll) উড়ন্ত অবস্থায় রাখা হয়েছিল। হেলিকপ্টারের এ ব্যবস্থাটি করা হয়েছিল অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে। পূর্ব নির্দেশ অনুযায়ী ইয়াহিয়া গভর্নর হাউসে পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত সিনিয়র অফিসারদের নিয়ে একটি সভা করেন। উত্তেজিত ইয়াহিয়া অবাধ্য মুজিব তার মতানুযায়ী আচরণ না করলে তার উত্তর কীভাবে দিতে হবে তা তার জানা আছে বলে জানান। পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত পাকিস্তানি অফিসাররাও এখানকার পরিস্থিতি সম্বন্ধে কম-বেশি অবহিত ছিলেন। ইয়াহিয়ার এ উচ্চারণে হঠাৎ সভায় স্তব্ধতা নেমে আসে। অস্বস্তিকর কয়েক মুহূর্তে অতিবাহিত হওয়ার পর দীর্ঘদেহী, সুঠাম গড়নের এবং সমান্তরাল কাঁধের এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে কিছু বলার জন্য ইয়াহিয়ার অনুমতি চান। ন্যায় ও সত্যের কঠোর প্রবক্তা এ ব্যক্তির নাম এয়ার কমডোর জাফর মাসুদ। পিএএফ বেস, ঢাকার বেস কমান্ডার। মিট্টি মাসুদ নামে তিনি সমধিক পরিচিত। সাহসী বৈমানিক। যে তিনজন পাইলট পঁয়ষট্টির পাক-ভারত যুদ্ধে 'হিলাল-ই-জুররত' উপাধি লাভ

করেন জাফর মাসুদ তাদের একজন। ১৯৫৮ সালে ১৬টি স্যাবর জেটের ফরমেশনকে খাড়াভাবে আকাশে তুলে বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেন। তাকে বলার অনুমতি দেয়া হয়। তিনি বলেন 'স্যার পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক। সমস্যা মূলত রাজনৈতিক এবং রাজনৈতিকভাবে এ সমস্যা সমাধান প্রয়োজন। তা না করে সামরিক কায়দায় এর মোকাবেলা করতে গেলে হাজার হাজার নারী-পুরুষ এবং শিশু নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।' ইয়াহিয়া তার চোখের ভারি ভ্রু কাঁপিয়ে এবং মাথা দুলিয়ে জবাব দেন– 'মিট্টি আমি জানি। এয়ার কমডোর জাফর মাসুদ বসে পড়লেন। (পরবর্তী সময়ে এ অফিসার অপারেশন-সার্চলাইটের পরিকল্পনা অনুযায়ী তার বিমান ও বৈমানিক ব্যবহার করতে অস্বীকৃতি জানান। তাকে পাকিস্তানে বদলি করা হয়, বিচার করা হয় এবং চাকরিচ্যুত করা হয়। ৭ অক্টোবর ২০০৩ তিনি মৃত্যুবরণ করেন।)

১৬ মার্চ ইয়াহিয়া ও শেখ মুজিবের মধ্যে প্রথম আনুষ্ঠানিক আলোচনা হয়। ১৭ মার্চ সন্ধ্যায় মে. জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা ইয়াহিয়া ও মুজিবের মধ্যে অনুষ্ঠিত দিনের আলোচনার ফলাফল জানতে লে. জেনারেল টিক্কা খানের কাছে যান। লে. জেনারেল টিক্কা খান জবাব দেন, 'তুমি যা সামান্য জান, আমিও ততটুকুই জানি।' খাদিম হোসেন রাজা বলেন, 'কিন্তু স্যার, অকুস্থলের ব্যক্তি হিসেবে যেন আপনি অসতর্ক অবস্থায় না পড়েন সেজন্য আলোচনার অগ্রগতি সম্বন্ধে জানা আপনার অধিকার।' সে সন্ধ্যায়ই টিক্কা খানের স্টাফ কার প্রেসিডেন্ট হাউসে প্রবেশ করে। জানা যায়, ইয়াহিয়া খান তাকে বলেন, 'বেজন্মাটা (মুজিব) ঠিকমতো আচরণ করছে না। তুমি তৈরি হও। টিক্কা খান রাত দশটায় জিওসিকে (মে. জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা) টেলিফোন করে বলেন, 'খাদিম, তুমি এগিয়ে যেতে পারো।'

১৮ মার্চ সকালে জিওসি'র অফিসে মে. জেনারেল রাও ফরমান আলী খান এবং মে. জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা ১৪ ডিভিশনের অফিসে হালকা নীল প্যাডে পেন্সিলে পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক শক্তি প্রয়োগের অপারেশনাল অর্ডার লিখে ফেলেন। অপারেশনটির নাম দেয়া হয়, 'অপারেশন-সার্চলাইট' (Operation-Searchlight)। ২০ মার্চ বিকেলে ঢাকা সেনানিবাসের ফ্ল্যাগ স্টাফ হাউজে অপারেশনাল অর্ডারটি চিফ অব স্টাফ জেনারেল আবদুল হামিদ খান এবং লে. জেনারেল টিক্কা খানকে পড়ে শোনানো হয়। ৫ মার্চ লে. জেনারেল ইয়াকুব গভর্নর এবং ইস্টার্ন কমান্ডার হিসেবে পদত্যাগ করেন। তার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা হলেও তাকে তার প্রতিস্থাপক না আসা পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যেতে বলা হয়। লে. জেনারেল টিক্কা খান ৭ মার্চ বিকেলে ঢাকা পৌঁছেন এবং এদিন রাতেই লে. জেনারেল ইয়াকুবের কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নেন। সামান্য পরিবর্তন করে তারা

অর্ডারটি অনুমোদন করেন। এ অর্ডারে একটি নির্দিষ্ট দিনে যখন শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ প্রেসিডেন্টের সাথে বৈঠকরত থাকবেন তখন তাদের গ্রেফতার করার কথা উল্লেখ ছিল। অর্ডারটি অনুমোদন করার সময় ইয়াহিয়া এটিতে রাজি হননি। তিনি বলেন, 'রাজনৈতিক আলোচনার জন্য আমার ওপর জনগণের আস্থা আমি হত্যা করতে পারি না। গণতন্ত্রের বিশ্বাসঘাতক হিসেবে আমি ইতিহাসে যেতে চাই না।' এ ভাবেই ২০ মার্চ পৃথিবীর অন্যতম গণহত্যার পরিকল্পনা 'অপারেশন-সার্চলাইট' চূড়ান্ত রূপ পায়।

১৯ শে মার্চ মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক শুরু হয় সকাল ১১টায়। আলোচনা ৯০ মিনিট কাল স্থায়ী হয়। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিব বলেন, সব চাইতে ভালো কিছুর আশা করছি এবং সব চাইতে খারাপের জন্যও প্রস্তুত আছি। সন্ধ্যায় শেখ মুজিবের পরামর্শদাতা তাউজদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ড. কামাল হোসেন এবং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার উপদেষ্টাদের মধ্যে দুই ঘণ্টা ধরে পৃথক বৈঠক হয়।

ঢাকায় যখন আলোচনা চলছিল তখন ঢাকার অদূরে জয়দেবপুরে পাক বাহিনীর একটি দলের সঙ্গে বাঙালিদের এক সংঘর্ষ হয়। ঢাকাস্থ ৫৭ ব্রিগেডের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব আরবাব খানের নের্তৃত্বে ৭২ জনের একটি কমান্ডো দল জয়দেবপুর রাজবাড়িতে অবস্থিত ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে নিরস্ত্র করার উদ্দেশ্যে সেখানে যাত্রা করে। ২য় ইস্ট বেঙ্গলের অফিসার ও সৈনিকরা যার যার অস্ত্র ও গোলাবরুদ নিয়ে প্রস্তুত থাকে। বার্তা পাঠানো হয়েছিল যে ব্রিগেড কমান্ডার সেখানে দুপুরের খাবার খাবেন। তাদের সব পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। খবর পেয়ে জনসাধারণ রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে ফেরার পথে সেনাবাহিনী বেসামরিক লোকদের ওপর গুলিবর্ষণ করে। ঘটনাস্থলে অন্তত ২০ ব্যক্তি নিহত হন। এ ঘটনায় বঙ্গবন্ধু এতই বিচলিত হন যে, তিনি সাংবাদিকদের বলেন, পরের দিন প্রেসিডেন্টের সাথে নির্ধারিত বৈঠকে নাও বসতে পারি।

২০ শে মার্চ মুজিব-ইয়াহিয়া চতুর্থ দফায় বৈঠক হয়। আলোচনার কিছুটা অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আরও তিনজন অতিরিক্ত পরামর্শদাতা মনসুর আলী, কামরুজ্জামান এবং খন্দকার মোশতাক আহমেদ যোগ দেন। এইদিন ভুট্টো করাচিতে বলেন, প্রেসিডেন্টের নিকট থেকে তিনি যে ব্যাখ্যা চেয়েছিলেন তার সন্তোষজনক জবাব পেয়ে তিনি ২০ সদস্যের একটি দল নিয়ে আগামীকাল ঢাকা রওয়ানা দিচ্ছেন।

এদিকে বঙ্গবন্ধু সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে আন্দোলনে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার আহ্বান জানান। মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী চট্টগ্রামে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও স্বাধিকারের দাবিতে

জনসাধারণ অনেক এগিয়ে গেছে, তাই সবগুলো রাজনৈতিক দলের উচিত জনগণকে অনুসরণ করা।

২১ শে মার্চ স্বীয় ঘোষণা মোতাবেক জুলফিকার আলী ভুট্টো আলোচনায় অংশ নেয়ার জন্য ঢাকা আসেন। তিনি জাতীয় সংসদে সংখ্যালঘু দল হয়েও পাকিস্তান সরকারের ক্ষমতায় অংশীদারের দাবিদার। ভুট্টোর সঙ্গে আলোচনার জন্য দেশি বিদেশি বহু সাংবাদিক নানানভাবে বিমান বন্দরে উপস্থিত হন। কিন্তু সামরিক কর্তৃপক্ষ কড়া পাহারায় অতি দ্রুত সকলের অলক্ষে তাকে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে নিয়ে যান। তিনি দুঘণ্টা ধরে ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হন এবং প্রকাশ্যে ত্রিপক্ষীয় মতৈক্যের দাবি উত্থাপন করেন। পর্যবেক্ষকদের মতে, তিনি এ মর্মে আইনের প্রশ্ন উত্থাপন করে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে সতর্ক করে দেন যে, আওয়ামী লীগকে বিশ্বাস করে একবার সামরিক আইন প্রত্যাহার করে জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান করলে, ভবিষ্যতের সবকিছু সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলই নির্ধারণ করবে। এই দিন শেখ মুজিবুর রহমান, ইয়াহিয়া এবং ভুট্টোর মধ্যে এক যৌথ বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়।

২২শে মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান, ইয়াহিয়া এবং ভুট্টোর মধ্যে আরেকটি যৌথ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, অপর দিকে ঢাকায় প্রেসিডেন্ট হাউজ থেকে প্রচারিত এক সরকারি ঘোষণায় ২৫শে মার্চ থেকে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের অধিবেশন পুনরায় স্থগিত ঘোষণা করেন। কারণ হিসেবে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্য সৃষ্টির জন্য আরো সময়ের প্রয়োজন বলে উল্লেখ করা হয়।

এদিন ঢাকায় প্রধান দৈনিক পত্রিকাসমূহে (অবজারভার ছাড়া) বাংলার স্বাধিকার শীর্ষক ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়। ক্রোড়পত্রে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। এ নিবন্ধগুলোর লেখক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক রেহমান সোবহান, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ চৌধুরী এবং আওয়ামী লীগ নেতা কামরুজ্জামান। এতে প্রথম পাতায় তিন কলামব্যাপী ছবিসহ বঙ্গবন্ধুর বাণী প্রকাশিত হয়।

২৩ শে মার্চ সারা বাংলায় পাকিস্তান দিবসের পরিবর্তে প্রতিরোধ দিবস পালিত হয়। পাকিস্তানি পতাকার পরিবর্তে সর্বত্র স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করা হয়। ছাত্রলীগ প্রতিরোধ বাহিনী পল্টন ময়দানে আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করেন। সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে ঢাকাস্থ ব্রিটিশ ডেপুটি হাইকমিশন ও সোভিয়েট কনসুলেটসহ প্রায় সব বিদেশি দূতাবাসেই স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়াতে দেখা যায়। কেবল চীনা ও ইরানি দূতাবাসে পাকিস্তানি পতাকা উত্তোলন করা হলে, ছাত্ররা তা নামিয়ে স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়ায়।

মজলুম জননেতা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী দিনটিকে স্বাধীন পূর্ববাংলা দিবস হিসেবে পালনের আহ্বান জানান। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন, প্রবীণ সাংবাদিক ও সাহিত্যিক আবুল কালাম সামসুদ্দিন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী পাকিস্তান সরকারের প্রদত্ত খেতাব বর্জন করেন। পল্টন ময়দানে আনুষ্ঠানিকতা শেষে প্যারেড করে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে তার মাধ্যমে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করান এবং বঙ্গবন্ধু ছাত্রদের সামনে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন।

২৪শে মার্চ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ এবং সামরিক জান্তার পরামর্শদাতাদের মধ্যে দুদফা বৈঠক হয়। এদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের ছোট ছোট দলের নেতারা এবং পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো ছাড়া তার দলের অন্য নেতৃবৃন্দ পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন। ইতোমধ্যে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেয়া সম্পর্কিত গুজব ঢাকায় ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু ঢাকার রাজনৈতিক মহল একটি ইঙ্গিতের আভাস পান।

২৫শে মার্চ সারা দিন বঙ্গবন্ধুর পরামর্শদাতারা আমন্ত্রণের অপেক্ষায় থেকেও লে. জেনারেল পীরজাদার কাছ থেকে আর কোনো প্রত্যাশিত সাড়া পেলেন না। বঙ্গবন্ধু সব কিছু বুঝতে পেরে সেনাবাহিনী কর্তৃক আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় নেতৃস্থানীয় সহকারীদের গোপন আশ্রয়ে চলে যাওয়ার জন্য পরামর্শ দেন। বঙ্গবন্ধুকে নিরাপদে আশ্রয়ে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করলে তিনি বাড়ি ছেড়ে পালাতে অস্বীকৃতি জানান।

সূর্য ডোবার পর থেকে সব থমথমে অস্বস্তিকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। সেদিন মধ্য রাতে বাঙালিদের ওপর বর্বরোচিত আক্রমণের জন্য সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিয়ে সন্ধ্যা সাতটায় ইয়াহিয়া করাচির উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন। সন্ধ্যার মধ্যে সম্ভাব্য সেনাবাহিনীর হামলার খবর ঢাকা শহরে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। পরে বাঙালিরা রাস্তায় রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে শুরু করে। একই সঙ্গে সেনাছাউনি থেকে ইউনিফর্ম পরিহিত হানাদার বাহিনী রাইফেল, মেশিনগান, ট্যাংকসহ আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে গোটা শহরে। রাত ১১-৩০ মিনিটে হানাদার বাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইপিআর সদর দপ্তর পিলখানা, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, আজিমপুর, ফুলবাড়িয়া, পুলিশ লাইন রাজারবাগসহ শহরের অন্যান্য সকল স্থানে অলিতে গলিতে খুনের নেশায় 'অপারেশন-সার্চলাইট' নামে শুরু করে ইতিহাসের সবচেয়ে বর্বরোচিত, পাশবিক ও ঘৃণ্য গণহত্যা। রক্তের স্রোতে, লাশের স্তূপে, আগুনের লেলিহান শিখায় আর মুমূর্ষু মানুষের আর্ত চিৎকারে গোটা নগরী পরিণত হয় নরককুণ্ডে। অসম যুদ্ধে রাজারবাগ পুলিশ লাইনে প্রাণ দেয় বহু বাঙালি পুলিশ। এ রাতেই প্রাণ দেয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এবং প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক। জ্বালিয়ে দেয়া হয় দৈনিক সংবাদ, পিপল, ইত্তেফাক কার্যালয় ও প্রেস। ক্রোধে ও আক্রোশে পাকিস্তানি সৈন্যরা উপড়ে ফেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বট গাছটি এবং গুঁড়িয়ে ফেলে স্বাধিকার আন্দোলনের পাদপীঠ কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার।

এদিকে সেনাবাহিনীর ৩ কমান্ডো ব্যাটিলিয়নের অধিনায়ক লে.কর্নেল জহির আলম খানের নের্তৃত্বে একটি সেনাদল শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়ি ঘিরে ফেলে এবং তার বাড়ির ওপর গুলি ছড়তে থাকলে তিনি বেলকনিতে বেরিয়ে আসেন। শেখ মুজিব বলেন, গুলি ছোড়ার দরকার নেই আমি প্রস্তুত। পাকিস্তান সেনাবাহিনী শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। শেখ মুজিবকে নিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে সৈন্যরা তার বাড়িতে ঢুকে যাবতীয় কাগজপত্র ও তার সারা জীবনের সঞ্চিত মূল্যবান দলিলপত্রসমূহ ধ্বংস করে ফেলে। তার বাড়িতে উড্ডীয়মান স্বাধীন বাংলার পতাকাটিও তারা গুলিতে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে।

এভাবে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাঙালি জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার ঘৃণ্য মতলবে এক বর্বর হত্যাযজ্ঞে মেতে ওঠে। রাতের অন্ধকারে হানাদার বাহিনী একটি জাতির মুক্তির অধিকারকে গুঁড়িয়ে দেয়ার জন্য যে কাপুরুষিত নৃশংস উল্লাসে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাতে রচিত হয় জঘন্যতম গণহত্যার এক ইতিহাস।

হত্যার এই মহোৎসব, রক্তের এই লীলাখেলার মধ্যেই ২৫ শে মার্চ মধ্য রাতে বাঙালি জাতি শুরু করে বাংলাদেশের স্বাধীনতার চূড়ান্ত সংগ্রাম। সূচনা হয় সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের। সংগ্রাম, আত্মত্যাগ আর রক্তের নদীতে স্নান করে জেগে ওঠে বাংলাদেশ। শুরু হয় মহান মুক্তিযুদ্ধ।

২৫শে মার্চ কালোরাত। পূর্ব পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র ও নীলনকশা অনুযায়ী পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘুমন্ত বাঙালি জাতির ওপর। আক্রমণ করল ঢাকার বিভিন্ন জনপদ, বিশেষ করে রাজারবাগ পুলিশ লাইন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পিলখানাসহ সর্বত্র। শুরু হলো ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ। তাদের ব্যাপক অগ্নিসংযোগ, নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ, আক্রান্ত এলাকাগুলোতে গোলাবর্ষণ, তাদের ট্যাঙ্ক বহরের আগ্রাসন সর্বোপরি চারদিকে আতঙ্কিত জনগণের আহাজারি, মা-বোন ও শিশুদের আর্তনাদে ভারী হয়ে ওঠেছিল পরিবেশ। আক্রান্ত এলাকাগুলোতে তথা পুরো শহরজুড়ে সৃষ্টি হলো এক বিভীষাকাময় চিত্র। যেন এক মৃত্যুপুরী। এই হত্যাযজ্ঞের নির্দেশ দিয়ে ইয়াহিয়া গংরা রওয়ানা হয়ে গেলেন তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্দেশে। ধানমন্ডি ৩২নং বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বেরিয়ে পড়ল বাংলার বিভিন্ন জনপদে। হাটবাজার, বাড়িঘরে আগুন লাগাতে শুরু করল। দাউ

দাউ করে জ্বলতে লাগল বাংলার জনপদগুলো। তাদের চরম নিষ্ঠুরতা ও নির্মম হত্যাকাণ্ডের এক করুণ চিত্র প্রত্যক্ষ করল বিশ্ববাসী। বিশ্ববাসী সেদিন শুনতে পেয়েছিল মানবতার আর্তনাদ। এ হাহাকার মুক্তিকামী মানুষের চেতনাকে করেছিল আরও শাণিত। ৭ই মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণে উদ্বুদ্ধ সর্বস্তরের জনগণ যার যা কিছু ছিল তা নিয়ে ব্যারিকেড সৃষ্টি করল বাংলার প্রতিটি জনপদে। অত্যাধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত একটি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ৭ই মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণে– উদ্বুদ্ধ /উদ্দিপ্ত মুক্তিকামী জনগোষ্ঠী ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এই ব্যারিকেড যুদ্ধে। এটি শুধু অতুলনীয় সাহসিকতার নিদর্শন নয়, একটি যুদ্ধ শুরুর প্রারম্ভে এ ধরনের প্রতিরোধের ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। এই তুমুল ব্যারিকেডযুদ্ধ স্থায়ী হয়েছিল মাত্র কয়েক দিন। সম্ভবত ৩১শে মার্চ পর্যন্ত। পরবর্তীতে এপ্রিলের শুরুতেই ছাত্র-জনতা/শ্রমিক-কৃষক তথা মুক্তিকামী সর্বস্তরের জনগণ সীমান্ত পাড়ি দিয়ে এদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। গঠিত হলো স্বাধীন বাংলা দেশের সরকার। জেনারেল ওসমানীকে সর্বাধিনায়ক করে তার অধীনে মুক্তিযুদ্ধ রণাঙ্গনকে ১১ টি সেক্টরে ভাগ করা হয়।

১১টি সেক্টর

সেক্টর নং	সেক্টর এলাকা	সেক্টর কমান্ডারের নাম
১	চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা এবং নোয়াখালী জেলার মুহুরী নদীর পূর্ব পর্যন্ত।	মেজর জিয়াউর রহমান (এপ্রিল-১০ – জুন'৭১) মেজর রফিকুল ইসলাম (১১জুন-১৬ ডিসেম্বর'৭১)
২	ফরিদপুরের পূর্বাঞ্চল, ঢাকা শহরসহ ঢাকা জেলার দক্ষিণাংশ, কুমিল্লা জেলা (আখাউড়া আশুগঞ্জ রেললাইনের উত্তরাংশ বাদে) এবং নোয়াখালী জেলা (মুহুরী নদীর পূর্বাঞ্চল বাদে)	মেজর খালেদ মোশাররফ (এপ্রিল-অক্টোবর'৭১) মেজর এটিএম হায়দার (অক্টোবর ১৬ডিসেম্বর '৭১)
৩	বৃহত্তর সিলেট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমা, ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমা, ঢাকা জেলার নরসিংদী, গাজীপুর মহকুমার একাংশ এবং কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার প্রায় অর্ধাংশ নিয়ে ৩নং সেক্টর এলাকা গঠিত।	মেজর কেএম সফি উল্লা (এপ্রিল ৩০ - সেপ্টেম্বর'৭১) মেজর এএন এম নুরুজ্জামান (১ অক্টোবর -১৬ডিসেম্বর'৭১)

৪	বৃহত্তর সিলেট জেহলার মৌলভীবাজার মহকুমা, সিলেট জেলা সদরের প্রায় অর্ধাংশ এবং সুনামগঞ্জ মহকুমার অংশবিশেষ নিয়ে এ সেক্টর গঠিত।	মেজর চিত্তরঞ্জন দত্ত (মে-১৬ ডিসেম্বর'৭১)
৫	সিলেট জেলার জেলা– সদর, জৈন্তাপুর, গোয়াইনঘাট, কোম্পানিগঞ্জ এবং সুনামগঞ্জ মহকুমার ছাতক, দোয়ারা বাজার, বিশ্বম্ভরপুর, জামালপুর থানা নিয়ে গঠিত।	মেজর মীর শওকত আলী (আগস্ট ১৬ – ডিসেম্বর '৭১)
৬	বৃহত্তর রংপুর জেলা এবং বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার দক্ষিণাঞ্চলের কিছু অংশ বাদে বাকি অংশ যেমন– রংপুর জেলা, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারী পঞ্চগড় মহকুমা এবং গাইবান্দা মহকুমার সাঘাটা গোবিন্দগঞ্জ থানা বরাবর সড়ক, দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ-পার্বতীপুর-চিরিরবন্দর-খানসামা-বীরগঞ্জ-কাহারোল– বোচাগঞ্জ থানা বরাবর সড়ক এবং ঠাকুরগাঁও মহকুমার পীরগঞ্জ-রাণীশঙ্কল-হরিপুর থানা বরাবর প্রধান সড়কের দক্ষিণাঞ্চল বাদে বাকি অংশ নিয়ে গঠিত	উইং কমান্ডার এম কে বাশার (জুন১৬ - ডিসেম্বর '৭১)
৭	বৃহত্তর রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া জেলা এবং দিনাজপুর জেলার অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত। রাজশাহী, নাটোর নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, জয়পুরহাট মহকুমা, বগুড়া জেলা এবং দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট, নবাবগঞ্জ, বিরামপুর, ফুলবাড়ি, দিনাজপুর সদর, বিরল বোচাগঞ্জ থানা বরাবর সড়কের দক্ষিণ ভাগ এবং গাইবান্ধা মহকুমার সাঘাটা, গোবিন্দগঞ্জ থানা বরাবর সড়কের দক্ষিণাঞ্চল নিয়ে গঠিত।	মেজর খন্দকার নাজমুল হক এপ্রিল ২৮ - সেপ্টেম্বর'৭১ মেজর কাজী নুর উজ-জামান) (১ অক্টোবর-১৬ ডিসেম্বর'৭১)

৮	প্রাথমিক পর্যায়ে পদ্মা, মেঘনার দক্ষিণ পশ্চিমাংশে সম্পূর্ণ এলাকা তথা কুষ্টিয়া, যশোর, ফরিদপুর, খুলনা, বরিশাল ও পটুয়াখালী মহকুমার বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ে 'দক্ষিণ পশ্চিম-রণাঙ্গন' নামে আত্মপ্রকাশ করে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়। মে মাসের প্রথম ভাগে এই সেক্টরের অপারেশন এলাকা সংকুচিত করে বৃহত্তর কুষ্টিয়া ও যশোর জেলা, খুলনা জেলা সদর ও সাতক্ষীরা মহকুমা এবং ফরিদপুরের উত্তরাংশ পর্যন্ত অপারেশন এলাকা নির্ধারণ করা হয়, যা কুষ্টিয়া জেলা, মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা মহকুমা যশোর জেলা, ঝিনাইদহ, মাগুরা, নড়াইল, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর মহকুমাসহ ফরিদপুর জেলার মধুখালী, বোয়ালমারী-আলফাডাঙ্গা, নগরকান্দা থানাসহ ফরিদপুর সদরের অংশ বিশেষ এবং খুলনা জেলা ও সাতক্ষীরা সড়ক পর্যন্ত এলাকা নিয়ে গঠিত।	মেজর আবু ওসমান চৌধুরী (এপ্রিল ১৫- আগস্ট' ৭১) মেজর এম আবুল মঞ্জুর (১৮ আঃ– ১৬ ডিসেম্বর'৭১)
৯	বৃহত্তর বরিশাল, পটুয়াখালী এবং খুলনা অঞ্চলের অধিকাংশ এলাকা নিয়ে ৯নং সেক্টর গঠিত হয়, যা খুলনা-সাতক্ষীরা সড়কের দক্ষিণাঞ্চল, বাগেরহাট, বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা সমন্বয়ে গঠিত।	মেজর এম এ আজিজ (এপ্রিল ১৬- ডিসেম্বর'৭১)
১০	এই সেক্টরের কোনো আঞ্চলিক সীমানা ছিল না। এ সেক্টরটি গঠিত হয়েছিল কেবল নৌ-কমান্ডোদের নিয়ে। বিভিন্ন নদীবন্দর ও শত্রুপক্ষের নৌযানগুলোতে অভিযান চালানোর জন্য এদের বিভিন্ন সেক্টরে পাঠানো হতো। লক্ষ্যবস্তুর গুরুত্ব এবং পাকিস্তানিদের প্রস্তুতি বিশ্লেষণ করে	কোনো সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত করা হয়নি। প্রধান সেনাপতি তাঁর নিয়ন্ত্রণে এই বাহিনীকে রেখেছিলেন। মূলত নৌ-কমান্ডো প্রধান সেনাপতির স্পেশাল ট্রুপস হিসেবে

	অভিযানে সাফল্য নিশ্চিত করার বিষয়টি বিবেচনায় আনা হতো এবং তার উপর নির্ভর করত অভিযানে অংশগ্রহণকারী দলসমূহে যোদ্ধার সংখ্যা কত হবে। যে সেক্টর এলাকায় অভিযান চালানো হতো, কমান্ডারের অধীনে কাজ করত। নৌ-অভিযান শেষে তারা আবার তাদের মূল সেক্টর অর্থাৎ ১০ নম্বর সেক্টরের আওতায় চলে আসত।	গঠিত হয়েছিল।
১১	কিশোরগঞ্জ মহকুমা বাদে বৃহত্তর ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলা এবং সিলেট জেলার সুনামগঞ্জের দক্ষিণাঞ্চল এবং রংপুর জেলার কুড়িগ্রাম মহকুমার অংশ বিশেষ নিয়ে গঠিত।	মেজর জিয়াউর রহমান (১০ জুন-১২ আগস্ট '৭১) মেজর আবু তাহের (১২ আগস্ট-১৪ নভেম্বর'৭১) ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট এম হামিদুল্লাহ খান (১৫ নভেম্বর-১৬ডিসেম্বর'৭১)

ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট হামিদ উল্লাহ
নভেম্বর টু ডিসেম্বর

ভারত সরকার ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় শুরু হলো মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ। পাশাপাশি ভারতীয় সেনাবাহিনী এই ১১টি সেক্টরের বিপরীতে স্থাপন করল তাদের নিয়ন্ত্রিত ৬টি সেক্টর। এগুলোর নামকরণ করা হয়েছিল ডেলটা সেক্টর। মূলত ডেলটা সেক্টরগুলো থেকে আমাদের সেক্টরগুলোকে খাদ্য, বস্ত্র, অস্ত্রসহ সব ধরনের গোলাবারুদ সরবরাহ অব্যাহত রাখত। ডেলটা সেক্টরের দায়িত্বে ছিলেন তখন বিগ্রেডিয়ার সাবেগ সিং। মুক্তিযুদ্ধের শেষ লগ্নে এসে আনন্দ স্বরূপের নের্তৃত্বে সৃষ্টি হয় কিলোফোর্স। প্রায় ৯৮ জন পাকিস্তানি কমিশন অফিসার অংশগ্রহণ ও নের্তৃত্ব প্রদান করেন এই ১১টি সেক্টরে যারা পাকিস্তান সামরিক বাহিনী ছেড়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পালিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। উল্লেখ থাকে যে ১০৩ জন চাকরিরত বাঙালি

সামরিক অফিসার স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দেননি। তাদের অনেকেই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সাথে বিভিন্ন অপারেশনে যোগদান করেছিলেন এবং মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যায় সহযোগিতা করেছিলেন। ভারতীয় ট্রেনিং ক্যাম্পগুলোতে মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যাপক প্রশিক্ষণ যুদ্ধের শেষ দিন পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে চলছিল। সেক্টরগুলোতে আমাদের অফিসারদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য তথা সেক্টরগুলোতে লিডারশিপ সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভারতীয় সেনাবাহিনী আমাদের বাঙালি একশো'রও অধিক অফিসার ক্যাডেটকে দু'ব্যাচে কমিশন প্রাপ্তির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। প্রথম ব্যাচে প্রায় ৬৫ জন বাঙালি অফিসার মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন সেক্টরের অধীনে অংশগ্রহণের কারণে যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাকি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অফিসার ক্যাডেটগণ যুদ্ধের শেষ লগ্নে সেক্টরগুলোতে যোগদানের জন্য প্রস্তুত ছিল। ১১টি সেক্টরের বাহিরে ও হেমায়েত বাহিনী ও কাদেরিয়া বাহিনী নামে দুটি বাহিনী পৃথক পৃথকভাবে নিজ নিজ অঞ্চলে সম্মুখ ও গেরিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। দুজনই সেনাবাহিনীর প্রাক্তন সদস্য ছিলেন। এখানে উল্লেখ করতে চাই, তখনকার পরিচালিত সব সম্মুখ যুদ্ধ ও গেরিলা যুদ্ধ স্বাধীন বাংলা সরকারের অধীনে ১১টি সেক্টরে এবং এর বাইরে কোথাও কোথাও আঞ্চলিকভাবে আঞ্চলিক কমান্ডারদের নের্তৃত্বে পরিচালিত হচ্ছিল। তখন সবার মধ্যে সর্বস্তরে একটি সমন্বয়ও ছিল। বিচ্ছিন্নভাবে কোনো গেরিলা যুদ্ধ বা সম্মুখ যুদ্ধ আঞ্চলিক কমান্ডার বা সংগঠকদের অজান্তে সংগঠিত হয়নি। গেরিলা যুদ্ধ কি সম্মুখ যুদ্ধ পুরো যুদ্ধটাই ছিল সামরিক যুদ্ধ আর তা ছিল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অফিসার্স ও সৈনিকদের নের্তৃত্বে। এ ব্যাপারে আমি পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করব। এ সেক্টরগুলোর পাশাপাশি যুদ্ধের শেষ লগ্নে এসে গঠিত হলো এস, জেড ও কে ফোর্স যা ছিল স্বাধীন বাংলা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত। অক্টোবর/নভেম্বর সর্বাত্মক গেরিলা ও সম্মুখ যুদ্ধের গতি অনেকগুণ তীব্রতা লাভ করে। যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তখনও যুদ্ধ ঘোষণা করেনি। ভারতীয় সেনাবাহিনী বিভিন্ন রণাঙ্গনে আমাদের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে আসছিল। গেরিলা যুদ্ধ ও সম্মুখ যুদ্ধ সবই কিন্তু সামরিক অপারেশনের আওতায় আসে। তাই যারা বলেন– স্বাধীন বাংলা সরকারের অধীনে ১১টি সেক্টরে ব্যাপক এই গেরিলা যুদ্ধ ও সম্মুখ যুদ্ধ সামরিকীকরণ করা হচ্ছে এটা সঠিক বিশ্লেষণ নয়। কারণ, ১১টি সেক্টরের অধীনে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় এই গেরিলা ও সম্মুখ যুদ্ধ সেক্টরগুলোর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অফিসার আর সৈনিকদের সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছিল। তাই যুদ্ধচলাকালীন সময়ে সেনাবাহিনীর সদস্য, গেরিলা যোদ্ধা, সম্মুখ যোদ্ধা এবং বিভিন্নভাবে যারা যুদ্ধচলাকালীন সময়ে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সংগঠক বা সহযোগী হিসেবে কাজ করেছিলেন তাদেরকে রণাঙ্গনে

যুদ্ধরত সেনাবাহিনী সদস্যদের থেকে পৃথকভাবে দেখার কোনো অবকাশ নেই। যারা মাঝে মাঝে এখনও মূল যুদ্ধের কাঠামো থেকে গেরিলা ও সম্মুখ যুদ্ধকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখে, সেই দেখা অনেকটা কাল্পনিক শুধু নয়, এতে করে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের ১১টি সেক্টরের হাজারো মুক্তিযোদ্ধা যারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও দায়িত্বপ্রাপ্ত সেনাবাহিনীর অফিসার ও সদস্যদের অধীনে যুদ্ধ করেছিলেন তাদের অবদানকে খাটো করা হয়। এ ধরনের মূল্যায়ন ইতিহাস বিকৃতির সামিল। এই যুদ্ধ ছিল একটি গণযুদ্ধ। তাই কারোর অবদানকেই খাটো করে দেখার কোনো অবকাশ নেই। সেদিন যুদ্ধচলাকালীন সময়ে সর্বস্তরের জনগণের সহযোগিতা ছাড়া এই গেরিলা যুদ্ধ/সম্মুখ যুদ্ধ কোনোদিনও সফল হতো না। রণাঙ্গনে যারা বিভিন্ন উপায়ে সক্রিয় সহযোগিতা করেছিল এই সহযোগিতার কারণে তারাও সেদিন পাক হানাদার বাহিনীর দোসর ও আল-বদরের হাতে নানাভাবে নির্যাতিত হয়েছিল। এবং মুক্তিযুদ্ধের হাজার হাজার সহযোগী পাকিস্তানি আর্মি ও তার দোসরদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়েছিল। হাজারো মা-বোন হয়েছিল লাঞ্ছিত। সেই পরিস্থিতিতেও আমরা লক্ষ করেছিলাম– এই মা/বোনরা সেদিন নীরবে নিভৃতে বসে আমাদের জন্য হাত তুলে দোয়া করতেন। যুদ্ধচলাকালীন সময়ে রণাঙ্গনের আশ-পাশের এলাকাগুলোতে পাক-হানাদার বাহিনীর গোলাগুলি ও আর্টিলারি সেলিং-এর কারণে ওই গ্রামগুলোর প্রায় সব বাড়ি-ঘর বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। দোয়ারত অনেক মা-বোন সেদিন এই সেলিং-এ আহত হয়েছেন।এদের অনেকেই পা হারিয়েছেন, অনেকে চিরদিনের জন্য পঙ্গু হয়ে গিয়েছেন। যুদ্ধে এদের অবদানকে আমরা কি কোনোদিন ভুলতে পারব? প্রায়ই রাতে আমরা বাঙ্কারে বসে অদূরে নীরব নিস্তবতার মধ্যে শুনতে পেতাম – অনেক মা/বোন/ শিশুদের আর্তনাদ ও কান্নার আওয়াজ। তখন হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসরদের অত্যাচার ও নির্যাতন চলছে।এ যুদ্ধে গ্রাম-অঞ্চলগুলোতে অনেকেই আমাদেরকে সেদিন আশ্রয় ও খাদ্য, বস্ত্র দিয়ে সহযোগিতা করেছিলেন। এদের অনেকেই রণাঙ্গনে বাঙ্কার নির্মাণ করার জন্য গাছ/কাঁঠ/টিন/বালুর বস্তা ইত্যাদি সরঞ্জাম সরবরাহ করেছিলেন।তাদের অবদান কি ভোলার কথা? স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে গায়ক আব্দুল জব্বার ও আপেল মাহমুদ এর কণ্ঠে – মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি / জয় বাংলাসহ বিভিন্ন দেশাত্মবোধক গান রণাঙ্গনে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সার্বক্ষণিক অনুপ্রেরণা ও উদ্দীপনা যুগিয়ে আসছিল। স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে সেদিন এম. আর. আক্তার মুকুল কর্তৃক প্রচারিত " চরম পত্র" রণাঙ্গনে প্রত্যেকটি মুক্তিযোদ্ধাকে এবং মুক্তিকামী জনগণকে যে সাহস ও উদ্দীপনা যুগিয়েছিল এদের তথা স্বাধীন বাংলা বেতারের প্রত্যেকটি শিল্পী/কলা-কৌশলী যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে যে ভূমিকা পালন করেছিলেন

তা শুধু একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগই নয় তারা যেন সবাই সেদিন সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমাদের কাতারের এক-একটি সৈনিক ছিলেন। জাতি তাদের নিয়ে আজও গর্ব করে। সেদিন যে সব কুটনৈতিক বিদেশে পাকিস্তান দূতাবাস ছেড়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পক্ষে অবস্থান নিয়ে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছিলেন তারাও তো মুক্তিযোদ্ধা। তাই এই গণযুদ্ধে কারো অবদানকে খাটো করে দেখা যাবে না। স্বাধীন বাংলার সরকারের অধীনে এই ব্যাপক মুক্তিযুদ্ধের সঠিক মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হলে যুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত হবে। আমি আগেই উল্লেখ করেছি – অক্টোবর/ নভেম্বরে যুদ্ধের গতি তীব্রতা দিন দিন যতই বৃদ্ধি পাচ্ছিল সেই মুহূর্তে ১১টি সেক্টরের পাশাপাশি সৃষ্টি হলো খালেদের নের্তৃত্বে কে ফোর্স, সফিউল্লাহর নের্তৃত্বে এস.ফোর্স এবং জিয়ার নের্তৃত্বে জেড ফোর্স। বিমান বাহিনী এবং নৌ বাহিনীর ছোট আকারের হলেও পৃথক পৃথকভাবে ফোর্স হিসেবে সংগঠিত হলো। (ফোর্স গুলোর চার্ট)

K.S.Z Force

এই ফোর্স গুলো আনুষ্ঠানিকভাবে সংগঠিত ও ঘোষিত হওয়ার অনেক আগ থেকে এর সদস্য তথা মুক্তিযোদ্ধরা যুদ্ধের প্রথম লগ্ন থেকে অর্থাৎ ১১টি সেক্টরের বিভিন্ন রণাঙ্গনে যুদ্ধরত অবস্থায় ছিল। রণাঙ্গনগুলোতে মুক্তি বাহিনীর যুদ্ধের গতি ও তীব্রতা যতই বৃদ্ধি পাচ্ছিল পাক-হানাদার বাহিনী ক্রমান্বয়ে ততোই পর্যদস্ত ও দুর্বল হয়ে পড়ছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে (Aug.71) তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনের সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্ট যুদ্ধরত সিনিয়র কমান্ডারদের সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং এই সভায় এই K.S.Z Force গুলো গঠনের আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেদিন জেনারেল ওসমানী এ ব্যাপারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

K Force গঠন

খালেদ মোশারফের নাম অনুসারে ‘ K’ ফোর্স নামকরণ করা হয়।

খালেদ এই ফোর্স এর অধিনায়ক নিযুক্ত হন। এছাড়া তিনি ২ নং সেক্টরের অধিনায়ক/কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন।

---আগস্ট ’৭১, তিনি রণাঙ্গনে শত্রুর আর্টিলারি সেলে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে ভারতের লক্ষ্ণৌ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তখন থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে ২নং সেক্টর কমান্ডার হিসেবে মেজর হায়দার (বীর উত্তম) দায়িত্ব প্রাপ্ত হন এবং ‘k’ Force এর কমান্ডার হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন মেজর শালেক (বীর উত্তম)। ‘কে’ ফোর্সের অধীনে তিনটি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট আগ থেকেই খালেদের অধীনেই যুদ্ধরত ছিল।

K Force এর অধীনে তিনটি রেজিমেন্ট

১। ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের
অধিনায়ক– ক্যাপ্টেন গফফার হাওলাদার (বীর উত্তম)

২। ৯ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের
অধিনায়ক– মেজর আইন উদ্দিন (বীর প্রতীক)

৩। ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের
অধিনায়ক– মেজর জাফর ইমাম (বীর বিক্রম)

S Force গঠন

মেজর সফিউল্লাহর নাম অনুসারে ' S' ফোর্স নামকরণ করা হয়। ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়ক মেজর সফিউল্লার (বীর উত্তম) পরে মেজর মঈন (বীর বিক্রম), এর পরে মেজর মতিন (বীর প্রতীক) সর্বশেষ যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত মেজর নাসিম (বীর উত্তম)

Z Force গঠন

জিয়ার নাম অনুসারে Z Force নামকরণ করা হয় এবং মেজর জিয়া (বীর উত্তম) কে জেড ফোর্স এর অধিনায়ক নিযুক্ত করা হয়। এর আগে জিয়া কিছু দিনের জন্য ১নং সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন। তার অধীনে ছিল প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট।

প্রথমে মেজর হাফিজ উদ্দিন (বীর বিক্রম) এর নের্তৃত্বে প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট বিদ্রোহ করার পর হাফিজ উদ্দিন অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেন তারপর মেজর মঈন (বীর বিক্রম) বিখ্যাত কমলপুর যুদ্ধের পরে অধিনায়ক হন এবং শেষ লগ্নে মেজর জিয়া উদ্দিন (বীর উত্তম) এর অধিনায়ক ছিলেন। ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়ক মেজর আমিনুল হক (বীর উত্তম)।

এই কে. এস. জেড ফোর্সগুলোসহ বিমান ও নৌবাহিনীর যোদ্ধারা এই ফোর্সগুলোর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ও গঠনের আগ থেকে বিভিন্ন রণাঙ্গনে যুদ্ধরত ছিল। পরে ২১ নভেম্বর '৭১ সশস্ত্র বাহিনী আনুষ্ঠানিক অপারেশন শুরু/আত্মপ্রকাশ দেখানো হয়। এটা ছিল শুধু একটি আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। সেদিন থেকেই বর্তমান সশস্ত্র বাহিনীর যাত্রা শুরু। বর্তমানে এই সশস্ত্র বাহিনী হাঁটি হাঁটি পা পা করে আজ এক বিশাল গর্বিত দক্ষ সশস্ত্র বাহিনীতে রূপান্তরিত হয়েছে।

বিমান বাহিনী গঠন

বাংলাদেশ বিমান বাহিনী গঠিত হয় একাত্তরের ২৮শে সেপ্টেম্বর ভারতের নাগাল্যান্ড রাজ্যের ডিমাপুরে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় তৈরি প্রায় ৫,০০০ বর্গফুট পরিত্যক্ত একটি রানওয়েতে। দুটি পাখাযুক্ত(Fixed wing) বিমান এবং একটি ছোট্ট হেলিকপ্টার (Rotary wing) নিয়ে গঠিত হয় এই বিমান বাহিনী। মুক্তিযুদ্ধকালে গ্রুফ ক্যাপ্টেন আব্দুল করীম খন্দকার ডিপুটি চিফ অব স্টাফ, বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী– বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর স্বপ্নদ্রষ্টা। বস্তুত তাঁর একক প্রচেষ্টায় বিমান সংগ্রহ এবং বৈমানিকসহ বিমান সেনাদের একত্রিত করা হয়। এই ছোট্ট বিমান বাহিনীর নাম নয় কিলো ফ্লাইট। গ্রুপ ক্যাপ্টেন খন্দকারের ইংরেজি বানানের আদ্যক্ষর 'k' দিয়ে কিলো ফ্লাইটের নামকরণ করা হয়। এই বিমান বাহিনীর প্রথম অফিসার কমান্ডিং ছিলেন Squardon লিডার সুলতান মাহমুদ (বীর উত্তম)। এর পূর্বে ১নং সেক্টরে স্থল যুদ্ধে তিনি নের্তৃত্ব দান করেন এবং শত্রুর গুলিতে আহত হন। ভারতীয় বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল প্রতাপ চন্দ্র লাল (পিসি লাল নামে সমধিক পরিচিত) এর আগ্রহ ও সক্রিয় সহযোগিতা ব্যতীত বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর জন্ম হতো না– এ কথা বলতেই হয়। মার্শাল চন্দ্র লাল তার বৈমানিক জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে যে বইটি লিখেছিলেন তার মৃত্যুর পর তারই বাঙালি সহধর্মিণী লীলা লাল ১৯৮৬ সালে My years with the IAF নামের বইটি মুদ্রণ করেন। সেখানে ভারতীয় বিমান বাহিনীর যুদ্ধকালীন নৈপুণ্য তুলে ধরার পাশাপাশি বহু অসুবিধার মধ্যে ও বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর অপারেশনগুলোর তিনি প্রশংসা করেন।

যে সকল অফিসার মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন–
(যারা ২৫শে মার্চ ১৯৭১ এর পূর্বে পাকিস্তান বিমান বাহিনীর সদস্য ছিলেন):

১। গ্রুপ ক্যাপ্টেন আব্দুল করীম খন্দকার, বীর উত্তম
[ফাইটার (সদর দপ্তর, বাংলাদেশ পাইলট) সশস্ত্র বাহিনী]

২। উইং কমান্ডার মোহাম্মদ খাদেমুল বাশার, বীর উত্তম
[৬ নম্বর সেক্টর কমান্ডার পাইলট]

৩। ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট সদরুদ্দিন, বীর প্রতীক
[ফাইটার (৬নম্বর সেক্টর) পাইলট]

৪। ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট সুলতান মাহমুদ, বীর উত্তম
[হেলিকপ্টার ১ নম্বর সেক্টর এবং পাইলট কিলো ফ্লাইট]

৫। ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট নুরুল কাদের
[ফাইটার (৪ নম্বর সেক্টর) পাইলট]

৬। ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট কিউএসএম ইকবাল রশীদ
[(হেলিকপ্টার (৬ নম্বর সেক্টর) পাইলট]

৭। ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট ওয়াহেদুর রহিম
[(গ্রাউন্ড ব্রঞ্চ) ৭ নম্বর সেক্টর]

৮। ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট এম এ রউফ
[(সিগন্যাল) এস ফোর্স]

৯। ফ্লাইং অফিসার লিয়াকত আলী খান, বীর উত্তম
[(ফাইটার) জেড ফোর্স]

১০। ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট শামসুল আলম, বীর উত্তম
[(ট্রান্সপোর্ট) কিলোফ্লাইট পাইলট]

১১। ফ্লাইং অফিসার বদরুল আলম, বীর উত্তম
[(ফাইটার কিলো ফ্লাইট) পাইলট]

১২। ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট এম হামিদুল্লাহ খান, বীর প্রতীক
[(অ্যাডমিন) ১১ নম্বর সেক্টর]

১৩। পাইলট অফিসার ফজলুল হক
[(পাইলট) ৮নম্বর সেক্টর]

১৪। ফ্লাইং অফিসার এটি এম আশরাফুল ইসলাম
[(অ্যাডমিন) জেড ফোর্স]

১৫। ফ্লাইং অফিসার কামালউদ্দিন আহমেদ
[(সিএন্ডআর) ২ নম্বর সেক্টর]

১৬। পাইলট অফিসার আতাউর রহমান
[(অ্যাডমিন) ১ নম্বর সেক্টর]

১৭। ফ্লাইং অফিসার শাখাওয়াত হোসেন
[(পাইলট) ১ নম্বর সেক্টর]

গ্রুপ ক্যাপ্টেন খন্দকার, স্কো.লী. সুলতান মাহমুদ, ফ্লা. লে. শামসুল আলম এবং ফ্লা.অ.বদরুল আলম ছাড়া বাকি ১৩ জন অফিসার বিভিন্ন সেক্টরে এবং ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটালিয়ানে নিয়মিত সৈনিকদের সাথে যুদ্ধ করেন। তাদের মধ্যে ফ্লা.অ. লিয়াকত আলী খান ২৬ শে নভেম্বর সিলেটের কানাইঘাট যুদ্ধে আহত হন। অদম্য সাহস ও বীরত্বের জন্য তিনি 'বীর উত্তম' উপাধিতে ভূষিত হন। অন্যান্য অফিসাররাও যুদ্ধে অসামান্য অবদান রাখেন।

কিলো ফ্লাইট গঠন

পরবর্তী দুটি ফিক্সড উইং এয়ারক্রাফট[২] (Fixed Wing Aircraft) এবং একটি রটারি উইং এয়ারক্রাফট[৩] (Rotory Wing Aricraft) ভারতীয় বিমান বাহিনী থেকে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী গঠনের জন্য উপহার হিসেবে দেয়া হয়। ফিক্সড উইং এয়ারক্রাফটগুলোর[৪] একটি ছিল যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাকডোনাল ডগলাস (Macdonell Douglas) কোম্পানির তৈরি ডিসি-৩ (ডাকোটা) [DC-3 (Dakota)] এবং অপরটি ছিল কানাডার ডি হেভিল্যান্ড কোম্পানির তৈরি ডিএইচসি-৩ (অটার) [de Havilland company manufactured DHC-3 (Otter)]। রটারি উইং এয়ারক্রাফট বা হেলিকপ্টারটি ছিল ফ্রান্স এর তৈরি। নাম ছিল অ্যালুয়েট-III(Alouette-III)। ডাকোটা বিমানটি যোধপুরের মহারাজার ব্যক্তিগত বিমান ছিল। মহারাজা এ বিমানটি বাংলাদেশকে উপহার দিয়েছিলেন ভারতীয় বিমান বাহিনীর মাধ্যমে। এ বিমান তিনটি সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি নাগাল্যান্ডের ডিমাপুরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তৈরি ৫,০০০ ঘনফুট একটি পরিত্যক্ত রানওয়েতে নিয়ে রাখা হয়। যেহেতু এ রানওয়েটি ব্যবহৃত হতো না কাজেই বিমান ওঠা-নামার জন্য প্রয়োজনীয় এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল (ATC-Air Traffic Control), রাডার (Radar) ইত্যাদি কিছুই ছিল না। বৈমানিক নিজ দায়িত্বে বিমান নিয়ে ওঠা-নামা করতেন। রানওয়ে সংলগ্ন একটি কাঠের দোতলা পুরনো ঘর ছিল। অনুমান করা হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন যখন এ রানওয়েটি ব্যবহার করা হতো তখন সম্ভবত এই ঘরটি এটিসি হিসেবে ব্যবহৃত হতো। গ্রুপ ক্যাপ্টেন খন্দকারের নির্দেশে ফ্লাইং অফিসার বদরুল আলম ২৪শে সেপ্টেম্বর কলিকাতা থেকে আগরতলা আসেন বৈমানিক ও বিমানসেনা সংগ্রহ করে নাগাল্যান্ডের ডিমাপুর বিমান বন্দরে যাবার জন্য। ২৬শে সেপ্টেম্বর ফ্লা. অ. বদরুল আলম, ক্যাপ্টেন শরফুদ্দিন আহমেদ, ক্যাপ্টেন আবদুল মুকিত এবং ৫৭ জন বিমানসেনাসহ আগরতলা থেকে ভারতীয় বিমান বাহিনীর বিমানে ডিমাপুর পৌছেন। গ্রুপ ক্যাপ্টেন আব্দুল করীম খন্দকার এবং ফ্লা. লে. শামসুল আলম কলকাতা থেকে পৌছান ১৪ই অক্টোবর। প্রকৃতপক্ষে তখনই তারা জানতে পারেন যে, পরদিন ২৮ শে সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ বিমান বাহিনী গঠিত হতে যাচ্ছে এবং তা এখানেই। প্রতিটি বিমানের জন্য তিনজন করে পাইলটকে নির্বাচন করা হয়। অর্থাৎ মোট নয় জন পাইলট। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর ডিপুটি চিফ অব স্টাফ গ্রুপ ক্যাপ্টেন আব্দুল করীম খন্দকারকে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে বিমান বাহিনী প্রধান নিযুক্তি দেয় বাংলাদেশ সরকার। এই নয় জন বৈমানিক অনেকেই পূর্ব পরিচিত ছিলেন এবং অনেকেই ছিলেন না। এখানেই সবাই সবার সাথে পরিচিত হন। ২৮ শে সেপ্টেম্বর সকাল এগারোটায় একটি ডাকোটা বিমানে ভারতীয় বিমান

বাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল পিসি লাল, এয়ার অফিসার কমান্ডিং ইন চিফ, ইস্টার্ন এয়ার কমান্ড এয়ার মার্শাল হরি চান্দ দেওয়ান, জোড়হাট ঘাঁটির স্টেশন কমান্ডার গ্রুপ ক্যাপ্টেন চন্দন সিং ডিমাপুর পৌঁছান। ছোট আকারে একটি গার্ড অব অনার প্রদান করা হয় ভারতীয় বিমান বাহিনী প্রধানকে। কিলো ফ্লাইটের সব বৈমানিকরা তখন তার সাথে পরিচিত হবার জন্য সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ান। বিমান থেকে অবতরণ করেই তিনি শুদ্ধ বাংলায় সবাইকে উদ্দেশে করে বললেন, আপনারা কেমন আছেন। এরপর গ্রুপ ক্যাপ্টেন আব্দুল করীম খন্দকার এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী গঠন করার ঘোষণা দেন। প্রধান অতিথি হিসেবে ছোট্ট বক্তব্য রাখেন এয়ার চিফ মার্শাল পিসি লাল। এবার হাত মেলানো এবং পরিচয়ের পালা। ফ্লা. লে. শামসুল আলম এবং ফ্লা. অ বদরুল আলম দাঁড়িয়ে ছিলেন পাশাপাশি। দুজনের নামের শেষে ‘আলম’ শুনে মজা করার জন্য জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি দুই ভাই?। আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর পতাকা উত্তোলন করা হয়। যতক্ষণ এয়ার চিফ মার্শাল পিসি লাল ছিলেন ততক্ষণই তিনি সবার সাথে বাংলায় কথাবার্তা বললেন। দুপুরের খাবার খেয়ে তারা ডিমাপুর ত্যাগ করেন।

অ্যালুয়েট-III(Alouette-III)

১. স্কোয়াড্রন লিডার সুলতান মাহমুদ (প্রাক্তন পাকিস্তান বিমান বাহিনী)
২. ক্যাপ্টেন সাহাবুদ্দিন আহমেদ (প্রাক্তন পিআইএ)
৩. ফ্লাইং অফিসার বদরুল আলম (প্রাক্তন পাকিস্তান বিমান বাহিনী)

ডিএইচসি-৩ (অটার) [DHC-3 (Otter)]

৪. ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট শামসুল আলম (প্রাক্তন পাকিস্তান বিমান বাহিনী)
৫. ক্যাপ্টেন আকরাম আহমেদ (প্ল্যান্ট প্রটেকশন ডিপার্টমেন্ট)
৬. ক্যাপ্টেন শরফুদ্দিন আহমেদ (ঔষধ কোম্পানি সিবা গেইগি’র বৈমানিক)

ডিসি-৩ (ডাকোটা) [DC-3 (Dakota)]

৭. ক্যাপ্টেন আবদুল খালেক (প্রাক্তন পিআইএ)
৮. ক্যাপ্টেন আবদুল মুকিত (প্রাক্তন পিআইএ)
৯. ক্যাপ্টেন কাজী আবদুল সাত্তার (প্রাক্তন পিআইএ)

এই তিনটি বিমান এবং নয় জন বৈমানিক নিয়ে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর প্রথম ইউনিট গঠিত হয়। এই ইউনিটটির নাম দেয়া হয় ‘কিলো ফ্লাইট’। বিমান

বাহিনী প্রধান গ্রুপ ক্যাপ্টেন আব্দুল করীম খন্দকার ‘খন্দকার’ (Khondoker) নামের ইংরেজি আদ্যক্ষর দিয়ে (যেমন ‘ কে’ ‘জেড’ এবং ‘এস’ ফোর্স যথাক্রমে লে. কর্নেল খালেদ মোশাররফ, লে. কর্নেল জিয়াউর রহমান এবং লে. কর্নেল কাজী মোহাম্মদ শফিউল্লাহর নামের ইংরেজি আদ্যক্ষর দিয়ে রাখা হয়।) কিলো ফ্লাইট নামকরণ করা হয়। প্রাথমিক অবস্থায় স্কোয়াড্রন লিডার সুলতান মাহমুদ ডিমাপুরে যোগ দিতে পারেননি। তিনি তখন ১ নম্বর সেক্টরে স্থল যুদ্ধের নের্তৃত্ব দিচ্ছিলেন। চট্টগ্রামের কাপ্তাইয়ের কাছে মদুনাঘাট বৈদ্যুতিক ঘাঁটি ধ্বংস করতে তিনি পায়ে গুলিবিদ্ধ হন। ১৪ই অক্টোবর তিনি ডিমাপুরে কিলো ফ্লাইট এর অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন।

কিলোফ্লাইটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

স্কোয়াড্রন লিডার সুলতান মাহমুদকে তার অনুপস্থিতিতে কিলো ফ্লাইটের অফিসার কমান্ডিং ঘোষণা করা হয়। শুরু হয় কঠোর প্রশিক্ষণ। সে প্রশিক্ষণের শুরু হতো সূর্য ওঠার আগে ৩/৪ মাইল দৌড় ও শরীর চর্চার মাধ্যমে। একই সাথে চলতে থাকে সীমিত হলেও বেসামরিক তিনটি বিমানকে কীভাবে যুদ্ধোপযোগী করা যায় সেই প্রয়াস। এ উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসেন আসামের সবচেয়ে পূর্ব দিকের ভারতের বিমান ঘাঁটি জোড়হাট বেস এর স্টেশন কমান্ডার গ্রুপ ক্যাপ্টেন চন্দন সিং। এসিএম লাল তারই ওপর দায়িত্ব অর্পণ করেন। ডাকোটা বিমানের (পিছনের) দরজা বা Hatch (ডাকোটা বিমানের একটিই দরজা) স্থায়ীভাবে খুলে ফেলা হয়। বিমানের পিছনে ১,০০০ পাউন্ড ওজনের পাঁচটি বোমা বহন করার তাক (Rack) বানানো হয়। দরজার সামনে মেঝেতে দুটি স্টিলের পাত (Rail) এমনভাবে লাগানো হয় যেন পাত দুটির উপর বোমাটি রেখে পা দিয়ে ধাক্কা দিলেই বোমাটি নিচে পড়ে। উদ্দেশ্য ছিল ডাকোটা বিমান দিয়ে ঢাকা বিমান বন্দরে বোম ফেলার। ভারতীয় বিমান বাহিনী প্রদত্ত তিনটি বিমানের জন্য তিনজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বৈমানিক (instructor pilot) নিয়োগ করা হয়।

১। ডিসি-৩ (ডাকোটা)– স্কোয়াড্রন লিডার সঞ্জয় কুমার চৌধুরী। তার বাড়ি পাবনা জেলার বেড়া থানায়। তাঁর ওপর প্রদত্ত দায়িত্বের বাইরেও বহু ঝুঁকিপূর্ণ কাজ গ্রহণ করতেন। কখনো অটার বিমানের মেশিনগানার হিসেবে কখনো হেলিকপ্টারে এসে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে সম্মুখ সমরে যুদ্ধ করে– যেন নিজের মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা।

২। ডিএইচসি-৩ (অটার)– ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট ঘোষাল

৩। অ্যালুয়েট–III– ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট কেসি সিংলা

অটার বিমানের দুই পাখার নিচে এবং হেলিকপ্টারের দুই দিকে স্টিলের কাঠামো (Truss) তৈরি করে সাতটি করে চৌদ্দটি রকেট বহন করার ব্যবস্থা করা হয়। বৈমানিকের সামনে লক্ষবস্তু চিহ্নিত (aiming site) করার জন্য ছোট বৃত্তের মধ্যে যোগ চিহ্ন (+) আঁকা হয়। বৈদ্যুতিক সুইচের মাধ্যমে রকেট ফায়ার করার ব্যবস্থা করা হয়। রকেট ফায়ার করার দুটি ধরন ছিল। একটি, যেটি দিলে দুই পাশ থেকে একটি করে রকেট ছুটে গিয়ে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করবে। এটিকে বলা হতো Pair বা জোড়া। অপরটি, দুই পাশ থেকে যুগপৎ সব কয়টি রকেট একসাথে ফায়ার হবে। এটিকে বলা হতো স্যালভো (salvo)। একই লক্ষ্যবস্তুর উপর দুই ধরনের ফায়ারও করা যেত। সেক্ষেত্রে বিমানটিকে একাধিকবার ঘুরে আসতে হতো। কিন্তু আরো জটিল কাজটি রয়ে গেল। বৈমানিক এইমিং সাইটের ভিতর দিয়ে লক্ষ্যবস্তু দেখে রকেট ফায়ার করলেই যে রকেট লক্ষ্যবস্তুতে অর্থাৎ point of aim এ আঘাত করবে তেমন নয়। কাজেই যখন যে লক্ষবস্তুর নিশানা করা হয় রকেট ফায়ার করলে যেন সে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করে তার যে ব্যবস্থা তাকে ইংরেজিতে বলে harmonisation. এ কাজটি জটিল এবং ধৈর্যসাপেক্ষ।

Harmonisation সঠিক ও পঙ্খানুপুঙ্খভাবে না করা হলে ফায়ার করা রকেট লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত না করে অন্যত্র আঘাত করবে। ভূমি থেকে শত্রুর গুলি যেন বৈমানিককে আঘাত না করে সে জন্য হেলিকপ্টারে বৈমানিকদের পায়ের নিচে এক ইঞ্চি পুরু স্টিলের প্লেট বিছানো হয়। চারদিকে ঘুরে গুলি করতে পারে (৩৬০°) এমন একটি করে মেশিনগান লাগনো হয় অটার এবং হেলিকপ্টারে। রকেট ছিল ফ্রান্সের তৈরি ৫৭ মি.মি. MATRA. এ রকেট ভারতীয় বিমান বাহিনীর ন্যাট (Gnat) বিমানে ব্যবহৃত হতো। ডিমাপুরের সেই পাহাড় আর জঙ্গলের মধ্যে লক্ষ্যবস্তু স্থাপন করা ছিল দুরূহ। পাহাড়ের উপর গাছ কেটে পরিষ্কার করে অথবা গাছের উপর প্যারাসুট বিছিয়ে সেটিকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে harmonisation and target practice করা হতো। ডিমাপুরে আমাদের অবস্থান থেকে আসামের জোড়হাট বিমান ঘাঁটির আকাশ পথে দূরুত্ব ছিল প্রায় ১৩০ মাইল। যেহেতু ভবিষ্যৎ অপারেশন রাতেও করা হবে তাই বিমানগুলো রাতে ওড়ার প্রশিক্ষণও নিতে থাকে। গাছের ঠিক ওপর দিয়ে অর্থাৎ শত্রুর রাডারে যেন ধরা না পড়ে সেজন্য খুব নিচু দিয়ে ওড়ার প্রশিক্ষণ নিতে হতো বৈমানিকদের। যে কোড (Registration Code) থাকে। এটি দেয় ইন্টারন্যাশনাল সিভিল অ্যাভিয়েশন অর্গানাইজেশন (ICAO- International Civil Aviation Organization)। এটি একটি জাতিসংঘ সংস্থা (UN Body)। বাংলাদেশ তখন কোনো স্বাধীন রাষ্ট্র নয়। কাজেই কিলো ফ্লাইটের তিনটি বিমানের রেজিস্ট্রেশন কোড দেয়া নিজেদের ইচ্ছামতো।[১]

ক. Alouette-III - VT-EBR
খ. Otter - EBR
গ. Dakota - EBA

বেসামরিক বিমান দিয়ে সামরিক অপারেশন করা এবং এত নিঁচু দিয়ে ওড়া যে ভূমি থেকে শত্রুর ক্ষুদ্র অস্ত্রের গুলির আঘাতে নিশ্চিত মৃত্যুর ঝুঁকি নেয়া। এখানে অসতর্ক ও অমনযোগী হওয়ার বিন্দুমাত্র অবকাশ ছিল না। এ প্রসঙ্গে আন্তরিকভাবে এবং গুরুত্বের সাথে ভারতীয় বিমান বাহিনীর গ্রুপ ক্যাপ্টেন চন্দন সিং, তিন ইন্সট্রাক্টর পাইলট– স্কো.লি. সঞ্জয়, ফ্লা. লে. সিংলা এবং ফ্লা. লে. ঘোষাল দিন-রাত কাজ করেছেন কিলো ফ্লাইটের জন্য। কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন আরো অনেকেই। আমরা যেন তাদের সেই সম্মান দিতে ও তাদের প্রতি অন্তহীন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ভুলে না যাই। যুদ্ধের শুরুতে বাঙালি বৈমানিকদের দিল্লিতে নিয়ে এবং কলকাতায় ভারতীয় গোয়েন্দা এবং বিমান বাহিনীর সিনিয়র অফিসাররা জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তারা আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাও জানতে চান। তারা প্রায় সবাই বাংলাদেশকে Short Take off and (SOTL) অর্থাৎ অল্প জায়গায় ওঠা-নামা করতে পারে এবং নদীতে ওঠা-নামার ছোট বিমান দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন। মে মাস থেকে গ্রুপ ক্যাপ্টেন খন্দকারও ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর জন্য বিমান সংগ্রহে সচেষ্ট থাকেন। ভারত চাইলেও এবং সক্ষম হলেও তার পক্ষে বিমান দেয়া মোটেও সহজ ছিল না। বিমান ব্যবহার অর্থ নিচের জিনিসগুলো লাগবে:

ক. Runway
খ. ATC (Air Traffic Control)
গ. Radar
ঘ. Ground Handling Facilities
ঙ. Flight Safety Measures
চ. Maintenance and Repair Facilities
ছ. Meteorological Service
জ. Fire Fighting Facilities, Etc

গোটা বাংলাদেশ তখন পাকিস্তানিদের হাতে অবরুদ্ধ। বাংলাদেশের পতাকাবাহী কোনো বিমান যদি ভূপাতিত হয় তখন পাকিস্তান এটা সহজেই বিশ্বকে বিশ্বাস করাতে সক্ষম হবে যে ভারত আগ্রাসী ভূমিকা পালন করছে এবং তাদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় তাদের দেয়া বিমান দিয়ে তাদের ভূখণ্ড থেকে বিমান

হামলা তথাকথিত বাংলাদেশ বিমান বাহিনী নামে চালানো হচ্ছে। ভারতীয়রা এভাবে কখনো না বললেও এটা সহজেই অনুমেয়।

এ প্রসঙ্গে স্ট্র্যাটেজির বিষয়টি আসে। ৩ রা ডিসেম্বর বিকালে পাকিস্তান ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে সাতটি বিমানঘাঁটি(শ্রীনগর, অভান্তিপুর, পাঠানকোট, উত্তরালাই, যোধপুর, আম্বালা এবং আগ্রা) আক্রমণ করে। পাকিস্তান যদি ৩রা ডিসেম্বর আক্রমণ না করত তাহলে ভারতই ৪ঠা ডিসেম্বর যুদ্ধ শুরু করত,[১] ভারতের পক্ষে যুদ্ধ শুরুর তারিখ নির্ধারণ নিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী তার মন্ত্রিসভায় এবং অন্য বহু পর্যায়ে প্রচুর আলোচনা করেছেন। সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষেও ভারতের ওপর চাপ ছিল। সার্বিক বিবেচনায় ভারত সিদ্ধান্ত নেয় যে বাংলাদেশ-ভারত যৌথ অভিযানের প্রাক্কালে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে। এ প্রসঙ্গে এয়ার ভাইস মার্শাল এ কে খন্দকার বলেন, ৩রা ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। এই যুদ্ধ ঘোষণার আগে ভারতের মাটি থেকে আমরা যদি বিমান হামলা চালাতাম তাতে অনেক অসুবিধা ছিল। তাই ভারতের সাথে এ ব্যাপারে আমাদের একটা বোঝাপড়া হয়েছিল কখন আমরা আক্রমণ চালাব।[২]

আমাদের তিনটি বিমানের লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ করা হয়। অপারেশনের তারিখ ঠিক করা হয় ৩রা নভেম্বর। ২রা নভেম্বর সকালে জোড়াহাট থেকে গ্রুপ ক্যাপ্টেন চন্দন সিং এবং স্কো.লি. সঞ্জয় কুমার চৌধুরী ডিমাপুর আসেন। তারা দিল্লি (ভারতীয় বিমান বাহিনী সদর দপ্তর) থেকে আসা একটি বার্তা (Message) দেখিয়ে বলেন যে ৩রা নভেম্বরের অপারেশন পরিকল্পনাটি স্থগিত করা হয়েছে। তারা আরো জানান যে সিদ্ধান্ত হয়েছে ডাকোটা বিমান দিয়ে কোনো অপারেশন করা হবে না। এ বিমানটি বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর কমান্ডার ইন চিফের অধীনস্ত থাকবে এবং পরিবহনের জন্য এটি ব্যবহৃত হবে। ৬ই নভেম্বর ডাকোটা বিমানটিকে কলকাতার অদূরে ব্যারাকপুর বিমান বন্দরে নিয়ে যাওয়া হয়।[৩]

---

১ সাক্ষাৎকার লে. জে জেএফ আর জ্যাকব (অব.) ঢাকা সেনানিবাস, ২৮ শে মার্চ ২০০৭

২ সাক্ষাৎকার এয়ার ভাইস মার্শাল মোহাম্মদ খাদেমুল বাশার, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র (১০ম খণ্ড)। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রাণালয়। ঢাকা ১৯৮৪, পৃ. ৭৫০

৩ সাক্ষাৎকার, ক্যাপ্টেন আকবর আহমেদ, বীর উত্তম, ক্যাপ্টেন কাজী আবদুস সাত্তার, বীর প্রতীক এবং ক্যাপ্টেন সাহাবউদ্দিন আহমেদ, বীর উত্তম, ৭ই জুন ২০১২।

অপারেশন

পূর্বেই বলা হয়েছে কিলো ফ্লাইটের তিনটি বিমানের মধ্যে ডিসি-৩ (ডাকোটা) বিমানটিকে দিয়ে কোনো অপারেশন করা হবে না বলে দিল্লির ভারতীয় বিমান বাহিনীর লিখিত সিদ্ধান্ত (Message) জানিয়ে দেয়া হয়। ৩রা নভেম্বর কিলো ফ্লাইটের তিনটি বিমানেরই অপারেশনে অংশ নেয়ার কথা ছিল। ২রা নভেম্বর সবগুলো বিমান যে উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের শমসেরনগর বিমান বন্দরের সীমান্ত সংলগ্ন ভারতের কৈলাশহর আসার কথা। ২ রা নভেম্বর জোড়হাট বিমান ঘাঁটির স্টেশন কমান্ডার গ্রুপ ক্যাপ্টেন চন্দন সিং এবং স্কো.লি.সঞ্জয় কুমার চৌধুরী ডিমাপুর এসে দিল্লির এ বার্তাটি দেখান। এ বার্তায় আরো বলা ছিল যে ৩রা নভেম্বরের অপারেশন আপাতত স্থগিত করা হলো। এ সংবাদে কিলো ফ্লাইটের সব বৈমানিকদের মন ভেঙে যায়। কিন্তু কারোই কিছু করার ছিল না।

এটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে কিলো ফ্লাইট সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় বিমান বাহিনীর অধীনস্ত ও নিয়ন্ত্রণে ছিল। নীতিগত কারণে এর যৌক্তিক কারণও ছিল। বিমানগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ, জ্বালানি, রকেট বোমা, প্রশিক্ষণ বস্তুত সব কিছুর জন্যই ভারতীয় বিমান বাহিনীর ওপর নির্ভর করতে হতো। লক্ষবস্তু নির্বাচন (Target Selection) ভারতীয়রা করে দিত। কোন বিমান ঘাঁটি থেকে উড্ডয়ন করবে এবং কোথায় অবতরণ করবে, অপারেশনের সময় যাবতীয় সবকিছুই তাদের নির্দেশে হতো।

৬ই নভেম্বর ডাকোটা বিমানটি কলকাতার দমদম বিমান বন্দরের প্রায় ৩০ কিলোমিটার উত্তরে ব্যারাকপুর বিমান ঘাঁটিতে চলে যায়। তারপর থেকে বিমানটি কমান্ডার ইন চিফ কর্নেল মোহাম্মদ আতাউল গনি ওসমানীর অধীনস্ত থাকে। এটি ব্যবহৃত হয় তার পরিবহনের জন্য। যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য রইল অটার এবং অ্যালুয়েট-III হেলিকপ্টার।

এ দুটি বিমান ডিসেম্বরের ৩ তারিখ রাত থেকে ডিসেম্বরের ১১ তারিখ পর্যন্ত মোট ৪৬ টি মিশন (অপারেশন) সম্পন্ন করে। অত্যন্ত সীমিত যুদ্ধ ক্ষমতা নিয়ে মিশনগুলো সম্পন্ন করা হয়। নিজেদের বৈমানিক বলে বাহুল্য প্রশংসা নয়– এ মিশনগুলো প্রায় সবই ছিল আত্মঘাতী। মৃত্যুর সমূহ সম্ভাবনা নিয়ে কিলো ফ্লাইটের বৈমানিকরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। এ কীর্তি অনুপম অহংকারের, এ অর্জন আমাদের স্বাধীনতা প্রাপ্তির ইতিহাসের অনন্ত গর্বের উপকরণ।

এই মূল্যায়ন মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়া তার লিখা বই **"বিহঙ্গের ডানা"** ও এর প্রেক্ষাপট সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।

নৌ-বাহিনী গঠন

দুঃখের সাথে বলতে হয় যে, নৌ-বাহিনী গঠিত হয় তাতে পাকিস্তান নৌ-বাহিনীর কোনো বাঙালি অফিসার ছিলেন না। ৮জন বাঙালি মেরিন ফ্রান্সে নৌ-বাহিনীতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ২৯ শে মে '৭১ ফ্রান্স থেকে পালিয়ে এসে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগদান করেন। এদের নের্তৃত্বে ছিলেন মেরিন অফিসার এ. ডব্লিউ চৌধুরী (বীর উত্তম/বীর বিক্রম)। তাদের নের্তৃত্বে পলাশীর ভাগীরথী নদীর ধারে প্রথম ৩০০ নৌ-কমান্ডোর ট্রেনিং দেওয়া হয়। পরে এর সংখ্যা ৫০০ পর্যন্ত উন্নীত হয়। এদের মধ্য থেকে পাকিস্তান ও ফ্রান্সে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ৬০জন মেরিন কমান্ডো ১৪ই আগস্ট (দিবাগত রাত থেকে) '৭১সালে এ.ডব্লিউ চৌধুরী ও তার সহকর্মীদের নের্তৃত্বে "জ্যাকপট" নামে দুর্ধর্ষ নেভাল অপারেশন পরিচালনা করেন। এই অপারেশনে ছোট বড় ৯টা জাহাজ শক্তিশালী মাইন পাতিয়ে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস ও ডুবিয়ে দেন। এতে চট্টগ্রাম বন্দরে পাকিস্তান নৌ-বাহিনীর মেরুদণ্ড ভেঙে পড়ে। এই জ্যাকপট অপারেশন পাশাপাশি চলছিল চালনা ও নারায়ণগঞ্জে। লে. কমান্ডার জালাল (বীর উত্তম) এর নের্তৃত্বে ৭৪ জন নেভাল কমান্ডো বিভিন্ন সেক্টর থেকে একত্রিত হয়ে পলাশ ও পদ্মা নামে দুটি জাহাজে ভাগ করে দেওয়া হয়। যারা ১লা ডিসেম্বর মংলা বন্দরের অপারেশনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। উল্লেখ্য যে, জাহাজ দুটি ভারতীয় নৌ-বাহিনী কর্তৃক প্রদান করা হয়েছিল। মংলা বন্দরের অপারেশনের আগে পথিমধ্যে যৌথ বাহিনীর ভুল বোঝাবুঝির কারণে এক পর্যায় দু পক্ষের মধ্যে গোলাগুলি বিনিময় হয়। এতে করে ১৮জন শহিদ হন এবং বেশ কয়েক জন আহত হয়েছেন। এই নৌ-কমান্ডো সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল ১০নং সেক্টর। এরাই মূলত রণাঙ্গনে পরবর্তী সময়ে নৌ-বাহিনীতে প্রতিনিধিত্ব করেন।

এই ফোর্সগুলো সমন্বয়ের মাধ্যমে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় সফল অপারেশন পরিচালনা শুরু করেন। সেনা সদস্যদের পাশাপাশি নৌ-কমান্ড ও ভারতীয় বিমানবাহিনীর সহযোগিতায় আমাদের পাইলট গণ ৪৬ টি সফল অপারেশন চালিয়েছিল। তাই রণাঙ্গনে সৃষ্ট এই সেনা/নৌ ও বিমান বাহিনী যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে ২১ শে নভেম্বর যাত্রা শুরু করেছিল।আসলে অনানুষ্ঠানিকভাবে এর কয়েক মাস আগেই সংঘটিত ছিল এমনকি যুদ্ধের শুরু থেকে নিজ নিজ অবস্থানে ১১টি সেক্টরের অধীনে তারা তাদের অবদান অব্যাহত রেখেছিলেন। তাই বলব– অনেকে মনে করেন যে, ২১শে নভেম্বর আমরা যে সশস্ত্র দিবস পালন করি, তার আগে হয়তো বিভিন্ন রণাঙ্গনে এদের অস্তিত্ব বা কর্মকাণ্ড বা পরিকল্পনা ছিল না এটা সঠিক তথ্য বা মূল্যায়ন নয়। শুধু এদেরকে নিয়ে আমরা গর্ববোধ করি। ইন্দিরা গান্ধির আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তান এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাজার হাজার অফিসার সৈনিক

হতাহত হয়েছিল। ভারত যেহেতু ৩রা ডিসেম্বরের আগে মুক্তিযুদ্ধ তথা আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে তাদের যুদ্ধ পরিকল্পনা বিশ্ববাসী থেকে গোপন রাখার লক্ষ্যে প্রকাশ ও প্রচার করছিল না, তবে অনানুষ্ঠানিকভাবে বিশ্ববাসী জানত, এমনকি পাকিস্তানও তখন বিশ্ববাসীর কাছে ভারতীয় সেনা বাহিনীর আমাদের সাথে বিভিন্ন রণাঙ্গনে যৌথ অভিযানসহ সম্পৃক্ততার কথা অভিযোগ সহকারে প্রচার করছিল। ৩রা ডিসেম্বর পাক-ভারত যুদ্ধ ঘোষণার আগ পর্যন্ত ভারতীয় সেনা বাহিনীর প্রায় ৪ হাজার অফিসার সেনা আমাদের এই স্বাধীনতার যুদ্ধে হতাহত হয়েছিল। সে সব আত্মহুতি ও আত্মত্যাগের অবদান বিস্তারিত আমাদের এমনকি ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সম্বলিত কোনো সঠিক ইতিহাস আজও নেই। অর্থাৎ তারা শুধু আমাদের ও তাদের অংশগ্রহণ ও আত্মহুতি সম্পর্কে নেপথ্যে তাদের যুদ্ধের বিবরণীতে সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন মাত্র। অথচ ৩রা ডিসেম্বর যুদ্ধ ঘোষণার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত এই সাড়ে আট মাস সময়কালে ভারতীয় সেনাদের সক্রিয় সহযোগিতায় বিভিন্ন রণাঙ্গনে গেরিলা ও সম্মুখ যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর আক্রমণে পাক হানাদার বাহিনী প্রায় পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছিল। বাড়তি সৈন্য ও গোলাবারুদ তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সরবরাহ প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এটা সম্ভব হয়েছিল আমাদের নৌ-কমান্ডদের দুর্ধর্ষ অপারেশনের মাধ্যমে। চট্টগ্রাম বন্দরে তাদের ২৪টিরও অধিক জাহাজ ধ্বংস ও ডুবিয়ে দেওয়া হয়। তারা তখন সম্পূর্ণ দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল। তাই বলব ৩রা ডিসেম্বর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ইন্দিরা গান্ধির যুদ্ধ ঘোষণা হঠাৎ করে ঘটেনি। এই যুদ্ধ ঘোষণার আগ মুহূর্তে ইন্দিরা গান্ধি তৎকালীন ভারতীয় সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল শ্যাম মানিক'শকে মন্ত্রী পরিষদে ডেকে পাঠান। এটা ছিল এক বিরল ঘটনা এবং সর্বশেষ পরিস্থিতি ও করণীয় সম্পর্কে তার মতামত জানতে চাওয়া হয়। মানিক'শ জানান যে– পাক হানাদার বাহিনীকে পর্যুদস্ত করার এখনই সুবর্ণ সুযোগ ও সময়। কারণ, গত সাড়ে আট মাস মুক্তিযুদ্ধে আমাদের সহযোগিতায় মুক্তিযোদ্ধরা পাক-হানাদার বাহিনীকে প্রায় পর্যুদস্ত ও কোণঠাসা করে ফেলেছে। বড় আক্রমণের জন্য এখন ক্ষেত্র প্রস্তুত প্রায়। অর্থাৎ Launching ground is prepared. We can take off any time now. এই কথা শুনার পর ইন্দিরা গান্ধি ৩রা ডিসেম্বর যুদ্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্ত দেশবাসী তথা পুরো বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিলেন। এর আগে পাক-বিমান বাহিনী কর্তৃক তাদের এ বিভিন্ন স্থাপনায় হামলা করেছিল বলে ভারত অভিযোগ করেছিল। আমি ১৬ই ডিসেম্বর ২০১৩ সালে ফোর্ট উইলিয়াম সেনানীবাসে ভারতীয় সেনা অফিসারদের বিজয় দিবস সমাবেশে বাংলাদেশ থেকে ৭১ জন মুক্তিযোদ্ধা দলের Leader of the delegation হিসেবে যোগদান করি এবং সেদিন আমার ভাষণে যুদ্ধের পুরো প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করে বলেছিলাম– This declaration

of war on 3rd dec. '71, could not have come at a better time . ফিল্ড মার্শাল শ্যাম মানিক'শর পরামর্শ অনুযায়ী ৩রা ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে ইন্দিরা গান্ধি যুদ্ধ ঘোষণার আগে মানিক'শ থেকে যুদ্ধের পরিস্থিতি ও যুদ্ধের ঘোষণা ও সময়ক্ষণ সম্পর্কে কয়েকদফা মতামত চেয়েছিলেন। মানিকশ তখন যুদ্ধ ঘোষণার পক্ষে কোনো মতামত দেননি। অর্থাৎ তিনি বুঝিয়েছিলেন– এখন ও সময় হয়নি। এতে সার্বিক মূল্যায়নে দেখা যায় যে, ৩ রা ডিসেম্বর যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে সাড়ে আট মাস ভারতীয় সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় মুক্তিবাহিনীর সফলতা ১৬ ডিসেম্বরে মিত্র বাহিনীর চূড়ান্ত বিজয় ত্বরান্বিত হয়েছিল। এই ১৩ দিনের যুদ্ধ ছিল তৎকালীন ভারতীয় ইস্টার্ন কমান্ডার জেনারেল অরোরার নের্তৃত্বে (ভারতীয় সেনাবাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল এই মিত্র বাহিনী।) বিপরীত মূল্যায়নে দেখা যাবে, ভারতীয় সেনাবাহিনী ও মুক্তিবাহিনী সাড়ে আট মাস যুদ্ধে যদি পাক হানাদার বাহিনীকে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত না করে ঘোষিত ৩রা ডিসেম্বর যুদ্ধ শুরু করত তা হলে ১৬ ডিসেম্বরের বিজয় অর্জন আরো শুধু বিলম্বিতই হতো না সার্বিক যুদ্ধের পরিস্থিতি ও বিশ্বজনমত জটিল ও ভিন্ন খাতে মোড় নেওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত মার্কিন রণতরী ৭ম নৌবহর হয়তো পাকিস্তানের সহায়তায় এগিয়ে আসলে পরিস্থিতি ভিন্ন খাতে মোড় নেওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিত অর্থাৎ ৩রা ডিসেম্বর যুদ্ধের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত এই সাড়ে আট মাস ছিল ১৩ দিনের মিত্র বাহিনীর সফলতা। তাই বলব– নয় মাসের যুদ্ধে এই সাড়ে আট মাস যুদ্ধ ছিল ভারত ও মুক্তিবাহিনীর যৌথ অবদানের একটা গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। আবার এই সাড়ে আট মাস যুদ্ধের সফলতা এবং ৩রা ডিসেম্বর থেকে ১৬ই ডিসেম্বর মিত্র বাহিনীর এই চূড়ান্ত বিজয় অর্জন পর্যন্ত এই সফল যুদ্ধকে সাড়ে আট মাসের যুদ্ধ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখানোর কোনো অবকাশ নেই। দুটো মিলেই ছিল আমাদের ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধ। আমাদের দেশের মধ্যেও মাঝে মাঝে অনেকে এই ৯ মাসের যুদ্ধ সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমাদের দীর্ঘ মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস তুলে ধরে ৯ মাসের যুদ্ধকে পাশ কাটিয়ে যুদ্ধের বিস্তারিত প্রেক্ষাপট ও বিবরণ পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে না ধরে, তথা স্বাধীন বাংলা সরকারের অধীনে ৯ মাসের যুদ্ধের পূর্ণ বিবরণ উল্লেখ না করে সংগ্রাম থেকে সরাসরি বিশাল ত্যাগের বিনিময় ১৬ই ডিসেম্বর আমরা যে বিজয় অর্জন করেছি শুধু তাই উল্লেখ করে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের সমাপ্তি টানেন। এতে করে, ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে সঠিক ইতিহাস বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে অজানা থেকে যায়।দীর্ঘ সংগ্রামের পথ ধরে আমরা এই মুক্তি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলাম। দীর্ঘ মুক্তি সংগ্রাম সফল না হলে যুদ্ধ কখনো আসত না। একই সূত্রে গাঁথা সংগ্রাম ও যুদ্ধ দুটি অধ্যায়। সব সংগ্রামীই কিন্তু মুক্তি নয়। আমার এলাকা

ফেনী ছাগলনাইয়ার '৭০ সালে সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত হয় ওবায়েদউল্লাহ মজুমদার (প্রিন্সিপাল)। তিনি যুদ্ধের সময় পক্ষত্যাগ করে পাকিস্তানের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। এ ধরনের আরো অনেক পক্ষত্যাগকারী ছিলেন। ৯ মাসের মুক্তিযোদ্ধারা সারা জীবন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধা থাকবেন। তবে – যারা চেতনা থেকে বিচ্যুত হবে প্রমাণ সাপেক্ষে অবশ্যই আমরা বলব – ওদের নৈতিক অবক্ষয় ঘটেছে। রাজনৈতিক কাদা ছোড়াছুড়ির কারণে অথবা পছন্দ অপছন্দের কারণে কাউকে খাটো করে দেখা উচিত হবেনা। আমরা লক্ষ্য করেছি অনেকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে বলে থাকেন রাজাকারেরা সারাজীবন রাজাকার থাকবে। মুক্তিযোদ্ধারা যদি পথভ্রষ্ট হয় সে আর মুক্তিযোদ্ধা থাকবে না। এই মূল্যায়ন সঠিক নয়।কারণ ঐ মুক্তিযোদ্ধারা নীতিভ্রষ্ট হয়েছেন কিনা বা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকে দূরে সরে গেছেন এই মূল্যায়নের মাপকাঠি কি রাজনৈতিক কারণে তার প্রতিপক্ষ অথবা স্বার্থান্বেষী মহল এই ধরনের উক্তি করেছেন কিনা তা অবশ্যই বিচার বিশ্লেষণের দাবি রাখে। যেমন কাদের সিদ্দিকী (বীর উত্তম)---------- এছাড়া ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধে যারা মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন ঐ ৯ মাস পর নতুনভাবে কেউ মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার সুযোগ নেই। রাজনৈতিক কারণে তার পরবর্তী কার্যকলাপ বিতর্কিত ও সমালোচিত হতেই পারে। তাই বলে হঠাৎ করে কাউকে অবমূল্যায়ন করা সঠিক নয়। আমি আগেই বলেছি – আমরা মুক্তিযোদ্ধারা স্বাধীনতার পর পর বঙ্গবন্ধুর জীবদ্দশায় সাড়ে তিন বছর সময় কালে অনেক ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলাম। (তৎকালীন সশস্ত্র বাহিনী পুলিশ/বি.ডি.আর / আনসার ছাড়া) বিশাল মুজিব বাহিনী থেকে মেধা ও যোগ্য ও তীক্ষ্ণ দূরদর্শী সম্পন্ন যুব সমাজের এক বিশাল অংশ (মুজিব বাহিনী) বেরিয়ে জাসদ গঠন করেন। কিছুদিনের মধ্যে '৭৪ এর শেষ লগ্নে এই জাসদ থেকে সৃষ্ট হয় গণবাহিনী। যেই জাসদ কৃষক শ্রমিক রাজ সৃষ্টির স্বপ্ন নিয়ে সমাজতন্ত্রের শ্লোগান দিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল।পরবর্তীতে গণ বাহিনীর সৃষ্টির মাধ্যমে তারা তাদের মূল আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। তখন আমরা লক্ষ করলাম নিম্নে উল্লিখিত ঘটনা প্রবাহ।

১। তাদের এই ভূমিকায় তৎকালীন আওয়ামী লীগ কে সংগঠন হিসেবে দুর্বল করে দেয়। এছাড়া তখন আওয়ামী লীগেও চলছিল অন্তঃকোন্দল।

২। পাশাপাশি চলছিল সর্বহারাদের ক্যাম্প লুট/ অস্ত্র লুট / হত্যা/ঘুম ইত্যাদি। এর সাথে চলছিল গণবাহিনীর একই ধরনের তৎপরতা। '৭৪ এর দুর্ভিক্ষে ও অর্থনৈতিক মন্দার কারণে জনগণের মধ্যে ছিল চরম হতাশা।

৩। এই পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধুকে উৎখাত করার জন্য যুদ্ধকালীন সময় থেকে মুশতাক গংদের যে ষড়যন্ত্র চলমান ছিল তা আরো ঘনীভূত ও ত্বরান্বিত হলো।

৪। জাসদ কর্তৃক তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মনসুর আলীর বাসভবন আক্রমণ – পুলিশের সাথে সংঘাত, হতা হতের ঘটনা ঘটে। সেদিন জাসদের সম্মেলন থেকে আওয়াজ উঠেছিল বাংলার বেইমান শেখ মুজিবুর রহমান। সেদিনের সেই জাসদ আজ ঐ দিনের মতো ঐক্যবদ্ধ নেই। তারা আজ বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত। এ পর্যায়ে বলতে হয়– সেদিনের সেই জাসদ তাদের ভূমিকা শুধু মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে চরমভাবে আঘাত করেনি বঙ্গবন্ধুর হাতকে করে দিয়েছিল দুর্বল এবং পরোক্ষভাবে বঙ্গবন্ধুর ঘাতক ও ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্রের নীল-নকশা বাস্তবায়নে সহায়তা করেছিল। তারা বঙ্গবন্ধুর হত্যার ষড়যন্ত্রে জড়িত না থাকলেও পরোক্ষভাবে হয়তো তাদের অজান্তে বঙ্গবন্ধুর হত্যার জন্য মোশতাক গংদেরকে যে সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছিল এই দায় আজও তারা এড়াতে পারেন না। যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ তার উপর '৭৪ এর দুর্ভিক্ষ দেশের অর্থনীতি মন্দা, গণ বাহিনী ও সর্বহারাদের বাজার লুট / ব্যাংক লুট / অস্ত্র লুট / হত্যা সর্বোপরি রাজনৈতিক অস্থিরতাও বিশৃঙ্খলার মধ্যে মোশতাক গংররা ১৫ই আগস্ট ইতিহাসের যে নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল তখনকার পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটসহ বঙ্গবন্ধুর সাড়ে তিন বছরের শাসন আমলে সবাইর কর্মকাণ্ড, সংশ্লিষ্ট সবার ষড়যন্ত্র, ব্যর্থতা, সার্বিক কর্মকাণ্ড ও ধারাবাহিক বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহর উপর বিলম্বে হলেও ১টা শ্বেতপত্র ভবিষ্যৎ ও বর্তমান প্রজন্ম জানার জন্য প্রকাশ করা উচিত। সেদিন পুরো বিশ্ব অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল বাংলাদেশের দিকে। তারা আমাদের থেকে বেশি হতাশা ও আপসোস প্রকাশ করেছিল। ধিক্কার দিয়েছিল বাঙালি জাতিকে এই বলে যে, বিশ্বের নন্দিত প্রথম সারির নেতাদের একজন শেখ মুজিব, যে তোমাদেরকে একটি নতুন রাষ্ট্র উপহার দিয়েছে, যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশকে পুনঃগঠন করে অর্থনীতি মুক্তি যা সাড়ে তিন বছরের মধ্যে সম্ভব ছিল না। তোমরা তাকে সেই সময়-সুযোগ না দিয়ে বিশ্ব দরবারে কলঙ্কিত হয়ে থাকলে। আমাদের মতে, তিনি তোমাদেরকে বেশি ভালোবাসতেন এটাই ছিল তার বড় অপরাধ।

৫। বঙ্গবন্ধুর জীবদ্দশায় যেখানে মুক্তিযোদ্ধারা এক থাকতে পারলেন না আজ ৪ দশক পর এক হওয়া কী সম্ভব? তবুও দেশের স্বাধীনতা

সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখার লক্ষ্যে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তিগুলোর ঐকমত্য জাতীয় স্বার্থে অপরিহার্য। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বড় আঘাত বঙ্গবন্ধুর জীবদ্দশায় যারা ঘটিয়েছিল পরে ১৫ই আগস্ট '৭৫ বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ডের মধ্যে এই চেতনার উপর চূড়ান্ত আঘাত হানা যা ছিল দেশি-বিদেশি এক গভীর ষড়যন্ত্র। তাই আজ সবাইকে চেতনার প্রশ্নে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আর এই চেতনার ভিত্তিতে বৃহত্তম জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানতে হবে।

১৬ই ডিসেম্বর আমাদের বিজয় দিবস। আমাদের পাশাপাশি একই দিনে ভারতীয় সেনাবাহিনীরাও এই দিনটিতে বিজয় দিবস উদযাপন করে থাকেন। ১৬ই ডিসেম্বর কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম সেনানিবাসে বিজয় দিবস অনুষ্ঠানে তাদের অর্থাৎ ভারতীয় সেনা বাহিনী ও War Vateran দের সমাবেশে বক্তব্য দেওয়া ও তাদের বক্তব্য শুনা আমার সৌভাগ্য হয়েছিল। তারা এই ৩রা ডিসেম্বর থেকে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত এই যুদ্ধকে এখনও ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধ হিসেবে অভিহিত করেন। পাশাপাশি আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের শুরু থেকে ৩রা ডিসেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে আট মাস যুদ্ধে মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর ভূমিকা ও অবদানকে সংক্ষেপে উল্লেখ করেন মাত্র। সেদিন আমি লক্ষ করেছিলাম– ৯ মাসের যুদ্ধে রণাঙ্গনগুলোতে মুক্তিযোদ্ধাদের বীরগাথা ইতিহাস তথা মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বের কাহিনি এবং ভারতীয় সেনাদের আত্মাহুতি ও ত্যাগের সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস উল্লেখে এখনও যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। এটাই আমাদের ব্যর্থতা। সেদিন আমি আরো লক্ষ করলাম ও তাদের ভাষণ শুনে উপলব্ধি করলাম যে, তারাও ৩রা ডিসেম্বর ১৯৭১ যুদ্ধের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত তাদের যে প্রায় সাড়ে ৪ হাজার অফিসার ও সৈন্য আমাদের রণাঙ্গনগুলোতে হতাহত হয়েছিল, সেদিন এদের বুকের তাজা রক্তে বাংলার মাটি রঞ্জিত হয়েছিল। যাদের স্বজনরা আজও আমাদের বিভিন্ন রণাঙ্গনে তাদের স্বজনরা কোথায় কীভাবে আত্মাহুতি দিয়েছিল, এই খোঁজে আসেন, জানতে চান যুদ্ধে তাদের বীরত্বের কাহিনি– এতে সৃষ্টি হয় এক আবেগময় পরিবেশ। অথচ, তারা এই অবদানকে বিস্তারিতভাবে অর্থাৎ এদের অবদানের পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছেন। ভারতীয় সেনাবাহিনীর যেসব ইউনিট আমাদের সাথে রণাঙ্গনে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছিল সেই সব ইউনিটে এখনও বিস্তারিত বিবরণ সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ নেই। অর্থাৎ যুদ্ধে অংশগ্রহণ উল্লেখ করে সংক্ষেপে একটা বিবরণ রয়েছে মাত্র। এ ব্যাপারটি আমি তৎকালীন ইস্টার্ন কমান্ডার জেনারেল দালবির সিং যিনি বর্তমানে ভারতের সেনাপ্রধান। (২০১৫-২০১৬) তার উপস্থিতিতে ঐ অনুষ্ঠানে সবার অবগতির জন্য তুলে ধরি। এর আগে ২০১২ সালে তৎকালীন ভারতীয়

সেনাপ্রধান জেনারেল বি. কে সিং বর্তমানে (২০১৫) ভারত সরকারের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী। উল্লেখ্য যে, তিনি বিলোনিয়া যুদ্ধে রাজপুত ব্যাটালিয়নে লেঃ হিসেবে আমাদের দশম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এর সাথে এক হয়ে পাশাপাশি যুদ্ধ করেছিলেন। উভয়কে ৯ মাসের যুদ্ধের পূর্ণ বিবরণী আমাদের সাথে সমন্বয় করে যেন পূর্ণাঙ্গ সঠিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা হয় এবং আমাদের রণাঙ্গনে ভারতীয় সেনাদের মধ্যে শহিদ ও আহতদের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রদানের জন্যও অনুরোধ করা হয়। আমরা যেন বাংলাদেশে এই ভারতীয় শহীদদের স্মরণে ১টি স্মৃতি মেমোরিয়াল তৈরি করতে পারি। সেদিন ভারতের বিজয় দিবসে আমি আমার ভাষণে দু'দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে সঠিক যুদ্ধের ইতিহাস তুলে ধরার উপর গুরুত্ব দিয়ে আরো বলেছিলাম−

এক : ৩রা ডিসেম্বর যুদ্ধ ঘোষণার আগে সাড়ে ৮ মাসের যুদ্ধকে সঠিকভাবে তুলে না ধরলে মুক্তিবাহিনীর গেরিলা ও সম্মুখ যুদ্ধ এবং সাধারণ মানুষের অবদান ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবদানকে খাটো করে দেখা হবে। সেই ক্ষেত্রে দু'দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মরা কোনোদিন এই যুদ্ধের সত্যিকারের ইতিহাস জানবে না। ভারতীয় সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় স্বাধীন বাংলা সরকারের অধীনে সশস্ত্র বাহিনীর নের্তৃত্বে ১১টি সেক্টর গঠন পর্যায়ক্রমে রণাঙ্গনে কে, জেড, এস ফোর্স গঠন। এবং বিমান ও নৌ বাহিনী গঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন অপারেশনে সম্মুখ যুদ্ধ ও গেরিলা যুদ্ধের তীব্রতা ও গতি বৃদ্ধি পায়। ভারতীয় সরকার ও সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় স্বাধীন বাংলা সরকারের অধীনে উপরের উল্লিখিত এই ফোর্সগুলো গঠনের পরিকল্পনা এবং এর বাস্তবায়ন যুদ্ধের শেষ লগ্নে যৌথ বাহিনীর চূড়ান্ত আঘাত হানার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। এই প্রস্তুতির পাশাপাশি আমাদের হাজার হাজার মুক্তিবাহিনী ভারতের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। দু'ব্যাচে প্রায় দেড়শো বাঙালি ক্যাডেট ভারতের সামরিক স্কুল থেকে অফিসার ট্রেনিং সমাপ্তির পর বিভিন্ন সেক্টরে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধে প্রায় ৯৮ জন বাঙালি (পাকিস্তান মিলেটারি একাডেমি থেকে ট্রেনিং প্রাপ্ত অফিসার) ১১টি সেক্টরে আগ থেকেই দায়িত্বে ছিলেন। জেনারেল ওসমানী ছিলেন সর্বাধিনায়ক। এই কথাগুলো আমি এজন্যই বলছি যদি স্বাধীনতা যুদ্ধে আমাদের এই কাঠামো গঠন না হতো তাহলে সামরিক গেরিলা ও সম্মুখ যুদ্ধ সংগঠিত করা অনেকটা দুরূহ হয়ে পড়ত। সেই ক্ষেত্রে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় ও যৌথ অভিযান সীমিত আকার ধারণ করত। তাতে ৩রা ডিসেম্বর ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ ঘোষণা হয়তো বিলম্বিত হতো। এই কথাগুলো আমি আরো গুরুত্ব সহকারে বলছি এই জন্য যে, শুধু গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে আমরা দেশ স্বাধীন করতে নয় মাসেরও অধিক সময় লেগে যেত। ভিয়েতনাম যুদ্ধের পরিণতি আমরা তাই দেখেছি। তাই আমি

সর্বশেষ মূল্যায়নে বলব– ভারতীয় সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় ৯ মাসে আমাদের সশস্ত্র গেরিলা ও সম্মুখ যুদ্ধকে ইতিহাসে সঠিক মূল্যায়ন করতে হবে। আজ চার দশক পরেও আমরা মুক্তিযুদ্ধের সম্মুখ যুদ্ধ ও গেরিলা যুদ্ধের সঠিক ইতিহাস এখনও জানি না বা তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছি। পাশাপাশি ভারতীয় সেনাবাহিনীও ৯ মাস যুদ্ধে তাদের বিশাল ভূমিকা সম্পূর্ণভাবে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছে। উভয়পক্ষের এই ৯ মাস যুদ্ধের অবদান বিস্তারিত ভূমিকা তথা যুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ তথ্য ভিত্তিক সঠিক ইতিহাস জানতে আরো অনেক দূর পথ চলতে হবে। এখনও রয়েছে যুদ্ধের অনেক অজানা তথ্য এ জন্য বলব ১টি ছোট ডিঙি নৌকা দিয়ে মহাসাগর পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা করছি। সর্বশেষ এ কথাও আমাদেরকে স্বীকার করতে হবে যুদ্ধের শেষ লগ্নে ভারতীয় সেনাবাহিনীর নৈপুণ্যতা মুক্তিবাহিনীসহ যৌথ অভিযানের সফলতায় ১৬ই ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় এনে দিয়েছিল। যুদ্ধের এই শেষ লগ্নে ভারতীয় সেনাবাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধারা যৌথ বাহিনীর চূড়ান্ত আক্রমণ ছাড়া (যেখানে তাদের ৯ মাস যুদ্ধের প্রায় ৮ হাজার সৈন্য হতাহত হয়েছিল) এত কম সময়ের মধ্যে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করা হয়তো সম্ভব হতো না।

দুই : ৩রা ডিসেম্বর থেকে ১৬ই ডিসেম্বর এই ১৩ দিনের যুদ্ধ ঘোষণা যেহেতু তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধেও যুদ্ধের ঘোষণা ছিল। সেই জন্য তোমরা পুরো যুদ্ধকে ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধ বলে থাকে, সেটা যদিও ব্যাপক অর্থে আপত্তিকর নয়। তবে মনে রাখতে হবে আমাদের এই অংশে অর্থাৎ (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) বর্তমান বাংলাদেশ এই অংশে এই যুদ্ধকে শুধু পাক-ভারত যুদ্ধ বললে সঠিক হবে না। কারণ, ৩রা ডিসেম্বর ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি যুদ্ধ ঘোষণার মুহূর্তে পূর্বের সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনানুযায়ী ভারতীয় সেনাবাহিনী ও যুদ্ধরত মুক্তিবাহিনীর সমন্বয়ে জেনারেল অরোরার নের্তৃত্বে মিত্র বাহিনী বাংলাদেশ অংশে নতুন উদ্যমে বিজয়ের লক্ষ্যে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অরোরার নের্তৃত্বে যৌথ বাহিনীর এই ১৩ দিনের যুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর যুদ্ধের নৈপুণ্যতা এবং মুক্তিবাহিনীর বিভিন্ন রণাঙ্গনে সফলতা এনে দিয়েছিল ১৬ই ডিসেম্বরের চূড়ান্ত বিজয়। ১৬ই ডিসেম্বর বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করল বিকেল ৪টা ৩১ মিনিটে ঢাকার রমনার রেসকোর্স ময়দানে মিত্র বাহিনীর প্রধান জেনারেল অরোরার নিকট পাক-বাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠান। বাংলাদেশের পক্ষে যুদ্ধকালীন উপ-প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল, এ, কে খোন্দকার(বীর উত্তম) ও কর্নেল হায়দার(বীর উত্তম) উপস্থিত ছিলেন।

তিন : আমার ভাষণের শেষ অংশে আমি আবার পুনঃ ব্যক্ত করে বললাম – আমরা যদি যুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরতে ব্যর্থ হই, তাহলে যুদ্ধের সঠিক ইতিহাস বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কখনো জানবে না। ভারতীয় জনগণ/ভারত

সরকারের তথা ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি যুদ্ধকালীন সময়ে যে ভূমিকা ও অবদান রেখেছেন সেটি আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের ৯ মাসের ইতিহাস একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় হিসেবে সমুজ্জ্বল থাকবে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর সর্বাত্মক সহযোগিতার পাশাপাশি বিভিন্ন রাজ্যে– পশ্চিম বঙ্গ/ ত্রিপুরাসহ ভারতের বিভিন্ন শরণার্থী ক্যাম্পগুলোতে প্রায় ১ কোটির অধিক বাংলাদেশি শরণার্থী আশ্রয় গ্রহণ করে। এদেরকে ভারত সরকার ও জনগণ আশ্রয়ের পাশাপাশি খাদ্য, বস্ত্র ও চিকিৎসা প্রদান করেছিল। এতে করে ঐ সব অঞ্চলগুলোতে শরণার্থীদের ভিড়ে/চাপে অনেকটা সামাজিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল। ভারতীয়রা তাদের সুবিধা-অসুবিধা বুঝতে না দিয়ে শরণার্থীদের হাসিমুখে গ্রহণ করেছিল। স্বাধীন বাংলা সরকারের ও আমাদের যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধাদের তৎকালীন তদন্ত রিপোর্টে কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি এমনকি কোথাও কোনো অভিযোগ ছিল না। এই শরণার্থীরা আজও কৃতজ্ঞতার সাথে তাদের সাহায্য/সহযোগিতাকে স্মরণ করে। আমার ভাষণের একেবারেই শেষ পর্বে আমি আরো জোরালোভাবে বললাম– প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির বিশাল অবদানকে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখার কোনো অবকাশ নেই। আমরা যদি সঠিক ইতিহাস তুলে ধরতে ব্যর্থ হই, তাহলে শুধু ভারতীয় সেনাবাহিনী/ভারতীয় জনগণের অবদান ছাড়াও তৎকালীন ভারতীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির বিশাল অবদানকে খাটো করা হবে। তিনি সেদিন আমাদের স্বাধীনতার পক্ষে পাকিস্তানের গণহত্যাসহ নির্যাতনের করুণ চিত্র বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরার জন্য বিশ্বের ২৬ টি দেশ সফর করেছিলেন। তিনি দু'দুবার আমাদের পক্ষে জাতিসংঘে ভাষণ দিয়েছিলেন। তাঁর পাশাপাশি তাঁর সরকারও বিশ্বজনমত সৃষ্টিতে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। বঙ্গবন্ধু সেদিন পাকিস্তান কারাগারে বন্দী ছিলেন। তিনি বিশ্ববাসীর নিকট বঙ্গবন্ধুর পাক কারাগারে বন্দী অবস্থায় তার জীবনের নিরাপত্তার কথাও বিশ্ববাসীকে জানিয়েছিলেন। বিশ্ব জনমতের কারণে, পাকিস্তানি সরকার বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে ক্ষতিকর কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সাহস করেনি। এর জন্য ইন্দিরা গান্ধির কাছে চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবে বাংলাদেশ।

১৬ই ডিসেম্বরের পরে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ১০ই জানুয়ারি '৭২ সালে বাংলাদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। বঙ্গবন্ধু দেশে ফেরার পর যুদ্ধকালীন সময়ে মোশতাক গংরা বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র শুরু করেছিল এবং স্বাধীন বাংলা সরকারের সাথে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করে আসছিল মোশতাকের এই ষড়যন্ত্র ও যুদ্ধের সময়কালীন স্বাধীন বাংলা সরকার ও অন্যান্যদের ভূমিকা বঙ্গবন্ধুর কাছে সঠিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে কিনা আমরা জানি না। আমরা যদি মুক্তিযুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ সঠিক ইতিহাস বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

প্রজন্মের জন্য রেখে না যেতে পারি– তাহলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা একদিন সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আর এর জন্য স্বাধীন বাংলা সরকার ও মুক্তিযোদ্ধাদেরকে ইতিহাস কোনো দিন ক্ষমা করবে না।

যুদ্ধচলাকালীন সময়ে মজলুম জননেতা মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাষানীর নের্তৃত্বে অন্যান্য দলের নেতৃবৃন্দসহ সীমান্ত পাড়ি দিয়েছিলেন বাকি আরো বামদল ও অন্যান্য সমমনাদের সমন্বয়ে সর্বদলীয় ঐক্য সৃষ্টি হয়েছিল যারা তৎকালীন স্বাধীন বাংলা সরকারকে ভারত থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতা ও সমর্থন দিয়েছিলেন। এই পরিস্থিতি ও পরিবেশ সর্বোপরি এই উদ্যোগ সৃষ্টি হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে।

মুক্তিযুদ্ধের বামদলগুলোসহ বাকিরা ও স্বাধীন বাংলার সরকারের সহযোগিতায় প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছিল। তখনও এদের সাথে সমন্বয়ের কিছুটা ঘাটতি ছিল। যুদ্ধোত্তর এই ঘাটতি পূরণে কোনো বাস্তব প্রয়াস গ্রহণ করা হয়নি। এই প্রশ্নে অনেক ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর আশপাশের অনেকে বঙ্গবন্ধুকে অন্ধকারে রেখেছিলেন। স্বাধীনতার স্বপক্ষের সবাইকে এক পতাকাতলে সম্মিলিত করার বঙ্গবন্ধুর এই প্রয়াসকে দলের অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা ষড়যন্ত্রকারীরা সফল হতে দেননি। বঙ্গবন্ধুর হত্যার পরে দলের এ ষড়যন্ত্রকারীদের মুখোশ উন্মোচিত হয়েছিল। যুদ্ধের আগে এবং যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে যারা রাজনৈতিক নের্তৃত্ব দিয়েছিলেন, যারা কবিতা ও বিভিন্ন লেখনীর মাধ্যমে জনগণকে স্বাধীনতার দৃপ্ত মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, যারা গান গেয়ে স্বাধীনতার প্রেরণাকে উজ্জীবিত রেখেছিল, আর সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী কূটনীতিবিদ সজীব সজিত রেখে আরো শাণিত করার প্রয়াস অব্যাহত রেখেছিলেন, যারা গান গেয়ে স্বাধীনতার প্রেরণাকে উজ্জীবিত রেখেছিলেন, যারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে একনিষ্ঠ অবদান রেখেছিলেন, এছাড়া রণাঙ্গনে বাংলার দামাল ছেলেরা-যারা জীবন বাজি রেখে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং দেশের ভিতরে বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর মধ্যে যারা মুক্তিযোদ্ধাদেরকে আশ্রয়, খাদ্য, বস্ত্র দিয়ে সহযোগিতা করেছিল, এমনকি যুদ্ধ চলাকালীন যেসব মা ও ভাই-বোন সেদিন নিভৃতে দু'হাত তুলে আল্লাহর দরবারে মুক্তিযোদ্ধাদের ও স্বাধীনতার জন্য প্রার্থনা করেছিল, সবাই সেদিন স্বাধীনতার প্রশ্নে বঙ্গবন্ধুর নের্তৃত্বে যে স্বাধীনতা যুদ্ধ হচ্ছিল সেই প্রশ্নে ঐকমত্যের ভিত্তিতে একতাবদ্ধ ছিল। যুদ্ধচলাকালীন সময়ে সর্বদলীয় সমন্বয় কমিটিও স্বাধীনতা সরকারের সাথে ঐকমত্য ছিল। এক কথায় স্বাধীনতা বিরোধীদেরকে বাদ দিয়ে দেখা যাবে অবশিষ্ট বৃহত্তম জনগোষ্ঠী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে স্বাধীনতার স্বপক্ষের শক্তি।

এই উল্লিখিত শক্তিগুলোকে রাষ্ট্র পরিচালনার ঐকমত্যের ভিত্তিতে সম্পৃক্ত রাখার প্রয়াস তাৎক্ষণিকভাবে দৃশ্যমান ছিল না। পাশাপাশি আওয়ামী লীগের

ভিতরে ও বাইরে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও কোন্দল বৃদ্ধি পেতে থাকে। অথচ, এর বিপরীত মূল্যায়নে দেখা যাবে, সবাইকে ঐকমত্যের ভিত্তিতে এক রাখার প্রয়াস সময়মত গ্রহণ করলে হয়তো পরবর্তীতে রাজনৈতিক অস্থিরতা অনেকটা এড়ানো সম্ভব হতো। এতে করে ষড়যন্ত্রের মাত্রা অনেকাংশে হ্রাস পেত এবং পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ হয়তো অন্য ধারায় প্রবাহিত হতো।

যুদ্ধোত্তর স্বাধীনতার পক্ষের শক্তিগুলোকে নিয়ে আওয়ামী লীগ একক রাজনৈতিক নের্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে যুদ্ধচলাকালীন সময়ে সূদুর প্রসারী রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে মুজিব বাহিনী গঠিত হয়েছিল। ভারতীয় জেনারেল ওবান এর সার্থক দায়িত্বে ছিলেন। আমাদের জানা মতে, মুজিব বাহিনী গঠন নিয়ে স্বাধীনতা সরকারের সাথে সমন্বয়হীনতা ছিল। যুদ্ধ যদি দীর্ঘস্থায়ী হতো, তাহলে মুজিব বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর মধ্যে সমন্বয় ও ঐক্য রক্ষা করা এক দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত। ৯মাস যুদ্ধকালীন সময়ে এবং পরবর্তীতে মুক্তিযোদ্ধা ও মুজিববাহিনীর মধ্যে কোনো বড় ধরনের ভুল বুঝাবুঝি বা সমস্যা সৃষ্টি হয়নি। যেহেতু অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে যুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হয়েছিল। সীমিত আকারে গেরিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণের পাশাপাশি মুজিব বাহিনীর উদ্দেশ্য ছিল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রুপে বাংলাদেশের ভিতরে বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থান করে নিজ নিজ অঞ্চলে রাজনৈতিক নের্তৃত্ব গ্রহণ করা এবং আঞ্চলিকভাবে নিজেদের রাজনৈতিক অবস্থান সুদৃঢ় করা যেন ঐসব অঞ্চলে স্বাধীনতা বিরোধীদের আধিপত্য বিস্তার না ঘটে। মূল লক্ষ্য ছিল যুদ্ধকালীন সময়ে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে যুদ্ধের মূল চালিকা শক্তি সেক্টরগুলোও কে, জেড, এস ফোর্সগুলোকে যুদ্ধে সম্ভাব্য সহযোগিতাকরত স্বাধীন বাংলা সরকারের অধীনস্ত এই রেগুলার সেক্টর ফোর্সগুলোর উপর নজর রাখা– যেন এই ফোসগুলো রাজনৈতিকভাবে উচ্চভিলাষী হয়ে না উঠে এবং সর্বশেষ মূল দায়িত্ব ছিল যুদ্ধশেষে বঙ্গবন্ধুর নের্তৃত্বের প্রতিপক্ষ হিসেবে কোনো পক্ষ যেন আত্মপ্রকাশ না করে। আমি আগেও বলেছি, তাদের এই ভূমিকা বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের ব্যাপারে সেক্টরগুলোও কে. এস. জেড ফোর্সগুলোর অধীনস্ত মুক্তিযোদ্ধাদের কোনো দ্বিমত ছিল না বরং তারা যুদ্ধের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। কারণ সেক্টরগুলো এবং কে, জেড, এস ফোর্স সবাই কিন্তু বঙ্গবন্ধুর আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিল। পুরো যুদ্ধই বঙ্গবন্ধুর নামের উপর চলছিল। তখন সবার কাছে বঙ্গবন্ধু ছিল বিতর্কের উর্ধ্বে। কিন্তু যুদ্ধ যদি দীর্ঘস্থায়ী হতো, তাহলে মুজিব বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর মধ্যে আধিপত্য ও ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে সময়ের ব্যবধানে গিয়ে সমঝোতা ও ঐক্যের ফাটল দেখা দিত এবং অনেক আঞ্চলিক গ্রুপের আবির্ভাব যুদ্ধ চলাকালীন বাহ্যিকভাবে না ঘটলেও ভিন্ন ভিন্ন মতের গ্রুপের অস্তিত্ব বিকাশের

প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকত। এদের মধ্যে বহির্বিশ্বের অন্যান্য দেশের প্রভাব বিস্তারের ও যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল যার বহিঃপ্রকাশ স্বাধীনতার পরে ভয়াবহ হতে পারত।

মুজিব বাহিনী গঠন নিয়ে বিতর্ক না করে বলব, মুজিব বাহিনীর সাংগঠনিক নের্তৃত্বে যারা ছিলেন তাদের সাথে স্বাধীন বাংলা সরকারের অধীনে সেক্টরগুলো ও কে, জেড, এস ফোর্সগুলোর নের্তৃত্বে যারা ছিলেন, এই দুইপক্ষের নের্তৃত্বদানকারীদের মধ্যে আনুষ্ঠানিক সমঝোতা বা সমন্বয় থাকা বাঞ্ছনীয় ছিল। এটা সম্ভব হতো এজন্য যে, পুরো যুদ্ধই পরিচালিত হচ্ছিল স্বাধীন বাংলা সরকারের নির্দেশিত কাঠামোর মধ্যে। জেনারেল এম. এ. জি. ওসমানী তৎকালীন আওয়ামী লীগের এম. পি ছিলেন এবং ছিলেন যুদ্ধের সর্বাধিনায়ক। যুদ্ধকালীন সমন্বয় ও সমঝোতার অভাবের কারণে ছোট-খাটো বিচ্ছিন্ন ভুল বুঝাবুঝি দু'পক্ষের মধ্যে হয়েছিল। যেহেতু পুরো যুদ্ধ স্বাধীন বাংলা সরকারের অধীনে হচ্ছিল– সেহেতু মুক্তিবাহিনী ও মুজিব বাহিনী এক করে পৃথক পৃথক নের্তৃত্ব কাঠামো সৃষ্টি করে অথবা এমনকি একক নের্তৃত্বের কাঠামোর মাধ্যমে উভয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে যুদ্ধ পরিচালনা ও সুদূর প্রসারী রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন দু'টিই সম্ভব ছিল।

কিন্তু স্বাধীনতা উত্তর মুজিব বাহিনীর একটি বিরাট অংশ বঙ্গবন্ধুর জীবদ্দশায় মুজিব বাহিনী থেকে বেরিয়ে এসে জাসদ গঠন করে গণবাহিনী সর্বোপরি এদের পরবর্তী কর্মকাণ্ডে আমার উপরে উল্লিখিত ঐক্য কতদূর সম্ভব হতো এটা অবশ্য বিশ্লেষণের দাবি রাখে। এই ধারাবাহিকতা মুক্তিযোদ্ধাদেরকে বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হওয়া শুরু হলো আজও তা অব্যাহত আছে।

বঙ্গবন্ধু পলাতক/ গ্রেপ্তার ॥ এ. কে. খন্দকার

৭ই মার্চের পর বঙ্গবন্ধুর সব MNA/MPA, District Governorসহ সব নেতা কর্মীদের নিজ নিজ জেলায় যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ২৫ মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধু কড়া গোয়েন্দা নজরদারিতে ছিলেন। এ সময় তাজউদ্দীন আহমেদ বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করে তাঁকে স্বাধীনতার একটি লিখিত বার্তা রেকর্ড করার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু তার কথায় সম্মত হননি। উত্তরে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আমার বার্তা প্রচার হলে এবং পাকিস্তানিরা তা শুনলে তারা আমাকে দেশদ্রোহী বলবে।' বঙ্গবন্ধুর এই কথা শুনে তাজউদ্দীন সাহেব হতাশ হয়ে বাসা থেকে বেরিয়ে যান। পরবর্তী সময়ে দেখা যায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে শুরু করে বিশ্বের বিভিন্ন গণ মাধ্যম থেকে ঐ বার্তাটিই হুবহু প্রচার করা হয়েছিল। তাই দেখা যায়, অত্যন্ত দূরদর্শী ও কৌশলী বঙ্গবন্ধু ঐদিন প্রকাশ্যে তাজউদ্দীন আহমেদকে ঐ উক্তিটি করেছিলেন।

মার্চের শুরুতে পূর্ব পাকিস্তানে কমসংখ্যক পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্য উপস্থিত ছিল। বিপরীতে এখানে কয়েক ব্যাটালিয়ন বাঙালি সৈন্য, ইপিআর, পুলিশ, আনসার, মুজাহিদ ছিল, যাদের সংখ্যা ছিল পাকিস্তানিদের চেয়ে বেশি। এ ছাড়া বিপুলসংখ্যক অবসারপ্রাপ্ত বাঙালি সৈনিক অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। এই সময়ে তিনি যদি বাঙালি সেনা, ইপিআর আর পুলিশকে কোনো নির্দেশ দিতেন, তাহলে আমাদের বিশ্বাস, সাধারণ জনগণের সহযোগিতা ও সমর্থনে অল্প রক্তপাতেই আমরা যুদ্ধ জয় করতে পারতাম।

আমি মনে করি খন্দকার সাহেবের যুদ্ধ জয়ের ধারণাটি ভিন্ন আঙ্গিকে মূল্যায়ন করতে হবে।

এ. কে খোন্দকার সাহেব অবশ্য ঠিকই বলেছেন যে বাঙালি ইপিআর, পুলিশ, আনসার, মুজাহিদসহ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য সংখ্যা পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনীর তুলনায় বেশি ছিল। আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যের মধ্যে ছিল ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটালিয়নের সৈন্য-৫,৫০০; ইবিআরসিতে রিক্রুটসহ (প্রশিক্ষণরত সৈনিক)

সৈন্য– ২,৫০০; ইপিআর-১৫,০০০; ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটালিয়ন ব্যতীত অন্যান্য রেজিমেন্ট/ব্যাটালিয়ন/সামরিক প্রতিষ্ঠান/স্থাপনায় চাকরিরত -১,৫০০; বিমান ও নৌ-বাহিনীতে চাকরিরত-৫০০; পুলিশ ও অন্যান্য বাহিনীতে-২০,০০০। তাতে দেখা যাচ্ছে আমাদের নিয়মিত সামরিক, আধা-সামরিক, পুলিশ ও অন্যান্য বাহিনী মিলিয়ে মোট সশস্ত্র বাহিনীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৫,০০০ এর মতো। অন্যদিকে বাংলাদেশে অবস্থানরত পাকিস্তানি নিয়মিত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল ৩০-৩৫ হাজারের মতো।

তবে যুদ্ধের সক্ষমতার দৃষ্টিকোণ থেকে তুলনামূলক বিচারে তারা সংখ্যায় কম থাকা সত্ত্বেও তাদের প্রস্তুতি ও সক্ষমতা ছিল আমাদের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি। এছাড়াও মার্চের প্রথম দিক থেকেই পশ্চিম পাকিস্তান থেকে তাদের বাড়তি সৈন্য ও যুদ্ধ সরঞ্জাম আসা অব্যাহত ছিল। আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের অবস্থান ছিল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। যেমন– প্রায় ১৫, ০০০ ইপিআর এর অধিকাংশই ৫৪, ০০০ বর্গমাইল বিস্তৃত সীমান্তে পৃথক পৃথক অবস্থানে কর্তব্যরত ছিল। পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা ও দেশের সর্বত্র বিচ্ছিন্নভাবে কর্তব্যরত ছিল। মুজাহিদ, আনসার এরাও ছিল একই অবস্থায়। সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা কোথাও একত্রে অবস্থানে ছিল না– এ কথাটি এ জন্য তুলে ধরলাম যে, এদেরকে একত্র করে সংগঠিত করা ছিল এক দুরূহ ব্যাপার। তাছাড়া সময় ও কাল ছিল একটি বড় Factor. এটি একটি বড় Factor এ জন্য যে, ২৫ মার্চের আগে পাকিস্তান সরকারের অধীনে এ সব বাঙালি সশস্ত্র সদস্যরা তাদের নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণের বাইরে এসে একত্রিত হওয়া ছিল শুধু অসম্ভবই নয়, এটা হতো একটি ঘোষিত বিদ্রোহ। সেক্ষেত্রে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রেক্ষাপট হতো ভিন্ন। ২৫ মার্চের আগে এই ধরনের উদ্যোগ যুক্তিযুক্ত ছিল না। এর আরেকটি বড় কারণ হচ্ছে আমাদের আগে ও পরে এ ব্যাপারে কোনো পূর্ব প্রস্তুতি বা সিদ্ধান্ত ছিল না।

যাই হোক ২৫ মার্চের আগে আমাদের পূর্ব প্রস্তুতি এবং সিদ্ধান্ত যদি থাকতও তবু এই উদ্যোগ কখনো সফল হতো না। কারণ– তুলনামূলক বিশ্লেষণের যৌক্তিকতায় স্পষ্ট হবে :

ক. আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের সবার হাতে ছিল রাইফেল ও খুব সীমিত এলএমজি।	ক. পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের হাতে ছিল ভারী অস্ত্র– LMG, MMG রকেট ল্যান্সার, Mortors আর্টিলারি, গ্রেনেড, ট্যাঙ্কসহ বিমান ও নৌ বাহিনী।

খ. আমাদের সামরিক বাহিনীর সদস্য ছাড়া বাকি ইপিআর, পুলিশ আনসার ও মুজাহিদ এদের যুদ্ধের বাহিনী ও ছিল। কোনো প্রশিক্ষণ ছিল না।	খ. পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনীর সবাই ছিল সামরিক প্রশিক্ষিত এমনকি তাদের কমান্ডো প্রশিক্ষণও ছিল।
গ. আমাদের বাড়তি সৈন্য বৃদ্ধির কোনো সুবিধা ছিল না।	গ. পাকিস্তানিদের পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য আনার যথেষ্ট সুবিধা ছিল।

আর ২৫ মার্চের পরেও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সবাইকে একত্রিত করা বা আঞ্চলিকভাবে একত্রিত করা পাকিস্তানিদের আক্রমণের মুখে তা ছিল আরও অসম্ভব এবং এটা হতো একটি অপরিপক্ব সিদ্ধান্ত।

সব মিলিয়ে এই পরিস্থিতিতে তাদের যে যুদ্ধ প্রস্তুতি ছিল তাতে আমরা যদি কারো নির্দেশে তাদের বিরুদ্ধে প্রথমে আক্রমণ চালাতাম সেক্ষেত্রে তারা আমাদের বিরুদ্ধে কনভেনশনাল যুদ্ধ শুরু করত। তাতে তারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে আমাদেরকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করে দিত। পরিচালিত এই কনভেনশনাল ওয়ারে তাদের বিমান, নৌ হামলাসহ ভারী আর্টিলারি ফায়ারের মাধ্যমে আমাদের অবস্থানগুলোকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করত। এতে ২৫ মার্চ রাতে শুরু হওয়া গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ ও নির্যাতনের পরিমাণ থেকে আমাদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হতো শত গুণ বেশি। এক্ষেত্রে তারা পুরো বিশ্বকে বোঝাতে সক্ষম হতো যে, তারা নিজস্ব বাহিনীগুলোর মধ্যে বিদ্রোহ দমন করছে। এই অজুহাতে তারা রাজনৈতিক নেতাসহ মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী বাঙালি সদস্যদের খুঁজে বের করার উদ্দেশ্যে পুরো বাংলাদেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অবস্থানে তল্লাশির নামে নির্যাতন, এমনকি বোমা বর্ষণ করে ওইসব এলাকার বিভিন্ন স্থাপনাগুলোকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিত। আমরা ইরাক যুদ্ধে সাদ্দাম হোসেন গংদের বিরুদ্ধে বুশ ও ব্লেয়ারের ষড়যন্ত্রমূলক ধ্বংসাত্মক হত্যাযজ্ঞ ও নির্মম নির্যাতনের চিত্র দেখেছি। যুদ্ধের জন্য আমাদের পূর্বপরিকল্পনা ও প্রস্তুতি ছিল না; যদি থাকত আর বঙ্গবন্ধু যদি নির্দেশ দিতেনও তাহলে এর পরিণতি– আমি আগেই যা উল্লেখ করেছি তাই হতো। অর্থাৎ ২৫ মার্চ রাতে শুরু হওয়া প্রতিরোধ যুদ্ধে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ যা হয়েছিল তার থেকে শতগুণ বেশি হতো। তবে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, যেহেতু যুদ্ধের পূর্বপরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত ছিল না, তাই সেই মুহূর্তে শেষ পর্যায়ে এসে বিভিন্ন বাহিনীর বাঙালি সদস্যদের যোগাযোগের মাধ্যমে যুদ্ধ শুরু করা হতো একটি অপরিপক্ব ও সুসাইডেল সিদ্ধান্ত। ঐ মুহূর্তে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ জয়ের ধারণা একটি আবেগ-প্রবণ ও উচ্চভিলাষী

চিন্তার বহিঃপ্রকাশ। এমনিতে বাঙালি সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা পাক-সেনাদের কড়া নজরদারিতে ছিল। ইয়াহিয়া খান যত বারই সেনাবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকতাদের সাথে সভা করতেন তিনি বাঙালি বিভিন্ন বাহিনীর সদস্যদের ব্যাপারে তার করণীয় সর্ম্পকে আগ থেকেই সংশ্লিষ্ট সামরিক কর্মকর্তাদেরকে পরামর্শ দিয়েই রেখেছিলেন। এবং এই ব্যাপারে গোয়েন্দা নজরদারি আরো বৃদ্ধি করার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাই আমরা লক্ষ করেছি ২৫শে মার্চ রাতে বাংলাদেশের বিভিন্ন জনপদে যখন পাক হানাদার বাহিনী নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞ শুরু করল একই সময়, এক যোগে, এক সাথে তাদের পূর্ব পরিকল্পনানুযায়ী আঘাত করল রাজারবাগ পুলিশ লাইন, পিলখানায় ইপিআর এবং মুজাহিদ, আনসারসহ সশস্ত্র বাহিনীর বাঙালি সদস্যদের ওপর। তাই এ ব্যাপারে সর্বশেষ পরিস্থিতির মূল্যায়নে দেখা যাবে বিভিন্ন বাহিনীর বাঙালি সদস্যরা জনগণকে নিয়ে যে প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু করল সেটাই ছিল বাস্তবও ঐ মুহূর্তে সময়ের দাবি। ২৫ শে মার্চ রাতে পাক হানাদার বাহিনী যখন ঘুমন্ত জাতির উপরে আঘাত করল সেই মুহূর্ত থেকে আসলে আমাদের প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল। এ বাস্তব কথাটি অবশ্য আমার শ্রদ্ধেয় খন্দকার সাহেব জোর দিয়ে বলেছেন। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন– তখন কেউ কারো নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করেনি বা অপেক্ষার প্রয়োজন ছিল না। এ বিষয়ে ৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধুর ভাষণে সুস্পষ্ট নির্দেশনা ছিল, "আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি তোমাদের যার যা কিছু আছে তা নিয়ে প্রস্তুত থাকো ;--- শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।" বঙ্গবন্ধুর সেদিনের সেই অবস্থান থেকে বাড়তি আর কোনো উদ্যোগ গ্রহণ/নির্দেশ পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তুলত বলে আমি মনে করি। কারণ, বঙ্গবন্ধুসহ পুরো বাঙালি জাতি কখনও ধারণা করেনি যে পাক হানাদার বাহিনী আমাদের জাতীয় সত্তাকে পুরো ধ্বংস করে দিয়ে আমাদের নাম-নিশানা ইতিহাস থেকে মুছে ফেলতে এত জঘন্য হিংসাত্মক আক্রমণ চালাবে। সবাইকে বুঝতে হবে গণতন্ত্র তথা অধিকার আদায়ে চলমান সংগ্রাম যদি ব্যর্থ হতো তাহলে কোনোদিন স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হতো না। আমাদের '৫২তে শুরু হওয়া ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে দীর্ঘ এই সংগ্রাম সফল হয়েছে বলেই ২৫শে মার্চ আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। গ্রেপ্তার হওয়ার আগে বঙ্গবন্ধু সবাইকে আত্মগোপনে চলে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাই কাউকে তিনি কিছু বলে যাননি এটা যেমন– সঠিক নয়; তেমনি পাক-হানাদার বাহিনী আমাদের কল্পনার বাইরে গণহত্যাসহ নির্যাতনের আচমকা যে চরম আঘাত হেনেছিল তার পরিণতিতে শুরু হয়েছিল অবরোধ যুদ্ধ থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং আমাদের এনে দিয়েছিল চূড়ান্ত বিজয়ের মাধ্যমে স্বাধীনতার লাল সূর্য।

এ. কে খন্দকার সাহেবের " ১৯৭১ : ভেতরে বাইরে " বইতে তিনি আরো উল্লেখ করেছেন– বঙ্গবন্ধু গ্রেপ্তার এড়িয়ে পালিয়ে গিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারতেন। এতে পরিস্থিতি কী আকার ধারণ করত; তার একটা বিশ্লেষণের প্রয়োজন।

প্রথমত : বঙ্গবন্ধু পালিয়ে গেলে বিশ্বদরবারে তাঁর ভাবমূর্তি খাটো হয়ে যেত। পাকিস্তান তখন বহির্বিশ্বে প্রচার করত– শেখ মুজিব পলাতক। আত্মগোপনে থেকে তার নের্তৃত্বে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা পাকিস্তানকে ধ্বংস করার জন্য বিচ্ছিন্নভাবে সশস্ত্র প্রতিরোধ এর মাধ্যমে সহিংসতা চালাচ্ছে। পাকিস্তান সরকার এ বিদ্রোহ দমনে আর নীরব থাকতে পারে না।

দ্বিতীয়ত : পলাতক বঙ্গবন্ধুকে খুঁজে বের করার অজুহাতে তাদের সামরিক অভিযান শুধু আরো জোরদার করত না; পাশাপাশি বাংলাদেশের বিভিন্ন জনপদের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলো বিমান থেকে ভারী গোলা বর্ষণের মাধ্যমে গুড়িয়ে দিত। এই অবস্থায় বাংলাদেশ হতো এক মৃত্যু উপত্যকা। এতে করে আমাদের প্রতিরোধ যুদ্ধ এবং পরবর্তী মহান মুক্তিযুদ্ধ স্বপ্নই থেকে যেত। ২৫শে মার্চ থেকে ৩-৪ দিন ব্যাপী তাদের এই সামরিক অভিযানে হয়তো বঙ্গবন্ধুসহ আরো লক্ষাধিক বাঙালি প্রাণ হারাত। এতে করে পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলা সরকার গঠন এবং এর অধীনে পরিকল্পিত যুদ্ধ শুরু, ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সহযোগিতা আদায় তথা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্বজনমত সৃষ্টি করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াত।

তৃতীয়ত বঙ্গবন্ধু যদি সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে আশ্রয় নিতেন; তাহলে পরিস্থিতি কী হতো?

পাকিস্তান বঙ্গবন্ধুকে জাতিসংঘসহ বিশ্বের কাছে রাষ্টদ্রোহী/বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা হিসেবে আখ্যায়িত করত। বঙ্গবন্ধুকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য ভারতকে অভিযুক্ত করত। তখন ভারতে বঙ্গবন্ধুর নের্তৃত্বে প্রবাসী সরকার গঠনসহ আমাদের নতুন করে যুদ্ধ প্রস্তুতির বিরুদ্ধে পাকিস্তান-আমেরিকা ও ইসলামি রাষ্ট্রসমূহ সোচ্চার হতো। বঙ্গবন্ধু নিজে সার্বিক পরিস্থিতি মূল্যায়নে বিশ্ব গণমাধ্যমের মুখোমুখি হতে বাধ্য হতেন। এতে বিশ্বজনমতের মধ্যেও এক ধরনের মিশ্র-প্রতিক্রিয়া দৃশ্যমান হতো। বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতে নিজেদের মধ্যে নানা বিষয়ে অন্ত:দ্বন্দ্ব জটিল আকারে ধারণ করার আশঙ্কা ছিল। এতে করে ভারতের সহযোগিতার মাত্রা সীমিত আকার ধারণ করত এবং আমাদের ও সার্বিক প্রস্তুতির ঘাটতি দেখা দিত। এমতাবস্থায় বঙ্গবন্ধুর নিজেরই যুদ্ধ পরিচালনার পাশাপাশি পাকিস্তানিদের বর্বরতা ও গণহত্যার বিরুদ্ধে বিশ্বজনমত সৃষ্টির তৎপরতা চালাতে

হতো। আমরা দেখেছি, বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে এই বিশাল দায়িত্বটি পালন করছিল ভারত সরকার। তাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা, আমাদের মধ্যকার অন্ত ঃকোন্দল ও বিশ্বের কয়েকটি দেশের বিরোধিতাকে পাশ কাটিয়ে আমাদের পক্ষে বিশ্বজনমত সৃষ্টিকরত যৌথ বাহিনীর চূড়ান্ত বিজয়কে নিশ্চিত করেছিল। বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতে পরিস্থিতি ভিন্ন রূপ নিত। বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির তুলনামূলক বিচারে প্রেক্ষাপট ভিন্ন ভিন্ন থাকত। পরিস্থিতি মূল্যায়নে, বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে ৯ মাসে যুদ্ধে লক্ষ অর্জনে আমাদের পক্ষের পাল্লা ছিল ভারী। এ জন্য যে, পুরো যুদ্ধই চলছিল বঙ্গবন্ধুর নামের ওপরে। তিনি পাকিস্তান কারাগারে বন্দী থাকার কারণে ভারত ও বিশ্ব সমর্থনে আমাদের যুদ্ধের গতি দিন দিন যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছিল একই সাথে বিশ্বব্যাপী বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবিও জোরদার হচ্ছিল। বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি রেখে সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের নের্তৃত্ব দানকারী স্বাধীন বাংলা সরকারও চলছিল তাঁর নামের ওপরে।

এবার আসা যাক, বঙ্গবন্ধু কাউকে কিছু না বলে ধরা দিলেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে, এতে আমাদের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশি হয়েছে এ. কে. খন্দকার সাহেবের এই উক্তির সাথে আমি একমত হতে পারিনি। ধরা না দিয়ে আত্মগোপনে গেলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এর চেয়ে শতগুণ বেশি হতো, এ বিষয়ে ইতোমধ্যে আমি উল্লেখ করেছি। এ. কে. খন্দকার সাহেব তার লিখিত '১৯৭১ : ভেতরে বাইরে' বইয়ের ৪৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন– " বঙ্গবন্ধুর গ্রেপ্তারের বিষয়টি আপাতত একটি রহস্য হয়ে আছে। আমার বিশ্বাস, এ রহস্যকে বহু গবেষক ও ঐতিহাসিক বিভিন্নভাবে বিভিন্ন আঙ্গিকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করবেন। যদি কেউ একটি দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ২৫ মার্চ রাতে শেখ মুজিবের গ্রেপ্তার হওয়াকে বিশ্লেষণ করেন, তবে সেটা সম্পূর্ণ হবে না। বিষয়টিকে দেখতে হবে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি, আঙ্গিক ও অবস্থান থেকে। এ নিয়ে গভীর গবেষণা হওয়া উচিত।" এ. কে খন্দকার সাহেবের উল্লিখিত এই বিষয়গুলো আমার নিজ দৃষ্টিভঙ্গি ও আঙ্গিকে ব্যাখ্যাসহ মূল্যায়ন করছি।

এ. কে. খন্দকার সাহেব অনেক কাছ থেকে মুক্তিযুদ্ধকে দেখেছেন এবং যুদ্ধকালীন সময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাই তার অভিজ্ঞতা অনেক বেশি। এম.এন.এ ও এম.পি কর্তৃক মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণের জন্য বাচাই, এ ব্যাপারে মন্ত্রী পরিষদের সিদ্ধান্ত, যুদ্ধ পরিষদ গঠনসহ অনেক বিষয়ে তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ ছিল বাস্তবমুখী। গুরুত্বপূর্ণ আরো কিছু বিষয় তাঁর লেখায় উল্লেখ রয়েছে, যেগুলো বিশ্লেষণের দাবি রাখে। এ. কে. খন্দকার সাহেব আমাদের

বিমান বাহিনীর স্বপ্নদ্রষ্টা। তার নামেই কিলোফ্লাইট গঠিত হয়েছিল। তিনি এবং প্রথম অফিসার কমান্ডিং এয়ার ভাইস মার্শাল সুলতান মাহমুদ (বীর উত্তম) ও অন্যান্যদের সহযোগিতায় আমাদের বিমান বাহিনী যুদ্ধকালীন ৪৬টি অপারেশন পরিচালনা করেছিলেন। সেই পথ ধরে আজকের এই গর্বিত বিমান বাহিনী। নির্যাতিত, নিপীড়িত বাঙালি জাতির ভাগ্যে ছিল এই স্বাধীনতা অর্জন। তাই তো চূড়ান্ত বিজয় অর্জন পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তাঁর নের্তৃত্ব ছিল আমাদের সাহস ও অনুপ্রেরণার মূল উৎস।

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ
ও
জিয়ার ঘোষণা

যুদ্ধচলাকালীন স্বাধীন বাংলা সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ-এর ব্যাপক কর্মকাণ্ড ও তৎপরতা সম্পর্কে কয়েকটি কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

তিনি কলকাতার ৮ নং থিয়েটার রোডে স্বাধীন বাংলা সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে রাত দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছিলেন। নিবেদিত এই ব্যক্তিত্ব এক পোশাকে (অনেক সময় গেঞ্জি পরে) অনেক দিন কাটিয়ে দিতেন। বঙ্গবন্ধুর প্রতি ছিল তাঁর অগাধ শ্রদ্ধাবোধ। যুদ্ধকালীন ৮ মাসের মধ্যে থিয়েটার রোডের কাছে অবস্থানরত তাঁর পরিবারের সঙ্গে শুধু একবারই দেখা করতে গিয়েছিলেন। তিনি মুক্তিযোদ্ধাদেরকে খুবই ভালোবাসতেন। তিনি প্রায়ই রণাঙ্গন পরিদর্শনে যেতেন। রণাঙ্গন পরিদর্শনে আমরা তাঁর ভিতরে দেখেছি আদর্শিক দৃঢ়তা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপসহীন এবং যুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয়ের লক্ষ্যে তার দৃঢ় সংকল্প। তিনি কম সময়ের মধ্যে সবাইকে আপন করে নিতে পারতেন। রণাঙ্গনে সবাই তাকে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য করতেন। '৭১ এর ২০ শে নভেম্বর ছিল ঈদুল ফিতরের দিন। সেদিন তিনি তাঁর পরিবারের সাথে ঈদ না করে রণাঙ্গনে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করতে এসেছিলেন। আসলে রণাঙ্গনে কোথাও কোনো ঈদের আমেজ বলতে যা বোঝায়– মিষ্টি বিতরণ, নতুন কাপড় পরিধান করা, কোলাকুলি করা, সেমাই খাওয়া– এই সব এর কিছুই ছিল না। রণাঙ্গনগুলোতে কোথাও সীমিত আকারে চিনি ছাড়া সেমাই, কোথাও সাগু, কোথাও অদূরের কোনো বাজার থেকে খেজুরের গুড় ও শুকনো চিড়া কিনে চুপিসারে খাওয়া হয়েছিল। কিন্তু কারোর মধ্যে কোনো বিষণ্নতার ছাপ লক্ষ করা যায়নি। শুধু কয়েকটি রণাঙ্গনে তাদের প্রধানমন্ত্রীকে দেখে আবেগে অনেকে কেঁদে দিয়েছিল। অশ্রুভরা চোখে প্রধানমন্ত্রীও সেদিন তাদেরকে তাঁর আবেগময় কণ্ঠে সাহস ও উৎসাহ যুগিয়েছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী যুদ্ধের পুরো সময়কাল ব্যাপী শুধু রণাঙ্গন, ভারত সরকার ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধের গতি সঞ্চারের লক্ষ্যে সমন্বয় সাধন করে চলছিলেন। এর মধ্যে মুজিব বাহিনী গঠন প্রক্রিয়াসহ অন্যান্য রাজনৈতিক বিষয়ে সিদ্ধান্তে সময় ক্ষেপণ করা তিনি পছন্দ করতেন না। এমনকি তাঁর অফিসে সামরিক হেড কোয়ার্টারে যুদ্ধ পরিষদ গঠন প্রস্তাবসহ বিভিন্ন জটিল বিষয়ও এড়িয়ে চলতেন। তিনি প্রায়ই বলতেন ও বিশ্বাস করতেন যুদ্ধরত সেক্টরগুলোর সাথে সরাসরি যোগাযোগ ও সমন্বয় থাকবে ভারতীয় সেনাবাহিনী ও বি.এস.এফ এর। এর মাঝে আমি এবং সেনা সর্বাধিনায়ক সার্বিক সমন্বয় সাধন করব। এর মাঝে আর কেউ এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ বা সম্পৃক্ততা থাকার প্রয়োজন নেই। থিয়েটার রোডে অবস্থিত সামরিক হেড কোয়ার্টারের কর্মকতারা শুধু রুটিন ওয়ার্ক করবে। এছাড়াও আমাদের দলীয় এম.পি, সংগঠক, নেতারা প্রশিক্ষণের জন্য ইয়থ ক্যাম্পগুলো থেকে মুক্তিযুদ্ধ প্রশিক্ষণের জন্য যুবক বাছাইয়ে তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করবে মাত্র। সবার মাঝে থাকবে একটি সমন্বয়। এটা পর্যবেক্ষণের দায়িত্বে থাকবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও তার সহকর্মীরা। অভ্যন্তরীণ কোন্দল সৃষ্টিকারী অনেকের মধ্যে তৎকালীন স্বাধীন বাংলা সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক ছিলেন অন্যতম। তিনি দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রেও লিপ্ত ছিলেন। যুদ্ধকালীন সময়ে ভারতে বসে তৎকালীন কলকাতায় বাংলাদেশের হাই কমিশনার হোসেন আলী, পররাষ্ট্র সচিব মাহবুব আলম চাষী আর ও অন্যান্যদেরকে নিয়ে এই স্বাধীনতা যুদ্ধকে বানচাল করাসহ ও তখন থেকেই বঙ্গবন্ধুকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। মোশতাক তখন প্রস্তাব করেছিলেন– "তোমরা বঙ্গবন্ধুকে চাও, নাকি পাকিস্তানের সাথে confederation চাও।" সবাই সেদিন তাকে এক বাক্যে জানিয়ে দিয়েছিল– আমরা বঙ্গবন্ধুকেও চাই, স্বাধীনতাও চাই। এ ব্যাপারে স্বাধীন বাংলা সরকারের মধ্যে এবং সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যারা সেদিন কলকাতাসহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে দায়িত্ব পালন করছিলেন। তাদের মধ্যে কোনো প্রতিবাদ বা প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। মোশতাককে তাৎক্ষণিক মন্ত্রী পরিষদ থেকে বাদ দিয়ে কেন এই চক্রান্তের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না– এ ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ লক্ষ করা যায়নি। এমনকি স্বাধীনতাত্তোর বঙ্গবন্ধু ১০ই জানুয়ারি '৭২ দেশে ফিরে আসার পরে যুদ্ধচলাকালীন সময়ে মোশতাকের এ ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে বঙ্গবন্ধুকে অবহিত করা হয়েছে কিনা জানি না; তবে মোশতাক স্বাধীনতাত্তোর বঙ্গবন্ধুর পানি সম্পদ ও পরে বাণিজ্য মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। স্বাধীন বাংলা সরকারের প্রধানমন্ত্রী, তাঁর সহকর্মীরা ও তৎকালীন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা এর দায় এড়াতে পারেন না। মোশতাককে যদি যুদ্ধচলাকালীন সময়ে অব্যাহতি দিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া

যেত তাহলে স্বাধীনতাত্তোর বঙ্গবন্ধু হত্যা, জেলহত্যাসহ হয়তো অনেক দুর্ঘটনাও এড়ানো যেত। যুদ্ধকালীন অন্তঃকোন্দল এর বিস্তারিত বিবরণ– মুজিব বাহিনী ভেঙে যাওয়া, জাসদ ও গণবাহিনী সৃষ্টিসহ আরো অনেক অজানা তথ্য জাতির জানার অধিকার রয়েছে। যুদ্ধোত্তর এই ঘটনাগুলো স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনার ওপর বঙ্গবন্ধুর জীবদ্দশায় প্রথম আঘাত হেনেছিল। খন্দকার মোশতাক ফেডারেশনের প্রস্তাব দেওয়ার পর জাতিসংঘে যাওয়ার কর্মসূচি ছিল। তিনি যদি জাতিসংঘে যেতে পারতেন তাহলে এই কনফেডারেশনের পক্ষে তার বক্তব্য রাখতেন এমনকি আমাদের পুরো যুদ্ধের ব্যাপারে বিশ্বজনমতে একটি বড় ধরনের বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতো। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ কৌশলে তাঁর এই জাতিসংঘ সফর বাতিল করেন। আমি মনে করি প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনের এই পদক্ষেপ যথেষ্ট ছিল না। এ ব্যাপারে তাঁকে তখনও এবং পরেও খুব একটা সোচ্চার হতে আমরা দেখিনি। অথচ, মোশতাক গংরা তাঁর বিরুদ্ধে ও ষড়যন্ত্র অব্যাহত রেখেছিল। এ ব্যাপারে তাজউদ্দীন সাহেবের ব্যর্থতা রয়েছে কিনা তা ইতিহাস মূল্যায়ন করবে। আমার মনে হয় চরম অন্তঃকোন্দলের কারণে তিনি এ ব্যাপারে খুব বেশি এগুতে পারেননি।

জিয়ার ঘোষণা

জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা নিয়ে এখনও রাজনৈতিক বিতর্কের অবসান ঘটেনি। অথচ, স্বাধীনতা পরবর্তী বঙ্গবন্ধুর সাড়ে তিন বছরের জীবদ্দশায় এ নিয়ে কোনো বিতর্ক ছিল না। তাঁদের দু'জনের (বঙ্গবন্ধু ও জিয়া) অবর্তমানে অদ্যাবধি এ বিষয়ে রাজনৈতিক কাঁদা-ছোড়াছুড়ি এমন এক মাত্রায় গিয়ে পৌঁছেছে যে, এই বিতর্ক ও সমালোচনা-আলোচনার মাধ্যমে উভয় পক্ষ নিজ নিজ দলের নেতাকে সবার উপরে স্থান দিতে চায়। এটা একটি অহেতুক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রয়াস বটে। আসলে ইতিহাসে বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধুর জায়গায় থাকবেন, জিয়া জিয়ার জায়গায় থাকবেন। জিয়া কোনোদিন কোনো মূল্যায়নে বঙ্গবন্ধুর সমকক্ষে আসতে পারেন না। জিয়া বঙ্গবন্ধুর জীবদ্দশায় এবং পরেও যখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ছিলেন কোনোদিন এ ধরনের কোনো দাবিও করেননি। এমনকি বঙ্গবন্ধুর প্রতি তাঁর ক্ষোভ ও অভিমান থাকা সত্ত্বেও কোনো অশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন বলে কোনো প্রমাণ নেই। বরং আমরা দেখেছি জিয়া বঙ্গবন্ধুর আনুগত্য হয়ে সেদিন বাকশালের সদস্যপদ গ্রহণ করেছিলেন। জিয়া বঙ্গবন্ধুর সমকক্ষ না হলেও মুক্তিযোদ্ধা, সেক্টার কমান্ডার, ও বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য ইতিহাসে তাঁর জায়গায় তিনি থাকবেন। যারা সমালোচনার মাধ্যমে তাকে তুচ্ছভাবে দেখেন তারা পক্ষান্তরে বঙ্গবন্ধুর ভাবমূর্তিকেই খাটো করেন। ২৫ মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধু গ্রেপ্তার হওয়ার

পর শুরু করল পাকিস্তান হানাদার বাহিনী বাঙালি জাতির ওপর গণহত্যাসহ, চরম নিষ্ঠুর ও নির্মম নির্যাতন। তাৎক্ষণিক শুরু হয়ে গেল অবরোধ সংগ্রাম তখন পুরো জাতি ছিল দিশেহারা। ২৬ মার্চ কালুরঘাট স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে আওয়ামী লীগ নেতা হান্নানসহ কয়েকজন বেতার কর্মী স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেছিলেন। পূর্ব প্রস্তুতি ও সিদ্ধান্ত না থাকা সত্ত্বেও পুলিশ, ইপিআর, আনসার, মুজাহিদ ও সশস্ত্র বাহিনীর অনেক সদস্য নিজ নিজ অবস্থান থেকে প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। সে সময় লক্ষ লক্ষ মানুষ ভারত সীমান্ত পাড়ি দেওয়ার উদ্দেশ্যে শেষ সম্বলটুকু নিয়ে পরিবারের আবাল বৃদ্ধ বনিতা, শিশু কিশোরসহ ধাবিত হচ্ছিল সীমান্তের দিকে। সে এক করুণ চিত্র। আওয়ামী লীগের চট্টগ্রামের কিছু নেতা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেন যে, এ সময়ে যদি একজন সিনিয়র সামরিক অফিসারের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণাটি কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচার করা যেত তাহলে মানুষ অনেকটা আশ্বস্ত হবে এবং সবার মধ্যে আত্মবিশ্বাস ফিরে আসবে। বিশেষ করে পুলিশ, ইপিআর, আনসার, মুজাহিদসহ সশস্ত্র বাহিনীর প্রায় ৪৫,০০০ এর অধিক সশস্ত্র ও প্রশিক্ষিত সদস্য একটি দিক নির্দেশনা পাবে। তাই তারা একজন সিনিয়র সামরিক অফিসারের খোঁজে সেদিন প্রথমে চট্টগ্রামের ষোলশহরে যান। সেখানে ছিল ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট। এর আগে তারা ক্যাপ্টেন রফিকের সাথে দেখা করেছিলেন। ষোলশহরে অবস্থানরত ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসাররা তাদের প্রস্তাব শুনে বলেন মেজর জিয়াই হচ্ছে চট্টগ্রামে বাঙালি অফিসারদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ অফিসার। আরো বলেন – জিয়া বর্তমানে বোয়ালখালী বা পটিয়ায় ৮ম বেঙ্গলের সৈনিকদের একটি অংশের সাথে আছেন। বোয়ালখালীর কুসুম ডাঙ্গায় আওয়ামী লীগ নেতা জনাব হান্নান ও ইঞ্জিঃ মোশারফের সাথে জিয়ার সাক্ষাতে যুদ্ধসহ সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে তাদের আলাপ হয়েছিল। পরের দিন জিয়া চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা জহুর আহমেদ চৌধুরীর বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কিত প্রেরিত বার্তা পেয়ে কয়েকজন আওয়ামী লীগ নেতা ও বেতারের কয়েকজন কর্মীসহ কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রে আসেন। তিনি আওয়ামী লীগ নেতা, বেতার কর্মীদের পরামর্শ অনুযায়ী সংশোধিত আকারে চূড়ান্তভাবে বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে এ স্বাধীনতা ঘোষণা পাঠ করেন। সম্প্রতি জেনারেল সফিউল্লাহ (প্রাক্তন সেনাপ্রধান) বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে এর সত্যতা স্বীকার করেন। জিয়াউর রহমানের "I Major Zia, Provisional Commander-in-Chief of the Bangladesh Liberation Army, hereby proclaims, on behalf of our great leader Bangha Bandhu Sheikh Mujibur Rahman, the independence of Bangladesh.

I also declare, we have already framed a sovereign, legal Government under Sheikh Mujibur Rahman which pledges to function

as per law and the constitution. The new democratic Government is committed to a policy of non-alignment in international relations. It will seek friendship with all nations and strive of international peace. I appeal to all Government to mobilige public openion in their respective countries against the brutal genocide in Bangladesh.

The Government under Sheikh Mujibur Rahman is sovereign legal Government of Bangladesh and is entitled to recognition from all democratic nations of the world Joy Bangla."

উনি জয় বাংলা বলে এ ঘোষণার সমাপ্তি টানেন। বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে সেদিন জিয়ার এই স্বাধীনতার ঘোষণা পুরো জাতিকে নতুনভাবে আবার উজ্জীবিত করেছিল, বিশেষ করে পুলিশ, ইপিআর, আনসার, মুজাহিদসহ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে একটি বাড়তি অনুপ্রেরণাও সৃষ্টি করেছিল। সেদিনের জিয়ার এই ঘোষণাকে আমরা বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার ধারাবাহিকতায় দেখি। তাই বলব– কে, কখন ঘোষণা দিয়েছিলেন, টেলিফোন করেছিলেন নাকি টেলিগ্রাম করেছিলেন। কার মাধ্যমে, কোথায়, কীভাবে ঘোষণা হলো এ ঘোষণার জন্য জিয়াকে বোয়ালখালী থেকে না পটিয়া থেকে নিয়ে আসা হলো। কার নির্দেশে আনা হয়েছিল। মীমাংসিত এই বিষয়টি নিয়ে তর্ক, বিতর্ক, সমালোচনা অহেতুক।। কারণ, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঘোষণার পর ২৬ মার্চে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা ছিল একটি আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। বঙ্গবন্ধুর পক্ষের এই ঘোষণা যেহেতু একটি মীমাংসিত ও বিশ্বের কাছে স্বীকৃত বিষয় সে জন্য এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে কৃতিত্ব বা বাহবা নেওয়ার জন্য বা কাউকে খাটো করার জন্য প্রতিযোগিতা অর্থহীন বলে আমি মনে করি। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত ইতিহাসের মীমাংসিত বিষয়গুলো নিয়ে পাল্টাপাল্টি আলোচনা-সমালোচনা স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধী পক্ষকে আমাদের চেতনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়।

আমি মনে করি তারা বঙ্গবন্ধুর ভাবমূর্তিকেই খাটো করে। জিয়াউর রহমানের এ ঘোষণায় যুদ্ধকামী জনগণ, বিশেষ করে বাঙালি সৈনিক ও অফিসাররা বাড়তি একটি অনুপ্রেরণা ও উদ্দীপনা পেয়েছিল। আমি মনে করি, এ বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক কাদা-ছোড়াছুড়ির উর্ধ্বে থাকাই সমীচীন। ইতিহাসে বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধুর জায়গাই থাকবেন – জিয়া জিয়ার জায়গায় থাকবেন। বঙ্গবন্ধু ও জিয়ার জীবদ্দশায় এ ঘোষণা নিয়ে কোনোপক্ষ থেকে কোনো বিতর্ক হয়নি। কারণ, বঙ্গবন্ধু এর প্রয়োজন মনে করেননি। '৫২-র ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে দীর্ঘ মুক্তি সংগ্রাম এবং '৭১এর স্বাধীনতা যুদ্ধ দুটিরই নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। আজ যারা রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে বঙ্গবন্ধুকে বঙ্গবন্ধু বলতে দ্বিধাবোধ করে,

আমার মতে তাদের শুধু নৈতিক অবক্ষয় ঘটেনি তারা বঙ্গবন্ধুর ভাবমূর্তিকে খাটো করে দেখার পাশাপাশি জিয়াকে বঙ্গবন্ধুর সাথে তুলনামূলক বিচার করতে চায়। জিয়া জীবিত থাকলে এদের এই ধরনের আচরণ ও উক্তিকে কখনো প্রশ্রয় দিতেন না। জিয়া যতই উচ্চাভিলাষী ও দূরদর্শিতাসম্পন্ন তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অফিসার থাকুন না কেন বঙ্গবন্ধুর প্রতি তার শ্রদ্ধাবোধ ছিল যথেষ্ট। শুধু মনে লালন করছিল একটি অভিমান ও ক্ষোভ কারণ তাকে ডিঙিয়ে সফিউল্লাহকে সেনা প্রধান করার কারণে। তবু সর্বশেষ তিনি বঙ্গবন্ধুর কাছে গিয়ে স্বাক্ষর করে বাকশালের সদস্যপদ গ্রহণ করেন।পাশাপাশি আবার বলব– যারা আবার তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে জিয়া মুক্তিযোদ্ধা নয়, তিনি পাকিস্তানের এজেন্ট ছিলেন, তিনি তো সামান্য একজন মেজর ছিলেন– এধরনের উক্তি করেন এগুলো অত্যন্ত আপত্তিকর শুধু নয়, এমনকি বঙ্গবন্ধু জীবিত থাকলে তিনি এই উক্তিগুলো কখনো মেনে নিতেন না। তবে জিয়ার ক্ষমতা গ্রহণ থেকে শুরু করে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বিতর্কিত বিষয়সমূহ নিয়ে আমি এখানে বিষদ আলোচনা করতে চাই না। আমি নয় মাস স্বাধীনতা যুদ্ধের মুক্তিযোদ্ধা জিয়াকে মূল্যায়ন করেছি মাত্র। এই ধরনের অতিরঞ্জিত উক্তিগুলো যারা করেন হয়তো এদের ভুল পরামর্শে জেনারেল জিয়া, সফিউল্লাহ থেকে সিরিয়ালে এগিয়ে থাকা সত্ত্বেও সেদিন জিয়াকে বাদ দিয়ে সফিউল্লাকে সেনাপ্রধান করা হয়েছিল। জিয়া একজন বিচক্ষণ ও দূরদর্শিতাসম্পন্ন উচ্চাভিলাষী একজন অফিসার ছিলেন এটা সত্য। এই জিয়া বঙ্গবন্ধুর কাছে সরাসরি গিয়ে সেদিন বাকশালে যোগদান করেছিল। জিয়ার রাজনৈতিক অধ্যায়ের বিতর্কে না গিয়ে বলব মুক্তিযুদ্ধ সেক্টর কমান্ডার জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধু কর্তৃক "বীর উত্তম" খেতাবপ্রাপ্ত যুদ্ধের শেষলগ্নে জেডফোর্স কমান্ডার ছিলেন। আমি একটি বিষয় লক্ষ্য করেছি যে, যারা বঙ্গবন্ধুকে বঙ্গবন্ধু বলতেন, তাদের মধ্যে একটা অংশ তাদের নেতা জিয়াকে কটূক্তি করার কারণে তারা বঙ্গবন্ধুকে বঙ্গবন্ধু না বলে শেখ মুজিবুর রহমান বলে এখনও উল্লেখ করেন। এমনকি রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে অপবাদ দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না। আবার আরেক শ্রেণির মুক্তিযোদ্ধা জিয়াকে পাকিস্তানের এজেন্ট বলতেও দ্বিধাবোধ করে না। রাজনীতিতে এই শ্রেণির ব্যক্তিদের Double Standard আমাদের রাজনীতি সংস্কৃতিকে কলুষিত করে রেখেছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রাখতে হলে আমাদের এর সঠিক ইতিহাস বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে হবে। নয়তো এর সঠিক ইতিহাস না জানার কারণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার চরম ঘাটতি দেখা দেবে। চেতনা হবে তখন প্রশ্নবিদ্ধ। এই চেতনায় বৃহত্তর জাতীয় ঐক্য যদি না থাকে তাহলে একদিন আমাদের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্বও হুমকির সম্মুখীন হবে। এই চেতনাকে সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে স্বাধীনতার পক্ষের সব শক্তিগুলো দলীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে,

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ একটি বৃহত্তম ঐক্য সৃষ্টির প্রয়াস অব্যাহত রাখতে হবে। এর প্রয়াসের ঘাটতি এখনও রয়েছে। জিয়ার রাজনৈতিক অধ্যায় বিস্তারিত আলোচনা না করে একটি বিষয় উল্লেখ না করলে নয়। অভিমানি জিয়া সবসময় ঠান্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নিতেন। তার সাথে বঙ্গবন্ধুর ঘাতকদের একটি অংশের যোগাযোগ ছিল। তবে হয়তো বঙ্গবন্ধুর হত্যার ব্যাপারটি বিস্তারিত জানতেন কী না সেটা আরো বিশ্লেষণের প্রয়োজন। তবে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর সেদিন সকাল ভোরে কয়েকজন অফিসার মরহুম জেনারেল আমিন আহমেদ চৌধুরী (বীর বিক্রম)সহ জিয়ার বাসায় খবরটি যখন পৌঁছান তখন জিয়া শেভ (Shave) করছিলেন। মুখের একপাশ শেষ করে অন্যপাশ শুরু করবেন ঠিক এসময় এরা বললেন শেখ মুজিবকে মেরে ফেলা হয়েছে। তাৎক্ষণিক জিয়া ঠান্ডা মাথায় খুব গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিলেন-"দেশের ভাইস প্রেসিডেন্ট অথবা পরবর্তী সিনিয়র ব্যক্তি ক্ষমতা নিবেন।" জিয়া ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে সেদিন নাটকীয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। সেটা হয়তো তার কৌশল ছিল। তিনি হয়তো আর একটি সেনা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে মোশতাকের কাছ থেকে ক্ষমতা নেবেন এই ধরনের চিন্তা করেছিলেন।

১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধী ও বঙ্গবন্ধুর ক্ষমা প্রসঙ্গে

আমরা ১৯৫ জন পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীকে নিয়ে এখনও তর্ক-বিতর্কে/ আলোচনায়-সমালোচনায় লিপ্ত রয়েছি। এদেরকে পাকিস্তান থেকে ফেরত এনে বিচার যদি আমরা করতে পারি তাহলে জাতি আরেকটি কলঙ্ক থেকে দায়মুক্তি পাবে। তবে, ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীকে বঙ্গবন্ধু কেন ক্ষমা করলেন অথবা ক্ষমা করেননি অথবা পাকিস্তানিরা নিজেদের বিচার করার কথা ছিল বলে যারা উক্তি করেন অথবা আমাদের বর্তমানে কী করণীয় বা এ ব্যাপারে আমাদের অবস্থান কী এর একটি সঠিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন। আসলে ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীকে বঙ্গবন্ধু ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। তাই গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর এ বিষয়ের একটি সঠিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন। শারমিন আহমদের লিখিত "তাজউদ্দীন আহমদ : নেতা ও পিতা" বইয়ের ১৮০ নং পৃষ্ঠায় বিচারপতি হাবিবুর রহমানের মন্তব্য নিম্নে তুলে ধরলাম।

"বিচারপতি হাবিবুর রহমান, বঙ্গবন্ধুর অন্যান্য বক্তব্যের সাথে ২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫ ও ২৬ মার্চ ১৯৭৫ এর দুটি বক্তব্য ক্ষমা ঘোষণার প্রেক্ষিতে তুলে ধরেন। ২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫ সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী বিল পাস হওয়ার পর নতুন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'কোনো দেশের ইতিহাসে নাই বিপ্লবের পর বিপ্লবকে বাধা দিয়েছে যারা, শত্রুর সঙ্গে সহযোগিতা করেছে যারা, যারা এ দেশের মানুষকে হত্যা করেছে, তাদের কোনো দেশে, কোনো যুগে ক্ষমা করে নাই। কিন্তু আমরা করেছিলাম..... সবাইকে ক্ষমা করেছিলাম।'২৬ মার্চ ১৯৭৫ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের এক জনসভায় রাষ্ট্রপতি বললেন, 'ভায়েরা বোনেরা আমার' ,আমি চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু একটা ওয়াদা আমি রাখতে পারি নাই। জীবনে যে ওয়াদা আমি করেছি, জীবন দিয়ে হলেও সে ওয়াদা আমি পালন করেছি। আমি ওয়াদা করেছিলাম, তাদের বিচার করব। এই ওয়াদা আপনাদের পক্ষ থেকে খেলাপ করেছি, তাদের আমি বিচার করিনি। আমি ছেড়ে দিয়েছি এ জন্য যে এশিয়ায়, দুনিয়ায় আমি বন্ধুত্ব চেয়েছিলাম।"

'বাংলাদেশের মানুষ জানে কী করে ক্ষমা করতে হয়, ' ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীকে ছেড়ে দেওয়ার প্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধুর উক্তি সমন্ধে বিচারপতি হাবিবুর রহমান বলেন, ' যারা বিচার করতে পারেননি, তাঁদের মুখে ক্ষমা করার অহংকার মানায় না।'

হাবিবুর রহমান সাহেবের সেই মুহূর্তে, সে সময়ের বাংলাদেশের সার্বিক পরিস্থিতি মূল্যায়নের আলোকে তার ঐ উক্তি কতটুকু বাস্তবসম্মত এবং জাতীয় স্বার্থ, দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব সুপ্রতিষ্ঠায় কতটুকু সঠিক তা এখানে ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে।

কয়েকদিন আগে আমেরিকার মেশিগান ইউনিভার্সিটির প্রফেসার ড. দেওয়ান এই উক্তি সম্পর্কে বললেন– পুরো বিশ্বের চাপের মুখে বাংলাদেশ তখনকার বিরাজমান পরিস্থিতিতে কৌশলী ও দূরদর্শী না হলে বিশ্বে বাংলাদেশ একঘরে হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিত। আমি মনে করি বঙ্গবন্ধুর ক্ষমা করে দেওয়ার এই সিদ্ধান্তটি ছিল তৎকালীন পরিস্থিতির আলোকে সঠিক। এখানে দেখতে হবে সেদিনের সে বিরাজমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধুর আর কোনো বিকল্প ছিল কিনা? বঙ্গবন্ধু সেদিন দেশি-বিদেশি, শত্রু-মিত্র সব পক্ষ থেকে একটি অনুরোধ/ আহ্বান তথা বিশাল চাপের সম্মুখীন হয়েছিলেন। এর মধ্যে অনেকের অনেক ধরনের শর্ত ছিল। পাকিস্তানের শর্ত ছিল পাকিস্তানে আটক সাড়ে তিন লক্ষ বাঙালি তারা ফেরত দেবে না, প্রয়োজনে নানা ধরনের হিংসাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সৌদি আরব যারা আমাদেরকে তখনও স্বীকৃতি দেয়নি তারাও অনুরোধ জানাল আটক পাকিস্তানি বন্দী সৈন্য ও যুদ্ধাপরাধীদেরকে জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী ছেড়ে দেওয়া হয়। ইসলামি বিশ্বের দেশগুলোর নেতারা বিশেষ করে সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট হাফেজ আল আসাদ, মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার আল সাদাত, লিবিয়ার গাদ্দাফি প্রমুখ তারাও একই মত পোষণ করলেন। এমনকি চীন ও ইউরোপিয়ান দেশগুলো জেনেভা কনভেনশান মোতাবেক বন্দীদেরকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য একই সুরে দাবির পক্ষে সমর্থন দিতে শুরু করল। বাংলাদেশ যেন জাতিসংঘে অন্তর্ভুক্ত না হতে পারে সেজন্য ১৯৭২ সালে চীন জাতিসংঘের নিরাপত্তা কাউন্সিলে তাদের Veto power প্রয়োগ করে। এর সাথে সর্বশেষ যোগ হলো স্বাধীনতা যুদ্ধে আমাদের পরম দুই বন্ধু ভারত ও সৌভিয়েত ইউনিয়ন– এরাও চাপ সৃষ্টি করল বঙ্গবন্ধুর ওপর। এ সময়ে পাকিস্তান তাদের পরাজয়ের গ্লানির প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তাদের ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার লক্ষে চীন ও গোপনে আমেরিকার সামরিক সাহায্যে তাদের সশস্ত্র বাহিনীকে আবার ঢেলে সাজানোর কাজ শুরু করেন। অতি সহসায় তারা ভারত আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। ভারতীয় সেনাপ্রধান মানিক'শ উক্তি করে বলেছিলেন– "A defeated army will

naturally seek revenge to restore its image in the country. They will therefore want another round of hostilities for which we should be fully prepared.''(The Blood Telegram, page-332) তৎকালীন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি ১৯৭২ সালে জুন মাসে ভারতের সিমলায় ভুট্টর সাথে বৈঠকে বসেন। ভুট্ট তার মেয়ে বেনজির ভুট্টকো ও সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন। ভুট্টকে ইন্দিরা গান্ধি সেদিন তার এবং বাংলাদেশের উপরে যুদ্ধপরাধীদেরকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য বিশ্বের যে চাপ ছিল সার্বিক পরিস্থিতি মূল্যায়নে বাংলাদেশ সরকারের সম্মতি সাপেক্ষে ৯৩০০০ পাকিস্তানি সৈন্যকে ফেরত দেওয়াসহ ৫০০০ বর্গমাইল পাকিস্তানি ভূখণ্ডও (যাহা '৭১ যুদ্ধে ভারতের দখলে এসেছিল) ফেরত দেওয়ার প্রস্তাব করেন। সর্বশেষ উভয়ের সম্মতিক্রমে সিমলা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। স্বাক্ষরিত এ সিমলা চুক্তির ব্যাপারে ভারতে সেদিন যদিও মিশ্রপ্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তানের পক্ষ থেকে আরেকটি যুদ্ধ এড়ানোর জন্য ইন্দিরা গান্ধি সেদিন কৌশলগত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। বাংলাদেশ যৌথ স্বার্থে এই চুক্তির সাথে একমত হয়েছিল। Many Indians were startled by Bhutto's success at Simla, with the opposition arguing that Gandhi had lost at the megotiating table what the army had won in war. (THE BLOOD TELEGRAM, PAGEÑ 332)। এ সিমলা চুক্তি বাস্তবায়নে ইন্দিরা গান্ধি ও বঙ্গবন্ধুর ওপরে সমানভাবে চাপ সৃষ্টি হয়েছিল। এ চুক্তির ফলে আমাদের পশ্চিম পাকিস্তানে সাড়ে তিন লক্ষ বন্দী বাঙালির ফেরত আসার ভাগ্য নির্ধারিত হলো। তখন বাংলাদেশে এ সাড়ে তিন লক্ষ বন্দী বাঙালি ফিরিয়ে আনার জন্য মিছিল, মিটিং মানববন্ধন চলছে এবং এদের পক্ষে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও মানবিক সংস্থাগুলো সোচ্চার ভূমিকা পালন করছিল। সে মুহূর্তে আবার দেশের অভ্যন্তরে সর্বহারা, জাসদের গণবাহিনী, সিরাজ শিকদার গ্রুফ, তোহা গ্রুফ এদের সৃষ্ট নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি আরো চলছিল– ব্যাংক লুট, বাজার লুট, হত্যা, গুম, অস্ত্রলুটসহ বিভিন্ন অপকর্ম। ইতোমধ্যে দেশে অর্থনীতি মন্দা ও সার্বিক আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতির চরম অবনতি জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল। দেশি-বিদেশি এই চাপের মুখে দেশের ভিতরে এই পরিস্থিতি বঙ্গবন্ধুকে একা সামাল দিতে হচ্ছিল। তখনও আমরা বিশ্বের সব দেশের স্বীকৃতি পাইনি। জাতিসংঘ, ও. আই.সিসহ বিভিন্ন সংস্থার তখনও আমরা সদস্যপদ পাওয়ার অপেক্ষায়। এশিয়া, তথা পুরো বিশ্বের স্বীকৃতি অর্জন করে বিশ্ব দরবারে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করে অর্থনেতিক মুক্তির লক্ষ্যে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়াই ছিল আমাদের বাংলাদেশের লক্ষ্য। ঘর ঘুচাবেন না বিশ্ব জনমত অর্জন করবেন – এ ছিল বঙ্গবন্ধুর জন্য এক কঠিন পরীক্ষা। তাই সার্বিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণে সদ্য

স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশকে বিশ্ব দরবারে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে মাথা উঁচু করে চলার জন্য বৃহত্তম স্বার্থ বিবেচনায় অনেক সময় কৌশলগত ভূমিকা পালন করতে হয়। সে সময়ে দেশের ভিতরে অস্থির নৈরাজ্যকর এবং অতি সম্প্রতি একটি প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়, দুর্ভিক্ষ পীড়িত ও যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে তখন আরো চলছিল হিংসা বিদ্বেষ ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি। দেশের ভিতরে বিরাজমান এই সংকটময় পরিস্থিতিতে পুরো বিশ্বের অনুরোধ রক্ষায় আমার মতে বঙ্গবন্ধুর আর করণীয় বিকল্প কিছু ছিল না। যে কোনো বিষয়ের বিরুদ্ধে বলতে গেলে অনেক কিছুই বলা যায়। আমি কোনো পক্ষে না গিয়ে সেদিনের একজন দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ঐ দিনের বাস্তব পরিস্থিতি মূল্যায়নে সঠিক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

মুক্তিযোদ্ধাদের সঠিক সংজ্ঞা প্রসঙ্গে

আরেকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের এখনও সঠিক সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়নি। প্রায় সময় আমরা দেখি বিভিন্ন শ্রেণির মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে তাদের যুদ্ধকালীন নিজ নিজ ভূমিকা তুলে না ধরে যুদ্ধ সম্পর্কে অনেক সময় ঢালাওভাবে বক্তব্য দিয়ে থাকেন তাতে করে শুধু বিভ্রান্তিই সৃষ্টি হয় না, সঠিক ইতিহাস প্রকাশে অন্তরায়ও সৃষ্টি হয়। স্বাধীনতাত্তোর মুক্তিযোদ্ধাদের সংজ্ঞা নির্ধারণ না করে যে প্রক্রিয়ায় অদ্যাবধি মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রণয়নের কাজ চলছে– এই ত্রুটিপূর্ণ প্রক্রিয়া যদি আমরা একটু বাস্তবমুখী না করি তাহলে মুক্তিযোদ্ধাদের সঠিক তালিকা প্রণয়ন কোনোদিন সম্পন্ন হবে না। এর থেকে বড় কথা হচ্ছে এ ব্যাপারে স্বাধীনতা যুদ্ধের সংশ্লিষ্টদের সমন্বয়ে তালিকা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ না করা হয় তাহলে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসও একদিন হারিয়ে যাবে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ গ্রাম/ ইউনিয়ন/উপজেলা/জেলা ভিত্তিক পরিচালিত হয়নি বিধায় যুদ্ধকালীন সময়ে স্বাধীন বাংলা সরকারের অধীনে যুদ্ধের যে কাঠামো ছিল, সে কাঠামোর আঞ্চলিক নেতৃত্ব দানকারী কমান্ডার, মুক্তিযুদ্ধকালীন এম.এন.এ. এম.পি.এ, যুদ্ধকালীন রাজনৈতিক সংগঠক, মুজিব বাহিনীসহ বিভিন্ন স্বীকৃত বাহিনীর আঞ্চলিক কমান্ডার এদের সহযোগিতা নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় প্রশাসনিক উদ্যোগ এর মাধ্যমে এ কাজটি সম্পন্ন করা সম্ভব। দুঃখের সাথে লক্ষ করছি অদ্যবধি তালিকা প্রণয়নের এ কাজটি সঠিকভাবে এগুচ্ছে না, সেই জন্য এক দিকে তালিকা প্রণয়ন যেমনি জটিল হচ্ছে তেমনি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাসও দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে। তালিকা প্রণয়নের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টার সাথে সম্পৃক্ত আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও চেতনা। আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সঠিক ইতিহাস উপহার দেওয়ার মাধ্যমে এই চেতনাকে ধারণ ও লালন পালনে সর্বদা উদ্দীপ্ত রাখতে হবে। যুদ্ধচলাকালীন সময়ে সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধারা বিভিন্ন সেক্টর, বিভিন্ন গঠিত ফোর্সেস ও স্বীকৃত বাহিনীগুলোতে গেরিলা ও সম্মুখ যুদ্ধে যুদ্ধরত ছিল। এ ছাড়া আঞ্চলিকভাবে ও আমাদের অনেক

সামরিক অভিযান চলমান ছিল। এ সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সেদিন অনেকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিভিন্ন উপায়ে সাহায্য/সহযোগিতা করেছিলেন, এরাও মুক্তিযোদ্ধা। সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করতে গিয়ে অনেকে চরম নির্যাতন ও গণহত্যার স্বীকার হয়েছিলেন। এদের মধ্যে অনেকে সহযোগী মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধা রয়েছেন। এছাড়া সেদিন কূটনৈতিক/সাংবাদিক/রাজনৈতিক সংগঠক/ মুক্তিযোদ্ধা সংগঠক ও প্রশিক্ষক/খেলোয়ার /শিল্পী / স্বাধীন বাংলা বেতারের শিল্পী-কৌশলী ও সংগঠক। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষাবিদ, আমলাসহ বিভিন্ন পেশাজীবী। স্বাধীন বাংলা সরকার ও তার অধীনস্ত বিভিন্ন শ্রেণির কর্মকর্তা/কর্মচারী– এরা সবাই সেদিন নিজ নিজ অবস্থান থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধে তাদের অবদান রেখেছিলেন। এরাসহ আমরা সর্বস্তরের সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধারা একই কাতারের মুক্তিযোদ্ধা। তবে এ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়ার জন্য এবং এ যুদ্ধের চেতনাকে আরো বিকশিত করে দলমত নির্বিশেষে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সব শক্তির সমন্বয়ে একটি বৃহত্তম জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির লক্ষ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের শ্রেণিবিন্যাস করা প্রয়োজন। যেমন– সব গেরিলা/গণযোদ্ধা/বিভিন্ন বাহিনীর সদস্য/স্বীকৃত বাহিনী গুলোর সদস্য এবং যারা বিভিন্নভাবে অস্ত্র নিয়ে বিভিন্ন অপারেশনে অংশগ্রহণ করেছিলেন(স্বীকৃত ও চিহ্নিত) এরা সবাই সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা। আর যারা বিভিন্ন পর্যায়ে এ মুক্তিযুদ্ধকে গণযুদ্ধে রূপ দেওয়ার জন্য অবদান রেখেছিলেন তারাও মুক্তিযোদ্ধা। এ শ্রেণিবিন্যাসের মাধ্যমে আমরা চিহ্নিত করতে পারব সব শ্রেণির মুক্তিযোদ্ধাদেরকে। যেমন– যারা গেরিলা ও সামরিক যুদ্ধে/অভিযানে অংশগ্রহণ করেছেন তাদের নামের পাশে ব্রাকেটে লেখা থাকবে সশস্ত্র। আর বাকিদের মধ্যে যারা কূটনৈতিক ছিলেন তাদের নামের পাশে থাকবে (কূটনৈতিক)। যারা শিল্পী ছিলেন তাদের নামের পাশে থাকবে (শিল্পী)। যারা খেলোয়াড় ছিলেন তাদের নামের পাশে লিখা থাকবে (খেলোয়াড়)। আর যারা সংগঠক ছিলেন তাদের নামের পাশে লেখা থাকবে (সংগঠক)। যারা স্বাধীন বাংলা বেতারের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বে ছিলেন তাদের নামের পাশে লেখা থাকবে (স্বাধীন বাংলা বেতার)। এমনি করে সব অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধাদের নামের পাশে তার নিজ পেশার উল্লেখ থাকবে। এ কাজটি কঠিন হলেও মুক্তিযুদ্ধের সঠিক তালিকা ও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস প্রণয়নে অপরিহার্য পদক্ষেপ বলে আমি মনে করি।

বঙ্গবন্ধু হত্যার নেপথ্যে দেশি বিদেশি ষড়যন্ত্র

একটি বিষয় আমি খুব কাছ থেকে উপলব্ধি করছি যে, যারা যে সব অঞ্চলে নিজেরা গেরিলা ও সামরিক অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন আজ তাদের ঐ সব অঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধের তালিকা প্রণয়ন ও ইতিহাস লিপিবদ্ধকরণে ভূমিকা খুবই সীমিত অর্থাৎ বর্তমান প্রক্রিয়ার কারণে এদের সম্পৃক্ততা বিলুপ্তির পথে। এতে করে, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস ও চেতনা আমরা হারিয়ে ফেলেছি যা পরে খুঁজতে হবে। সেই দিন আর বেশি দূরে নয় যেদিন হয়তো আমরা সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধারা কেউই থাকব না। বিভিন্ন অঞ্চলে রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধা ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিয়ে এর সঠিক ইতিহাস সংরক্ষণে সচেষ্ট হতে হবে। আমরা অনেক সময় দেখি এ মুক্তিযুদ্ধকে অনেকে অনেক সময় ভুল মূল্যায়ন ও ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। প্রায়ই দেখি অনেকে বঙ্গবন্ধুকে তাদের বক্তব্যে শুধু দীর্ঘ মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন। তারা দীর্ঘ সংগ্রাম উল্লেখ করে ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধকে পাশ কাটিয়ে ১৬ই ডিসেম্বর শুধু বিজয় অর্জনের কথা উল্লেখ করে তাদের বক্তব্যের সমাপ্তি টানেন। এতে করে একদিকে তারা বঙ্গবন্ধুকে খাটো করেন অন্যদিকে স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং মুক্তিযোদ্ধাদেরকে অবমূল্যায়ন করেন। এটা চরম ইতিহাস বিকৃতির শামিল। কারণ, দীর্ঘ মুক্তির সংগ্রাম আর মুক্তিযুদ্ধ একই সূত্রে গাঁথা। যার নের্তৃত্ব দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। একটি কঠিন বিষয় সব সময়ে আমার চিন্তার মধ্যে ঘুরপাক খায়। সেটা হচ্ছে– ২৫ মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধু গ্রেপ্তার হওয়ার পরপর যদি পাকিস্তানিরা তাঁকে হত্যা করত সে অবস্থায় স্বাধীন বাংলা সরকার, স্বাধীনতা যুদ্ধ আমাদের বিশ্ব জনমত সৃষ্টির প্রয়াস– সব কিছু বানচাল হয়ে যাওয়ার আশঙ্ক কারণ, বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি দেখিয়ে স্বাধীন বাংলা সরকার গঠনের মাধ্যমে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার এত বড় আয়োজন সম্ভব হয়েছিল। বিপরীত মূল্যায়নে বলা যায় বঙ্গবন্ধুর নের্তৃত্ব ছাড়া(রাষ্ট্রপতি) গঠিত স্বাধীন বাংলা সরকারের ভাবমূর্তি ও গ্রহণযোগ্যতার মাত্রা অনেকাংশে হ্রাস পেত। এমনকি অন্তঃকোন্দল হয়তো দৃশ্যমান হতো। মহান আল্লাহ তা'আলার অসীম রহমত বলতে

হবে, বঙ্গবন্ধু জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সেদিন গ্রেপ্তার বরণ করে নিয়েছিলেন বলেই পুরো বিশ্বে সেদিন তার ভাবমূর্তি আরো বিকশিত হয়েছিল এবং আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতসহ বহিঃবিশ্বের সমর্থন দিন দিন জোরদার হচ্ছিল। সেদিন আমার এক সহযোদ্ধা আমাকে প্রশ্ন করেছিল – বঙ্গবন্ধু যদি ১৬ ডিসেম্বর আমাদের চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের পরে কোনো দুর্ঘটনা বা ষড়যন্ত্রের কারণে দেশে ফিরে আসতে না পারতেন তাহলে আমাদের কী হতো? আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম তোমার মনে কেন এই প্রশ্ন জাগল ? সে খুব গম্ভীরভাবে আমাকে উত্তরে বলল – স্যার এখানে দুটো বিষয় স্পষ্ট।

১। স্বাধীনতার পর যদি বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে না আসতেন তাহলে ভারতীয় সেনাবাহিনী সরাসরি কি আমাদের দেশ ছাড়ত ? হয়তো না। বঙ্গবন্ধুর বিশেষ অনুরোধে সেদিন তৎকালীন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি ভারতীয় সেনাবাহিনীকে আমাদের দেশ থেকে চলে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করেছিলেন।

২। বঙ্গবন্ধু যদি ফিরে না আসতেন তাহলে ক্ষমতা দখলকে কেন্দ্র করে আমাদের নিজেদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ শুরু হতো।

তিনি আরো বললেন – স্যার বঙ্গবন্ধু হচ্ছেন পৃথিবীর প্রথম সারির নেতাদের মধ্যে একজন। তিনি বঙ্গবন্ধুকে দক্ষিণ আফ্রিকার নেলসন ম্যান্ডেলা, কিউবার ফিদেল ক্যাস্ট্রো ও মিশরের আনোয়ার সাদাত এদের সমকক্ষ। আমি তখন তাকে বললাম– বঙ্গবন্ধুকে এদের সমকক্ষ বললেও কম বলা হয়। কারণ, এরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিশ্বে অবদান রেখেছেন যেমন নেলসন ম্যান্ডেলা বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনের নেতা ছিলেন। এবং অন্যারাও নিজ নিজ দেশে বিপ্লব ও সংস্কারে বিশাল ভূমিকা রেখেছিলেন। এদের কেউ কিন্তু কোনো নতুন রাষ্ট্র সৃষ্টি করেননি। অথচ, বঙ্গবন্ধু মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ে তথা বাঙালি সত্তার বিকাশে নের্তৃত্ব দান ছাড়াও পৃথিবীর মানচিত্রে একটি নতুন দেশ সংযোজিত করেছেন। আজও বাংলাদেশে তার এই সংগ্রামী সত্তার সঠিক মূল্যায়ন হয়নি।

গণযুদ্ধ/জনযুদ্ধ
ইন্দ্রিরা গান্ধির যুদ্ধ ঘোষণা ও
যৌথ বাহিনীর চূড়ান্ত বিজয়

আমাদের এই মহান মুক্তিযুদ্ধ এক বিশাল জনযুদ্ধের রূপ ধারণ করেছিল– এটাই বাস্তবতা। আজ অত্যন্ত পরিতাপের সাথে আমরা লক্ষ করছি যে, আমাদের এই মুক্তিযুদ্ধকে বিতর্কিত করার জন্য একটি মহল মহান মুক্তিযুদ্ধ তথা এই জনযুদ্ধকে ভিন্ন সত্তায় ভুল ব্যাখ্যা ও বিভ্রান্তিকর উক্তির মাধ্যমে খাটো করার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছেন। আমাদের এই মুক্তিযুদ্ধ কী করে বিশাল জনযুদ্ধে রূপ ধারণ করেছিল সে ব্যাপারে আমি নিম্নে সঠিক ব্যাখ্যাসহ বিস্তারিত প্রেক্ষাপট তুলে ধরার চেষ্টা করব।

আমাদের এই মহান মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছিল ২৫শে মার্চ কালোরাতে যখন পাক-হানাদার বাহিনী আমাদের ঘুমন্ত জাতির উপরে সর্বাত্মক আক্রমণ চালিয়ে গণ-হত্যা, অগ্নি সংযোগ ও নির্মম নির্যাতনের মাধ্যমে রক্তের হলি খেলা শুরু করল। বাংলাদেশের সর্বত্র শুরু হলো এদের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিরোধ যুদ্ধ। এই প্রতিরোধ যুদ্ধ ছিল আমাদের জনযুদ্ধের প্রথম ধাপ। এই প্রতিরোধ যুদ্ধ স্থায়ী হয়েছিল প্রায় দু'সপ্তাহ সময়কাল। পুরো বাংলাদেশের জনপদগুলোতে ছিল এই অত্যাচার নির্যাতন/অগ্নিসংযোগ, গণহত্যার এক বিভীষিকাময় চিত্র। (এ ব্যাপারে আমি পরবর্তীতে হানাদার বাহিনীর এই নিশংস বর্বরোচিত হত্যাযজ্ঞের চিত্র তুলে ধরব)। প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ছাত্র/জনতা/ কৃষক/ শ্রমিক ও সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য (পুলিশ, ইপিআর, আনসার, মুজাহিদ) রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সংগঠকসহ সবাই একতাবদ্ধ হয়ে স্বাধীন বাংলা সরকারের অধীনে ১১ টি সেক্টর ও বিভিন্ন আঞ্চলিক কমান্ড-এর মাধ্যমে এপ্রিলের মাঝামাঝি সময় থেকে শুরু করল পরিকল্পিত স্বাধীনতা যুদ্ধ। এটা ছিল আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ তথা জনযুদ্ধের দ্বিতীয় ধাপ।

এবার আসা যাক যুদ্ধের এই দ্বিতীয় ধাপ বিশ্লেষণে। যেখানে আমাদের পরিকল্পিত মহান এই মুক্তিযুদ্ধ ধীরে ধীরে রূপ লাভ করেছিল জনযুদ্ধে। তাই আমাদের সবাইকে জানতে হবে কী করে, কেন আমাদের এই যুদ্ধ জনযুদ্ধে রূপ

লাভ করল। আসলে এই মুক্তিযুদ্ধকে ঘিরেই স্বাধীন বাংলা সরকারের ১১টি সেক্টর তথা যুদ্ধের কাঠামো গঠন ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সহযোগিতা অর্জনে ব্যাপক তৎপরতা এর পাশাপাশি সবার সর্বাত্মক অংশগ্রহণ ও অবদানের ফলশ্রুতিতে এই যুদ্ধ রূপ লাভ করেছিল আমাদের জনযুদ্ধে/গণযুদ্ধে। তাইতো সেদিন যারা স্বজন হারিয়েছিল, ভিটা-বাড়িসহ মা-বোনের সম্ভ্রম হারিয়েছিলেন, আমাদেরকে সহযোগিতা করতে গিয়ে গণহত্যা ও নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন এরা অনেকে আবেগ-প্রবণ হয়ে তাদের সঠিক মূল্যায়নের কথা বলে থাকেন। এরা সবাই আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসের অধ্যায়ের একটি অংশ। এছাড়া ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র/ কূটনৈতিক/ রাজনীতিবিদ/ সাংবাদিক/ সংগঠক/ বিদেশি বন্ধুরাও এই যুদ্ধকে আরো গতিশীল করার জন্য নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্মরণীয় অবদান রেখেছিলেন। সর্বোপরি স্বাধীন বাংলা সরকারের সুযোগ্য নের্তৃত্বেও তৎপরতায় এই যুদ্ধের পক্ষে যে বিশ্ব জনমত সৃষ্টি হচ্ছিল, সকলের সম্মিলিত প্রয়াস ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা ও জয়ের নেশায় সেদিনের এই দৃপ্ত শপথ মুক্তিযুদ্ধকে চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের দিকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যায়। তাই বলব– সেদিনের সেই মুক্তিযুদ্ধকে ঘিরে আমাদের ত্যাগ সবারই অভিন্ন লক্ষ্য, আকাশসম ভরসা, বুক ভরা আশা ও দু'চোখ জুড়ে একই স্বপ্নে আমরা সবাই ছিলাম বিভোর। আমাদের এই মহান মুক্তিযুদ্ধকে ঘিরেই এত বড় আয়োজন, এত সব সম্ভব হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর আহ্বান ও নের্তৃত্বে। তাই এই বিশাল সামরিক গেরিলা ও সম্মুখ যুদ্ধকে খাটো করার লক্ষ্যে যারা এই জনযুদ্ধকে একটি স্বতন্ত্র সত্তায় ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা পক্ষের বৃহত্তম শক্তিগুলোর মধ্যে ঐক্যের ফাটল এমনকি বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টায় নানা ধরনের উক্তি করে তারা অবশ্যই ইতিহাসের কাঠগড়ায় কুচক্রী হিসেবে চিহ্নিত হবে।

এরা প্রায় বলে থাকে –

এক. তৎকালীন সশস্ত্র বাহিনীর পুলিশ, ইপিআর, মুজাহিদ, আনসার এই বাহিনীগুলোর সশস্ত্র যোদ্ধারাই কি যুদ্ধ করে দেশটাকে স্বাধীন করে ফেলল। বেসামরিক যোদ্ধাদের অংশগ্রহণের কথা বা অবদানের স্বীকৃতি কোথায়?

দুই. এরা বলে থাকেন– আমাদের অংশগ্রহণের কথা প্রকাশ্যে উল্লেখ না করে যুদ্ধটাকে সামরিকীকরণ করা হচ্ছে।

তিন. আরো বলে থাকেন– আমরা যারা বিভিন্নভাবে যুদ্ধ করলাম তাদের পৃথক স্বীকৃতি কোথায়?

উপরে উল্লিখিত তাদের এই উক্তিগুলো স্বাধীনতা বিরোধীদেরকে দুরভিসন্ধি ও উসকানিমূলক উক্তি করতে উৎসাহ যোগায়।

উপরে উল্লিখিত প্যারায় সমালোচনার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

প্রথমে উল্লেখ করতে চাই যে, অনেকে ১১টি সেক্টরের যুদ্ধ পরিচালনা সম্পর্কে একটা ভুল ধারণা দিয়ে থাকেন। এটা অবশ্যই উদ্দেশ্য প্রণোদিত একটি অপপ্রচার। এই জন্য যে স্বাধীন বাংলা সরকারের অধীনে ১১টি সেক্টরে পরিকল্পিত যে যুদ্ধ শুরু হলো এখানে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য ও গণযোদ্ধা/মুক্তিযোদ্ধাদেরকে পৃথকভাবে দেখার কোনো অবকাশ নেই। এখানে প্রত্যেকটি সেক্টরে প্রায় ৭০ শতাংশ ছিল গণযোদ্ধা। আর বাকি ৩০ শতাংশ ছিল সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য, ইপিআর, পুলিশ, আনসার, মুজাহিদ। এই বাহিনীর সদস্যরা পৃথক কোনো সত্তা নিয়ে পৃথক বা বিচ্ছিন্ন কোনো যুদ্ধ করেনি। সশস্ত্র বাহিনীর এই সদস্যরা ছিলেন স্বাধীন বাংলা সরকার কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভিন্ন সেক্টর ও সাব সেক্টর কমান্ডার। এছাড়া ৭০% গণযোদ্ধাদের নিয়ে গঠিত এই সেক্টরগুলোতে বিভিন্ন পর্যায়ে নের্তৃত্ব দিয়েছিল সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা। এই পুরো সেক্টরগুলো এবং বাহিনী পরিচালিত সব ধরনের যুদ্ধ সেদিন পুরো বিশ্বের কাছে গেরিলা যুদ্ধ হিসেবে সুপরিচিত ছিল। তাই এই যুদ্ধে পরিচালিত গেরিলা যুদ্ধসহ সব ধরনের অভিযান ছিল সামরিক যুদ্ধ। যুদ্ধের সময় গেরিলা অপারেশন এবং যে কোনো অভিযানকে ছোট বড় সামরিক অপারেশন হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। তাই বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধকালীন অপারেশন তথা যুদ্ধকে সামরিকীকরণ করা হচ্ছে বলে যারা উক্তি করেন, তাদের এই উক্তি সঠিক নয়। যুদ্ধের শেষ লগ্নে এই ১১টি সেক্টরের যুদ্ধ পরিচালনার মূল কাঠামো ঠিক রেখে সশস্ত্র বাহিনীর কিছু সংখ্যক বাড়তি সদস্য ইপিআর, পুলিশ, আনসার, মুজাহিদ এদের একটি অংশের সমন্বয়ে গঠন করা হলো কে, এস, জেড ফোর্স। গঠিত এই ফোর্সগুলোতেও অধিকাংশ সদস্য ছিল গণযোদ্ধা। এই গণযোদ্ধারা ছিল গ্রাম-বাংলার ছাত্র/ কৃষক/ শ্রমিক/ ক্ষেত মজুর– যাদের অনেকের একদিনের খোরাক মিলত না। তারা জানত দেশ স্বাধীন হলে এরা কোনোদিন সচিব, মন্ত্রী, শিল্পপতি, সামরিক কর্মকর্তা বা রাজনীতিবিদ হবে না। এই গণযোদ্ধারাই তথা মুক্তিযোদ্ধারাই ছিল সশস্ত্র বাহিনীর বিভিন্ন পর্যায়ের সদস্যদের নের্তৃত্বে সুসংগঠিত ও প্রশিক্ষিত গেরিলা যোদ্ধা ও সম্মুখ যোদ্ধা। সশস্ত্র বাহিনীর নের্তৃত্বদানকারী সদস্য যোদ্ধাগণ সেদিন গণযোদ্ধাদের সাথে ছিল একাকার। তাই যারা বলেন– সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য ইপিআর, পুলিশ, মুজাহিদ, আনসার এরা ছিল ২৫-৩০%। আর বাকি গণযোদ্ধারা ছিল ৭০%। এই বিভাজন বা এদেরকে একই রণাঙ্গনে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য এর নের্তৃত্বে যুদ্ধরত-অবস্থায় পৃথক পৃথকভাবে দেখা স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসকে বিকৃত করার একটা চক্রান্ত ছাড়া কিছু নয়। গণযোদ্ধাদের সাথে অংশগ্রহণকারী এই সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা এবং এই পুরো বাহিনীকে নের্তৃত্বদানকারী সশস্ত্র বাহিনীর বিভিন্ন পর্যায়ের সদস্যদেরকে যারা আজ

তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যভাবে উক্তি করে এদের সেদিনের ঝুঁকিপূর্ণ ও দুঃসাহসী ভূমিকা তথা অবদানকে হেয়প্রতিপন্ন করাই এদের লক্ষ্য। তাদের জানা উচিত এদের নেতৃত্বে গণযোদ্ধা তথা মুক্তিযোদ্ধারা শুধু বাড়তি অনুপ্রেরণাই পায়নি এর পাশাপাশি গেরিলা ও সম্মুখ যুদ্ধে নৈপুণ্য প্রদর্শনে সক্ষমতা অর্জন করেছিল। তাইতো দিন দিন সেদিন আমাদের এই যুদ্ধের গতি তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছিল। সার্বিক যুদ্ধ মূল্যায়নে দেখা যায় সশস্ত্র বাহিনী সদস্যদের এই নের্তৃত্ব ছাড়া এত কম সময়ের মধ্যে এই মুক্তিযুদ্ধ আশানুরূপ সংগঠিত হওয়া ও যুদ্ধে গতি সঞ্চার সম্ভব হতো না। এই নের্তৃত্ব ছিল তখন অপরিহার্য। শুধু সীমিত আকারে গেরিলা যুদ্ধের মধ্যে আমরা যদি সীমবদ্ধ থাকতাম তাহলে হয়তো এই যুদ্ধ অনেক দীর্ঘস্থায়ী হতো এবং সে ক্ষেত্রে ভারতীয় সামরিক সহযোগিতার মাত্রাও সীমিত থাকত। এই উপলব্ধিতে আমাদের স্বাধীন বাংলা সরকার, ভারতীয় সরকার ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর গৃহীত পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের নের্তৃত্বে গঠিত ১১ সেক্টর/ কে, এস, জেড ফোর্স/ গঠিত নৌ ও বিমান বাহিনী নিজ নিজ ক্ষেত্রে রণাঙ্গনে দিন দিন যুদ্ধের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে যৌথ বাহিনী হিসেবে অভিযান পরিচালনার প্রস্তুতি অব্যাহত রাখে। যুদ্ধের শুরুতে এপ্রিল মাসে পাকিস্তান সেনাবাহিনী সিদ্ধান্ত ছিল যে, বাঙালিরা যেন গেরিলা যুদ্ধ বা অন্য কোনো যুদ্ধে সংগঠিত না হতে পারে সেই জন্য বাংলাদেশে অবস্থানরত বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর, পুলিশসহ বাকি সশস্ত্র ফোর্সগুলোকে শুরুতেই ধ্বংস করে দিতে হবে। কারণ এরাই আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে এবং এরাই হবে আমাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের মূল চালিকা শক্তি অর্থাৎ নিউক্লিয়াস অব দ্য রেজিস্টেনস। এই জন্য যে, এরা হচ্ছে আমাদের পরিচালিত বিভিন্ন ফোর্সেস গুলোতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্য। তাই সেদিন ২৫শে মার্চ রাতে বাংলাদেশের বিভিন্ন জনপদে তাদের হত্যাযজ্ঞের পাশাপাশি একযোগে সামরিক কায়দায় আক্রমণ পরিচালনা করেছিল এবং তৎকালীন ইপিআর হেড কোয়ার্টার, পিলখানা, রাজারবাগ পুলিশ লাইন এবং সশস্ত্র বাহিনীতে বাঙালি সেনাদেরকে শুরু করেছিল নিরস্ত্রীকরণ। তাদের এই পরিকল্পনায় তারা সম্পূর্ণ সফল হতে পারেনি। তার প্রমাণ স্বরূপ আমরা দেখি পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলা সরকারের অধীনে পরিচালিত গেরিলা যুদ্ধে এই গঠিত ১১টি সেক্টরে বিভিন্ন পর্যায়ে যুদ্ধ পরিচালনা ও নের্তৃত্ব গ্রহণ করেন এই ইপিআর, পুলিশ, সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা।

Yahya's slaughter drove Bengalis to take up arms. The nucleus of the resistance was trained Bengalis serving in Pakistan's military; in units called the East Pakistan Rifles and the East Bengal Regiment; as well as police officers. Unable to stomach the crackdown, many of

these Bengalis rebelled. They became early targets for Yahya's assault. As Archer Blood remembered, the Pakistan army "deliberately set out first to destroy any Bengali units in Dacca which might have a military capability;" particularly the Bengali troops in the East Pakistan Rifles. "And so they just attacked their barracks and killed all of them that they could." Scott Butcher, the junior political officer in the U.S. consulate in Dacca, says that the Pakistan army swiftly turned on the Bengalis in their ranks: "a lot of the gunfire we heard were executions of some of those personnel. Some of these Bengalis reportedly killed their own West Pakistani officers and ambushed other army units."

এখানে আরো উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সেদিন ৯৮ জন সামরিক সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নের্তৃত্ব দিয়েছিলেন। এছাড়া গণযোদ্ধাদের থেকে প্রথম ব্যাচে ৬১জন বাঙালি ক্যাডেট ভারতের ট্রেনিং একাডেমি থেকে (মূর্তি) অফিসার্স কোর্স সমাপ্ত করে বিভিন্ন সেক্টরে যোগদান করেন। এতে করে, প্রত্যেকটি সেক্টরে লিডারশিপের গুণগত মান বৃদ্ধির মাধ্যমে রণাঙ্গনেও যুদ্ধের গতি সঞ্চারিত হয়। অথচ, ১০৩ জন সশস্ত্র বাহিনীর বাঙালি কর্মকর্তা সেদিন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বর্তমান বাংলাদেশে কর্মরত থাকা অবস্থায় মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেনি। এদের মধ্যে অনেকে আবার আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণও করেছিল। স্বাধীনতার পরবর্তীতে আবার এদের অনেকেই বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীতে পুনর্বহাল হয়েছিল। এদের পাশাপাশি স্বাধীনতা-উত্তর যারা যুদ্ধকালীন এই ৯ মাস পাকিস্তান সরকারের অধীনে চাকরি করেছেন তারাও পরে পুনর্বহাল হলেন। এছাড়া যুদ্ধের প্রায় শেষ দিন পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা রেখে ক্লাস চালু ছিল। স্বাধীনতার পরবর্তী উল্লিখিত এই শ্রেণির সদস্যরা ব্যবসা-বাণিজ্যসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অনেকেই সচিব/মন্ত্রী ও শিল্পপতি হয়েছিল। এদের খোঁজ অতীতে কেউ নেয়নি আজও অনেকেই এদের খোঁজ জানেন না। এদের একটি বিরাট অংশ অদ্যবধি, স্বাধীনতা পক্ষের শক্তির সাথে ঐকমত্য পোষণ করেন না। বিলম্বে হলেও এদের অতীত ও বর্তমান ভূমিকার উপর একটি তদন্ত রিপোর্ট সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। ২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার পরে এরা কি দালাল আইনের আওতায় আসে কিনা সেটা বিশ্লেষণের দাবি রাখে। তাই বলব– বিশ্বে সাড়া জাগানো এই মুক্তিযুদ্ধকে সামরিক সক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে আরো গতিশীল ও জোরদার ভূমিকা পালনে বিভিন্ন বাহিনী সদস্যদের এই নের্তৃত্ব ছিল অপরিহার্য। সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের নের্তৃত্বকে তুচ্ছভাবে দেখা আর এদের নেতৃত্বে প্রায় ৭০% এর অধিক গণযোদ্ধা তথা মুক্তিযোদ্ধাদের অংশগ্রহণ ও

অবদানকে যারা খাটো করে দেখেন ইতিহাস এদেরকে কোনো দিন ক্ষমা করবে না। মনে রাখতে হবে, যে জাতি তার বীরদেরকে সম্মান দেখাতে জানে না সে জাতিতে বীর জন্মগ্রহণ করে না। বীর জাতি হিসেবে আমরা বিশ্বে যেভাবে পরিচিত হয়েছি এই সম্মান আমাদেরকে অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। সেদিন আমরা গেরিলা যুদ্ধের পাশাপাশি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধের অভিযানও পরিচালিত হচ্ছিল। এতে আমাদের দিন দিন সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এই সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যাপারে ভারতীয় সেনাবাহিনী ভারতের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ক্যাম্পগুলোতে পর্যায়ক্রমে ব্যাচে ব্যাচে সামরিক প্রশিক্ষণ চালু রেখেছিলেন। আমরা জানতাম, যে কোনো এক সময় আমরা যৌথ বাহিনী হিসেবে ব্যাপক গেরিলা ও সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত হতে হবে। আমাদের এও জানতাম যে, শুধু গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে এ দেশ কখনো এত তাড়াতাড়ি স্বাধীন হবে না। ভিয়েতনাম যুদ্ধে এর পরিণতি আমরা দেখেছি। এপ্রিল মে মাসে ভারতীয় সামরিক বিশেষজ্ঞ ও কয়েকজন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তা বিশেষ করে জেনারেল অরোরা ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট অ্যান্ড ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস্ ভেঙে দিয়ে মুক্তিবাহিনীসহ্ সবাইকে এক করে শুধু গেরিলা যুদ্ধের পরিচালনার প্রস্তাব করেন। এ পর্যায়ে আমাদের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ রণাঙ্গনে ওসমানীসহ সিনিয়র সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্টদের সাথে আলাপ আলোচনার প্রেক্ষিতে এই প্রস্তাবের সাথে দ্বিমত পোষণ করে গেরিলা ও সামরিক অভিযান চলমান রাখার উদ্দেশ্যে বাড়তি ৫টি রেজিমেন্ট চেয়ে ফোর্স গঠনকরত পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধের কাঠামোর মাধ্যমে- যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব পেশ করেন। যা দিল্লি সরকার সেদিন হুবহু বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদন প্রদান করেন। দ্য ব্লাড টেলিগ্রাম বইয়ের ১০১ পৃষ্ঠায় MRS. GANDHI'S SHADOW WAR থেকে উদ্ধৃত :

The Bengali rebels more expansive ambitions than the Indian army, and pulled India along. General Aurora, as the R & AW noted, wanted to dismantle the East Pakistan Rifles and East Bengal Regiment and train their troops.— as well as new volunteers –for guerrilla warfare. But the Bengalis drilled for both insurgency and con-ventional war, seeking at least five battalions. To build up this rudi-mentary army, the Bengalis came up with a plan of what they needed from the Indian army. Gandhi's government approved this escalation: 'This scheme was approved by the highest authorities in Delhi and the Army was asked to implement it. এই অনুমোদনের আলোকে যুদ্ধের গতি আরো

বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরবর্তীতে এস, কে ও জেড ফোর্স গঠন করা হলো। এই ফোর্সগুলোর মধ্যেও একটা বড় অংশ ছিল গণযোদ্ধা। যুদ্ধের শেষ লগ্নে এসে (অক্টোবর/নভেম্বর) নৌ ও বিমান বাহিনী গঠিত হলো। এখানেও একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল গণযোদ্ধা। ১১টি সেক্টর ও এস, কে, জেড ফোর্স এবং নৌ ও বিমান বাহিনী ছাড়াও এই গেরিলা ও সামরিক যুদ্ধে আরো অংশগ্রহণে ছিলেন কাদেরিয়া ও হেমায়েত বাহিনী। (কাদের ও হেমায়েত দু'জনেই ছিলেন সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য)। যুদ্ধের শেষ লগ্নে এসে এর সাথে আরো সম্পৃক্ত হলো প্রশিক্ষিত মুজিব বাহিনী। যারা সীমিত অস্ত্র/গোলাবারুদ নিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন পয়েন্টে অনুপ্রবেশ করেছিল। অনেক ক্ষেত্রে এদের সাথে যুদ্ধরত সশস্ত্র বাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে সমন্বয় ছিল। বাংলাদেশ সরকারের অধীনে এপ্রিলের মাঝামাঝি সময় থেকে নিয়ে পর্যায়ক্রমে প্রথমে ১১টি সেক্টর গঠন এবং উপরে উল্লিখিত ফোর্সেসগুলো এবং আরো পরে বিভিন্ন বাহিনীর সমন্বয়ে যুদ্ধের যে কাঠামো গঠন করা হয়েছিল চলমান এই মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের সমগ্র এলাকাকে এই যুদ্ধের কাঠামোর অধীনে আনা হয়। তবুও বলব ১০-১৫% এলাকায় বিচ্ছিন্নভাবে কিছু সংখ্যক অপারেশন আঞ্চলিকভাবে চলছিল। যার সমন্বয় রণাঙ্গনে স্বাধীন বাংলা সরকারের অধীনস্ত বিভিন্ন পর্যায় সেক্টর অথবা ফোর্সেসগুলোর সাথে ছিল। এছাড়াও যুদ্ধের প্রায় শেষ পর্যায়ে বাংলাদেশের কিছু প্রত্যন্ত অঞ্চলে কিছু বিচ্ছিন্ন অপারেশন হয়েছিল। এগুলো সার্বিক যুদ্ধের পরিসংখ্যানের হিসেবে ২-৩% হবে। এর বাইরে স্বাধীন বাংলা সরকারের অধীনস্ত সেক্টরগুলো, স্বীকৃত বাহিনীসহ বিভিন্ন ফোর্সেসগুলো এক কথায় স্বাধীন বাংলা সরকারের গঠিত যুদ্ধের কাঠামোর বাইরে বিচ্ছিন্নভাবে আর কোনো অপারেশন পরিচালিত হয়নি। গঠিত সেক্টর ও আঞ্চলিক কমান্ড এর বাইরে কোথাও কোথাও সবাইর অজান্তে ভিন্ন ভিন্নভাবে অনেকে যুদ্ধ/অপারেশন করেছে বলে ঢালাওভাবে যারা প্রায়ই উক্তি করেন এটা অনেকটা কাল্পনিক ও ইতিহাস বিকৃতির শামিল। তবে ২৫/২৬ শে মার্চ থেকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বর্বরোচিত আক্রমণ, নির্মম নির্যাতন, অগ্নিসংযোগ, নিষ্ঠুর গণহত্যার বিরুদ্ধে জণগণের যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হয়েছিল তা এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত চলছিল। এই প্রতিরোধ যুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের আহ্বানে সাড়া দিয়ে যার যা কিছু ছিল তা নিয়ে অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানের ট্যাঙ্ক ও বিমান হামলার মুখোমুখি হয়েছিল। এই দু'সপ্তাহে পুরো বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ জনগণ প্রাণ দিয়েছিল। এই প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কৃষক/ শ্রমিক/ ছাত্র-জনতা তৎকালীন সেনাবাহিনী, ইপিআর, আনসার, মুজাহিদ সদস্যরা এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে স্বাধীন বাংলা সরকারের গঠিত যুদ্ধের কাঠামোর আওতায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর সহযোগিতায়

পরিকল্পিতভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধের দ্বিতীয় ধাপ তথা আনুষ্ঠানিকভাবে সামরিক গেরিলা ও সম্মুখ যুদ্ধের সূচনা করেন।

তাই প্রথম ধাপ প্রতিরোধ যুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেছিল এবং ভিন্ন ভিন্নভাবে নিজস্ব পরিকল্পনায় অনেক ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নভাবে বুকভরা সাহস নিয়ে জীবন বাজি রেখে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ট্যাঙ্ক ও গুলির সামনে। রক্তে রঞ্জিত করেছিল বাংলার জনপদ। এই প্রতিরোধ যুদ্ধ ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে এক বিরল ঘটনা। দ্বিতীয় ধাপ ছিল– আমাদের পরিকল্পিত গেরিলা ও সম্মুখ যুদ্ধ। যা আমি আগেই উল্লেখ করেছি। আমি আগেই বলেছি আমাদের প্রথম ধাপে এই প্রতিরোধ যুদ্ধ বিভিন্নভাবে বিভিন্ন উপায়ে জনসাধারণের অংশগ্রহণ ও সহযোগিতায় হয়েছিল। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এই যুদ্ধকে ঘিরেই সব আয়োজন, সবার সহযোগিতা, তৎপরতা, ত্যাগ, বিশ্বজনমত সৃষ্টির প্রয়াস। এই যুদ্ধকে ঘিরেই আমাদের স্বাধীন বাংলা সরকারের সার্বিক পরিকল্পনা, এই যুদ্ধকে ঘিরেই ভারতীয় সেনাবাহিনীর যৌথ অভিযানের পরিকল্পনা, এই যুদ্ধে আমাদের প্রস্তুতি ও সফলতার উপর নির্ভর করছিল তৎকালীন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি কর্তৃক ৩রা ডিসেম্বর '৭১ পাক-হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। ৩রা ডিসেম্বরের আগে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় আমরা পাকিস্তান হানাদার বাহিনীকে প্রায় সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত করে ফেলেছিলাম বিধায় ৩রা ডিসেম্বর ইন্দিরা গান্ধি যুদ্ধের ঘোষণা চূড়ান্ত করেছিলেন। এপ্রিল মে থেকে নিয়ে ৩রা ডিসেম্বরের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার জন্য ভারতীয় সেনাপ্রধান মানিক'শর কাছে কয়েক দফা মতামত চেয়েছিলেন কিন্তু তিনি প্রস্তুতির ঘাটতি ও আবহাওয়ার কারণ দেখিয়ে যুদ্ধের ঘোষণা থেকে বিরত রাখেন। এমনও (এপ্রিল-জুন) বলেছিলেন– এখন পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ করলে আমরা সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হবো।

GANDHI TOOK AN EARLY DECISION FOR WAR. "I KNEW THAT THE WAR and to come in Bangladesh, " she later told a friend. Major General Jacob-Farj-Rafael Jacob, the chief of staff of the army's Eastern Command, remembers getting marching orders at the beginning of April. "This was her orders, " he says. "Then I get a phone call from Manekshaw" — the top officer, General Sam Manekshaw, the chief of staff of the Indian army— "telling me to move in." But India's generals balked at the unfavorable conditions for combat. Jacob recalls, "I tell him, no way I told him that we were mountain divisions, we had very little transport, we had no bridges.

The military according to its top ranks, persuaded Gandhi to wait awhile. The rivers and swamps of East Pakistan were daunting terrain.

"There were a lot of tidal rivers to cross, " says Jacob. "The monsoon was about to break." If we moved in, we'd get bogged down. We need bridges and time for training. I told Manekshaw this. I sent a brief, which he read out to Mrs. Gandhi. He asked the earliest I could move, and I said the fifteenth of November. This was conveyed to Mrs. Gandhi, who was wanting us to move in immediately and she accepted that.

At the time, Manekshaw told General William Westmoreland, the U.S. Army's Chief of Staff, that the Indian military had sobered its hawkish civilian politicians, who were eagerto strike in East Pakistan. Since then, he has recounted a detailed story of military caution similar to]acob's. In Manekshaw's flavorsome and well-polished version-which has taken on a halfway mythological character in Indian military circles-in April, as the refugees flooded in, Gandhi angrily waved a telegram from the chief minister of one of the border states and, in front of her cabinet, asked him, "Can't you do something?" Manekshaw replied, "What do you want me to do?" "Go into East Pakistan, " she said. "This would mean war, " he replied. "I know, " Gandhi reportedly said. "We don't mind a war." But the general balked. "In the Bible, " he claims to have said, "it is Written that God said, 'Let there be light, and there was light." You think that by saying 'Let there be war, ' there can be a war? Are you ready for a war? I am not. 'Manekshaw says that he explained to the cabinet that the imminent monsoon would make ground operations impossible, and the air force could not provide support in awful weather. Two divisions were nowhere near East Pakistan. His armor was underfunded. China could strike in defense of Pakistan. So he recommended postponing the war until winter, when snow on the Himalayan mountain passes would freeze out Chinese troops. "If you still want me to go ahead, I will, " he reportedly told an unhappy Gandhi. "But I guarantee you a one hun- dred per cent defeat." Jagjivan Ram, the defense minister, urged him to act. He refused. Gandhi, fuming and red-faced, dismissed the cabinet, holding Manekshaw behind. He offered his resignation. In his account, he told her, "Give me another six months and I guarantee you a hun-dred per cent success" —unusually cocksure stuff for a professional soldier speaking to a civilian commander. Gandhi put him in charge. "Thank you, " he purportedly said. "I guarantee you a victory."

ভারতীয় সেনাপ্রধান সর্বশেষ ৩রা ডিসেম্বর যুদ্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্তের প্রতি সম্মতি প্রদান করেন। ইতোমধ্যে আমরা ব্যাপক গেরিলা যুদ্ধ ও সম্মুখ যুদ্ধে সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাথে যৌথ বাহিনী হিসেবে অভিযান পরিচালনায় প্রস্তুতি সম্পন্ন করি। এটা ছিল আমাদের দু'পক্ষের সমন্বয়ে গঠিত মিত্র বাহিনীর চূড়ান্ত আক্রমণের পরিকল্পনা। ভারতীয় সেনাবাহিনী আমাদের সক্ষমতা দেখে রণাঙ্গনে তাদের সহযোগিতা আরো জোরদার করে তুলেছিল। ৩রা ডিসেম্বর যুদ্ধ ঘোষণার সাথে সাথে যৌথ বাহিনীর আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। ১৬ই ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জন পর্যন্ত এই সংক্ষিপ্ত যুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর রণকৌশল ও নৈপুণ্যতার সাথে যুদ্ধরত মুক্তিবাহিনী ছিল একাকার। সহজ হয়েছিল যৌথ বাহিনীর চূড়ান্ত বিজয় অর্জন। পুরো বিশ্ব সেদিন প্রত্যক্ষ করেছিল পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণ দৃশ্য।

এখানে আমি আবার ফিরে যাচ্ছি, দ্বিতীয় ধাপে পরিকল্পিত যুদ্ধ শুরুর দিনগুলোতে। স্বাধীন বাংলা সরকারের অধীনে ১১টি সেক্টর গঠনের মাধ্যমে পরিকল্পিত গেরিলা ও সম্মুখ যুদ্ধ যখন চলছিল তখন এপ্রিল/মে '৭১ এ ইন্দিরা গান্ধি তার সেনাবাহিনীকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ ও দখলের জন্য বার বার নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। ভারতীয় সেনাবাহিনী বার বার তাদের অপারগতা জানায়।

Mrs. Gandhi's Shadow War

Indira Gandhi's loyalists today often blame the war entirely on Pakistan. K. C. Pant, a young minister of state for home affairs in 1971 who went on to become Indian defense minister, recalls, "There was no, as far as I know, no intention to provoke a war, or to create a situation where warbecame inevitable. That was not the intention at all." But in fact, Gandhi's government was planning for war from the start, and escalated toughly as the crisis wore on.

As early as April, India's government was bracing for a military onfrontation. Some Indian hawks were tempted to strike while Pakistan's rulers were still in panicky disarray Several of Gandhi's ministers demanded that the army march into East Pakistan; she was under tremendous public pressure, particularly from the Jana Sangh; and some Indian advisers were urging the government to seize this opportunity."

Just over a Week after Yahya's crackdown began, the top echelon of the Indian government—including Haksar and the foreign and

defense ministers—received a brilliant and brutal argument for war from K. Subrahmanyam. (He also published a truncated newspaper version, which scandalized Pakistan.) As the director of the Institute for Defence Studies and Analyses, an illustrious think tank funded by the defense ministry, Subrahmanyam was well launched on a career that, over six decades in public life, would make him India's most influential strategic thinker.

Subrahmanyam secretly urged the government to swiftly escalate the crisis all the way to war, establishing Indian hegemony over all of South Asia. The Bengali guerrillas, he argued, would not be able to defeat the Pakistan army, and anyway he doubted that India could avoid directly fighting Pakistan. Pakistan's "military-bureaucratic industrialist- oligarchic" rulers, he argued, might actually prefer to spark a war with India and lose, rather than face the bigger humiliation of defeat by Bengali people power. India's armed forces, he confidently predicted, would quickly win a two-front war, capturing East Pakistan while fighting hard against West Pakistan.

The world would accept India's fait accompli, he claimed. The United States had gotten away with its interventions in Guatemala and Cuba, and the Soviet Union with its in Hungary and Czechoslovakia. Despite China's bitter rivalry with India, he doubted that China would really ride to Pakistan's rescue. With Pakistan ripped apart, India would dominate South Asia. And Subrahmanyam saw the strategic uses of moralizing: if India could make "the Bangladesh genocide" its cause for war, then the superpowers—and even revolutionary Chiny—would find it hard to support Pakistan.

আমরা তখন মাত্র পরিকল্পিত গেরিলা ও সামরিক যুদ্ধ শুরুর প্রথম লগ্নে। ভারতীয় বিভিন্ন শিবিরে চলছিল আমাদের নিবিড় প্রশিক্ষণ। সেই এপ্রিল/মে তে যদি ভারতীয় সেনাবাহিনী তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ করে দখল করতে পারত আমরা যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছি বলেও দাবি জোরদার হতো না। ইতিহাস তখন হয়তো ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হতো। আর যদি আক্রমণ করে দখল করতে ব্যর্থ হতো অথবা এই যুদ্ধ যদি আরো দীর্ঘস্থায়ী হতো সেক্ষেত্রে আমাদের ভাগ্যের বিষয়টি ইতিহাসই শুধু মূল্যায়ন করবে। এই পর্যায় আমি ভারতীয় সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা ও সামরিক বিশেষজ্ঞদের এপ্রিল/ মে তে যুদ্ধে না যাওয়ার ভারতীয় সরকারকে দেওয়া মতামতকে সঠিক হয়েছে বলেই দাবি করি। তখন তড়িঘড়ি করে প্রস্তুতি ছাড়া যুদ্ধে না গিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনী আমাদেরকে প্রশিক্ষণসহ সর্বপ্রকারের সহযোগিতা দিয়ে গড়ে তুলেছিল একটি ব্যাপক গেরিলা

ও সম্মুখ যুদ্ধের জন্য। আমরা গর্বিত ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাথে চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের যুদ্ধে আমরা তাদের সহযোগিতায় রণাঙ্গনে যুদ্ধে সক্ষমতা অর্জনে আমাদের সফলতার দৃষ্টান্ত রাখতে পেরেছিলাম।

সম্প্রতি আমরা লক্ষ করেছি- অনেকের ঢালাও উদ্দেশ্য প্রণোদিত কাল্পনিক উক্তির কারণে আজ অনেকে রণাঙ্গনের সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদেরকে ডিঙিয়ে প্রথম সারির মুক্তিযোদ্ধা সেজে বসে আছেন। এদের অনেকে আবার ৯ মাসের যুদ্ধের কাহিনিকে বাদ দিয়ে মনগড়া বিশ্লেষণের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধকে অবমূল্যায়ন করে থাকেন। এরা হয়তো সহযোগী মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। তাই এলাকা ভিত্তিক রণাঙ্গনের ইতিহাস আঞ্চলিকভাবে তুলে ধরার দায়িত্ব সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের থাকা উচিত। নয়তো স্বাধীনতা যুদ্ধের সঠিক ইতিহাস একদিন হারিয়ে যাবে। আজ আমরা সেই পথে ধাবিত হচ্ছি। এটাই আমাদের ভয়ও আশঙ্কা। এ জন্য যে, এই ইতিহাস হারিয়ে গেলে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস কোনোদিন জানবে না এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনাকে ধারণ ও লালন করতে ব্যর্থ হবে। একদিন আসবে যারা ইতিহাস বিকৃতি করার চেষ্টা করবে, যারা সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের জায়গায় সহযোগী মুক্তিযোদ্ধাদের স্থান হিসেবে সঠিক ইতিহাস না জানার কারণে বিকৃত ও কাল্পনিক যুদ্ধের চিত্র তুলে ধরবে তাদেরকে অবশ্যই মুখোমুখি হতে হবে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে। '৫২র ভাষা আন্দোলন থেকে দীর্ঘ মুক্তিসংগ্রাম এর পথ ধরে আমরা '৭১ এ বঙ্গবন্ধুর নের্তৃত্বে মুক্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলাম। তাই এ প্রেক্ষাপটে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সঠিক মূল্যায়ন অব্যাহত রাখতে হবে। এই সার্বিক সামরিক গেরিলা ও সম্মুখ যুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনী (পুলিশ, ইপিআর, মুজাহিদ, আনসার) গুলোর নের্তৃত্বকে তুচ্ছ বা হালকাভাবে দেখার বা এদেরকে নিয়ে কটূক্তি করা শুধু অমার্জনীয় অপরাধই নয় এটা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে করবে বিকৃত ও প্রশ্নবিদ্ধ। কারণ, এই নের্তৃত্ব ছাড়া এই মুক্তিযুদ্ধ সশস্ত্র জনযুদ্ধের রূপ লাভ করত না। পর্যায়ক্রমে এই নের্তৃত্বে গণযোদ্ধারা তথা মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শত্রু পক্ষের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনার সক্ষমতা অর্জন করে। এই সক্ষমতা অর্জনের কারণে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাথে যৌথ বাহিনী হিসেবে দায়িত্ব পালন সম্ভব হয়েছিল। ভারতীয় সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় এরা ডিসেম্বর যুদ্ধ ঘোষণায় আগ পর্যন্ত সাড়ে ৮ মাসের যুদ্ধ পাক-হানাদার বাহিনীকে প্রায় পর্যুদস্ত করার ফলেই তৎকালীন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি ৩রা ডিসেম্বর '৭১ সালে পাক-ভারত যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। এ পর্যায়ে মূল্যায়নে দেখা যায়, ভারতীয় সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় আমাদের মুক্তিবাহিনীর সশস্ত্র যুদ্ধে এই ছিল এক বিশাল অবদান। এই যুদ্ধে ৩রা ডিসেম্বর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রায় ৪ হাজার

সৈনিক অফিসার হতাহত হয়েছিলেন। এই তুলনায় আমাদের হতাহতের সংখ্যা ছিল কয়েকগুণ বেশি। তাই বলা যায়, ৩রা ডিসেম্বর যুদ্ধ ঘোষণার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত উভয় পক্ষের এই ত্যাগ এই সশস্ত্র যুদ্ধকে চূড়ান্ত বিজয়ের লক্ষ্যে নিয়ে গিয়েছিল। ৩রা ডিসেম্বর যুদ্ধ ঘোষণার সাথে সাথে গঠিত হলো ভারতীয় সেনাবাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর সমন্বয়ে মিত্র বাহিনী। যার অধিনায়কত্বে ছিলেন ভারতীয় পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার জেনারেল অরোরা। ১৬ই ডিসেম্বর যৌথ আক্রমণে এনে দিয়েছিল আমাদের চূড়ান্ত বিজয়। (এই ব্যাপারে আমার ধারাবাহিক তথ্য পরবর্তী অধ্যায়ে রয়েছে)। অনেকে না বুঝে বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে বলে এই যুদ্ধকে সামরিকীকরণ করা হচ্ছে। আসলে পুরো বাংলাদেশ ছিল তখন রণাঙ্গন। তাই যুদ্ধচলাকালীন সময়ে যে সব গেরিলা ও সম্মুখ যুদ্ধ হয়েছে সবই ছিল সামরিক যুদ্ধ। কোথায় কার অধীনে হয়েছে সেটা ইতিহাস বিশ্লেষণেই থাকবে। এই নিয়ে বিতর্কের কোনো অবকাশ নেই। স্বাধীন বাংলা সরকারের অধীনে এপ্রিলের মাঝামাঝি সময় থেকে ১৬ই ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জন পর্যন্ত সমগ্র বাংলাদেশে এই সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালিত হচ্ছিল ভারতীয় সেনাবাহিনীর পর্যবেক্ষণ, সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে। তাই আমি আগেও বলেছি ঢালাওভাবে এই সময়ের চলমান সামরিক গেরিলা ও সম্মুখ যুদ্ধে যারা সম্পৃক্ত ছিলেন তার বাইরে কোনো কাল্পনিক যুদ্ধ আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধকে শুধু খাটো করবে না এই যুদ্ধের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাবমূর্তিকেও খাটো করবে।

তবে একটি বিষয়ে এখানে আলোকপাত না করলেই নয়। ২৫শে মার্চ রাতে যখন পাক-হানাদার বাহিনী ঘুমন্ত জাতির উপরে তাদের ট্যাঙ্ক বহর ও অত্যাধুনিক অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং সৃষ্টি করেছিল এক বিভীষিকাময় চিত্র। বাংলার বিভিন্ন জনপদ সেদিন দাউ দাউ করে জ্বলছিল। সেদিনের সেই ৭ই মার্চের ভাষণে উদ্বুদ্ধ পুরো জাতি যার যা কিছু ছিল তা নিয়ে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে জনপদগুলোতে হানাদার বাহিনীর ট্যাঙ্ক এর সামনে জীবন বাজি রেখে প্রতিরোধ সৃষ্টি করেছিল। সেই এক বিরল ঘটনা। সেদিন নির্বিচারে পুরো বাংলাদেশের জনপদগুলোতে তারা ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল। রক্তের বন্যায় ভেসে গিয়েছিল জনপদগুলো। জনপদগুলোর দু'পাশের বাড়ি ঘর, হাট-বাজারে তারা অগ্নি সংযোগ করেছিল। এই প্রতিরোধ যুদ্ধ চলছিল প্রায় এপ্রিলের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত। এই কয়েকদিনের মধ্যে শহিদ হয়েছিলেন কয়েক লক্ষ প্রতিরোধ যোদ্ধা ও তাদের স্বজনরা। শুধু ঢাকাতেই ২৫শে মার্চ রাত থেকে এক সপ্তাহ এর কম সময়ের মধ্যে প্রায় ৬ (ছয়) হাজার মানুষ হত্যা করেছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসররা। সেই হিসেবে পুরো দেশে এই এক সপ্তাহের কম সময়ের মধ্যে প্রায়

এক লক্ষ মানুষ হত্যা করেছিল পাক হানাদার বাহিনীরা। এরা আমাদের প্রতিরোধ যুদ্ধের প্রথম সারির শহিদ। The Author the Blood Telegram, (Garry .J. BASS) দ্য ব্লাড টেলিগ্রাম পৃষ্ঠা-এ নং ৭৩ এ লিখেছেন "The overall death toll was hard to calculate precisely. The whole objective of the West Pak army apparently was and is to hit hard and Terrorize population into submission, Blood wrote. Although unsure how many people had perished in Chittagong and elsewhere, he estimated that as many as six thousand had been killed in less than a week in Dacca alone.''

বিশ্বের গণমাধ্যম গুলোতে সেদিন বাংলাদেশে পাকিস্তানিদের নির্মম গণহত্যার করুণ চিত্র তুলে ধরেছিল। ঢাকা/চট্টগ্রামসহ রাস্তার দু'পাশে পড়ে আছে অসংখ্য গলিত লাশ। মাথার উপরে ঝাঁকে ঝাঁকে শকুন আর নিচে কুকুরের মধ্যে চলছিল এই লাশ ভক্ষণের যেন এক প্রতিযোগিতা। এই লাশের গন্ধে সেদিন বাংলার জনপদের পরিবেশ ভারী হয়ে উঠছিল। গণহত্যার শিকার এই শহিদদের আর্তনাদ আমরা এখনও যেন শুনতে পাই। তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তানের আর্মি কমান্ডার নর পিশাচ এ. কে নিয়াজি তার লেখা "The killing of civilians and a scorched earth policy''. তে এক পর্যায়ে নিজের দোষ স্বীকার করে নিন্দার সাথে বলেছিলেন– "A display of stark cruelty, more merciless than the massacres…..by changez {Genghis } khan ….or at Jallianwala Bagh by the British General Dyer.''

অর্থাৎ এই হত্যাযজ্ঞ চেঙ্গিস খান ও ব্রিটিশ জেনারেল ডায়ারকেও হার মানায়।

২৫ মার্চ থেকে ২৭ মার্চ পর্যন্ত পাক হানাদার বাহিনীর The Search Light"-এর *নিষ্টুরতা চিত্র–* Symon Dringe OperationVisit *তুলে ধরলেন*। Symon Dringe

(সায়মন ড্রিঞ্জ) একজন British Photo সাংবাদিক।

সাংবা্দিক। ২৫ মার্চ রাতে প্রথমে Sheraton হোটেলের ছাদ থেকে সব প্রত্যক্ষ করে ছিলেন। তখন চলছিল রাজারবাগ, পিলখানা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সর্বত্র চলছিল অগ্নিসংযোগ ও হত্যাযজ্ঞ ও গোলাগুলি। ট্যাংক বহরের আওয়াজ এর পাশাপাশি চারদিক থেকে ভেসে আসছিল শিশুসহ মা-বোনের আর্তচিৎকার তিনি অন্যান্য বিদেশি সাংবাদিক যারা ঐদিন রাত Sheraton পরে রূপসী বাংলা ঐ হোটেলে ছিলেন এবং এই দৃশ্য এরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে Casset ও ক্যামেরা বন্দী করেছিলেন। ২৬/২৭ মার্চ সব বিদেশি সাংবাদিক কে পরনের সব কাপড় খুলে তল্লাশির পর ট্রাকে ভর্তি করে নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর উদ্দেশ্যে

ঢাকা পুরনো বিমান বন্দরে নিয়ে Plane-এ উঠিয়ে দেওয়া হয়। শুধু British সাংবাদিক সায়েমন ড্রিঞ্জ লুকিয়ে ছিলেন Sheraton হোটেলে ধুপির কাপড়ের স্তূপে। তাকে এরা খুঁজে পায়নি। পরের দিন সায়মন চরম ঝুঁকি নিয়ে ঢাকার প্রায় সর্বত্র বর্বর হত্যাযজ্ঞের চিত্র ধারণ করেন। দুই দিন ধরে তিনি যে চিত্র ধারণ করেছিলেন– সেগুলো ২৮ মার্চ যখন তাকে ফেরত পাঠানোর জন্য বিমান বন্দরে নিয়ে যাওয়া হয়– ঐ চিত্রগুলো তিনি মোজাসহ শরীরের বিভিন্ন জায়গায় গোপন করে রাখেন এবং পরে সাথে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। পরে তিনি গণহত্যার শিকার সারি সারি লাশের করুণ চিত্রগুলো বিশ্বের গণমাধ্যমে প্রচার করেন। তখন পুরো বিশ্বের মানুষ প্রমাণ পেল পাক হানাদার বাহিনীর এই নৃশংস হত্যাযজ্ঞের– এতে এক নিন্দার ঝড় বয়ে গেল বিশ্বজুড়ে। সায়মন ড্রিঞ্জের কাছে আমরা থাকব চির কৃতজ্ঞ।

২৫ মার্চ রাতে "The Search Light Operation" -এর একটি নির্মম চিত্র "The Blood Tlegram" ------ বিবরণ তুলে ধরলেন। বর্বরোচিত হামলা এই প্রতিরোধ যুদ্ধে সেদিন আওয়ামী লীগ এর নের্তৃত্বে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সাধারণ কৃষক/শ্রমিক /ছাত্র জনতা। এরাই পরবর্তীতে ১১টি সেক্টরে ও বিভিন্ন বাহিনীতে গণযোদ্ধা তথা মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে যুদ্ধ করেছিলেন। সেদিন জেলায় জেলায় যে সব নেতৃবৃন্দ এই ব্যারিকেড যুদ্ধ সংগঠিত ও পরিচালনা করেছিলেন পরবর্তীতে এরাই প্রায় এলাকায় এই গণযোদ্ধাদেরকেই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তারা সেদিন স্বাধীনতার চেতনায় বিভোর হয়ে জীবন বাজি রেখে গেরিলা ও সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আমার জেলা বৃহত্তম নোয়াখালীতে (যার সাব সেক্টর কমান্ডার ছিলাম আমি নিজেই) সেদিন আমি দেখেছি ফেনীর খাজা আহম্মেদ এম.পি / নোয়াখালীর মালেক উকিল/ নুরুল হক এম.পি / কচি মিয়া এম.পি/ কালু ভাই এম.পি/ হানিফ এম.পি / খালেদ মোহাম্মদ আলী এম.পি মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ ও সংগঠনের ব্যাপারে এদের ভূমিকা ও তৎপরতা আমি দেখেছি। এদের সাথে ছিলেন আরো ছাত্রনেতা মাহমুদুর রহমান বেলায়েত। এই তৎপরতা কম বেশি তখন যুদ্ধকালীন সময়ে প্রত্যেকটি জেলাতে ছিল। বঙ্গবন্ধু সেদিন বলেছিলেন– এই সংগ্রাম সাড়ে ৭ কোটি বাঙালির সংগ্রাম। আওয়ামী লীগের নের্তৃত্বে সবাইকে নিয়ে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তুলতে হবে। এই আহ্বানের আলোকে সেদিন স্বাধীনতা বিরোধী ছাড়া সবাই একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করছিলেন। এমনকি যুদ্ধের দ্বিতীয় ধাপে এপ্রিলে যখন পরিকল্পিত যুদ্ধ শুরু হয় তখন ভারতে জননেতা আবদুল হামিদ খান ভাসানীসহ অন্যান্য বিরোধীদলীয় নেতাদের গঠিত ঐক্য স্বাধীন বাংলা সরকারের সাথে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছিল। যদিও যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে এই ঐক্য আর আমরা দেখতে পাইনি। বরং

যুদ্ধচলাকালীন সময়ে মোশতাকের নের্তৃত্বে চলছিল ষড়যন্ত্র/ দলীয় কোন্দল- (এর ব্যাখ্যা পরের অধ্যায় গুলোতে কিছুটা তুলে ধরার চেষ্টা করছি) মোশতাকে এই ষড়যন্ত্র যুদ্ধ পরবর্তী সময়েও চলছিল।

পরিতাপের সাথে বলতে হয়, এই প্রতিরোধ যুদ্ধে যারা শহিদ হয়েছিলেন, নির্যাতিত হয়েছিলেন, ভিটা-বাড়ি হারিয়েছিলেন এবং প্রতিরোধ যুদ্ধ সময় থেকে নিয়ে পরবর্তীতে বিভিন্ন সময় যারা গণহত্যার শিকার হয়েছিলেন এবং যে সব মা-বোন ইজ্জত ও সম্ভ্রম হারিয়েছিলেন আজও তাদের সঠিক মূল্যায়ন হয়নি, হয়নি সঠিক তালিকা এমনকি এই প্রতিরোধ যুদ্ধের আবেগময় এই অধ্যায় এখনও অসম্পূর্ণ। এতে একদিকে নির্যাতিতরা হয়েছেন মূল্যায়ন থেকে বঞ্চিত, অন্যদিকে নতুন প্রজন্ম এই প্রারম্ভিক যুদ্ধের বীর গাঁথা ইতিহাস ও ত্যাগ সম্পর্কে থাকবে অজানা। এই সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধ আমাদের গর্ব ও অহংকার। এই যুদ্ধকে ঘিরেই যত ত্যাগ, যত আয়োজন এবং সর্বোপরি সবাইর অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা। তাইতো এই সশস্ত্র যুদ্ধ রূপ নিয়েছিল গণযুদ্ধে/জনযুদ্ধে। এই সশস্ত্র যুদ্ধকে ঘিরে এই জনযুদ্ধ কোনো দিন সফল হতো না, যদি না বঙ্গবন্ধুর নের্তৃত্ব ও নামের উপরে এই যুদ্ধ চলমান না থাকত। তাই সর্বস্তরের সবাইর ত্যাগ ও অবদান ইতিহাস স্বীকৃত। যুদ্ধকালীন সময়ে অন্যান্যদের সহযোগিতার পাশাপাশি একটি বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন আমাদের স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পীরা। সেদিন রণাঙ্গনে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে দেশত্মবোধক গান, জল্লাদের দরবার, এম.আর. আক্তার মুকুলের চরমপত্রসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উৎসাহিত ও সাহস যুগিয়েছিলেন। সর্বোপরি করেছিলেন অনুপ্রাণিত ও উদ্দীপ্ত। এদের অবদান কালুর ঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে শুরু করে হাঁটি হাঁটি, পা পা করে অসীম ত্যাগ ও সাধনার বিনিময়ে সেদিন প্রতিষ্ঠা করেছিল এই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। এদের অনেকেই রণাঙ্গনেও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তারা রণাঙ্গন ছাড়াও সর্বস্তরের জনগণকে সব সময় রেখেছিলেন উজ্জীবিত। এদের সঠিক মূল্যায়ন আজও হয়নি। স্বাধীন বাংলা বেতারের অনুষ্ঠানগুলো আমাদের বিভিন্ন চ্যানেল গুলোতে শুধু ১৬ই ডিসেম্বর, ২৬শে মার্চ এর অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে পুরো বছরের অনুষ্ঠানমালায় অন্তর্ভুক্ত করলে আমাদের স্বাধীনতার চেতনা সর্বদা জাগ্রত থাকবে।

মুজিব হত্যা
১৫ই আগস্টের মর্মান্তিক ঘটনার প্রেক্ষাপট

স্বাধীনতার স্বপক্ষের সবাইকে এক পতাকাতলে সম্মিলিত করার বঙ্গবন্ধুর প্রয়াসকে দলের অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা ষড়যন্ত্রকারীরা সফল হতে দেয়নি। যুদ্ধের আগে এবং যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে যারা রাজনীতির নের্তৃত্ব দিয়েছিলেন, যারা কবিতা ও বিভিন্ন লেখনীর মাধ্যমে জনগণকে স্বাধীনতার দৃপ্ত মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, যারা গান গেয়ে স্বাধীনতার প্রেরণাকে উজ্জীবিত রেখেছিলেন, আর সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, কূটনীতিবিদ যারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে একনিষ্ঠ অবদান রেখেছিলেন, এছাড়া রণাঙ্গনে বাংলার দামাল ছেলেরা– যারা জীবন বাজি রেখে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং দেশের ভিতরে বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর মধ্যে যারা মুক্তিযোদ্ধাদেরকে আশ্রয়, প্রশ্রয়, খাদ্য, বস্ত্র দিয়ে সহযোগিতা করেছিল, এমনকি যুদ্ধ চলাকালীন যেসব মা ও ভাই-বোন সেদিন নিভৃতে দু'হাত তুলে আল্লাহর দরবারে মুক্তিযোদ্ধাদের ও স্বাধীনতার জন্য প্রার্থনা করেছিল সবাই সেদিন স্বাধীনতার প্রশ্নে বঙ্গবন্ধুর নের্তৃত্বে যে স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালনা হচ্ছিল সেই প্রশ্নে ঐকমত্যের ভিত্তিতে একতাবদ্ধ ছিল। যুদ্ধচলাকালীন সময়ে সর্বদলীয় সমন্বয় এক কথায় স্বাধীনতা-বিরোধীদেরকে বাদ দিলে দেখা যাবে অবশিষ্ট বৃহত্তম জনগোষ্ঠী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে স্বাধীনতার স্বপক্ষের শক্তি।

স্বাধীনতার পর পর সর্বস্তরের মুক্তিযোদ্ধা, সহযোগী মুক্তিযোদ্ধা এক কথায় স্বাধীনতার স্বপক্ষের শক্তিগুলোকে নিয়ে মুক্তিযোদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ একটি জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির প্রয়াস গ্রহণ করা হয়। শুরুতে এই প্রয়াসের বিপক্ষে কেউ ছিল না, কারণ সর্বস্তরের মুক্তিযোদ্ধারা তখন বঙ্গবন্ধুর আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিল। কিন্তু এ প্রয়াস সফল হলো না। অতি অল্প সময়ে দেখা দিল আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দল। পার্টির ভিতরে লুকিয়ে থাকা ষড়যন্ত্রকারীরা বঙ্গবন্ধুর জীবদ্দশায় ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে জয়ী হওয়ার জন্য ষড়যন্ত্রের নীল নকশা বাস্তবায়নে ছিল তৎপর, অপেক্ষায় ছিল সুযোগের। সদ্য, স্বাধীনতাপ্রাপ্ত একটি শিশু রাষ্ট্রের ছিল

অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক নানান সমস্যা। সেগুলো গুছিয়ে আনতে প্রচুর সময়ের প্রয়োজন ছিল। সেই প্রয়োজনীয় সময় উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ের কারণে তৎকালীন সরকারের ব্যর্থতার বিরুদ্ধে আওয়াজ ওঠে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে যে সরকারের ব্যর্থতা ছিল না তা নয়– অর্থনৈতিক ও আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি সে সময়ে ছিল লক্ষণীয়। কিন্তু সার্বিক মূল্যায়নে দেখা যাবে যে স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৩/৪ বছরের মধ্যে সব সমস্যা সমাধান করে অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন ছিল একটি কঠিন চ্যালেঞ্জের ব্যাপার। আমি মনে করি, সফল বা ব্যর্থ হয়েছে এ মূল্যায়নের জন্য যুদ্ধ বিধ্বস্ত একটি দেশের জন্য সরকারের যে সময়ের প্রয়োজন ছিল সেই সময় তৎকালীন সরকার পাননি। সব মিলিয়ে তৎকালীন সময়ে বিপর্যস্ত অর্থনীতি, রাজনৈতিক অস্থিরতা, মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্তি, ষড়যন্ত্রকারীদের নীল নকশা বাস্তবায়নে তৎপরতা এবং এসবের ফলশ্রুতিতে আমরা দেখলাম জাসদের আত্মপ্রকাশ এবং তাদের বিপ্লবী ভূমিকা। ১৫ আগস্ট '৭৫ বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা, মোশতাকের ক্ষমতা দখলের হীন ষড়যন্ত্র, সেনাবাহিনীর ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে অসংখ্য অভ্যুত্থান এবং পাল্টা অভ্যুত্থান। মুজিব বাহিনী থেকে গণবাহিনী ও জাসদের আত্মপ্রকাশ এবং আওয়ামী লীগের ভিতরে অভ্যন্তরীণ কন্দোল, এমনকি সেনাবাহীনিতে মুক্তিযোদ্ধাদের ১টি অংশের মধ্যে রক্ষীবাহিনী সৃষ্টি এবং এর সঠিক মূল্যায়নের অভাবের কারণে অনেকটা চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছিল। সাময়িক মূল্যায়নে দেখা যাবে যে স্বাধীনতা পরবর্তী যতগুলো অঘটন ও অভ্যুত্থান সংগঠিত হয়েছিল সবগুলো ঘটনা প্রবাহের নায়ক ও অংশগ্রহণকারীরা মুক্তিযোদ্ধা এবং আরো লক্ষণীয় এরা সবাই বঙ্গবন্ধুর নের্তৃত্বের প্রতি প্রাথমিক পর্যায়ে সম্পূর্ণ আস্থাশীল ও অনুগত ছিল। তারপরেও বলব, এদের মধ্যে অনেকে যুদ্ধকালীন সময়ে এবং পরে ক্ষমতা দখলের গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, শুধু অপেক্ষায় ছিল সময়ের ও সুযোগের।

যুদ্ধ চলাকালীন বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে এবং পরে বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্র পরিচালনার সময়ে তাঁর পরামর্শ দাতাদের অনেকের অনেকক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত ও পরামর্শ সঠিক ছিল না। এদের মধ্যে অনেকে আবার হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে এমন কিছু সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করেছিলেন যাতে বঙ্গবন্ধু বিতর্কিত হয়ে ওঠেন এবং এতে করে বিভিন্ন মহলে হিংসা ও বিদ্বেষের বীজ রোপিত হয়। স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগের একটি অংশ তাঁকে দলীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে এবং এরাই পরবর্তীতে কেউ দল ছেড়ে চলে যায়, আর বাকিরা ভিতর থেকে ষড়যন্ত্রের ফাঁদ রচনা করে। স্বাধীনতা-উত্তর ঘটনা প্রবাহে এদের ভূমিকা কারো অজানা নয়। বঙ্গবন্ধুর হত্যার পরে আওয়ামী লীগের এই নেতা-কর্মীদের ভূমিকা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তার প্রমাণ

বঙ্গবন্ধুর জীবদ্দশায় জাসদ/গণবাহিনীর আত্মপ্রকাশ ও এদের বিপ্লবী ভূমিকা এবং তাঁর সপরিবারে হত্যার পরে আওয়ামী লীগের একটা অংশের ক্ষমতা দখল/অংশীদারিত্ব এবং আরো পরবর্তীতে পূর্বে সৃষ্ট অভ্যন্তরীণ কোন্দলের ফলে অনেক নতুন নতুন ব্যক্তির নামে আওয়ামী লীগের আবির্ভাব। বঙ্গবন্ধুর হত্যার নৈপথ্যে এদের তৎকালীন কর্মকাণ্ড পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে হত্যা ষড়যন্ত্রের পরিস্থিতিও পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক শক্তি হিসেবে যোগান দিয়েছিল।

১৫ই আগস্ট : আমাদের জাতীয় জীবনের একটি বেদনাত্মক দিন

১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুর সপরিবারে হত্যার সময়কালে আমি সেনাবাহিনীতে রংপুর সেনানিবাসে ১৫তম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের দায়িত্বে ছিলাম। এর আগে কিছু সময়ের জন্য চট্টগ্রাম সেনানিবাসে ৮ম ও ১৮তম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সহ-অধিনায়কের দায়িত্বে ছিলাম এবং তারও পূর্বে স্বাধীনতার পর পর ঢাকা সেনানিবাসে প্রায় ২ বছরের অধিক কাল দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সহ-অধিনায়ক ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রভোস্ট মার্শালের দায়িত্ব পালন করি।

যুদ্ধ চলাকালীন ও যুদ্ধোত্তর সময়ে রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আগেই আমি কিছুটা আলোকপাত করেছি। তৎকালীন সামরিক বাহিনীর একজন মুক্তিযোদ্ধা অফিসার হিসেবে বঙ্গবন্ধু হত্যার নেপথ্যে আমার দৃষ্টিতে এবং আমার জানা মতে সেনাবাহিনীর ভূমিকা কিছুটা তুলে ধরার চেষ্টা করব। এর আগে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মুশতাক গংয়েরা বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ক্ষমতা দখলের উচ্চাভিলাষী এই চিন্তা ভাবনা মনে প্রাণে লালন করে আসছিল। সেদিন ভারতের মাটিতে মুশতাককে কেন্দ্র করে একটি চক্র গড়ে উঠেছিল। এদের মধ্যে তাহের উদ্দিন ঠাকুর, মাহবুবুর রহমান চাষী, হোসেন আলী (কলকাতায় তৎকালীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত) এদের নাম উল্লেখযোগ্য। এই চক্রটি সেই সময়ে স্বাধীন বাংলা সরকারের দায়িত্বে থেকেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করত। এবং নিজেদের ভিন্ন সত্তা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তখন থেকেই অভ্যন্তরীণ কোন্দলকে প্রশ্রয় দিয়ে আসে। ভারতের সক্রিয় সহযোগিতায় রণাঙ্গনে মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয় সুনিশ্চিত জেনেও মোশতাকের নের্তৃত্বে এই চক্রটি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে নিয়ে Confederation গঠনের মত প্রকাশ করেছিল এই বলে যে, আপনারা স্বাধীনতা চান, না কি শেখ সাহেবকে চান? কারণ সেদিন একটি সংবাদ বহুল প্রচারিত ছিল যে পাকিস্তানের কারাগারে শেখ সাহেবের বিচার প্রায় সমাপ্তির পথে এবং যে কোনো মুহূর্তে তাঁর ফাঁসি হয়ে যেতে পারে। ঠিক সেই সময়ে ভারতে বসে নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন মহলে মুশতাকের এই উক্তি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত একটি গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ ছিল। এমনও প্রচার

আছে যে, মোশতাক সেদিন স্বাধীন বাংলা সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী থাকার সুবাদে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে গোপনে আমেরিকাসহ বিভিন্ন দেশের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেছিল।

স্বাধীন বাংলা সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও সরকারের মূল চালিকা শক্তি জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জনাব মনসুর আলী, জনাব কামরুজ্জামানসহ অন্যান্য সহকর্মীদের সাথে পরোক্ষভাবে নিজের প্রাধান্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে নিজস্ব ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালাতেন। স্বাধীনতাত্তোর বঙ্গবন্ধুকে কেউ মোশতাকের যুদ্ধকালীন সময়ের ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত করেছিল কিনা জানি না। বঙ্গবন্ধু তাকে তাঁর সরকারের বাণিজ্য ও পরে পানি সম্পদ মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু মোশতাক তার ভিতরে লুকিয়ে রাখা ষড়যন্ত্র লালন অব্যাহত রেখেছিলেন যার বহিঃপ্রকাশ আমরা পরবর্তীতে প্রত্যক্ষ করেছি। মোশতাক যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে যে কয়েকজনকে নিয়ে চক্র গঠন করেছিলেন, যুদ্ধপরবর্তী তার এই চক্রের সদস্য সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পায়– সেই প্রমাণ আমরা পাই বঙ্গবন্ধু হত্যার পরে মোশতাকের নের্তৃত্বে গঠিত মন্ত্রী পরিষদের দিকে তাকালে।

স্বাধীনতার পরবর্তীতে এরা অভ্যন্তরীণ কোন্দলকে নানানভাবে যোগান দিচ্ছিল এবং ষড়যন্ত্রের নীল নক্শা বাস্তবায়নে একটি সময় ও সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। স্বাধীনতাত্তোর এই ষড়যন্ত্রে গভীরভাবে জড়িত ছিল সেনাবাহিনীর কিছু চাকরিরত অফিসার ও কিছু অবসরপ্রাপ্ত অফিসার। এই ঘটনাটি কোনো সামরিক অভ্যুত্থান ছিল না, কারণ ১৫ই আগস্ট রাতে পুরো বাংলাদেশ সেনাবাহিনী যখন ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল ঠিক সেই মুহূর্তে কর্নেল ফারুক, কর্নেল রশিদসহ কিছু সংখ্যক অফিসারের নের্তৃত্বে সেনাবাহিনীর মাত্র দুটি ইউনিট নৈশ প্রশিক্ষণের নামে মাঝ রাতে ঢাকা সেনানিবাস থেকে বেরিয়ে এসে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ভোর রাতের মধ্যেই একের পর এক সমস্ত অপারেশন সমাপ্ত করে।

উল্লিখিত দুটি রেজিমেন্ট ঢাকা পুরাতন বিমান বন্দরের কাছাকাছি জায়গায় প্রথম বেঙ্গল লেন্সার সমবেত হয়। সেখান থেকে একটি অংশ প্রয়োজনীয় গোলা বারুদ সংগ্রহ করে সবাই বর্তমান জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের রানওয়ের নিকটবর্তী জায়গায় গভীর রাতে সর্বশেষ ব্রিফিং ও শপথ নেওয়ার উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়। সেখানে সংশ্লিষ্ট সবাই মায়ের দুধের কসম নিয়ে কয়েকটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে যায়। এক গ্রুপ বঙ্গভবন, এক গ্রুপ রেডিও স্টেশন, এক গ্রুপ রক্ষী বাহিনীর শেরে বাংলা নগরের অবস্থান এবং অন্যরা বঙ্গবন্ধুর বাড়ি, সেরনিয়াবাদের বাড়ি ও শেখ মণির বাড়ির জন্য নির্ধারিত হয়। হত্যাযজ্ঞ পরিচালনা করার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে রাত শেষ হওয়ার ঘণ্টা খানেক আগ মুহূর্তে নিজ নিজ টার্গেটে পৌছার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। যে দুটি গ্রুপ সেরনিয়াবাত ও শেখ

মণির বাড়িতে গিয়েছিল তাদের নিকট কোনো ট্যাংক বহর ছিল না। সেরনিয়াবাতসহ প্রায় ৭ জনকে হত্যা করা হয় সেরনিয়াবাতের বাড়িতে। শেখ ফজলুল হক মণির অন্তঃস্বত্ত্বা স্ত্রীসহ তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

যে গ্রুপটি বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিল তাদের ট্যাংকও ছিল। বাড়ির নিচ তলায় বঙ্গবন্ধুর ভাই শেখ নাসের ও শেখ কামালকে হত্যা করা হয়। একজন পুলিশ অফিসারও এই হত্যার শিকার হয়েছিলেন। গোলাগুলির আওয়াজ শুনে বঙ্গবন্ধু সেনা প্রধান সফিউল্লাহকে টেলিফোন করেছিলেন। তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও সময়ের অভাবের কারণে সেনাবাহিনী বা অন্য কোনো ফোর্স সাহায্যে এগিয়ে আসেনি। এর মূল কারণ ছিল Information gap, সম্ভবত সফিউল্লাহর সাথে কথা বলার পর লাল টেলিফোনে অন্যদের সাথে যোগাযোগ করার আগেই নিচ তলায় প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দ শুনে বঙ্গবন্ধু অসীম সাহস ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামার উদ্যোগ নেন এই ধারণা করে যে হয়তো তিনি পরিস্থিতি সামাল দিতে পারবেন। কিন্তু এই ঘটনা যে কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না, ছিল এক গভীর ষড়যন্ত্রের নীল নকশা তা তিনি তখনও অনুমান করতে পারেননি। তা না হলে সিঁড়ির প্রথম ধাপে দাঁড়িয়ে এত বড় বিশ্বাস নিয়ে জিজ্ঞেস করতেন না– "তোরা কী চাস্"? কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই চাইনিজ গানের গুলি স্তব্ধ করে দিল চিরতরে ঐ বজ্র কণ্ঠস্বর। লুটিয়ে পড়লেন সিঁড়ির পরবর্তী ধাপের মধ্যে। কয়েকজন তখন ঢুকে পড়ল দোতলায় বঙ্গবন্ধুর শয়নকক্ষে। সেখানে অবস্থান করেছিলেন বেগম মুজিব তাদের ছোট শিশু সন্তান রাসেল, লেঃ শেখ জামাল এবং শেখ কামাল ও তাদের বধূদ্বয়। এরা ঢুকেই সবাই অটোমেটিক গান দিয়ে বৃষ্টির মতো গুলি করল। সে এক করুণ দৃশ্য। ক্ষণিকের মধ্যেই কক্ষে রক্তের বন্যা বয়ে গেল।

বঙ্গবন্ধু যদি দোতলা থেকে না আসতেন জেঃ সফিউল্লাহ বা অন্য কেউ যদি সংশ্লিষ্ট সবাইকে খবরটি সময়মত পৌঁছিয়ে দিত তাহলে দোতলার গেট ভেঙে ঢুকতে বেশ কিছু সময়ের ব্যাপার ছিল। এতে করে পুরো অপারেশন বিলম্বিত হতো সেই ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুকে উদ্ধারের জন্য হয়তো সেনাবাহিনী ও অন্যান্য ফোর্সগুলো এগিয়ে আসতে পারত। কারণ অপারেশন যারা করেছিল তারাও প্রায় ভোর রাতের শেষ লগ্নে গিয়ে পৌঁছেছিল। ভোরে যখন বঙ্গবন্ধু নেই– এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল তখন কিন্তু পুরো ব্যাপারটি ভিন্ন খাতে মোড় নিয়েছিল।

যে গ্রুপটি ট্যাংক বহর নিয়ে শেরে বাংলা নগর রক্ষীবাহিনীর অবস্থানে গিয়েছিল তাদের কাছে কিন্তু ট্যাংক এর গোলা ছিল না– এটা রক্ষীবাহিনী বা অন্যরা জানত না। গোলা ভর্তি ট্যাংককে মোকাবিলা করা সম্ভব নয় বলে কেউ

কাউন্টার অ্যাটাক করেনি। ট্যাংক বহরের লোকেরাও সেদিন ঝুঁকিপূর্ণ সাহসের পরিচয় দিয়েছিল।

উপরে উল্লিখিত এই গ্রুপগুলোতে ট্যাংক রেজিমেন্ট ও দ্বিতীয় ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্টের চাকরিরত অফিসারেরা ছাড়াও চাকরিচ্যুত মেজর ডালিম, ক্যাপ্টেন নূর, মেজর শাহরিয়ার ও অন্যান্যরা ঐদিন ইউনিফর্ম পরিধান করেই নের্তৃত্বে ছিল। জেনারেল সফিউল্লার সাথে বঙ্গবন্ধু শেষ কথা যে হয়েছিল– সেই প্রেক্ষিতে বলতে হয় তার অনেক কিছু করণীয় ছিল।

(ক) বঙ্গবন্ধু যেন দোতলার কক্ষ থেকে বের না হন এই পরামর্শ দিয়ে ঢাকা সেনানিবাস থেকে ৪৬ ব্রিগেড এর ট্রুপস জরুরি ভিত্তিতে মুভ করে একটি পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারত।

(খ) সফিউল্লাহ সাহেব পুলিশের আই. জি. রক্ষীবাহিনী সবার সাথে আলাপ করে শেখ সাহেবকে উদ্ধারের পরিকল্পনা নিতে পারতেন। কারণ সবকিছু কিন্তু সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলছিল। যদি কাউন্টার পদক্ষেপ সময়মত নেওয়া যেত আধ ঘণ্টা এক ঘণ্টার মধ্যে হয়তো ওদের সার্বিক পরিকল্পনা পুরো না হলেও আংশিক বানচাল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল এবং পরবর্তীতে আংশিক বানচালের মুখে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল নিয়েও বিতর্ক, গ্রুপিং দেখা দেওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। যাই হোক আমার এই মূল্যায়ন সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করবে শেষ মুহূর্তে বঙ্গবন্ধুর সাথে জেঃ সফিউল্লার যদি কথা হয়ে থাকে তার উপর ভিত্তি করে আর যদি একেবারেই কথা না হয়ে থাকে তাহলে উপরে উল্লিখিত মূল্যায়ন সঠিক নয়। যতদূর আমরা জানতাম বঙ্গবন্ধু সাথে সফিউল্লার শেষ কথা হয়েছিল– এই ব্যাপারে জেঃ সফিউল্লাহ ভালো জানবেন। সেদিন সকালেই বঙ্গবন্ধুর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগদানের কথা ছিল। সেই অনুষ্ঠানে তাঁর আর যাওয়া হলো না।

মোশতাক গংয়েরা মনে করেছিল, দেশের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি সময়ের ব্যবধানে হয়তো আরো অবনতি ঘটবে। কিন্তু জেলায় জেলায় ইতোমধ্যে যে গভর্নর নিয়োগ করা হয়েছে তারা যদি পুরোদমে দায়িত্ব পালন শুরু করে এবং ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়া সমাপ্তির মাধ্যমে এই পদ্ধতি যদি প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তাহলে সরকারের রাজনৈতিক অবস্থান আরো সুদৃঢ় হবে। সেইক্ষেত্রে সরকার উৎখাত করার পর রাজনৈতিকভাবে টিকে থাকা তাদের পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে। ১৫ই আগস্টকে সুযোগ ও সময় হিসেবে বেছে নেওয়ার পেছনে অনেক কারণের মধ্যে এটা অন্যতম বিবেচ্য বিষয় ছিল। ঐদিন সকালে রংপুর সেনানিবাসে বসে আমি রেডিওতে মেজর ডালিমের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। সে বঙ্গবন্ধু হত্যা ও ক্ষমতার পট পরিবর্তনের কথা ঘোষণা করল। যদিও সেদিন

সেনাবাহিনীর মধ্যে রক্ষীবাহিনী গঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অনেকের মনে অনেক প্রশ্ন ছিল, কিন্তু নির্মমভাবে সপরিবারে বঙ্গবন্ধু-হত্যা সেনাবাহিনী সাধারণভাবে গ্রহণ করে নিতে পারেনি। এ পর্যায়ে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসবে সেনাবাহিনীর ভূমিকা সম্পর্কে।

যেহেতু এই ঘটনার সাথে জড়িত কর্নেল ফারুক ও কর্নেল রশিদ এর অধীনস্ত ইউনিট দুটি ছাড়া ঢাকায় অবস্থানরত ৪৬ পদাতিক ব্রিগেড ও অন্যান্য ইউনিটগুলো এবং কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, রংপুর, যশোর সেনানিবাসগুলোতে অবস্থানরত বিগ্রেডগুলো অর্থাৎ এক কথায় পুরো আর্মি এই ঘটনায় জড়িত ছিল না, তাই তাৎক্ষণিকভাবে এই ঘটনার পক্ষে-বিপক্ষে অবস্থান নেওয়ার কোনো অবকাশ ছিল না। প্রত্যেকটি সেনানিবাসে নিজেদের মধ্যে Chain of command ঠিক রেখে সবাই অপেক্ষায় ছিল ঢাকা সেনানিবাসের সেনাবাহিনীর প্রধানের পরবর্তী নির্দেশের জন্য। সেই সময় প্রত্যেকটি সেনানিবাসে সর্বস্তরের সৈনিকদের মধ্যে পুরো ঘটনা ব্যাখ্যাসহ কী করণীয় এই প্রশ্নে একটা অস্থিরতা কাজ করছিল। পাশাপাশি সেনা অফিসারেরা নিজেদের মধ্যে ঐকমত্য রেখে যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় মানসিক প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তখন কিন্তু বাইরে সর্বত্র একটি থমথমে ভাব বিরাজ করছিল। সর্বস্তরের সেনা অফিসারেরা, যার যেই অভিপ্রায় মনের মধ্যে থাকুক না কেন, বিচ্ছিন্নভাবে পাল্টা কিছু করার পরিস্থিতি ও পরিবেশ তখন ছিল না কারণ সবাই ধারণা করছিল বাইরে পুরো দেশে যে কোনো মুহূর্তে একটি গৃহযুদ্ধ শুরু হতে পারে এমনকি কোথাও কোথাও বিক্ষুব্ধ জনতা সেনাবাহিনীর একটি ক্ষুদ্র অংশের অংশগ্রহণের কারণে সেনানিবাস ঘেরাও করতে পারে, এ ধারণাসহ আরো অনেক জল্পনা কল্পনা সবার মধ্যে চলছিল। এ আশংকা দেখিয়ে রংপুর সেনানিবাসে প্রতিরক্ষার জন্য বিভিন্ন ইউনিটগুলোকে সেনানিবাসের চারপাশে দায়িত্ব বণ্টন করে অবস্থান নেওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হলো। অন্যান্য সেনানিবাসেও এই পরিস্থিতিতে হয়তো একই ধরনের প্রস্তুতি ছিল। এই ধরনের প্রস্তুতির পেছনে আসল উদ্দেশ্য ছিল, মূলত সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলোর মধ্যে শৃংখলাবোধ সমুন্নত রেখে Chain of command ঠিক রাখা এবং যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় সদা প্রস্তুত থাকা এবং ইউনিটগুলোকে প্রস্তুতিতে ব্যস্ত রাখা যেন একে অন্যের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করে নিজেদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার সুযোগ না পায়। পুরো ঘটনার ব্যাপারে সেনাবাহিনীতে একটি অংশের মধ্যে কিছুটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া থাকা সত্ত্বেও দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি যেন চরম সংঘাতের দিকে ধাবিত না হয় এবং বিভিন্ন ফোর্সগুলোর মধ্যে কোনো প্রকার ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি না হয়, সে জন্য নতুন সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করার জন্য ঢাকাতে বিভিন্ন মহলের জোর তৎপরতা চলছিল। ফোর্সগুলোর মধ্যে সেই

মুহূর্তে এবং পুরো দেশের কোথাও এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের পক্ষে-বিপক্ষে কোনো বিক্ষোভ বা প্রতিবাদ মিছিল এক কথায় কোনো রাজনৈতিক তৎপরতা দেখা যায়নি। শুধু সর্বত্র একটি গম্ভীর ভাব বিরাজ করছিল। আওয়ামী লীগের অনেক নেতা ও কর্মী সাময়িকভাবে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যায়।

স্বঘোষিত নতুন সরকারের বিরুদ্ধেও কোনো রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বা কোনো প্রকার ক্ষোভ-বিক্ষোভ পরিলক্ষিত হয়নি– স্বঘোষিত নতুন সরকার যেহেতু আওয়ামী লীগের নেতাদের একটি অংশের সমন্বয়ে গঠিত সেহেতু বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে বাকিরা এর বিরুদ্ধে রাজপথে নামাকে ঝুঁকিপূর্ণ মনে করেছিল। পাশাপাশি নিজেদের পক্ষে জন সমর্থনের প্রশ্নে সন্দেহ পোষণ করছিল কারণ এই ষড়যন্ত্রকারী চক্রসহ অনেক নেতা কর্মী বঙ্গবন্ধুর আদেশের ও নির্দেশের বাইরে নিজেদের কর্মকাণ্ডের কারণে জনপ্রিয়তা হারিয়েছিল। আরও পরবর্তীতে এদের অনেকে দল ছেড়ে চলে যায়। এক কথায় সেই মুহূর্তে সঠিক রাজনৈতিক নের্তৃত্বের সঙ্কটও ছিল দলের। সেনা প্রধান মেজর জেনারেল সফিউল্লাকে মেজর ডালিমও কিছু অফিসার নিয়ে আসল প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টে সেখানে নৌ ও বিমান বাহিনী প্রধানদেরকেও আনা হলো। বেলা তখন প্রায় ৯.৩০ কি ১০.০০ টা হবে। সেখান থেকে সবাই গেলেন রেডিওতে দেশের সার্বিক পরিস্থিতি মূল্যায়নে অনিবার্য ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী সংঘাত এড়ানোর জন্য দেশের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার অভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনবাহিনী প্রধানগণ রেডিওতে গিয়ে স্বঘোষিত নতুন সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করলেন। রেডিও স্টেশনে আগে থেকে খোন্দকার মোশতাক ও তাহের উদ্দিন ঠাকুর বসা ছিলেন। এই ঘোষণার সাথে বিডিআর, পুলিশ ও রক্ষীবাহিনীর প্রতিনিধিও সামিল ছিল। ঘোষণার পর পর সাভারে রক্ষীবাহিনী সদর দপ্তরের উপরে বিমান বাহিনীর জঙ্গি বিমান False Fly করেছিল তাদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য। যদিও এই ঘোষণা বিভিন্ন বাহিনীতে অনেকের মধ্যে কিছুটা সংশয়ের সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু সেই মুহূর্তে সবার মধ্যে একতাকে সমুন্নত রেখে বিরাজমান সার্বিক পরিস্থিতির আলোকে যৌথভাবে যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবেলা সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের বিবেচ্য বিষয় হিসেবে প্রাধান্য পাচ্ছিল। সামরিক বাহিনীতে এই ঘোষণার প্রশ্নে যে একটি অংশ একমত ছিল না তার বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাই মাত্র আড়াই মাসের মাথায় খালেদ মোশাররফের নের্তৃত্বে ৩রা নভেম্বর সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে।

সেনা প্রধান জেঃ শফিউল্যাহ্ ও অন্যান্য বাহিনীর প্রধানগণ কি বিকল্প ভূমিকা পালন করতে পারতেন? এই প্রশ্ন হয়তো অনেকের মাঝে আজও থেকেই গেল। সামরিক বাহিনীতে যদিও নৈতিকভাবে সেনাবাহিনীর এই ক্ষুদ্র অংশটির নির্মম হত্যা ঘটনাকে কেউ বাহ্যিক সমর্থন দেয়নি, কিন্তু কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে তাদের

বিরুদ্ধে এই বিলম্বিত অ্যাকশান আবার হয়তো ফোর্সেসগুলোর মধ্যে এবং বাইরে জনগণের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করে চরম সংঘাতের রূপ লাভ করবে– এই আশংকায় কোনো অ্যাকশানের প্রশ্নে জোরালো মতামত/চিন্তা-ভাবনা বা কোনো প্রস্তাব ছিল না। এছাড়া ক্ষমতাসীন দলের মধ্য থেকে একটি অংশ যেহেতু ক্ষমতা দখলের ঘোষণা দিয়েছে এবং অন্য কোনো অংশের প্রতিবাদ নেই, এমনকি তৎকালীন অর্থনৈতিক মন্দাবস্থা ও রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে জনগণের মধ্যেও তেমন কোনো জোরালো প্রতিক্রিয়া লক্ষণীয় ছিল না।

সকাল ১০টার দিকে আনুগত্য ঘোষণার পরিবর্তে যদি সেনাবাহিনী কোনো বিকল্প অ্যাকশানে যেত– প্রথমত সেনাবাহিনী এক থাকত না, ফোর্সগুলোর মধ্যে গ্রুপিং হয়ে যেত। এমতাবস্থায় কোনো রাজনৈতিক সমর্থনবিহীন ও বহির্বিশ্বের কারো পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ আশির্বাদ ছাড়া যে কোনো বিকল্প অ্যাকশান ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করত যা সামাল দেওয়া দুরূহ ব্যাপার হতো। জনগণের মধ্যেও নিরাপত্তাহীনতা দেখা দিত এবং পুরো পরিস্থিতি গৃহযুদ্ধে রূপলাভ করতে পারত।

সেনাবাহিনীর অ্যাকশান এর প্রশ্নে এক না থাকার কতগুলো কারণ আগ থেকে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে কাজ করে আসছিল। স্বাধীনতার পর পর মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদেরকে দুই বছরের Antidate Seniority দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্ত পাকিস্তান ফেরত অফিসারেরা সহজে গ্রহণ করে নিতে পারেনি।

দ্বিতীয়ত জিয়া শফিউল্লাহ থেকে সিনিয়র থাকা সত্ত্বেও তাকে প্রধান না করে উপ-প্রধান করে রাখা অনেকে এটা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত হলেও মেনে নিতে পারেনি।

তৃতীয়ত রক্ষীবাহিনী গঠন নিয়ে সেনাবাহিনীতে অনেকের মধ্যে চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছিল। এই চাপা ক্ষোভের মুখে সৈনিক ও অফিসারদের মধ্যে একটি গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল এই বলে যে, গত রাতে শেখ সাহেব আর্মিকে রক্ষীবাহিনীর সাথে একত্রীকরণের নির্দেশ দিয়েছিলেন যা সেনাবাহিনী মেনে নিতে পারেনি এবং যারা জিজ্ঞেস করতে গিয়েছিল তারা বাধাগ্রস্ত হয় এবং বাড়ির রক্ষীদের সাথে গুলি বিনিময়ের এক পর্যায়ে ক্রস ফায়ারের মতো দুর্ঘটনা ঘটে। আর নেপথ্যে যেসব যুক্তি কাজ করছিল সেগুলো হচ্ছে, দেশের তৎকালীন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সেনাবাহিনীর অনেকের মতে জনগণের অনুকূলে ছিল না। এছাড়া সেনাবাহিনী অ্যাকশান নিয়ে কাউকে ক্ষমতায় বসানোর পরিবেশ পরিস্থিতি ছিল বিতর্কিত, কারণ ক্ষমতাসীন দল ইতোমধ্যেই বিভক্ত। এক অংশ ক্ষমতার দাবিদার, বাকি অংশ গোপন আশ্রয়ে। সেনাবাহিনীর মধ্যে হবে বিভক্তি, ফোর্সগুলোর মধ্যেও এর প্রভাব পড়বে। আর এককভাবে সেনাবাহিনী ক্ষমতা (মার্শাল 'ল') দখল করবে– সেই ব্যাপারে জেনারেল ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট

অফিসারদের মধ্যে ঐকমত্যের অভাব দেখা দেওয়া ছিল স্বাভাবিক। জেনারেলদের একের প্রতি অন্যের আত্মবিশ্বাসের অভাবও ছিল। উপরে উল্লিখিত কারণগুলো ছাড়াও কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা সেনা অফিসারদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করে রেখেছিল। তার মধ্যে একটি ঘটনা আমার মনে পড়ে। স্বাধীনতার পর আমি সেনাবাহিনীর PROVOST MARSHAL ছিলাম। মেজর ডালিমের সাথে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল বন্ধুসুলভ। একদিন (তারিখ মনে নেই) হঠাৎ সে এসে আমাকে বলল, গাজী গোলাম মোস্তফার (তৎকালীন আওয়ামী লীগের ত্রাণ সভাপতি) বাড়ি সে কিছু সঙ্গী নিয়ে তছনছ করে এসেছে। আমি অবাক হলাম তার এই কথা শুনে এ জন্য যে এই ডালিম প্রায়ই সময় আমাদেরকে বলত, বঙ্গবন্ধু তাকে ব্যক্তিগতভাবে চিনে, জানে এবং খুব আদর করে। সে ৩২ নং বাসায় আসা যাওয়া করে– এসব বিষয়ে প্রায়ই গল্প করত। সে ডালিম হঠাৎ শেখ সাহেবের ঘনিষ্ঠ সহচর গাজী গোলাম মোস্তফার বাড়ি তছনছ করবে কেন? যাই হোক, তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কী ব্যাপার দোস্ত, কী হয়েছিল? সে উত্তরে বলল, তোমার ভাবি লেডিস ক্লাবে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়েছিল। সেখানে এক পর্যায়ে গাজী গোলাম মোস্তফার ছেলে ও সঙ্গীরা তোমার ভাবিকে অপমান করেই ক্ষান্ত হয়নি, তার পরনের শাড়ি টেনে প্রায় খুলে ফেলার অবস্থা সৃষ্টি করেছিল।" সেনাপ্রধান সফিউল্লাও ইতোমধ্যে এসব শুনে ডালিমকে খোঁজাখুঁজি করছিলেন। বঙ্গবন্ধু সফিউল্লা সাহেবকে সব জানিয়ে অ্যাকশন নিতে বলেছিলেন। ডালিম তখন আরও উত্তেজিত ছিল, আমরা তাকে শান্ত করে বললাম। এটা আর্মির প্রেস্টিজের ব্যাপার। আমরাও চিফকে বলব বঙ্গবন্ধুর সাথে আলাপ করে একটা সুষ্ঠু বিচার করতে। পরবর্তীতে ডালিম গংদেরকে সেনাবাহিনী থেকে বিদায় নিতে হলো। দেখা যাচ্ছে যে ঐ বিদায়ের পর যে চাপা ক্ষোভ তাদের মনের মধ্যে ছিল তার কারণে তারা লে. কর্নেল ফারুক ও কর্নেল রশিদ (চাকরিরত) গংদের সাথে পরে গভীর ষড়যন্ত্রে জড়িত হলো। প্রশাসনের ভিতরে-বাইরে ছোটখাটো এই ধরনের আরও অনেক ঘটনা দেশের মধ্যে ঘটছিল। অনেক ক্ষেত্রে হয়তো অনেক ঘটনা বঙ্গবন্ধু নিজেও জানতেন না। কিন্তু বিভিন্ন মহলে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছিল।

১৫ই আগস্টের ঘটনার প্রায় পর পর সূর্যোদয়ের মুহূর্তে পরিস্থিতি আলোচনার জন্য জেনারেল জিয়ার বাসায় গিয়েছিলেন মেজর গাফফার বীর উত্তম, মেজর হাফিজ বীর বিক্রম ও মেজর সাখাওয়াত। তিনি মাত্র কিছুক্ষণ আগে সেভ সেরে নিয়ে সাদা পায়জামা পাঞ্জাবি পরিধান করে ড্রয়িং রুমে পায়চারি করছিলেন। যখন জিয়াকে ঘটনা জানানো হলো, মনে হলো যে তিনি আগ থেকেই ঘটনা জানতেন। তিনি খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে ঠাণ্ডা মাথায় এদেরকে উত্তরে বললেন

"দেশের সংবিধান আছে প্রয়োজনে পরবর্তীজন ক্ষমতায় আসবে।" ইঙ্গিতে বুঝালেন, আমাদের অতিরিক্ত কোনো ভূমিকা পালনের অবকাশ নেই, সবকিছু স্বাভাবিক গতিতেই হবে।

সার্বিক পরিস্থিতি মূল্যায়নে স্বীকার করতে হবে যদিও হয়তো ঘটনার বিরুদ্ধে কোনো অ্যাকশন নেওয়ার অনুকূল পরিবেশ তখন ছিল না কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে মোশতাকের ক্ষমতা দখলের এই অবৈধ ও অস্বাভাবিক প্রক্রিয়ার পক্ষে জনগণ ছিল। দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল এবং দলের ভিতরে ঘাপটি মেরে বসে থাকা মোশতাক গংদের কারণেই সৃষ্টি হয়েছিল উপরে উল্লিখিত দেশের পরিবেশ পরিস্থিতি। বঙ্গবন্ধু নিজেও বলতেন "আমাকে আপনারা কিছু সোনার মানুষ দিন, আমি আপনাদেরকে সোনার বাংলা দেব। আমার চারদিকে চাটুকারের দল, যা-ই বিদেশ থেকে ভিক্ষা করে আনা হয় তা এরাই শেষ করে ফেলে।" তিনিও এক পর্যায়ে এই ষড়যন্ত্রকারীদের ব্যাপারে সজাগ হয়েছিলেন। যদিও এদের বৃহত্তম অংশ নানানভাবে দল থেকে পর্যায়ক্রমে চলে যায় কিন্তু মূলত এদের বাড়াবাড়ির কারণে ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে নির্মমভাবে সপরিবারে জীবন দিতে হলো বঙ্গবন্ধুকেই।

তৎকালীন দেশের অর্থনৈতিক ও আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কারণে জনগণ যে নারাজ ছিল সেটা আসলে সাময়িক সমস্যা ছিল, সময়ের ব্যবধানে সেগুলো হয়তো সমাধান হয়ে যেত। যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের জনগণ দ্রুত অর্থনৈতিক সামাজিক পরিবর্তন প্রত্যাশা করে আসছিল। মোশতাক গংয়েরা সময় ও সুযোগের সদ্ব্যবহার করে এই হীন চক্রান্তের মাধ্যমে সেনাবাহিনীসহ পুরো জাতিকে আচমকা কঠিন পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছিল। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ের এই চক্রের কার্যকলাপ স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর কাছে যদি যথাযথভাবে তুলে ধরা হতো তাহলে এর মূল্যায়ন করে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেত। মুজিব বাহিনীর ভিতরে একটি উল্লেখযোগ্য অংশের কার্যকলাপ যদি সতর্কতার সাথে নিয়ন্ত্রণে রাখা যেত (যার থেকে পরে গণবাহিনী/জাসদ আত্মপ্রকাশ করল) এবং সার্বিকভাবে ষড়যন্ত্রকারীদেরকে চিহ্নিত করে দলের মধ্যে সময়মতো যদি শুদ্ধি অভিযান চালিয়ে দলকে ঢেলে সাজানো হতো এবং সেনাবাহিনীর মধ্যে সমস্যাগুলো আগ থেকেই সমাধান করে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করা হতো। সর্বোপরি স্বাধীনতার স্বপক্ষের শক্তিগুলো ষড়যন্ত্র ও বাড়াবাড়ির ঊর্ধ্বে এক থাকত এবং এর পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু যদি সরল মনে সবাইকে বিশ্বাস না করে কঠিন হাতে সব মোকাবেলা করতেন, তাহলে হয়তো এই নির্মম ঘটনা ঘটত না।

সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে মোশতাক আওয়ামী লীগ এম. পি ও অন্যান্যদের বঙ্গভবনে যে সভা ডেকেছিলেন সেখানে অনেকেই উপস্থিত হয়েছিলেন। কারা

কারা ছিলেন, কেন ছিলেন, সেই মূল্যায়ন আওয়ামী লীগের মধ্যে হয়েছিল কিনা জানি না, তবে মোশতাক চেয়েছিলেন আওয়ামী লীগের একটি বৃহত্তম অংশকে তার পক্ষে নিয়ে আসা এবং আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক শক্তিকে আরও দুর্বল করে দেয়া। মোশতাক গংয়েরা বঙ্গভবনে বসে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক পরিবর্তনের চাইতে নিজেদের ক্ষমতা কুক্ষিগত করে আরো পাকাপোক্ত ও মজবুত করার কাজে বেশি ব্যস্ত ছিলেন। নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী সিভিল প্রশাসনে পরিবর্তন আনা এবং সুবিধা অনুযায়ী নিত্য নতুন ফরমান জারি করছিলেন। নতুন টুপির রাজনীতিও তিনি চালু করলেন।

৩রা নভেম্বর : অপারেশন প্যান্থার ও খালেদ হত্যা

সেনাবাহিনীতে জেঃ জিয়াকে নতুন সেনাপ্রধান করে প্রকৃতপক্ষে বঙ্গভবনে মোশতাকের সাথে অবস্থানরত মেজর কর্নেলগণের অধীনে রাখা হলো তাদের কথা মোতাবেক সেনাবাহিনীতেও পরিবর্তন আনতে হবে– এই ধরনের একটি জোর উদ্যোগ তাদের মধ্যে তখন ছিল। জিয়া প্রথম নতুন সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেছিলেন কিন্তু পরবর্তীতে তাদের বাড়াবাড়ি খুব একটা পছন্দ করছিলেন না। সেনাবাহিনীতেও এ নিয়ে ক্ষোভ বৃদ্ধি পেল। ঘটনায় জড়িত মেজর কর্নেলগণ বঙ্গভবনে বসে সিভিল প্রশাসনেও হস্তক্ষেপ শুরু করেছিল। সেনাবাহিনীর কয়েকজন সিনিয়র অফিসার জেনারেল জিয়াকে এই সম্পর্কে অবহিত করলে উনি বলছিলেন "Give me Time, I shall take action." তখন অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি সময়। খালেদ মোশাররফের নের্তৃত্বে এই অফিসারেরা যেহেতু জেঃ জিয়াকে এদের সম্পর্কে অভিযোগ দিয়ে ফেলেছেন এবং জিয়া সময় চেয়েছেন, খালেদ গংয়েরা মনে করলেন এখন আর সময় দিলে হয়তো আমাদের বিরুদ্ধেই অ্যাকশন শুরু হবে। কারণ আমাদের উদ্দেশ্য জানাজানি হয়ে গেছে। আমাদের নিজেদেরকে OFFENSIVE হতে হবে। এমনিতেই খালেদদের একটি অংশ আগে থেকেই সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। এবার সবাই মিলে উপরে উল্লিখিত কারণে সিদ্ধান্ত নিল, ৩রা নভেম্বর ১৯৭৫ ভোর রাতেই Operation "PANTHER" কার্যকরী করবে অর্থাৎ সামরিক অভ্যুত্থান ঘটল সরকারের বিরুদ্ধে।

আমি তখন রংপুর ক্যান্টনমেন্টে ১৫ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেছিলাম। সেখানে কমান্ডার ছিলেন কর্নেল হুদা। তিনি যুদ্ধ চলাকালীন সেনাবাহিনীর চাকরিতে ছিলেন না, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় তিনি একজন অভিযুক্ত আসামি ছিলেন। যুদ্ধে অংশগ্রহণের কারণে স্বাধীনতার পর তাকে চাকরিতে পুনর্বহাল করা হয়েছিল। কর্নেল হুদাও আমার সাথে ৩রা নভেম্বরের আগে ঢাকাতে খালেদ মোশাররফ ও কয়েকজন অফিসারদের সাথে দেশের মধ্যে

ও সেনাবাহিনীতে বিরাজমান বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি ও করণীয় সম্পর্কে আলাপ হয়েছিল। ২রা নভেম্বর রাতে খালেদ মোশাররফ রংপুরে কর্নেল হুদার বাসায় টেলিফোন করেন।

আমি সেই বাসায় আগে থেকেই কর্নেল হুদার আমন্ত্রণে অপেক্ষা করছিলাম এই জন্য যে, যে কোনো মুহূর্তে Operation "Panther"-এর নির্দেশ আসবে। খালেদ মোশাররফ কর্নেল হুদার সাথে আলাপ সেরে আমাকে টেলিফোন দিতে বললেন, আমার সাথে আলাপকালে তিনি শুধু কুশল বিনিময় করলেন এবং বললেন "কর্নেল হুদারা কাছ থেকে তোমার ইউনিটের অনেক সুনাম শুনলাম Keep it up." তিনি আরো বললেন "হুদা তার যুদ্ধের অভিজ্ঞতার ওপর একটি বই লিখবে। আমাদের ২ নং সেক্টরে তোমার বিলোনিয়া যুদ্ধের কাহিনিও হুদাকে শুনাবে এবং তার বইতে উল্লেখ করতে বলবে।" টেলিফোনে যেহেতু এই সম্পর্কে আলাপ করা নিরাপদ নয় সেই কারণে খালেদ ঐ কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে আমাকে পূর্বের সিদ্ধান্ত কার্যকরী হতে যাচ্ছে এই Message টি পরোক্ষভাবে দিলেন। সর্বশেষ টেলিফোনে কথা আর না বাড়িয়ে বললেন– "তোমরা গল্প কর, আমি ঘুমাতে যাচ্ছি"– এই বলে তিনি টেলিফোনে আমার কাছ থেকে বিদায় নিলেন। আমি কর্নেল হুদার সাথে কথা বলার সময় তার কথার ধরনে ও ইঙ্গিতে বুঝে নিয়েছিলাম যে অপারেশন শুরু হতে আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাকি। টেলিফোন রাখার সাথে সাথে কর্নেল হুদা তার স্বাভাবিক ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকিয়ে একটু মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন "কী বুঝলে?" আমি উত্তর দিলাম "খালেদ মোশাররফ যেভাবে চেয়েছে বিশেষ করে আপনার সাথে অপারেশনে আমাদের করণীয় সম্পর্কে যেভাবে পূর্বে আলাপ হয়েছে সব ঠিক আছে, আমরা পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী রংপুরে সব ঠিকঠাক রেখে এক বা একাধিক ইউনিট ঢাকার সাহায্যে পাঠাতে হবে, সে জন্য আমার নিজস্ব ইউনিট ১৫ ইস্ট বেঙ্গলকে রংপুরে সতর্ক অবস্থায় রেখে ঐ দিনেই রংপুর থেকে ১০ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে ঢাকার উদ্দেশ্যে পাঠানো হলো। প্রয়োজনে পরে ১৫ ইস্ট বেঙ্গল ঢাকা যাবে।" আমি ও কর্নেল হুদা একদিন আগে ঢাকা থেকে Flying Club এর একটি Cessna Aircraft আগে থেকেই রংপুরে এনে রেখেছিলাম। কেউ যেন না বুঝতে পারে সেজন্য ঐ Aircraft এ রংপুরে একটি অনুষ্ঠানের জন্য একজন শিল্পী ও একজন মেহমান পাখি শিকারি শিকারের উদ্দেশ্যে রংপুরে এসেছিলেন কর্নেল হুদার ব্যক্তিগত দাওয়াতে ঐ Cassna করে।

৩রা নভেম্বর আমি ও কর্নেল হুদা খালেদ মোশাররফের সাথে টেলিফোনে আলাপ করি এবং তাকে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী জানানো হয় যে ১০ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে ইতোমধ্যেই ঢাকার উদ্দেশে রওয়ানা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া

হয়েছে। এই ইউনিটটি যুদ্ধকালীন সময়ে আমার অধীনেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এর প্রতিষ্ঠাতা অধিনায়ক হিসেবে আমি এর দায়িত্ব পালন করেছিলাম এবং যুদ্ধকালীন সময়ে এই রেজিমেন্টটি "K" Force অর্থাৎ খালেদ মোশাররফ ফোর্সের অধীনে একটি ইউনিট ছিল বিধায় তাঁর প্রতি অনুগত থাকবে। কর্নেল হুদা উপরোল্লিখিত কথাগুলো খালেদকে স্মরণ করিয়ে দিলেন এবং ১০ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে প্রথমে ঢাকা পাঠানোর যৌক্তিকতা তুলে ধরলেন এবং আরো বললেন প্রয়োজনে জাফর ইমামের বর্তমান ইউনিট ১৫ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকেও ঢাকায় পাঠানো হবে। এছাড়া খালেদের পক্ষ থেকে কর্নেল হুদাও আমার প্রতি আরেকটি বাড়তি দায়িত্ব ছিল যশোর সেনানিবাস থেকে খালেদের বিরুদ্ধে কোনো ইউনিট যেন ঢাকার দিকে রওয়ানা না হয় সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। বিগ্রেডিয়ার শওকত যশোর সেনানিবাসের দায়িত্বে ছিলেন। যদিও যশোর থেকে কোনো ইউনিট ঢাকা অভিমুখে রওয়ানা হয়নি তবুও আমাদেরকে ফেরিঘাট পর্যন্ত কড়া সতর্কতা ও নজর রাখতে হয়েছিল। এই ব্যাপারে প্রস্তুতির কারণে আমরা খালেদের সাথে একমত হলাম যে ৩রা নভেম্বর আমরা উল্লিখিত দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত থাকব এবং সব ঠিকঠাক করে ৪ তারিখ ভোরে Flying Club এর Cessna Aircraft নিয়ে আমরা ঢাকায় আসব। ৩রা নভেম্বর এমনিতে আমরা ঢাকার সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগে ছিলাম। ২রা নভেম্বর মধ্যরাত থেকে ৩রা নভেম্বর ভোর রাত পর্যন্ত অপারেশন সফল করার জন্য ঢাকায় অবস্থানরত ইউনিটগুলো পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন পয়েন্টে অবস্থান গ্রহণ করে।

১ম বেঙ্গলের একটি কোম্পানি মেজর ইকবালের নের্তৃত্বে আগে থেকেই বঙ্গভবনে ছিল। তাদেরকে এই অপারেশনের পক্ষে আনা হয় এবং অন্যত্র দায়িত্ব দেওয়া হয়। ক্যাপ্টেন দীপকের নের্তৃত্বে ২২তম বেঙ্গলের আরেকটি কোম্পানি বঙ্গভবনে পাঠানো হয়। ২২ বেঙ্গলের আরেকটি কোম্পানি গাফফারের নের্তৃত্বে মহাখালীতে অবস্থান গ্রহণ করে। উদ্দেশ্য ছিল কূটনৈতিক এলাকা গুলশান বনানীর দিকে কেহ যেন দায়িত্ব ছাড়া সংঘবদ্ধভাবে না যেতে পারে। পাশাপাশি ঐ এলাকাগুলো থেকে কূটনৈতিকরা যেন শহর অভিমুখে না আসে এ ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখা এবং কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ২ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের এক কোম্পানি ঢাকা টঙ্গী হাইওয়েতে চেক পোস্ট স্থাপন করে এবং ইউনিট যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় সর্বদাই প্রস্তুত ছিল। সেনানিবাসের ভিতরে ও ইউনিটগুলো যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য সতর্ক অবস্থায় ছিল। কর্নেল শাফায়াত জামিল ছিলেন ৪৬ ব্রিগেড কমান্ডার। তিনি মূলত ইউনিটগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন দূরদর্শীসম্পন্ন Professional

Officer. মেজর হাফিজ উদ্দিন ছিলেন তখন ৪৬ বিগ্রেডে-বিগ্রেড মেজর। তিনিও খালেদ মোশাররফ শাফায়াত জামিলও অন্যান্য অফিসারদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। কর্নেল মালেক Director Military Operation এ থেকে বুদ্ধি পরামর্শ প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছিলেন।

৪ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট যেহেতু যুদ্ধ চলাকালীন খালেদ মোশাররফের নের্তৃত্বে ছিল স্বাভাবিক কারণে ঐ ইউনিটের অফিসার ও সৈনিকেরা খালেদের ব্যক্তিগত ভক্ত ছিল। এছাড়া অভ্যুত্থানের আরেকজন মূল নায়ক কর্নেল গাফফার ছিলেন এই ইউনিটের যুদ্ধ চলাকালীন অধিনায়ক। সেজন্য ৪ বেঙ্গলে অপারেশন পরিচালনার সমন্বয় কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। সেইদিন অন্যান্য ইউনিট অফিসারেরাও ৪ বেঙ্গলে আসা যাওয়া করছিল। ৪ বেঙ্গল আগস্টের অভ্যুত্থানে জড়িত ২ ফিল্ড আর্টিলারি ও ট্যাঙ্ক রেজিমেন্টের পাশাপাশি অবস্থান করেছিল সে জন্য কর্নেল রশিদ ও কর্নেল ফারুকের এই ইউনিট দুটির প্রতি কড়া নজর রাখার ইঙ্গিত ছিল। ৪ বেঙ্গলও এই ইউনিট দুটিকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখার লক্ষ্যে সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করে। সকাল থেকে এয়ার ফোর্সের হেলিকপ্টার ও জঙ্গি বিমান মোশতাক ও কর্নেল ফারুক রশিদের বঙ্গভবন ও রেসকোর্স এ তাদের অনুগত সাজোয়া ও পদাতিক বাহিনীর সৈনিকদের অবস্থানের উপর বার বার ফ্লাই ওভার করছিল। নের্তৃত্বে ছিলেন স্কয়ার্ডন লিডার আলম, লিয়াকত, ইকবাল ও অন্যান্যরা। তখন বঙ্গভবনে মোশতাক গংদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে সমঝোতা চলছিল পরবর্তী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় কে আসবে, কী করে আবার সাংবিধানিক প্রক্রিয়া চালু করা যায় ইত্যাদি।

এদিকে ঢাকা সেনানিবাসে জেঃ জিয়াকে অঘোষিতভাবে নিরাপত্তার অজুহাত দেখিয়ে গৃহবন্দি রাখা হয়। ক্যাপ্টেন হাফিজ উল্লার নের্তৃত্বে তার বাসায় টেলিফোন যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং নতুনভাবে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। জিয়াকে বন্দী অবস্থায় কয়েকজন অফিসার জানিয়েছিলেন যে, বঙ্গ ভবনে মোশতাকের সাথে পরবর্তী রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে অর্থাৎ ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে আলাপ আলোচনা চলছে। আপনি যদি আগ্রহী থাকেন তাহলে আপনি দেশের প্রেসিডেন্ট হতে পারেন। খালেদ সেনাবাহিনীর প্রধান থাকবে। এ প্রস্তাবে খালেদ মোশাররফের কোনো আপত্তি নেই। এই অফিসারেরা খালেদের পক্ষ থেকে কিংবা রসিকতা করে এই প্রস্তাব দিয়েছিল কিনা জানি না। জিয়া ঠান্ডা মাথায় তাদেরকে উত্তর দিয়েছিল "আমার প্রেসিডেন্ট হওয়ার সখ নেই, আমাকে কাগজ কলম দাও আমি অবসর গ্রহণের জন্য দরখাস্ত করব। আমাকে পেনশনে পাঠালেই আমি খুশি থাকব।"

অভ্যুত্থানের প্রাথমিক পর্যায়ে খালেদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের কোনো মানসিক প্রস্তুতি এমনকি পরিকল্পনাও ছিল না। এ কারণে এই অভ্যুত্থানের সাথে সম্পৃক্ত অফিসারেরাও করণীয় সম্পর্কে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিল। খালেদ চেয়েছিল রক্তপাত এড়িয়ে সমঝোতার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় মোশতাককে সরিয়ে অন্য কাউকে বসানো এবং নিজে সেনা প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করা এবং পরবর্তীতে সময়মত প্রয়োজনে মার্শাল 'ল' ঘোষণা করে রাষ্ট্র পরিচালনা করা এবং সময়মত নতুন নির্বাচন দিয়ে সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠা করা। খালেদের দ্বিতীয় পর্যায়ের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বেশি সময়ক্ষেপণ করে ফেলেছিলেন যদিও মোশতাককে ক্ষমতাচ্যুত করেছিলেন এবং নিজে সেনাপ্রধান হয়েছিলেন কিন্তু পরবর্তী পরিকল্পনা নিয়ে আর আগাতে পারলেন না।

৪৮ ঘণ্টা রেডিও বন্ধ রেখে বঙ্গভবনে সমঝোতার যে নাটক চলছিল এতে করে অন্য ষড়যন্ত্র তড়িৎ দানা বেঁধে উঠল এবং ৭ নভেম্বর ঘটে গেলে রক্তক্ষয়ী আরেকটি অভ্যুত্থান। এই অভ্যুত্থান ৩রা নভেম্বর অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে কোনো পাল্টা অভ্যুত্থান ছিল না। ৭ই নভেম্বর অভ্যুত্থানের নায়করা ৩রা নভেম্বরের অভ্যুত্থানের অনেক আগ থেকেই তাদের এই অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি সম্পন্ন করে শুধু একটি সময় ও সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। ৩রা নভেম্বর খালেদের অভ্যুত্থানের পর ৪৮ ঘণ্টা রেডিও বন্ধ রেখে দেশবাসীকে অন্ধকারে রাখা, রক্তপাত এড়িয়ে সমঝোতার চেষ্টা চালিয়ে সময়ক্ষেপণ করা। জিয়াকে গৃহবন্দি রাখা, মোশতাক, ফারুক, রশীদ গংদের ইউনিটগুলোকে নিয়ন্ত্রণে রেখে কোনো অ্যাকশনে না যাওয়া, জেলে চার নেতা হত্যার কারণে বাইরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি কারণে ৭ই নভেম্বরের নায়করা তাদের পূর্ব পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ৭ই নভেম্বরকেই সুবর্ণ সময় ও সুযোগ হিসেবে বেছে নিয়েছিল। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ইতিহাসে ৩রা নভেম্বর যদি সংগঠিত নাও হতো ৭ই নভেম্বরের এই রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের পূর্ব পরিকল্পনা অন্য কোনো সময়ে সংগঠিত হতো। সৈনিক সংস্থার মাধ্যমে সেনানিবাসগুলোতে সৈনিকদের মধ্যে ঐদিন বিদ্বেষ ও বিদ্রোহের বীজ ছড়িয়েছিল, আওয়াজ উঠেছিল "সিপাহি সিপাহি ভাই ভাই অফিসারের রক্ত চাই"। যার কারণে অফিসারেরা সিভিল পোশাক পরিধান করে অনেকে সেনানিবাস থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল এবং অনেক Young Officer এই বিদ্রোহী সৈনিকদের হাতে নিহত হয়েছিল। সেনানিবাসগুলো প্রায় বিদ্রোহী সিপাহিদের নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছিল কিন্তু তাদের মধ্যে Chain of Command এর অভাব ছিল। এ ঘটনা ৩রা নভেম্বরের সামরিক অভ্যুত্থানের কারণে ঘটেনি বা হঠাৎ করেও ঘটেনি বা এটা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনাও ছিল না। গোপন সৈনিক সংস্থা সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটে অনেকদিন ধরে নীরবে তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল।

এ অভ্যুত্থান সম্পর্কে পরে আমি আবার কিছু আলোকপাত করব। ফিরে আসছি আবার খালেদ মোশাররফ প্রসঙ্গে ৩রা নভেম্বর খালেদ মোশাররফ রক্তপাত এগিয়ে অভ্যুত্থানকে সফল করার জন্য পর্যায়ক্রমে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত কেন নিয়েছিলেন। এর কারণ ছিল খালেদের অভ্যুত্থানের আগ থেকে সেনাবাহিনীতে মোশতাক, ফারুক, রশিদ, ডালিম গংয়েরা বঙ্গভবনে বসে জিয়ার মাধ্যমে তাদের সুবিধানুযায়ী সেনাবাহিনী পরিচালনা করার চেষ্টা করছিল– এ প্রশ্নে সেনাবাহিনীর মধ্যে একটি চাপা ক্ষোভ ছিল এবং Chain of Command ঠিক করার একটা জোরালো দাবি সৈনিক ও অফিসারদের মধ্যে ছিল, তাই খালেদ অভ্যুত্থানের প্রাথমিক পর্যায়ে দেখাচ্ছিলেন তিনি ক্ষমতার লোভী নন, তিনি সেনাবাহিনীকে এক কমান্ডে রাখার জন্য এই উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং পুরো সেনাবাহিনী মোটামুটিভাবে তার সমর্থনে ছিল কিন্তু তিনি যদি মোশতাকের সাথে আর্মির যেই অংশটি জড়িত ছিল তাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশানে যেতেন তাহলে সেনাবাহিনীর মধ্যে ছোটখাটো ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারত। যদিও খালেদ মোশাররফের পক্ষের শক্তি এইসব ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটাতে সম্পূর্ণ সক্ষম ছিল। খালেদ মূল উদ্দেশ্যকে পাশ কাটিয়ে এ ধরনের বিচ্ছিন্ন ঘটনায় জড়িত হতে চাননি। তিনি এ ব্যাপারে খুব সতর্ক ভূমিকা পালন করছিলেন। এক পর্যায়ে যখন এয়ার ফোর্সের হেলিকপ্টারগুলো মোশতাক গংদের অবস্থান বঙ্গ ভবনের উপর দিয়ে ফ্লাই ওভার করছিল তারা ঐসব অবস্থানের উপরে গুলি করতে খুব আগ্রহী ছিল প্রয়োজনে বিমান বাহিনীর জঙ্গি বিমান ও ব্যবহার করতে চেয়েছিল। খালেদ সরাসরি এ প্রস্তাব নাকোচ করে বলেছিলেন "No fire, wait and see." খালেদ আরো বললেন, "আমরা যদি অ্যাকশানে যাই তাহলে আমরা ক্ষমতা দখলের জন্য এই অভ্যুত্থান করছি বলে সেনাবাহিনীর মধ্যে একটা ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে। আর তারা যেহেতু প্রায় আত্মসমর্পণ করেছে অ্যাকশান ইচ্ছা করলে পরেও নেওয়া যাবে। এই মুহূর্তে তাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশান নিলে বিভিন্ন সেনানিবাসে কেউ কেউ তাদের পক্ষ অবলম্বন করতে পারে। এ সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া আমাদের উচিত হবে না।"

তিনি আরো বললেন, "সব কিছু নিয়ন্ত্রণে রেখে আমাদেরকে কৌশলগতভাবে পর্যায়ক্রমে এগিয়ে যেতে হবে।" যদি ৭ই নভেম্বর সংঘটিত না হতো তাহলে মোশতাকের পরিবর্তে বিচারপতি সায়েমের মাধ্যমে খালেদ মোশাররফ সেনা প্রধান হিসেবে তার প্রতিশ্রুতি মোতাবেক একটি নির্বাচনের ব্যবস্থা করতেন। অথবা সময়ের ব্যবধানে রাজনৈতিক পরিস্থিতি যদি সামাল দেওয়া যেত তাহলে হয়তো খালেদের সময়মত Cheif Martial Law Administrator এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল এবং সেক্ষেত্রেও দেশে সুষ্ঠু একটি জাতীয়

নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে অথবা জিয়াউর রহমান কিংবা এরশাদের মতো কৌশল অবলম্বন করতেন। রক্তপাত এড়ানোর এই প্রশ্নে সেনাবাহিনীর মধ্যেও অফিসারদের একটি অংশ বিশেষ ভূমিকা পালন করছিল। মূলত এদের উদ্যোগেই ডালিম গংয়েরা দেশ ত্যাগ করতে পেরেছিল। জেলের অভ্যন্তরে চার নেতাকে যেভাবে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল এই খবরটি ডালিম গংদের দেশ ত্যাগের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত সেনাবাহিনীতে ও বাইরে সবার মধ্যে প্রচার করা হলো না। অফিসারদের একটা ক্ষুদ্র অংশ, তৎকালীন আই. জি. পুলিশ ও জেল কর্তৃপক্ষের মধ্যে খবরটি সীমাবদ্ধ ছিল। এদের দেশ ত্যাগের কিছুক্ষণের মধ্যেই সবার মধ্যে ব্যাপকভাবে জানাজানি হয়ে গেল এবং প্রশ্ন উঠল, এক্ষেত্রে কে বা কারা এদেরকে দেশ ত্যাগের অনুমতি দিলেন। দেখা গেল, ৩রা নভেম্বর অভ্যুত্থানের সাথে জড়িত মূল নায়কদের অধিকাংশই এই জেল হত্যা সম্পর্কে পরে জেনেছিল। আমি ও কর্নেল হুদা Flying Club এর Cessna Aircraft নিয়ে ঢাকা এসে খালেদের সাথে সাক্ষাৎ করি। কর্নেল হুদাকে খালেদের সাথে রেখে আমি ৪র্থ বেঙ্গলে আসি। সেখানে এই অভ্যুত্থানের সাথে জড়িত প্রায় সবার সাথেই সাক্ষাৎ হয়ে যায়। সবার মধ্যে একটা উত্তপ্ত ভাব লক্ষ করলাম। সবার মধ্যে একই প্রশ্ন, জেল হত্যা সম্পর্কে আমরা সময়মতো জানলাম না কেন? সবাই বলাবলি করছিল, "আমরা যদি সময়মতো জানতে পারতাম তাহলে ডালিম গংদেরকে দেশ ত্যাগ করতে দিতাম না। অভ্যুত্থান করলাম আমরা হত্যা করে তারা। এখন এই হত্যাকাণ্ডের দায় দায়িত্ব কে নেবে? অভ্যুত্থানের একদিন অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে, এখনও নাকি খালেদের পক্ষে মোশতাক গংদের সাথে বঙ্গভবনে সমঝোতা চলছে। এ কিসের সমঝোতা? কেন এত বিলম্ব?" ৪র্থ বেঙ্গলে এসব প্রশ্ন নিয়ে নানা জল্পনা কল্পনা ও উত্তপ্ত অবস্থা বিরাজ করছিল। এ অবস্থা প্রায় বিকেল ৪টা/৫টা পর্যন্ত চলে। এক পর্যায়ে সবাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, এ অবস্থা চলতে দেয়া যেতে পারে না। যা করতে হবে আজ সন্ধ্যার মধ্যেই চূড়ান্ত করতে হবে এবং আমরা শাফায়াত জামিলের নের্তৃত্বে বঙ্গভবনে গিয়ে এর একটা সমাধান করব। খালেদ তখন বঙ্গভবনে এদের সাথে সমঝোতায় ব্যস্ত। ৪র্থ বেঙ্গল থেকে সবাই বঙ্গভবনের উদ্দেশে রওয়ানা দেওয়ার আগেই আমরা কয়েকজন চলে আসলাম বঙ্গভবনে। বঙ্গভবনে তখন মন্ত্রী পরিষদ কক্ষে মোশতাক, তার মন্ত্রী পরিষদ ও ওসমানীর সাথে খালেদের নানা প্রশ্নে তুমুল বিতর্ক চলছিল। কক্ষের বাইরে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ উল্লা পায়চারি করছিলেন ও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন। আমার সাথের একজন জিজ্ঞেস করল কী ব্যাপার তাকে খুব বিষণ্ন ভীত ও হতাশাগ্রস্ত দেখাচ্ছে। তিনি উত্তর দিলেন, "কী হয়ে গেল, কী হয়ে গেল"। ইতোমধ্যেই সন্ধ্যার পরে ৪র্থ বেঙ্গল থেকে কর্নেল গফফার তাজ, হাফিজ, মেজর

হাফিজ উদ্দিন, মেজর ইকবাল, কর্নেল মালেক, হুমায়ুন, কর্নেল শাফায়াত জামিলের নের্তৃত্বে বঙ্গভবনে আসল। আমরা সবাই সরাসরি ঢুকে পড়লাম মন্ত্রী পরিষদের সভাকক্ষে। প্রায় সবার হাতে স্টেনগান, পিস্তল রয়েছে। সবাই তেড়ে গেল মোশতাক ও মন্ত্রীদের দিকে। অনেকে চিৎকার করে বলল, "You have seen Dalim— you have not seen Fathers of Dalim.'' অনেকে আবার চিৎকার করে বলতে থাকল, You Bloody killers, we shall not spare you." আবার কয়েকজন বললেন, "কিসের সমঝোতা? কোনো সমঝোতা চলবে না। জেল হত্যার ব্যাপারে এখনই এই মুহূর্তে আমরা জানতে চাই এবং এর দায় দায়িত্ব কাউকে না কাউকে অবশ্যই নিতে হবে।" মোশতাক চেয়ারে বসেছিলেন, তার চারপাশে যে মন্ত্রীরা বসা ছিল তাদের অধিকাংশই চেয়ার ছেড়ে তখন তাদের সামনের টেবিলের নিচে অবস্থান গ্রহণ করে চিৎকার করে বলছিল, "আমরা না, আমরা না- আমরা কিছুই জানি না। জেল হত্যার প্রতিবাদে আমরা পদত্যাগপত্র দিয়েছি, ঐ দেখেন এগুলো মোশতাকের সামনে আছে।" আসলে তখন মোশতাকের সামনের টেবিলের উপর কিছু দরখাস্ত ছিল। জেনারেল ওসমানী দিক-বিদিক ছুটাছুটি করছিলেন ও আগত অফিসারদেরকে নিবৃত করার চেষ্টা করছিলেন। কারণ পুরো কক্ষের মধ্যে হইচই ও উত্তপ্ত বাক্য ব্যবহার হচ্ছিল একতরফাভাবে। অনেকে আবার স্টেনগান কক্ করে গুলি করার উদ্যোগ নিচ্ছিল। কক্ষের ভিতরে চলছিল অফিসারদের একতরফা হুমকি ও গালিগালাজ। এক পর্যায়ে জেল হত্যা সম্পর্কে মোশতাককে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করা হলে সে স্বীকার করল, দু'দুবার জেল কর্তৃপক্ষের নিকট সে টেলিফোন করছিল এবং পুরো ব্যাপারটি সম্পর্কে সে অবহিত ছিল।

রাত আস্তে আস্তে বাড়তে থাকল এবং মোটামুটি কয়েকটি সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হলো। খালেদকে পদোন্নতি দিয়ে সেনাপ্রধান করা হলো, মোশতাককে বঙ্গভবনের উপরে একটি কক্ষে গৃহবন্দি করে রাখার সিদ্ধান্ত হলো। আমাকে ও ক্যাপ্টেন দীপককে দায়িত্ব দেওয়া হলো মোশতাককে Escort সহকারে ঐ কক্ষে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আমি ও ক্যাপ্টেন দীপক তাই করলাম। মোশতাককে রুমে রেখে ক্যাপ্টেন দীপককে দায়িত্ব দিয়ে আমি ঐ কক্ষ ত্যাগ করার আগে মোশতাককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এখন আপনার চিন্তা ভাবনা কী? মোশতাক ঠান্ডা মাথায় বিচলিত না হয়ে আমাকে উত্তর দিল, "Wait and see." তখন আমি বুঝলাম, এই লোকটি কোনো সহজ ব্যক্তি নয়। মনে হচ্ছিল তার ষড়যন্ত্র তখনও শেষ হয়নি। আমি নিচে নেমে আসলাম। সভাকক্ষে তখন মোশতাকের মন্ত্রীদেরকে পরবর্তী সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করতে বলা হলো। আমরা কয়েকজন অফিসার খালেদকে রেডিও বন্ধ না রাখার জন্য পরামর্শ দিলাম এবং এও বলা হলো Draft তৈরি আছে

আপনি জাতির উদ্দেশে কিছু বলতে পারেন অথবা আপনার পক্ষ থেকে আমাদের একজন রেডিওতে ঘোষণা পাঠ করতে পারে। উত্তরে খালেদ মোশাররফ বললেন, "You want to be another Dalim." তিনি আরো বললেন, "বিচারপতি সায়েমের ব্যাপারে আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি দায়িত্ব দেওয়ার জন্য। সায়েম অথবা তার জায়গায় নতুন যিনি দায়িত্বে আসবেন তিনিই দেশবাসীর উদ্দেশ্যে ভাষণ দিবেন। অপেক্ষা কর সব ঠিক হয়ে যাবে।" ঐ রাতে বিচারপতি সায়েম দায়িত্ব গ্রহণে তাঁর সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। প্রায় সারারাত সবাই বঙ্গভবনে ছিল। অনেক রাজনীতিবিদ বিশেষ করে আওয়ামী লীগের অনেক নেতা সে রাতে বঙ্গভবনে খালেদকে টেলিফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিল। খালেদ খুব ঠান্ডা মাথায় সব কিছুর মোকাবেলা করেছিল। ৩রা নভেম্বরের এই অভ্যুত্থানের পিছনে কোনো রাজনৈতিক সমর্থন আছে বা নতুনভাবে সমর্থন প্রয়োজন, খালেদের কর্মকাণ্ড এবং পদক্ষেপগুলোতে এ ধরনের কোনো আভাস যাতে না থাকে সে ব্যাপারে খালেদ খুব সতর্ক ছিলেন এবং অন্যদেরকেও খুব সতর্ক করে দিয়েছিলেন। কারণ তা না হলে সেনাবাহিনীর ভিতরে ও বাইরে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে। খালেদ ব্যক্তিগতভাবে বঙ্গবন্ধুর একজন ভক্ত ছিলেন এবং আওয়ামী লীগের প্রতি দুর্বলতা ছিল। আওয়ামী লীগের অনেক নেতার সাথে তার সুসম্পর্ক ছিল। এজন্য খালেদ আরো বেশি সতর্কতা অবলম্বন করছিলেন। খালেদ যদি টিকে যেতেন এবং দেশে যদি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া শুরু হতো, সে অবস্থায় আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে অবশিষ্ট ষড়যন্ত্রকারীরা (যারা পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে দল ছেড়ে গেল) কোণঠাসা হয়ে পড়ত এবং বঙ্গবন্ধুর বিশেষ অনুগত নেতা-কর্মীরা আবার নতুনভাবে সু-সংগঠিত হওয়ার সুযোগ পেতেন। তখন এদের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী হতো জাসদ, ন্যাপ। ৪ঠা নভেম্বর বঙ্গভবনে প্রায় শেষ রাতে সিদ্ধান্ত হলো নূরুল ইসলাম মঞ্জু ও তাহের উদ্দিন ঠাকুরকে বঙ্গভবন থেকে সরাসরি জেলে পাঠানো হবে এবং বাকিদেরকে নিজ নিজ বাসায় ফিরে যাওয়ার জন্য অনুমতি দেওয়া হলো। তবে শর্ত ছিল যে, কেউ বাসা ছেড়ে যেতে পারবে না। এ ব্যাপারে সরকারেরও নজরদারি থাকবে। রাত শেষ হয়ে গেল। নতুন দিনের আলো উঁকি দিল। সবাই ফিরে গেল নিজ নিজ অবস্থানে।

জাসদের হটকারী অভ্যুত্থান

ঢাকা সেনানিবাসে তথাকথিত সিপাহি বিদ্রোহ প্রেক্ষাপট

আমাদের সিপাহিরা সাধারণত সরলমনা এবং সম্পূর্ণ Professional মন মানসিকতায় ভরপুর ছিল। নিজ নিজ ইউনিটে Chain of Command মেনে চলা তাদের ফরজ দায়িত্ব হিসেবে মনে করে। এছাড়া সদ্য সমাপ্ত মুক্তিযুদ্ধে যারা তাদের বিভিন্ন পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার তাদের প্রতি এদের ছিল অফুরন্ত শ্রদ্ধাবোধ ও আনুগত্য। অফিসারেরা সৈনিকদের এই প্রচুর আত্মবিশ্বাসকে পুঁজি করে দেশের ও সেনাবাহিনীতে নানান বিতর্কিত প্রশ্নে নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত ছিল। যদিও সেনাবাহিনীর Chain of Command বাহ্যিক ঠিক ছিল কিন্তু এই গ্রুপগুলোর চাপা ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ভিন্ন রূপে পরবর্তী সময়গুলোতে আমরা দেখেছি। সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে '৭৩ সাল থেকে জাসদ সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটে হাজার হাজার সৈনিকদের মধ্যে গোপনে ছোট ছোট কমিটি করে সৈনিক সংস্থা নামে একটি সংগঠন দাঁড় করাল যদিও ইউনিটগুলোতে এর পরিচিতিও বিস্তৃতি ঘটেনি। সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ সৈনিকেরা এই গোপন সংস্থা সম্পর্কে ৭ই নভেম্বর তাদের প্রয়াস ব্যর্থ হওয়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত জানত না। ঢাকা ছাড়া বাংলাদেশের অন্য কোনো সেনানিবাসে ঐদিন এই ধরনের কোনো বিদ্রোহও সংগঠিত হয়নি।

ঢাকা সেনানিবাসে সৈনিক সংস্থার সদস্যরা দেশের বিরাজমান সমস্যা অর্থাৎ অবৈধভাবে সৈনিকদেরকে অফিসারেরা ক্ষমতার জন্য ব্যবহার করেছে অথচ সৈনিকদের সমস্যা সমাধানে তারা সজাগ নন, এমনকি সৈনিকদেরকে তুচ্ছ মনে করে– এই অপপ্রচারের সমর্থনে সৈনিকদের মধ্যে সৈনিক সংস্থা সদস্যরা ব্যাপক প্রচার চালায়। সৈনিকদেরকে অফিসারদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলে। ঢাকায় অবস্থানরত প্রায় ইউনিট থেকে এই দাবির প্রশ্নে অনেক সাধারণ সৈনিক একাত্মতা ঘোষণা করে সম্পূর্ণভাবে তাদের নিজস্ব স্বার্থে। এদের মধ্যে একটি

অংশ অবশ্য Motivated ছিল। এরা চাচ্ছিল সাধারণ সৈনিকদেরকে আরো একতাবদ্ধ করে এই বিদ্রোহ ব্যাপক করতে হবে। তখনও সাধারণ সৈনিকেরা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং এর পিছনে অন্য কোনো উদ্দেশ্য লুকিয়ে আছে কিনা কিছুই জানত না। সৈনিকেরা তাদের ১২ দফা দাবির প্রশ্নে একতাবদ্ধ ছিল। দাবিগুলোর মধ্যে সৈনিকদের থেকে অফিসারদের বেটম্যান প্রথা বিলোপ, সৈনিকদের মধ্য থেকে শিক্ষা ও যোগ্যতা অনুযায়ী অফিসার নিয়োগ, সৈনিকদের অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির দাবি প্রাধান্য পাচ্ছিল। ঢাকায় অবস্থানরত বেশ কয়েকটি ইউনিটের সাধারণ সৈনিকের একটি বড় অংশ কিন্তু নীরব ভূমিকা পালন করছিল। শুধু সৈনিকদের Common দাবি প্রশ্নে মৌন সমর্থন দিয়েছিল। সৈনিক সংস্থার সদস্যরা ও ফারুক রশিদদের অনুগত সৈনিকেরা সৈনিকদের দাবি আদায়ের প্রশ্নে ও তাদেরকে অবৈধভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলে অবৈধভাবে সব সময় ব্যবহার করা হয়। সব মিলিয়ে সাধারণ সৈনিকদের মধ্যে যে ক্ষোভ ও উত্তেজনা ছড়িয়ে দিয়েছিল সেই উত্তেজনা ও ক্ষোভের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে Motivated ঐ সৈনিক সংস্থার সদস্যরা আরো ব্যাপকভাবে বাড়তি প্রচার করল যে, খালেদ যে অভ্যুত্থান করেছে, আসলে এটা একটি ভারতপন্থী অভ্যুত্থান। আমাদের স্বাধীনতার পরিপন্থীও বটে। আমাদেরকে অবৈধভাবে ব্যবহার করছে। এই মর্মে একটি লিফলেটও ছাড়া হয়েছিল এই বলে যে, "অফিসারেরা ক্ষমতা ও পদের জন্য লোভে অভ্যুত্থান ঘটাচ্ছে। আর প্রাণ দিচ্ছে সাধারণ সিপাহিরা। নিগৃহীত, অধিকার বঞ্চিত সিপাহিরা আর কামানের খোরাক হবে না। সিপাহি-জনতার ভাগ্য এক। তাই সিপাহি-জনতার বিপ্লবের মাধ্যমেই ক্ষমতা দখল করতে হবে। সুতরাং বিপ্লবের জন্য, শ্রেণি সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হোন।" এই অপপ্রচারের ফলে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির মুখে খালেদের সমস্ত পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যায়। খালেদপন্থী অফিসারদেরকে ঐ বিদ্রোহে জড়িত সৈনিকদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ খোঁজাখুঁজি শুরু করে দেয়। জাসদ বাহিরে ব্যাপক জনগণকে সংগঠিত করতে ব্যর্থ হলো। বঙ্গভবন ও রেডিও নিয়ন্ত্রণে ছিল না। সৈনিক সংস্থা যদিও কৌশলে খালেদের প্রয়াস ব্যর্থ করে দেয় জাসদ কিন্তু রাজনৈতিকভাবে তাদের পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী পুরো পরিস্থিতির সামাল দিতে পারেনি।

তবে সেই মুহূর্তে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের যে কোনো রাজনৈতিক সমর্থনের প্রশ্নে কিন্তু সৈনিকদের মধ্যেও বিভক্তি দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই সৈনিক সংস্থার সদস্যরা Common দাবির প্রশ্নে সবাইকে এক রাখার চেষ্টা করছিল। বিচ্ছিন্নভাবে যে যেখানে সম্ভব সাধারণ সৈনিকদের মধ্যে থেকেও দাবির প্রশ্নে নের্তৃত্ব দিচ্ছিল। সৈনিক সংস্থা নিজেরা এবং অন্য যারা নের্তৃত্ব দিচ্ছিল তাদের মাধ্যমে আরো কিছু সময় ধরে রেখে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সৈনিকদের একটি

উল্লেখযোগ্য অংশকে ব্যবহার করতে পারত। যদি সেনানিবাসের বাইরে জাসদের নের্তৃত্বে ব্যাপক জনগণের ঢল নামত। মিছিলে মিছিলে ঢাকা ভরে যেত এবং এর রাজনৈতিক নের্তৃত্বে থেকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রশ্নে যদি Radio/Television-এ ঘোষণা আসত এই বলে যে বিদেশি ষড়যন্ত্রের নাগপাশ থেকে দেশকে মুক্ত করেছি (যেই অপপ্রচার আগে থেকে চলছিল সেই প্রেক্ষপটে)। সিপাহিদেরকে আর ব্যবহার করা যাবে না এবং সর্বোপরি সৈনিকদের ১২ দফা দাবি মেনে নিয়ে সুস্পষ্ট ঘোষণা থাকত। সেই ক্ষেত্রে ঢাকা সেনানিবাসে সৈনিক সংস্থার নেতৃবৃন্দ সাধারণ সৈনিকদেরকে এই ঘোষণার পক্ষে আনা চেষ্টা করতে পারতেন। হয়তো সামরিক সফলতা আসত কিন্তু সেনাবাহিনীর Chain of Command ফিরিয়ে আনতে কষ্টসাধ্য ব্যাপার হতো, কারণ সৈনিক সংস্থার সমর্থনে কোনো চাকরিরত সেনা অফিসার ছিলেন না। যে কোনো উদ্যোগ চূড়ান্তভাবে ধরে রাখতে হলে চাকরিরত অফিসারের নের্তৃত্বের প্রশ্ন এক পর্যায়ে আসবেই।

সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশের সেনাবাহিনী মাত্র রণাঙ্গন থেকে ব্যারাকে ফিরেছে। বিভিন্ন রণাঙ্গনে এই সৈনিকদের একটি বৃহত্তম অংশকে নের্তৃত্ব দিয়েছিলেন মুক্তিযোদ্ধা অফিসারেরা। তাই নিজ নিজ ইউনিটের এইসব সৈনিকেরা নিজেদের ইউনিট অফিসার ও রণাঙ্গনে তাদের দায়িত্বে থাকা অফিসারদের প্রতি ছিল সমর্থন। সেনাবাহিনীতে প্রথম পর্যায়ে যাই ঘটে পাল্টা কিছু না হলে সেনাবাহিনী শৃঙ্খলার ও একতার প্রশ্নে এক থাকার চেষ্টা করে; কিন্তু পরে তারা নিজ নিজ অনুগত অফিসারের সাথে আবার মিলে যায়। এই সুবাদে অফিসারেরাও ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপ নীরবে গোপনে লালন করতেন। পাল্টা কিছু করতে গেলে অফিসার লাগবেই। সেই ক্ষেত্রে রক্তপাত এড়ানো সম্ভব নয়– এটা ছিল পরিষ্কার ধারণা। তার প্রমাণ কিছুটা ১৫ আগস্ট এর পরেও দেখেছি। সেনাবাহিনীতে রক্তপাত হয়নি (সব অফিসার সৈনিকেরা এক ছিল না তবুও)। ৩রা নভেম্বর দেখেছি রক্তপাত এড়ানোর চেষ্টা। ৭ই নভেম্বর প্রথম অবস্থায় যদি অফিসারদের নের্তৃত্ব থাকত তাহলে খালেদ, হুদা, হায়দারসহ ১২/১৩ জন Young অফিসার নিহত হতেন না। আমরা দেখেছি জিয়া যখন গৃহবন্দি থেকে দ্বিতীয় ফিল্ড রেজিমেন্টে অবস্থান সুদৃঢ় করলেন তখন সৈনিকদের সহায়তায় অফিসারেরা সেখানে আসতে থাকেন।

জাসদ সৈনিক সংস্থার মাধ্যমে উত্তেজনার বীজ ছড়িয়ে দিয়ে তাদের পরিকল্পনার প্রাথমিক ধাপ অতিক্রম করেছিল কিন্তু ঐ চাকরিরত অফিসার নের্তৃত্বের ঘাটতির কারণে বাইরে রাজনৈতিক সফলতা যদি অর্জনও করত তাহলে ঐ সফলতা ধরে রাখতে পারত না। সময়ে মোশতাকের অবস্থা হতো।

সেনানিবাসে জিয়াভক্ত ও অন্যান্য গ্রুপগুলো সক্রিয় হয়ে উঠে এবং জিয়ার পরামর্শ অনুযায়ী নিজ নিজ ইউনিট অফিসারদেরকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চালাতে থাকে। জিয়াকে যে গৃহবন্দি থেকে দ্বিতীয় ফিল্ড রেজিমেন্টে আনা হয়েছিল, সেখানে যদিও সৈনিক সংস্থার সদস্যদের ভূমিকা ছিল কিন্তু জিয়াভক্ত ও অন্যান্য সাধারণ সৈনিক ছিল প্রচুর। দ্বিতীয় ফিল্ড রেজিমেন্ট ছিল কর্নেল রশিদের ইউনিট। তিনি ছিলেন মোশতাকের অন্যতম সহযোগী। সেই ইউনিটে সৈনিকেরা নিয়ে আসল জিয়াকে। বস্তুত তখন থেকে সৈনিক সংস্থার নিয়ন্ত্রণ হ্রাস পেতে থাকে। সেই ইউনিটেই সমবেত হয়ে থাকলেন সকল সিনিয়র অফিসারেরা।

বাইরে জাসদের রাজনৈতিক Mobilisation এর অভাবের কারণে সৈনিক সংস্থা আর বেশি দূর আগাতে পারল না। তাদের একমাত্র সফলতা খালেদের উদ্যোগ বানচাল করে অন্যের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করেছিল। তাই বলব খালেদ ব্যর্থ হয়নি। 'সিপাহি সিপাহি ভাই ভাই অফিসারের রক্ত চাই' শ্লোগান দিয়ে উত্তেজিত সৈনিকেরা নিরীহ টগ্‌বগে কিছু যুবক অফিসার হত্যা করল। হাসানুল হক ইনু বলেছেন রেষারেষির কারণে ঐ অফিসারেরা হত্যা হয়েছেন-সৈনিক সংস্থা করেনি। সেই প্রশ্নের বিতর্কে না গিয়ে আমি বলব সৈনিক সংস্থা কর্তৃক সৃষ্ট পরিস্থিতির শিকার হয়েছিলেন ঐ অফিসারেরা। খালেদ, হুদা, হায়দারকেও সৈনিক সংস্থা হত্যা করেনি। কিন্তু ঐদিনের বিশৃঙ্খল অবস্থার সুযোগ নিয়েছিল কিছু অফিসারের নের্তৃত্বে একটি স্বার্থন্বেষী মহল।

দ্বিতীয় ফিল্ডে যখন জিয়ার সাথে জাসদ নেতৃবৃন্দ দেখা করতে গেলেন ও পরের দিন Race কোর্স এর সমাবেশে ভাষণের প্রস্তাবসহ অনেক রাজনৈতিক প্রস্ত াব দিলেন, তখন কিন্তু সৈনিক সংস্থা ও জাসদের পাল্টা কিছু করার ক্ষমতা ছিল না। জিয়া বুঝলেন সম্পূর্ণ ব্যাপারটা একটি হঠকারিতা। জিয়া তখন সাধারণ সৈনিক অফিসার নিয়ে খুব শক্তিশালী অবস্থানে ছিলেন। তাই জিয়া জাসদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

গৃহবন্দি থেকে সৈনিকেরা জিয়াকে দ্বিতীয় ফিল্ড রেজিমেন্টে নিয়ে গেল। জাসদের নির্দেশ ছিল সৈনিক সংস্থা জিয়াকে সরাসরি এলিফেন্ট রোড়ে নিয়ে আসবে। যেহেতু সৈনিক সংস্থার সদস্যরা সাধারণ সৈনিকদেরকে নিজ সংগঠনের পরিচয় দিয়ে জাসদের নির্দেশ জানানো শুধু ঝুঁকিপূর্ণ মনে করেনি, সৈনিক সংস্থারও মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে বিধায় তারা তখন সেই মুহূর্তে সাধারণ সৈনিক ও ফারুক রশিদ অনুগত সৈনিকদেরকে জিয়াকে দ্বিতীয় ফিল্ড রেজিমেন্টে নিয়ে যাওয়া থেকে নিবৃত্ত করল না। হাসানুল হক ইনু বললেন জিয়া ১২ দফাসহ রাজনৈতিক প্রস্তাবগুলো যখন তাকে দ্বিতীয় ফিল্ড রেজিমেন্টে দেওয়া হলো তিনি মেনে নেননি। তাহলে দেখা যাচ্ছে জাসদ তখনই সম্পূর্ণ জিয়া

নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। জিয়ার সাথে ৭ই নভেম্বরের আগে জাসদের কোনো রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল বা অন্য কোনো আঁতাত ছিল না এবং সেই মুহূর্তে জাসদ যেহেতু রাজনৈতিকভাবে একেবারে ব্যর্থ হয়েছে জিয়া বুঝলেন তিনি কেন তাদের হাতে সব তুলে দেবেন। জাসদকে সমর্থন দিলে টিকে থাকা হবে ক্ষণস্থায়ী, এমনকি তার নিজ জীবনের জন্যও ঝুঁকিপূর্ণ। তিনি এটাও বুঝলেন যে জাসদ সৈনিক সংস্থা আর কোনো ফ্যাক্টর নয়। আমাকে টিকে থাকতে হলে সেনাবাহিনীতে পরবর্তীতে মুক্তিযোদ্ধা অফিসারের একটি অংশ আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে, এমনকি খালেদ গং্রা এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সমাপ্তির পর আবার ফিরে আসার চেষ্টা চালাবে তাদের ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে ও ব্যবস্থা নিতে হবে। তাই তিনি একের পর এক পরবর্তীতে অ্যাকশান নেওয়া শুরু করলেন কঠোর ও কঠিনভাবে। যার ফলে জেলের ভিতরেও খালেদ, হুদা, হায়দার হত্যার পর খালেদ পক্ষের শাফায়াত জামিল, কর্নেল মালেক, কর্নেল গাফফার, মেজর হাফিজ, ক্যাপ্টেন তাজ, হাফিজ উল্লাহ, মেজর নাসের, ক্যাপ্টেন হুমায়ুন, মেজর ইসলাম, বিমান বাহিনীর লিয়াকত, ইকবালসহ আরো অনেককে বন্দী করে বিচার শুরু করেছিলেন। বাইরে অনেক সেনা অফিসার জোয়ানকে প্রাণ দিতে হয়েছিল।

জিয়া ২য় ফিল্ড রেজিমেন্টে বসে সাধারণ সৈনিকদেরকে দিয়ে সবাইকে মোটামুটি এক করে ফেললেন। ৭ই নভেম্বর জাসদ ও সৈনিক সংস্থা বানচাল করে দিল খালেদের অভ্যুত্থানকে। কিন্তু খালেদ মোশতাককে উচ্ছেদ করতে সফল হলেন এবং ঐ বিশৃঙ্খল অবস্থার সুযোগের কারণে একটি স্বার্থান্বেষী মহল খালেদকে শেরে বাংলা নগরে দশম ইস্ট বেঙ্গলে হত্যা করল। ঢাকা সেনানিবাস থেকে গোপন নির্দেশে এই হত্যাকাণ্ড পরিচালিত হয়েছিল।

৬ নভেম্বর ভোরের কাগজে অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এক সাক্ষাৎকারে এই তথাকথিত সিপাহি বিদ্রোহ হঠকারিতা কিনা এর জবাবে বলেছিলেন– "হ্যাঁ, এটা তো ঠিকই যে জনগণকে সংগঠিত না করে বিপ্লবের জন্য জনগণকে মানসিকভাবে প্রস্তুত না করে শুধু সেনাবাহিনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের চিন্তা কিংবা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা এক অর্থে হঠকারিতাই কারণ বিপ্লবের জন্য দীর্ঘ প্রস্তুতির প্রয়োজন পড়ে। সে প্রস্তুতি ঐ সময় নেওয়া হয়নি।"

রাশেদ খান মেমন এক মূল্যায়নে বলেছিলেন– "সিপাহি জনতার অভ্যুত্থানকে সফল হয়ে মুহূর্তের মধ্যে ব্যর্থ হয়েছে। প্রতিবিপ্লব তাকে গ্রাস করেছে আর এই ব্যর্থতার লেগাসি্ রাষ্ট্রকে এখনও বহন করতে হচ্ছে।"

ভোরের কাগজকে সিরাজুল ইসলাম এর উত্তরে বললেন, "৭ নভেম্বরের শক্তি ঐ অর্থে ছিল যে রাষ্ট্র ক্ষমতা যারা দখল করে নিয়েছিল তাদের থেকে ক্ষমতা বাইরে বের করে আনার একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। তাহেরের যে অভ্যুত্থান

সেদিন ছিল তা হলো দক্ষিণ পন্থীদের কাছ থেকে রাষ্ট্র ক্ষমতা বের করে আনা এবং সেটা আওয়ামী লীগের হাতে আবার যাবে না। যারা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করত তাদের হাতে থাকবে। এ রকম একটা বিশ্বাস তাহেরদের ছিল। কিন্তু তা পূরণ হয়নি। তাহলে বিষয়টি হচ্ছে ৭ নভেম্বর অভ্যুত্থানকারীদের লক্ষ্য ছিল রাষ্ট্র ক্ষমতা থাকবে না দক্ষিণ পন্থীদের হাতে আবার যাবে না আওয়ামী লীগের হাতে। এই অর্থে ১৫ আগস্টের চক্রান্তকে মোকাবেলা করার শক্তি ৭ নভেম্বর ছিল।"

এখানেই প্রশ্ন, যদি জাসদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তাই হতো তাহলে ১৫ আগস্টের পরে ৩রা নভেম্বরের আগেই এই উদ্যোগ তারা নিতেন।

কর্নেল হামিদ (অবঃ) বাংলাবাজার পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ৩রা নভেম্বর করার প্রয়োজন ছিল না। মেজরদের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য সময় পেলে জিয়াই যথেষ্ট ছিল। কর্নেল হামিদের কথায় বুঝা যাচ্ছে তিনি ৩রা নভেম্বর সমর্থন করেন না। তিনি চেয়েছিলেন মোশতাক Continue করুক, কারণ জিয়া মোশতাকেরই সেনাপ্রধান ছিলেন। দেখা যাচ্ছে হামিদ সাহেব মোশতাকের পক্ষের লোক।

নভেম্বরের প্রথম দিনগুলো

কর্নেল হামিদ চেয়েছিলেন, জিয়া যেহেতু মোশতাকের সেনাপ্রধান ছিলেন, মুশতাক ক্ষমতায় টিকে থাকলে জিয়াও সেনাপ্রধান থাকবেন এবং জিয়া ঐ মেজর গংদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিতে পারবেন– হামিদ সাহেবের এই ধরনের উক্তিতে বুঝা যাচ্ছে তিনি মোশতাকের সমর্থনের লোক ছিলেন এবং ঐ মেজরদের বিরুদ্ধে কোনো অ্যাকশনেরও পক্ষে ছিলেন না। তিনি বাংলাবাজার পত্রিকায় একই সাক্ষাৎকারে আরো বলেছিলেন, খালেদের অভ্যুত্থান ছিল অফিসারদের অর্থাৎ তিনি বুঝাতে চেয়েছিলেন যে সৈনিকেরা এর মধ্যে জড়িত ছিল না। হামিদ সাহেব যদিও মুক্তিযোদ্ধা অফিসার ছিলেন না তবুও একজন সিনিয়র অভিজ্ঞ অফিসারের কাছ থেকে এই ধরনের একটি বিকৃত চিত্র প্রত্যাশিত নয়। সামরিক বাহিনীতে কোনো অভ্যুত্থান সৈনিকদের ব্যাপক সমর্থন ও অংশগ্রহণ ছাড়া সম্ভব হয় না। খালেদের অভ্যুত্থানেও বঙ্গভবন, রেডিও সেন্টার, টিভি সেন্টার ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সৈনিকেরাই দায়িত্বে ছিলেন। এছাড়া শেরেবাংলা নগরে দশম বেঙ্গল রেজিমেন্ট খালেদের সমর্থনে এসেছিল রংপুর থেকে। সৈনিকদের পক্ষ থেকে কোনো Reaction ছিল না। আমি আগেও বলেছি, '৭ই নভেম্বরের, ৩রা নভেম্বর কোনো পাল্টা অভ্যুত্থান ছিল না। মোশতাককে উচ্ছেদ করে খালেদ শুধু সফলই হননি, সেই সাথে এদেশের রাজনীতির মোড়ও ঘুরিয়েছিলেন।

হামিদ সাহেব ছিলেন স্টেশন কমান্ডার। আসলে Station কমান্ডার কোনো Troops/ফোর্স কমান্ডার নন। সেনাবাহিনীতে যে সব Fighting/ Supporting ইউনিট থাকে।

এছাড়া বিগ্রেড ফোর্সের কাঠামোর বাইরে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের Staff দায়িত্ব পালন করে Station কমান্ড। তিনি একজন সিনিয়র অফিসার ছিলেন। জিয়ার সাথে কমিশন প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও Promotion থেকে বঞ্চিত ছিলেন দীর্ঘদিন। (যেহেতু ইউনিট/ফোর্সেস কমান্ডার ছিলেন না, সেনাবাহিনীর অভ্যুত্থানগুলোতে মূলত ইউনিট ও বিগ্রেডগুলো জড়িত ছিল তাই তাদের সার্বিক পরিকল্পনা ও গোপনীয় অ্যাকশন Programme সব হামিদ সাহেবের অগ্রিম জানার কথা নয়। এসব ক্ষেত্রে অনেক সময় জড়িত জুনিয়র অফিসারেরাও সব সময় সবকিছু অগ্রিম জানত না। তবে অনেক ক্ষেত্রে হামিদ সাহেবের উল্লিখিত বিভিন্ন ব্যর্থতা মূল্যায়নের অবকাশ রাখে।

খালেদ, হুদা, হায়দার সৈনিকদের উদ্যোগে হত্যা হয়নি– কেন, কী করে কার ইঙ্গিতে কী স্বার্থে এসব হত্যাকাণ্ড হলো এর একটা তদন্ত পর্যন্ত অদ্যাবধি হয়নি। আমরা মনে করি, খালেদ, হুদা, হায়দারের এই হত্যাকাণ্ড একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সুদূর প্রসারী ষড়যন্ত্রের নীল নক্‌শা ছিল– এই হত্যাকাণ্ডের বিচার হওয়া উচিত।

৩রা নভেম্বর জড়িত অফিসারেরা যখন জানল যে, ডালিম গংরা আত্মসমপর্ণের শর্ত অনুযায়ী দেশ ত্যাগ করেছে কিন্তু জেলে নির্মমভাবে হত্যা করেছে ৪ জাতীয় নেতাকে তখন ৩রা নভেম্বর অংশগ্রহণকারী অফিসাররা ডালিমদেরকে বহনকারী Plane টি আকাশে উড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং সেই মোতাবেক বিমান বাহিনীর অংশগ্রহণকারী কয়েকজন অফিসারের সাথে তারা আলাপও সেরে নিয়েছিলেন। কিন্তু খবর নিয়ে জানা গেল, ওদেরকে বহনকারী Plane টি তখন রেঙ্গুনের আকাশে। সবার মধ্যে তখন চরম উত্তেজনা।

খালেদ হত্যার প্রেক্ষাপট

৭ নভেম্বর ভোর রাতে খালেদ যদি রহস্যজনকভাবে নির্মম ও মর্মান্তিক হত্যার শিকার না হতেন অথবা খালেদ, হুদা, হায়দার ও নুরুজ্জামান (রক্ষীবাহিনী প্রধান) যদি ঐ বিশৃঙ্খল ও উত্তেজিত মুহূর্ত এড়িয়ে গিয়ে কিছু সময়ের জন্য আত্মগোপন করে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতেন তাহলে পুরো পরিস্থিতি ভিন্ন রূপ লাভ করতে পারত। কারণ, সাধারণ সৈনিকদের মধ্যে তাদের নিজস্ব ১২ দফা দাবি ও অফিসারদের বিরুদ্ধে উত্তেজনার বীজ ছড়িয়ে যে বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি করেছিল কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সেনাবাহিনীর চেইন অব কমান্ড ফিরিয়ে আনার প্রশ্নে সৈনিক

অফিসার আবার এক হয়ে যাওয়ার যে সম্ভাবনা ছিল তার আরো একটি কারণ ছিল এই বিদ্রোহের নের্তৃত্বের কোনো একক কমান্ড কাঠামো ছিল না এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেও সাধারণ সৈনিকদের ব্যবহার করার কোনো পরিবেশ বিরাজ করছিল না। তাই জিয়া কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সেনাবাহিনীর চেইন অব কমান্ড ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে অফিসার সৈনিকদেরকে এক করার উদ্যোগ গ্রহণ করে সফল হয়েছিলেন। এছাড়া এই উত্তেজিত বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি ঢাকার বাইরে রংপুর, যশোর, বগুড়া ও চট্টগ্রাম সেনানিবাসগুলোতে ছিল না। খালেদ, হুদা, হায়দার, রক্ষীবাহিনী প্রধান নুরুজ্জামান প্রথমে একসাথেই ছিলেন। আসাদগেট থেকে নুরুজ্জামান চলে গেলেন সাভারের উদ্দেশ্যে, বাকি তিনজন আসলেন শেরেবাংলা নগরে অবস্থানরত রংপুর থেকে খালেদের সমর্থনে আগত দশম বেঙ্গল রেজিমেন্টে। খালেদ, নুরুজ্জামান যদি বিচ্ছিন্ন না হয়ে ঐ রাতটি অন্যত্র থেকে পুরো পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে সকালে আরও কিছু সময় নিয়ে নিজেদের অনুগত অফিসার সৈনিকদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন তাহলে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ সৈনিকদেরকে তাদের ১২ দফা দাবি ও তাদেরকে অফিসাররা ক্ষমতা দখলের জন্যে অবৈধভাবে ব্যবহার করছে এই অজুহাত দেখিয়ে খালেদের বিরুদ্ধে সৈনিকদের একটি মোটিভ্যাটেড অংশ যে ভারতপন্থী বলে অপপ্রচার করছিল, কিছু সময় নিয়ে আবার অনুগত সৈনিকদের মাধ্যমেই সাধারণ সৈনিকদেরকে এই অপপ্রচারের বিরুদ্ধে পাল্টা বুঝানোর যথেষ্ট সুযোগ ছিল– কারণ যারা নেপথ্যে সাধারণ সৈনিকদের মধ্যে অফিসারদের বিরুদ্ধে সৈনিদেরকে উত্তেজিত করে তুলেছিল তাদের রাজনৈতিক কোনো পরিকল্পনা বা উদ্দেশ্যে সম্পর্কে সাধারণ সৈনিকরা অবহিত ছিল না। যদি অবহিত করা হতো তাহলে খালেদ পক্ষের সৈনিকরা বাকি সাধারণ সৈনিকদেরকে এই বলে বুঝাতে সক্ষম হতো যে, খালেদ গংরা যদি আমাদেরকে ব্যবহার করে থাকে তাহলে আমরা এখন কার স্বার্থে ব্যবহৃত হচ্ছি। তখনই সৈনিকদের মধ্যে বাস্তব উপলব্ধি আসত যে, আসলে আমাদের দাবি আদায় ও অফিসারদের বিরুদ্ধে বলে আমাদের মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে সেনাবাহিনীর চেইন অব কমান্ড ভেঙে দিয়ে আমাদেরকে সামনে রেখে পর্দার অন্তরালে অবশ্যই অন্য কোনো স্বার্থান্বেষী মহল এই খেলায় রয়েছে। কয়েক ঘণ্টা সময়ের ব্যবধানে খালেদের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের কারণে যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছিল তাও দূর হয়ে যেত। নতুন সৃষ্ট অবস্থায় সেনাবাহিনীর চেইন অব কমান্ড-এর প্রশ্নে সেনাবাহিনীতে রক্তপাত এড়ানোর লক্ষ্যে জিয়া-খালেদ হয়তো এক হয়ে যেতেন।

জাসদ ও মোশতাককে পাশ কাটিয়ে সেনাবাহিনীকে এক রাখার উদ্দেশ্যে জিয়াই এর উদ্যোগ নিতেন। জিয়া জানতেন, খালেদকে এড়িয়ে গেলে

সেনাবাহিনীতে রক্তপাত শুধু নয়, জাসদের সাথে তার সমঝোতার বিকল্প থাকবে না এবং এই সমঝোতা জিয়ার জন্যে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হবে। খালেদ কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত বিচারপতি সায়েম তখনও প্রেসিডেন্ট। জিয়া দায়িত্ব নেয়ার পর কিন্তু সায়েমকে সরিয়ে দেননি। তাই সায়েমকে রেখে জিয়া খালেদ এক থাকার চেষ্টা করতেন। পরবর্তীতে কী হতো সেটা সময় ও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করত। সায়েম থাকাটা খালেদের জন্যে বাড়তি সুবিধা হতো। তবে জিয়ার প্রশ্ন থাকত সেনা প্রধান কে হবে। কারণ ইতোমধ্যে খালেদ সেনাপ্রধান হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন। এ ব্যাপারে জিয়া খালেদের মধ্য এক থাকার প্রশ্নে একটি সমঝোতা অবশ্যই হতো; এর বিকল্প দেখা যাবে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অপপ্রচারের কারণে যে বিভ্রান্তি সৈনিকদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল তার অনেকটা অবসান ঘটত এবং খালেদ অনুগত ইউনিটগুলো তৎপর হতো, ঢাকার বাইরে বিভিন্ন সেনানিবাস থেকেও সমর্থন পেত। সর্বোপরি রক্ষীবাহিনীর পুরো সমর্থন নিয়ে হয়তো খালেদ আবার ফিরে আসত। এই মূল্যায়ন তখন যারা বুঝেছিলেন তারাই খালেদ, হুদা, হায়দারকে ঠান্ডা মাথায় হত্যার নির্দেশ দিয়েছিল।

খালেদ, হুদা, হায়দার এরা জীবিত থাকলে সময় মতো যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্যে খালেদ গংরা রাজনৈতিক সমর্থন নিয়েই পাল্টা ব্যবস্থা নেয়ার পরিকল্পনা করতেন।

খালেদ, হুদা, হায়দার হত্যার পর খালেদ সমর্থক শাফায়েত জামিলসহ কিছু অফিসার আত্মগোপন করলেন, বাকিরা আত্মসমর্পণ করল। এই অফিসারদের ইউনিটগুলো দিকনির্দেশনার অভাবের কারণে নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল।

তাৎক্ষণিক খালেদ গংদের কিছু করার ছিল না। পুরো জাতি তখন বিভ্রান্তির মধ্যে। শুধু ঢাকা সেনানিবাসে উত্তেজনা বিরাজ করছিল, চলছিল খালেদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার এই বলে যে, খালেদ যে ভারতপন্থী তার প্রমাণ পাওয়া গেছে তার সাথে কয়েক কোটি ভারতীয় মুদ্রা পাওয়া গেছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

ব্যাপকভাবে উদ্দেশ্য প্রণোদিত এই অসত্য প্রচার চালাচ্ছিল যেন অফিসার বা সৈনিকদের মধ্য থেকে কেউ খালেদের এই হত্যার বিরুদ্ধে আওয়াজ না করে অথবা খালেদের পক্ষে যেন পাল্টা কেউ নতুন উদ্যোগ গ্রহণ না করে। সর্বত্র খাতে পক্ষের অফিসারদের বিরুদ্ধেও নানান অভিযোগ উত্থাপন করা শুরু হলো।

খালেদ মোশাররফ, হুদা, হায়দারের লাশগুলো সিএমইচ-এ সংরক্ষিত ছিল। কর্নেল হুদার স্ত্রীকে রংপুর থেকে হেলিকপ্টার যোগে ঢাকায় আনা হলো। তাদের পরিবারের কাছে লাশগুলো হস্তান্তর করা হলো। জিয়া ও অন্যরা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। যারা দেখেছেন, তারা বলেছিলেন, খালেদের পরিবারকে সাহায্য-সহানুভূতির আশ্বাস দিলেন। পরিবারের সদস্যরা খুব বিনীতভাবে সেদিন তা

প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। যারা দেখেছেন, তারা বলেছিলেন, খালেদের মৃত মুখমণ্ডল দেখে মনে হচ্ছিল যেন তিনি হাসছিলেন। তার আরো যেন অনেক কিছু বলার ছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধের সর্ববৃহত্তম দুই নং সেক্টরের কমান্ডার– যিনি স্বাধীনতা যুদ্ধের শেষলগ্নে রণাঙ্গনে পাক হানাদার বাহিনীর আর্টিলারি সেলে কপালে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে ভারতের বিভিন্ন হাসপাতালে সর্বশেষ লক্ষ্ণৌর হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা শেষে দেশে ফিরে এসেছিলেন। আমরা সেদিন তার আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম। খালেদ ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে সারা রাত সৈনিক-অফিসারদের সাথে কথা বলেছিলেন। অনেক প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। হঠাৎ ভোর রাতে বহিরাগত কিছু অফিসারের সহযোগিতায় পরিবেশ হয়ে ওঠে উত্তপ্ত। এক পর্যায়ে নিষ্ঠুরভাবে তাদেরকে হত্যা করা হলো। সে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্য। খালেদ শেষে বলে গিয়েছিলেন, 'দেখ আমার কোনো দোষ নেই– আমি কোনো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করিনি– আমি দেশটাকে ভালোবাসি, এটাই হয়তো আমার অপরাধ– তোমরা ভুল কোরো না, আমাদের শরীরে এখনও রণাঙ্গনের মাটির গন্ধ রয়েছে।' বাকি কথাগুলো শেষ করার আগেই ঘাতকের গুলির আঘাতে ৩ জন লুটে পড়ল মাটিতে। কর্নেল হুদা এসেছিলেন রংপুর থেকে। হায়দার নিজে বিয়ের বাজার করতে এসেছিলেন চট্টগ্রাম থেকে। ঐ দিন রাতে টেলিফোনে কুশল বিনিময় করে খালেদের সাথে দেখা করেন। রাতে এসেছিলেন বঙ্গভবনে, আর ফিরে যাওয়া হলো না।

আমিও কর্নেল হুদার সাথে রংপুর থেকে ৪ নভেম্বর এসেছিলাম ঢাকায়।

সবার পরামর্শক্রমে ৬ নভেম্বর বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্যে ফিরে গেলাম ফ্লায়িং ক্লাবে একটি Aircraft নিয়ে। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে আমি রণাঙ্গনে এই ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট গঠন করি এবং রণাঙ্গনে এই ইউনিটের প্রতিষ্ঠাতা অধিনায়কের দায়িত্বে ছিলাম, তাই আমি যদি ঐ রাতে খালেদ, হুদা, হায়দারের সাথে ১০ম ইস্ট বেঙ্গলে থাকতাম, তাদেরকে হয়তো বাঁচাতে পারতাম, না হয় ওদের সাথে আমারও একই পরিণতি হতো। জাসদের সাথে জিয়ার সমঝোতার নাটকের অবসানের পর জিয়া কিন্তু ব্যস্ত ছিলেন সিভিল প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা, কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন এবং সর্বোপরি অফিসারদের নিজ নিজ ইউনিটে ফিরিয়ে এনে সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা পুনঃস্থাপন করা অর্থাৎ সেনাবাহিনীকে ঢেলে সাজানোয়। তার অত্যন্ত বিশ্বস্ত জেনারেল মঞ্জুরকে CGS করলেন। ব্রিগেডিয়ার মহসীনকে DMO-এর দায়িত্ব দিলেন, ব্রিগেডিয়ার আমিনুল হককে ৪৬ ব্রিগেডের দায়িত্ব দিলেন, মেজর জেনারেল নূরুল ইসলাম (শিশু)-কে AG-এর দায়িত্ব ও মেজর জেনারেল মীর শওকত আলীকে ৯ পদাতিক ডিভিশন-এর GOC নিয়োগ দিলেন। জেঃ এরশাদ Deputy Chief of Army. এমনি করে

তার পক্ষের সবাইকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে বসালেন এবং কিছু সময়ের মধ্যে এই ঢেলে সাজানো কাজ সম্পাদন করে নিজেই ডেপুটি চিফ মার্শাল 'ল' Administrator থেকে Chief Martial law Administrator-এর দায়িত্ব নিলেন।

যদিও পরবর্তীতে জাসদের কিছু করার ছিল না। তবুও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জিয়া জাসদের ওপর কড়া নজরই শুধু রাখেননি, কী করে জাসদকে শিক্ষা দেয়া যায় সে ব্যাপারেও সজাগ ছিলেন। তিনি জানতেন তার ব্যাপারে জাসদের মন-মানসিকতা। ৬ নভেম্বর গুলশানের এক বাড়িতে জাসদের এক গোপনীয় বৈঠকে বলা হয়েছিল যে, 'জিয়াকে বিশ্বাস করা যায় না, তিনি কালসাপ, জিয়াকে হত্যা করা উচিত'।

যদিও অনেকে সেই বৈঠকে এর আপত্তি করেছিল কিন্তু সেটা ছিল পরিস্থিতি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনার জন্যে (ইনুর সাক্ষাৎকার ৬ নভেম্বর ভোরের কাগজ। ৯৮)। অনেকের ধারণা, সেই মুহূর্তগুলোকে জিয়ার সাথে সিরাজুল আলম খানের হয়তো যোগাযোগ ছিল। সিরাজুল আলম খানকে কিন্তু তাহের, ইনুর সাথে শেষ পর্যায়ে আর কোনো বৈঠকে দেখা যাচ্ছিল না। জিয়া তাহের ইনুকে দ্বিতীয় ফিল্ড রেজিমেন্টে ৭ নভেম্বর জিজ্ঞেসও করেছিলেন, 'সিরাজুল আলম খান কোথায়?'

জিয়া সেনাবাহিনীতেও সৈনিক সংস্থার সদস্যদের চিহ্নিত করে তাদেরকে কী করে দমানো যায়, সে ব্যাপারে গোপনীয় তৎপরতা চালাচ্ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে ছোটখাটো অনেক বিচ্ছিন্ন ঘটনাও ঘটেছিল। অনেককে এসব ঘটনায় প্রাণও দিতে হয়েছিল। সেনানিবাসের বাইরে জাসদের পরবর্তী কার্যকলাপের ওপর চলছিল গোয়েন্দার কড়া নজর। ইতোমধ্যে ধরপাকড়ও শুরু হয়ে যায়। ২২ নভেম্বর তাহেরের ভাই ইউসুফকে ও ২৩ নভেম্বর তাহেরকে বন্দী করা হয়। ২৬ নভেম্বর ভারতীয় দূতাবাসে হামলার প্রচেষ্টা চালায় গণবাহিনী, যদিও তাহেরের ভাই আবু ইউসুফ (৫ নভেম্বর '৯৮ ভোরের কাগজ) এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, আসলে তাদের উদ্দেশ্য ছিল মতিঝিল আদমজী কোর্টে মার্কিন দূতাবাসে হামলা চালিয়ে রাষ্ট্রদূতকে জিম্মি করা। কিন্তু তা শেষ পর্যন্ত করা হয়নি।

ভারতীয় দূতাবাসে হামলার ষড়যন্ত্র ও অব্যাহত জাসদের গোপন বৈঠকে বিভিন্ন সিদ্ধান্তের খবরের সূত্র ধরেই কিন্তু ২২ ও ২৩ নভেম্বর আবু ইউসুফ ও তাহেরকে বন্দী করা হয়েছিল।

ভারতীয় দূতাবাসে হামলার রহস্য অনেকের আজো অজানা। জাসদ এই হামলার মাধমে দেশবাসীকে হয়তো ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেছিল যে, বর্তমান রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিয়ে যে খেলা, এর পেছনে ভারত রয়েছে। অথবা জাসদ ভারতীয় দূতাবাস আক্রমণ করে রাষ্ট্রদূতসহ সবাইকে যদি হত্যা করতে পারত, সে ক্ষেত্রে জাসদ হয়তো মনে করেছিল যে, ভারত মৈত্রী চুক্তি মোতাবেক আমাদের

দেশে সৈন্য পাঠাতে বাধ্য হবে। অথবা ঐ হামলার (যদি সফল হতো) ধারাবাহিকতায় অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ টার্গেটে হামলা অব্যাহত রেখে পুরো দেশে একটি বিশৃঙ্খলা তথা চূড়ান্ত লক্ষ্য একটি ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করা। অবশ্যই জাসদের একটি উদ্দেশ্য ছিল, না হলে এ ধরনের একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হঠাৎ ঘটত না।

জাসদের ভিতরে লুকিয়ে থাকা কোনো মহল হয়তো দেশের পরিস্থিতি অন্য ধারায় প্রবাহিত করার জন্য ভারতীয় হস্তক্ষেপ প্রত্যাশা করছিল বিধায় এই হামলার পরিকল্পনার ঘটনার নেপথ্যে গভীর ষড়যন্ত্রে ছিলেন, তারা হয়তো ভারতপন্থী ছিলেন না। তাদের উদ্দেশ্য ছিল হয়তো ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করা। তখন কিন্তু জাসদের ভিতরে নের্তৃত্বের সমন্বয়ের সংকটও ছিল। এছাড়া ভারতও কিন্তু মোশতাকের ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে পুরো পরিস্থিতি খুব সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করছিল এবং বাংলাদেশের তখনকার বিরাজমান অবস্থায় নিজেদের উদ্বেগও প্রকাশ করেছিল। কর্নেল তাহেরের ভাই আবু ইউসুফ খান বীর বিক্রমের ৫ নভেম্বর '৯৮ সালে ভোরের কাগজে এক সাক্ষাৎকারে উপরে উল্লিখিত কথাগুলোর যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায়।

তিনি বলেছিলেন, 'প্রকাশ্যে না হলেও গুপ্তভাবে কেউ থাকতে পারে এই অর্থে যে, জাসদ হঠাৎ করে যে রকম একটা ফুলফুলা রাজনৈতিক দল হয়ে গেল, তখনকার পরিস্থিতিতে আমার মনে হয় হয়তো কেউ পিছন থেকে এটাকে মদদ যোগাচ্ছিল। আমি নিশ্চিত জানি না, তবে হতেও পারে। যেমন দেখেন ঐ সময় মিটিং হচ্ছে, মিছিল হচ্ছে, কত কিছু হচ্ছে, টাকা পয়সার কোনো অভাব ছিল না। একটি লিফলেট ছাপানোর জন্য আমি আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা ধার করে হাসানুল হক ইনুকে দিয়েছি।' আবু ইউসুফ আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়ে জাসদের যৌবনের দিনগুলোর কথা বলেছিলেন। তিনি জাসদ নেতৃবৃন্দের উপর ক্ষোভ করে আরও বললেন, 'কতিপয় কেন উপরতলার নেতৃবৃন্দের প্রায় কেউই পরবর্তী কালে ৭ নভেম্বরের চেতনা ধারণ করেননি। সিরাজুল আলম খান থেকে শুরু করে যে নাকি পার্টির পলিটিকেল কেন্দ্রবিন্দুই ছিলেন, পুরো পার্টি নের্তৃত্বই এমনভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে গেল যে, নিচের দিকের লোকেরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। আমি বলিব এখনও তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে একটা নের্তৃত্বের জন্যে।' তিনি আরও উল্লেখ করলেন, কী কারণে জানি না মার্কিন দূতাবাসের পরিবর্তে ভারতীয় দূতাবাস টার্গেট হয়েছিল ইত্যাদি। নভেম্বরের শেষ দিনগুলোতে দেশের প্রত্যেকটি সেনানিবাস জিয়ার শক্ত নিয়ন্ত্রণে। তাহের ও জাসদের নের্তৃত্বাধীন বিদ্রোহ কিন্তু তখন সম্পূর্ণ হারিয়ে গিয়েছিল। সাধারণ সৈনিকদের মধ্যে আর কোনো উল্লাস ধ্বনিত হচ্ছিল না। হর্ষধ্বনি,

আগ্নেয়াস্ত্রের গুলিবর্ষণে আকাশ বাতাস আর প্রকম্পিত হচ্ছে না। জিয়াউর রহমান আবির্ভূত হন সময়ের নায়ক হিসেবে।

ভারত কিন্তু ১৫ আগস্টের পর থেকেই বাংলাদেশের উপর কড়া নজর রেখেছিল। মোশতাকের সময় দিল্লিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা অ্যাটাশ ব্রিগেডিয়ার মনজুর একটি বার্তা নিয়ে ঢাকায় এসেছিলেন। বার্তাটি হলো- বাংলাদেশের পরিবর্তনকে ভারত ঠিক সুনজরে দেখছে না। এটা শুনে তাকে পাল্টা বলা হলো, ভারত থেকে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে যদি একটি মাত্র ডিভিশন সৈন্যও রওয়ান দেয় তবে চীন থেকে আসবে পাঁচ ডিভিশন সৈন্য। আওয়ামী লীগের তরফ থেকে কোনো সাড়া না পাওয়ায় ভারত সরকার তখন মৈত্রিচুক্তি সংশ্লিষ্ট বিতর্কিত ধারা পুনরুজ্জীবনে আগ্রহী হয়নি। ঐ ধারায় অভ্যন্তরীণ গোলযোগের সময় ভারতের প্রতিরক্ষা সহযোগিতা পাওয়ার সুযোগ ছিল। আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা যারা কেউ দেশে কেউ বা ভারতে আত্মগোপন করছিল তারা মোটামুটিভাবে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যমে রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু করার ঘরোয়া তৎপরতা চালাচ্ছিল। জিয়া সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা ফিরে এনে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার পরিকল্পনায় ব্যস্ত। ঠিক সেই মুহূর্তে যদি ভারতীয় দূতাবাস হামলা ব্যাপকভাবে সফল হয়ে যেত তাহলে ভারত বিলম্বে হলেও রাজনৈতিক সমর্থন সংগঠিত করে মৈত্রী চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ হস্ত ক্ষেপ করার অবকাশ ছিল। ঐ ভারত দূতাবাস হামলার পিছনে এই উদ্দেশ্য বাস্ত বায়নে একটি দেশি-বিদেশি চক্রান্ত ছিল বলে অনেকের ধারণা। যদিও সেনাবাহিনী সম্পূর্ণ জিয়ার নিয়ন্ত্রণে তবুও ছোটখাটো বিচ্ছিন্ন ঘটনা চাপা ক্ষোভ যে ছিল না তা নয়। জিয়া দেশ পরিচালনার পাশাপাশি নীরবে সেগুলোও মোকাবিলা করে যাচ্ছিলেন খুব কঠোরভাবে। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অনেক সেনাসদস্য বন্দী ছিলেন। অনেকে চাকরিতে তখনও যোগ দেননি। বিচারের কাজ শুরুর প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন করা হলো। গণভবনে বন্দী অবস্থায় আমিসহ কর্নেল মালেক, কর্নেল গাফফার বীর উত্তম, মেজর ইকবাল, মেজর হাফিজ, মেজর ইসলাম, ক্যাপ্টেন তাজ, ক্যাপ্টেন হুমায়ুন, ক্যাপ্টেন হাফিজ উল্লাহ, মেজর নাসির সবার তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়া ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। ইঞ্জিনিয়ার্সের কর্নেল মাহবুব ছিল আমার তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান। জিয়ার পক্ষ থেকে মেজর জেনারেল শওকত এসে আমাদেরকে বলে গেলেন, প্রয়োজনে তোমরা নিজস্ব উকিল নিয়োগ করতে পারবে। কর্নেল শাফায়াত জামিল বন্দী ছিলেন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে। খালেদের অভ্যুত্থানে জড়িত বিমানবাহিনীর স্কোয়ার্ডন লিডার লিয়াকত, ইকবাল, ওয়ালীসহ প্রায় ১০/১১ জন ছিল ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বিচারের অপেক্ষায়। ঢাকার বাইরে বাংলাদেশের সেনানিবাসগুলোতে চলছিল

খালেদ পক্ষের অফিসার অথবা সন্দেহভাজন অফিসারদেরকে বাদ দিয়ে জিয়াভক্তদেরকে দায়িত্ব প্রদানের পালা। ঐ দিকে জাসদের টগবগে যুব কর্মীরা বিশেষ করে Suicidal গ্রুপের গণবাহিনী সদস্যদের দেশত্যাগের হিড়িক। জিয়ার মূল টার্গেট ছিল জাসদ ও খালেদ গংরা। আওয়ামী লীগকে জিয়া কৌশলগত কারণে তখনও Disturb শুরু করেননি এবং জাসদ কর্তৃক ভারতীয় দূতাবাসে হামলা কঠোরহস্তে দমন করে ভারতকে খুশি করলেন। জাসদের কয়েকজন জঙ্গি কর্মীর সাথে পরে আমার কথা বলার সুযোগ হয়েছিল– তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ভারত দূতাবাস হামলার রহস্য। একজন বলেছিল ভেতরগত অন্য কোনো উদ্দেশ্য কারো থাকতে পারে। তবে আমরা চেয়েছিলাম রাষ্ট্রদূতকে জিম্মি করে তাহেরের মুক্তির জন্যে জিয়ার ওপর চাপ সৃষ্টি করা। সে আরো জানাল আমাদের সার্বিক ব্যর্থতার জন্য আমাদের নেতাদের পরিকল্পনা ও সমন্বয়ের অভাবই হচ্ছে মূল কারণ। সিরাজুল আলম খান অব্যাহত গোপন বৈঠক করে সময়ক্ষেপণ করেছিলেন। আমরা অনেকে অফিসার হত্যার বিরোধিতাও করেছিলাম। সর্বোপরি মিছিল, মিটিং-এ জনগণকে ব্যাপকভাবে সংগঠিত করার প্রস্তুতিও ছিল না। জিয়া যে সব অফিসারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস পরবর্তীতে এদেরই একটি অংশকে তার হত্যার অপরাধে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলতে হয়েছিল। এরা সবাই ছিল মুক্তিযোদ্ধা অফিসার। পরবর্তীতে জিয়া এদেরকেই সন্দেহের চোখে দেখছিলেন এবং এদেরকে গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে সরিয়ে অন্যত্র বদলি শুরু করেছিলেন অর্থাৎ মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদেরকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। পাকিস্তান থেকে ফেরত অফিসারদেরকে বেশি বিশ্বাস ও গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় নিয়োগ অব্যাহত রাখলেন। রাজনীতিতে স্বাধীনতা বিরোধীদেরকে পুনর্বাসনেরও ব্যাপক পরিকল্পনা নিলেন জিয়া। এতে মুক্তিযোদ্ধা অফিসাররা জিয়াকে অতি অল্পসময়ের মধ্যে আবার ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখা শুরু করলেন। জেঃ মঞ্জুরের চট্টগ্রামের বিদ্রোহের ঘটনার সূত্রপাত এখান থেকে শুরু হয়েছিল। মঞ্জুরকেও পরবর্তীতে চট্টগ্রাম থেকে Staff কলেজে বদলির নির্দেশ দিয়েছিলেন। খালেদের প্রয়াস যদি ৭ নভেম্বর উদ্দেশ্যবিহীন ঘটনা বানচাল না করত তাহলে পরবর্তী পটপরিবর্তনগুলো হতো না এবং বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচার অনেক আগেই সংগঠিত হতো।

'৭৫-এর নভেম্বর মাসে খালেদ, হুদা, হায়দার ছাড়াও অনেক অফিসার, সৈনিক প্রাণ হারিয়েছিলেন। এ রক্তাক্ত মাসের সূত্র ধরে পরবর্তীতেও অনেকে গোপন হত্যার শিকার, আবার অনেকে ফাঁসির কাষ্ঠে, অন্যদের বিদ্রোহের অজুহাতে প্রাণ দিতে হয়েছিল। মুক্তিযোদ্ধারা মুক্তিযোদ্ধাদের রক্ত হরণ করেছিল।

মুজিব বাহিনী থেকেই গণবাহিনী হয়েছিল। জিয়া, খালেদ, হুদা, হায়দার সবাই স্বাধীন বাংলা সরকারের অধীনে সেক্টর কমান্ডার হিসেবে রণাঙ্গনে বঙ্গবন্ধুর অনুগত হিসেবে সেদিন যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। জাসদের নেতারা আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ-সংগঠন ছাত্রলীগের নেতা ছিলেন। যুদ্ধ চলাকালীন বঙ্গবন্ধুর প্রশ্নে কোনো বিভেদ ছিল না। দুর্ভাগ্য আমাদের স্বাধীনতার পর আমরা এক থাকতে পারলাম না। এ ব্যর্থতা কার ইতিহাস এর মূল্যায়ন করবে।

সর্বশেষ আমি বলব, খালেদ, হুদা, হায়দার হত্যার খবর জাতির জানার অধিকার রয়েছে। বিলম্বে হলেও এর বিচার বিভাগীয় তদন্ত হওয়া উচিত। এছাড়া নভেম্বর '৭৫ এর ঘটনায় আরো যারা প্রাণ দিয়েছেন– নিরীহ অফিসার সৈনিক তারা শুধু পরিস্থিতির শিকার হয়েছিলেন। তাদের পরিবারদেরকে চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান আমি মনে করি জাতির নৈতিক কর্তব্য। এরা নিহত হওয়ার আগ মুহূর্তে মেয়াদ কম থাকার কারণে এবং অন্যান্য নিয়মের কারণে সেনাবাহিনীর সুযোগ-সুবিধা থেকেও বঞ্চিত।

পরিশেষে আবারও বলব মোশতাককে উচ্ছেদ সফল হয়েছিল কিন্তু চূড়ান্ত লক্ষ্য হয়তো অর্জন করতে পারেননি ৭ নভেম্বরের বিশৃঙ্খল অবস্থার কারণে।

ব্যাপক জনগণকে সংগঠিত না করে জাসদ যে ঝুঁকিপূর্ণ উদ্যোগ নিয়ে বিশেষ করে শুধু ঢাকা সেনানিবাসে যে উত্তেজনার বীজ ছড়িয়ে দিয়েছিল সেটাও তারা ধরে রাখতে পারেনি বিধায় দেশের মধ্যে ও পুরো সেনাবাহিনীর মধ্যে যে পরিস্থিতি বিরাজ করছিল সেই মুহূর্তে হয়তো জিয়া যে ভূমিকা পালন করেছে তার বিকল্প ছিল না। খালেদ হত্যার পর জাসদ অন্যের রান্না ভাত যেন জিয়ার প্লেটে তুলে দিয়েছিল। ৩ নভেম্বর গৃহবন্দি জিয়ার বাড়ির গার্ড রেজিস্টারে লেখা ছিল, তাহের Telephone করলে বলবে নেই আর তার বউ Telephone করলে বলবে ঘুমাচ্ছে। জিয়ার সাথে ঘটনার ব্যাপারে জাসদের কোনো পূর্ব পরিকল্পনা বা সমঝোতা ছিল না। ৭ নভেম্বর পরিস্থিতির আলোকেই সমঝোতা করতে চেয়েছিলেন বিধায় জিয়া ভবিষ্যৎ চিন্তা করে খুব সতর্কতা অবলম্বন করছিলেন।

৭ই নভেম্বর : একটি পর্যালোচনা

বিচারপতি সায়েম দায়িত্ব গ্রহণ করার পর আগের পার্লামেন্ট বাতিল করা হলো এবং দেশবাসীকে নতুন নির্বাচনের আশ্বাস দেওয়া হলো। দেশের মধ্যে গত দুই দিনের নানান ধরনের জল্পনা কল্পনা ও অনিশ্চয়তার অবসান ঘটল। খালেদের এত সতর্কতা সত্ত্বেও রাজনৈতিক মহল বলাবলি করছিল যে, খালেদ আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং খালেদ থাকলে শেষ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ রাজনৈতিকভাবে লাভবান হবে। তবে এ ব্যাপারে জনগণের মধ্যে কোনো খারাপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়নি, যেহেতু নতুন নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি ছিল। সেনাবাহিনীতে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ খালেদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। ইংরেজিতে একটি কথা আছে "Defeat is an orphan", ৭ই নভেম্বরের কারণে খালেদকে ব্যর্থ অভ্যুত্থানের নায়ক হিসেবে চিহ্নিত করা হলো ইতিহাসে। আমি আগেও বলেছি ৭ই নভেম্বরের ঘটনা ৩রা নভেম্বরের অভ্যুত্থানের পাল্টা কিছু নয়। অনেক আগ থেকেই সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলোতে কয়েকজন করে প্রতিনিধি গোপন সৈনিক সংস্থার কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিল। তাদের হাই কমান্ডের নির্দেশে ৭ই নভেম্বরকে তারা বেছে নিয়েছিল সঠিক সময় হিসেবে। ৬ নভেম্বর রাতে এলিফ্যান্ট রোডে কর্নেল তাহেরের ভাই আনোয়ার সাহেবের বাসায় জাসদ, গণবাহিনী ও বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা গোপন বৈঠক করে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী মোটামুটি তাদের প্রস্তুতি সম্পন্ন করে। ঢাকার সর্বত্র তারা একটি লিফলেট বিতরণ করে। সন্ধ্যায় ঐ লিফলেট বিতরণের পর ঢাকাতে বিভিন্ন মহলে গুজব ছড়িয়ে পড়ে কিছু একটা হতে যাচ্ছে, পাশাপাশি সেনাবাহিনীতেও সৈনিক সংস্থার একটা ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছিল। তাদের সিদ্ধান্ত ছিল, সেনানিবাসে রাত ১২টা ১ মিনিটে সৈনিক সংস্থার নের্তৃত্বে "Motivated" সৈনিকরা উপরের দিকে গুলি শুরু করবে এবং এটাই হবে জাসদ, গণবাহিনীর জন্য সংকেত। সাথে সাথে তারা বিভিন্ন এলাকা থেকে মিছিল বের করবে। আদমজি থেকে একটা বড় মিছিল বের করার পরিকল্পনা ছিল। সেনানিবাসে সৈনিকদের বিদ্রোহের সমর্থনে বাইরে মিছিল চলবে এবং জনসমর্থন পক্ষে আনার প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হবে। ১২-১ মিনিটে ঢাকা সেনানিবাসে

গোলাগুলি শুরু হয়ে গেল একই সময়ে বাইরে পরিকল্পনা অনুযায়ী যে মিছিলটি ঢাকাতে হয়েছিল তা আকারে খুব একটা বড় ছিল না। সকালের দিকে যদিও খণ্ড খণ্ড মিছিল রাস্তায় ছিল, সে মিছিলগুলোর মধ্যে জাসদ ছাড়াও অনেক আওয়ামী লীগ বিরোধী লোক ছিল।

৪ঠা নভেম্বর খালেদের বৃদ্ধা মাতাকে সামনে রেখে রাশেদ মোশাররফ ও মোস্তফা মহসীন মন্টুর নের্তৃত্বে যে মৌন মিছিল বেরিয়েছিল অনেকে পরবর্তীতে এই মিছিলকে খালেদের ৩রা নভেম্বর অভ্যুত্থানের সমর্থনে ছিল বলে অপপ্রচার শুরু করে। ৬ই নভেম্বর সন্ধ্যায় ৩রা নভেম্বরকে কেন্দ্র করে যে লিফলেট প্রচারিত হয়, এতে করে জনগণের মধ্যে নতুনভাবে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। ঢাকা সেনানিবাসে সিপাহিদের বিদ্রোহের ঘটনার সমর্থনে যদি জাসদের পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী রাজধানীতে ব্যাপক মিছিল ও সমাবেশের মাধ্যমে রাজনৈতিক সমর্থন ব্যাপক জোরদার করতে পারত, তাহলে জিয়াউর রহমান লংমার্চের পরিকল্পনা বাতিলসহ আরো অনেক সিদ্ধান্ত নিতে সংকটে পড়তেন। জনগণের মধ্যে জাসদের সমর্থন ব্যাপক ছিল না এবং পরিস্থিতিরও সদ্ব্যবহার সঠিকভাবে পরিকল্পনা মোতাবেক না করতে পারায় সকাল ১০/১১ টার মধ্যেই জাসদের প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছিল। ৩রা নভেম্বরের অভ্যুত্থানের অনেক আগেই এ মৌন মিছিলের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছিল। তাই এই মিছিলের সাথে খালেদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। ঢাকা সেনানিবাসের ভিতরে ৬ই নভেম্বর মধ্যরাত থেকে নিয়ে ৭ই নভেম্বর সকাল ১০টা-১১টা পর্যন্ত সৈনিক সংস্থার "সিপাহি সিপাহি ভাই ভাই, অফিসারের রক্ত চাই" শ্লোগান সহকারে অফিসার হত্যা এক ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল। কর্নেল তাহের সেনানিবাসের বাইরে থেকে সৈনিক সংস্থার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছিল। যদিও অধিকাংশ সিপাহিরা এর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছিল, কিন্তু বেশির ভাগ সৈনিক আসল পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য জানত না। অনেকেই অফিসার হত্যাকে সমর্থন না করে সেনাবাহিনীতে Chain of Command ফিরে আসুক সেটাই চেয়েছিল। অফিসার হত্যা অব্যাহত রেখে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে যেন না আসে সে জন্য জাসদের একটি অংশ ছাড়াও দেশি বিদেশি আরো একটি চক্রও জড়িত ছিল বলে অনেকের অভিযোগ রয়েছে। জাসদের একটি অংশও এই ব্যাপারটিকে সমর্থন করছিল না। পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনার লক্ষ্যে কর্নেল তাহেরদের পরামর্শক্রমে সৈনিক সংস্থার সদস্যরা অন্যান্য জিয়া-ভক্ত সৈনিকদেরকে নিয়ে জিয়াকে গৃহবন্দি থেকে উদ্ধার করে ২য় ফিল্ড রেজিমেন্টে অর্থাৎ কর্নেল রশিদের ইউনিটে নিয়ে আসে। সৈনিক সংস্থা ও জাসদ চেয়েছিল, সে মুহূর্তে যেহেতু জিয়ার গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে তাকে সামনে রেখে সিপাহিদের একতাকে তাদের পক্ষে আরো দৃঢ় করা এবং তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা

প্রয়োজন। জিয়া বিষয়টা ভালোভাবে বুঝে উঠার জন্য, বিশেষ করে সেনাবাহিনীর কমান্ড ঠিক করে আনার লক্ষ্যে প্রথম কয়েক ঘণ্টার জন্য সব ব্যাপারে জাসদের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেন। ঢাকা সেনানিবাসে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার উদ্যোগের পাশাপাশি জিয়া জাসদের রব, জলিলসহ অন্যান্যদের জেল থেকে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন এবং ১২ টার মধ্যে জিয়া সেনাবাহিনীর Chain of Command মোটামুটিভাবে ঠিক করে ঢাকা সেনানিবাসে শৃঙ্খলা অনেকটা ফিরিয়ে আনেন। এক কথায় সেনানিবাসের পরিস্থিতি জিয়া নিজ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন।

ঢাকাতে তখন কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে জাসদের লংমার্চের প্রস্তুতি চলছিল। খন্দকার মোশতাক সেনাবাহিনীর ভ্রাম্যমাণ ট্রাকে বসে জনগণকে বুঝানোর চেষ্টা করছিলেন যে সব কিছু তার পক্ষে হচ্ছে, জিয়া তো তার সেনা প্রধানই ছিলেন। তাই তিনি যেহেতু সেনানিবাসকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন, জিয়া তার অনুগত থাকবেন। সেনাবাহিনীর সৈন্য বোঝাই কয়েকটি ট্রাক বহর মিছিল করে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে যায়। জিয়ার ১২টায় লংমার্চে যোগদানের জন্য শহিদ মিনারে আসার কথা ছিল। তিনি আর আসলেন না। আর্মির যেই অংশটি সেই সময়ে শহিদ মিনারে গিয়েছিল তারা লংমার্চের উদ্দেশ্যে সমবেত জাসদ কর্মী ও নেতৃবৃন্দকে আল্লাহু আকবর ধ্বনি দিয়ে মারধর করে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। জাসদ এর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত জিয়া এবং তাহেরের এর নামে শ্লোগান দিচ্ছিল। শহিদ মিনারের আশপাশে মোশতাকের কিছু পোস্টার ও ছবি ছিল। জাসদের উত্তেজিত নেতা-কর্মীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়ার পর সেগুলো ছিঁড়ে ফেলে দেয় ও মোশতাকের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিতে থাকে। এর আগে কর্নেল তাহের রেডিও স্টেশনে এসেছিলেন ভাষণ দেওয়ার জন্য। সেখানে তখন মোশতাকও উপস্থিত ছিলেন। তাহের বা মোশতাক কাউকেই ভাষণ দিতে দেওয়া হলো না। জিয়াকে গৃহবন্দি অবস্থা থেকে মুক্ত করার আগে কর্নেল তাহের যদি ইচ্ছে করতেন তাহলে ৭ই নভেম্বর ভোরে রেডিওতে ভাষণ দিতে পারতেন এজন্য যে তখন পরিস্থিতি অনেকাংশে তাহেরের নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং সর্বত্র একটা বিভ্রান্তি ও থমথমে ভাব বিরাজ করছিল। সেক্ষেত্রে সেনানিবাসের বাইরে জাসদের রাজনৈতিক Mobilisation ব্যাপক হতো এবং ভাষণের পর পর জিয়াকে গৃহবন্দি অবস্থা থেকে মুক্ত করলে কর্নেল তাহের কিছু সময়ের জন্য সেনাবাহিনীতে তার একটা গ্রহণযোগ্যতা ও সমর্থন বৃদ্ধি করার চেষ্টা করতে পারতেন। সেনাবাহিনীতে বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে চাপা ক্ষোভ, একের প্রতি অন্যের হিংসা ও প্রতিশোধের অভিপ্রায় বিরাজ করছিল। সবকিছুকে উপেক্ষা করে একক তাহেরের পক্ষে শুধু সৈনিক সংস্থার নের্তৃত্বে পুরো বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে একটি কমান্ডের অধীনে এনে

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পরিচালনা করা সম্ভব ছিল না। এই বাস্তব উপলব্ধিতেই জিয়াকে গৃহবন্দি থেকে মুক্ত করে এনে প্রাথমিক পর্যায়ে জিয়াকে সামনে রেখে তার মাধ্যমে সব কিছু সামাল দেওয়ার কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। গৃহবন্দি থেকে জিয়াকে মুক্ত করে আনার সময় তাকে ধারণা দেয়া হয়েছিল যে দেশব্যাপী বিশেষ করে ঢাকাতে তাদের সমর্থনে ছাত্র, শ্রমিক, জনতার ঢল নামবে এবং পুরো সেনাবাহিনীর সৈনিকরাও একতাবদ্ধ রয়েছে। জিয়া ২য় ফিল্ডে বসে দেখলেন, সেনাবাহিনীর সৈনিকদের মধ্যে যে অংশটি বিদ্রোহের নের্তৃত্ব দিচ্ছে তাদের সমর্থনে বাইরে কোনো ব্যাপক রাজনৈতিক সমর্থন নেই অর্থাৎ জাসদ তাদের পরিকল্পনায় ব্যর্থ হয়েছে। ঐ পরিস্থিতিতে কারো পক্ষে সেনাবাহিনীকে একতাবদ্ধ করা হয়তো সম্ভব ছিল না বিধায় জিয়া সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে জোর দেন এবং তার নিজস্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিস্থিতির মোকাবেলা করেন। এক্ষেত্রে জিয়া অন্যের সৃষ্ট সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছিলেন। শুধু প্রশ্ন থেকে যাবে যে জিয়ার কি আর কোনো বিকল্প ছিল? জিয়ার পরবর্তী কার্যক্রমগুলো কি জাতীয় স্বার্থে ছিল? ঐ পরিস্থিতিতে জিয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসতে কি বাধ্য হয়েছিলেন? ঐ সময়ে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে জিয়ার জায়গায় অন্য কোনো সেনা অফিসার থাকলে তার কী করণীয় ছিল? ইতিহাস এর মূল্যায়ন করবে। আমি আগেও বলেছি, ৩রা নভেম্বরের ও ৭ই নভেম্বরে অভ্যুত্থানের সুবাদেই জিয়াউর রহমান পর্যায়ক্রমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন। পরের দিন জিয়ার পূর্ব প্রতিশ্রুতি মোতাবেক রব ও মেজর জলিল কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে আসেন। জিয়া যদি লংমার্চে আসতেন এবং নের্তৃত্ব দিতেন, দেশের অবস্থা কী হতো তা উল্লেখ না করে বলব, জাসদ পরবর্তীতে জিয়াকে কখনও তাদের নেতা হিসেবে গ্রহণ করে নিত না। শেষ পর্যন্ত তাহেরই নের্তৃত্বে আসার চেষ্টা করতেন। জিয়ার এ ব্যাপারে সজাগ উপলব্ধি ছিল। তাই জিয়া সকাল ১১টা পর্যন্ত জাসদের সাথে ঐকমত্যে ছিলেন। ১১টার পরে লংমার্চে শরিক না হয়ে জিয়া জাসদের সাথে তার সম্পর্ক অনানুষ্ঠানিকভাবে ছিন্ন করে জিয়া মোশতাক গংদের ক্ষতি না করে তাদেরকেও পাশ কাটিয়ে সব কিছু নিজের নিয়ন্ত্রণে এনে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার স্বপ্ন দেখেন, সেই মোতাবেক তিনি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসেন।

জিয়া সকাল ১১টার পরে জাসদের সাথে তার পূর্ব প্রতিশ্রুতি মোতাবেক আর কোনো সমঝোতা রক্ষা করছিলেন না এবং আরো পরবর্তীতে একের পর এক জাসদের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগের প্রেক্ষিতে অ্যাকশানে গিয়েছিলেন। সে জন্য জাসদ জিয়াকে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে আখ্যায়িত করে। জিয়াও ১১টার পরে লংমার্চে না গিয়ে প্রশাসন ও বিভিন্ন মহলের সাথে যোগাযোগ

শুরু করেন। বিশেষ করে আমেরিকান দূতাবাসের সাথে লংমার্চের নির্ধারিত সময় সকাল ১২টার আগেই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সেরে নিয়েছিলেন। জিয়া লংমার্চে না গিয়ে কৌশলে সব কিছু নিজের নিয়ন্ত্রণে এনে বিচারপতি সায়েমকে প্রেসিডেন্ট ও Cheif Martal Law Administrator রেখে জিয়া নিজে সেনা প্রধান ও Deputy Cheif Martal Law Administration হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেই দিনের এবং সে সময়কার বিরাজমান পরিস্থিতিতে বৃহত্তম জাতীয় স্বার্থে জিয়ার এর বিকল্প হয়তো আর কিছু করণীয় ছিল না। জিয়ার কৌশলগত এই ভূমিকার বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে তখন কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া ছিল না। সবাই আশা পোষণ করছিল, জিয়া নতুন নির্বাচন দিয়ে সাংবিধানিক প্রক্রিয়া পুনরায় চালু করবেন। ৭ই নভেম্বরের প্রথম পর্বে সৈনিক সংস্থার নের্তৃত্বে জিয়াকে গৃহবন্দি থেকে ২য় ফিল্ড রেজিমেন্টে নিয়ে আসা, জিয়ার সাথে জাসদের সমঝোতা, পরে সমঝোতা ভেঙে এবং সর্বোপরি দ্বিতীয় পর্বে জাসদ ও মোশতাক গংদেরকে বাদ দিয়ে ব্যক্তি সমর্থনে ও কৌশলে এগিয়ে যাওয়ার কারণে ৭ই নভেম্বর বিপ্লব দিবস হিসেবে সঠিক মূল্যায়ন অনেকের কাছে এখনও বিতর্কিত। আমি ৬ই নভেম্বর খালেদ মোশারফ, কর্নেল হুদা ও অন্যান্য সহকর্মীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে Flying Club এর একটি Cessna Aircraft করে রংপুরে আমার ইউনিটে ফিরে যাই। যাওয়ার সময় খালেদ আমাকে বলেছিলেন, রংপুর বিগ্রেড যেন নিয়ন্ত্রণে থাকে। রংপুরে অবস্থানরত, রক্ষীবাহিনীর ইউনিটগুলোর সাথে যোগাযোগ রাখবে, প্রয়োজনে ইউনিট নিয়ে ঢাকার দিকে আসতে হতে পারে। সর্বশেষ বললেন, "যশোর বিগ্রেডের দিকে নজর রাখবে এবং ঢাকার সাথে যোগাযোগ রাখবে।" আমার যুদ্ধকালীন ইউনিট ১০ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ইতোমধ্যেই রংপুর থেকে ঢাকায় এসে শেরে বাংলা নগরে অবস্থান করছিল। এই ইউনিট যেহেতু যুদ্ধ চলাকালীন আমার অধিনায়কত্বে 'কে' ফোর্সের অধীনে ছিল সে কারণে এই ইউনিটের উপর খালেদের আস্থা ছিল অনেক বেশি। ৬ই নভেম্বর রাতে ঐ ভয়াবহ পরিস্থিতির সময় খালেদ, রক্ষীবাহিনীর প্রধান নুরুজ্জামান, কর্নেল হায়দার ও কর্নেল হুদা ১০ম বেঙ্গলে আশ্রয় নেওয়ার উদ্দেশ্যে কাঁঠাল বাগান খালেদের এক আত্মীয়ের বাসা হয়ে শেরে বাংলা নগরের দিকে যাত্রা শুরু করেন। আসাদ গেট পৌঁছার পর ব্রিগেডিয়ার নুরুজ্জামান সাভার অভিমুখে চলে যান, বাকি তিন জন ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে এসে উপস্থিত হন। সারারাত ধরে খালেদ-হুদাদের সাথে জিয়া-ভক্ত অফিসারদের কথা কাটাকাটি চলছিল। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে পাকিস্তান আর্টিলারি সেলে কপালে আঘাতপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা সেক্টর কমান্ডার খালেদ মোশাররাফ শান্তভাবে সব প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন। তিনি এক বসায় শেষ রাত পর্যন্ত প্রায় ২/৩ প্যাকেট সিগারেট শেষ করলেন। রংপুর থেকে ঢাকা আসা

এই ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে সৈনিকদের কোনো বিদ্রোহ ছিল না। মাত্র কিছু সংখ্যক অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যে উপরের ইঙ্গিতে কিছুটা উত্তেজনা ছিল। বড় ধরনের কোনো ষড়যন্ত্র ও ঢাকা সেনানিবাস থেকে কারো যোগসাজস ছাড়া এই সুপরিকল্পিত নির্মম হত্যাকাণ্ড ভোর রাতে সংঘটিত হতে পারে না। বিদ্রোহীদের হাতে যদি খালেদ-হুদা-হায়দার নিহত হতেন তাহলে সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে ও ব্যবস্থাপনায় তাদের লাশ ঢাকা সি.এম.এইচে এনে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করা তাদের আত্মীয়-স্বজনকে খুব স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় খবর পৌছানো, এমনকি কর্নেল হুদার স্ত্রীকে রংপুর থেকে আনার জন্য হেলিকপ্টার পাঠানো ইত্যাদি ঐ উত্তেজিত পরিস্থিতিতে সম্ভব হতো না। সে দিন খুব সুপরিকল্পিতভাবে এও প্রচার করা হয়েছিল যে, খালেদ ইন্ডিয়ান এজেন্ট ছিল এবং তার নিকট ইন্ডিয়ান টাকা পাওয়া গিয়াছে যা ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট ও উদ্দেশ্যে প্রণোদিত। এ প্রচার শুধু খালেদের বিরুদ্ধে ছিল না, পরোক্ষভাবে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধেও ছিল। অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের হত্যাকাণ্ডের বিচারের পাশাপাশি এই বীর সেক্টর কমান্ডার মেঃ জেনারেল খালেদ, কর্নেল হুদা ও কর্নেল হায়দার হত্যাকাণ্ডের বিচার হওয়া উচিত এবং এই হত্যাকাণ্ডের রহস্য জাতির জানার অধিকার রয়েছে।

খালেদের পরে দেশের রাজনীতির পট পরিবর্তন, ঘটনাপ্রবাহ ও অনেকের জাতীয় রাজনীতিতে আর্বিভাবের প্রেক্ষাপট মূল্যায়ন করলে দেখা যাবে, ৩রা নভেম্বরের অভ্যুত্থানের ছিল ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। যদি খালেদের নের্তৃত্বে ৩রা নভেম্বর অভ্যুত্থান না ঘটত তা হলো :

প্রথমত : মোশতাক গংয়েরা ক্ষমতায় আরো অনেকদিন অধিষ্ঠিত থেকে নিজেদের অবস্থান পাকাপোক্ত ও সুদৃঢ় করত। এতে করে আওয়ামী লীগের মধ্যে আরো ভাঙন সৃষ্টি হতো এবং আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক অবস্থা আরো দুর্বল হয়ে পড়ত। আওয়ামী লীগের যে সব নেতা কর্মী মোশতাকের পক্ষে আসতেন না, অথবা তার বিরুদ্ধাচরণ করতেন তাদেরকে জেল জুলুম নির্যাতন প্রহসনের বিচারে ফাঁসি, এমনকি গোপন হত্যার শিকার হতে হতো।

দ্বিতীয়ত : জাসদের ৭ই নভেম্বরের এই বিদ্রোহ বিপ্লব অবশ্যই অন্য কোনো সময়ে সংগঠিত হতো (যেহেতু ৭ই নভেম্বর ৩রা নভেম্বরের পাল্টা অভ্যুত্থান ছিল না), তখন হয়তো জিয়ার গৃহবন্দিরা প্রেক্ষাপটও থাকত না, জাসদ ও জিয়াকে গৃহবন্দি থেকে নিয়ে আর প্রশ্ন থাকত না, খালেদকে কেন্দ্র করে জিয়া-জাসদের সমঝোতা হতো না। কিন্তু এটা সত্য যে জাসদ যখনই যার আমলে এই বিপ্লব বা বিদ্রোহ সংগঠিত করত সেই বিপ্লব ৩রা নভেম্বরের প্রেক্ষাপটের সময় ও সুযোগের পরিস্থিতিতে ঘটত না। সে অবস্থায় জাসদ যদি এ ধরনের বিদ্রোহ, বিপ্লব ঘটাত সেই সময়ে দেশের ভিন্ন রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও পরিবেশের সৃষ্টি হতো।

তৃতীয়ত : জিয়া হয়তো অন্য কোনো সময়ে, সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিস্থিতিতে ও ভিন্ন প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসত। আমার মূল্যায়নে জিয়া সময়মত মোশতাক থেকে ক্ষমতা নিয়ে নিত এবং সে ক্ষেত্রে মোশতাকের পরিবর্তনের প্রশ্নে জিয়া খালেদের সমর্থন পেত, কারণ জিয়ার সাথে মোশতাক গংদের সম্পর্ক দিন দিন দ্রুত অবনতি ঘটছিল। জিয়াও একজন তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন উচ্চাবিলাসী অফিসার হিসেবে সময়ের অপেক্ষায় ছিল।

সামরিক বাহিনীতে যত সামরিক অভ্যুত্থান ও পাল্টা অভ্যুত্থান হয়েছে তার সবগুলোর পক্ষে ও বিপক্ষে মুক্তিযোদ্ধা অফিসারেরা জড়িত ছিল। মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যেকটি অফিসার রাজনৈতিকভাবে খুব সজাগ ও সচেতন ছিল, কারণ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ, এর অভিজ্ঞতা এবং এর পেছনে লুকিয়ে থাকা স্বপ্ন প্রত্যেকটি মুক্তিযোদ্ধা অফিসারকে এক একটি দায়িত্বশীল পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তুলেছে। ভুলে গেলে চলবে না যে, ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধ শুধু একটি সামরিক যুদ্ধ ছিল না। এ যুদ্ধ একাধারে সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক এবং সর্বোপরি নিজস্ব জাতীয় সত্তা ও ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠার একটি অস্তিত্বের লড়াই ছিল।

একজন সৈনিকের জীবনে এ যুদ্ধ একটি বিরল ঘটনা। এ যুদ্ধে তাই প্রত্যেকটি মুক্তিযোদ্ধা সেনা অফিসারেরা সামরিক অভিজ্ঞতার পাশাপাশি রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করেছে। অনেক রাজনীতিবিদকে বলতে শুনি, আমরা ছাত্র রাজনীতি করেছি, আমরা এত বছর রাজনীতি করেছি। আমাদের যে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা সে তুলনায় সেনা অফিসারেরা রাজনীতি কিছুই বুঝে না। তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই কোনো মুক্তিযোদ্ধা সেনা অফিসারকে রাজনৈতিকভাবে অবমূল্যায়ন করা সমীচীন নয়। প্রত্যেক রাজনীতিবিদ যেমন সমান অভিজ্ঞতা সম্পন্ন নয় ঠিক তেমনি সব সেনা অফিসার রাজনীতিবিদও সমান রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অধিকারী নয়।

'৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু হয়েছিল বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রাম।' ৬৬ এ বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ছাত্র ও গণআন্দোলন, . '৬৯ এর গণ অভ্যুত্থান, '৭০ এর নির্বাচন ও ৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ রণাঙ্গনে প্রত্যেকটি মুক্তযোদ্ধাকে (সামরিক ও বে-সামরিক) বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত ও আলোড়িত করেছিল। ইতিহাসের এই ধারাবাহিকতায় রাজনৈতিক সংকীর্ণতার উর্ধ্বে রণাঙ্গনে সেদিন প্রত্যেকটি মুক্তিযোদ্ধা ব্যক্তি মুজিবের সমর্থক ও অনুগত ছিল। তখন বঙ্গবন্ধুর প্রশ্নে কোনো বির্তক ছিল না, সবাই তাঁর প্রশ্নে এক ছিল। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মোশতাক চক্রের ভূমিকা দুরভিসন্ধিমূলক ছিল। সে সময়ে নিজেদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে মুজিব বাহিনী সৃষ্টি, সার্বিক পরিচালনায় যদিও কোনো বড় ধরনের ভুল বুঝাবুঝি হয়নি,

কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তর এর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল খুব নির্মমভাবে। আমার এই লেখার মাধ্যমে '৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর থেকে '৭৫ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ের ঘটনা প্রবাহ তার সাক্ষ্য বহন করবে। ৬ই নভেম্বর ঢাকা থেকে রংপুর ফিরে গিয়ে নিজস্ব ইউনিটের দায়িত্বভার গ্রহণ করলাম এবং ঢাকার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছিলাম। ঢাকার খবরাখবর নেওয়ার ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে রাত প্রায় শেষ হয়ে গেল। ৭ই নভেম্বর ভোরে, তখনও পূর্ব দিগন্তে সূর্য উদিত হয়নি দূরের মসজিদ থেকে মোয়াজ্জিনের কণ্ঠে ভেসে এল "আসসালাতু খায়রুম মিনান নাউম"। নামাজের আহ্বান শুনে ঘুম থেকে ওঠে ড্রয়িং রুমে বসে ঢাকায় টেলিফোন করার চেষ্টা করছিলাম। হঠাৎ একজন ওয়্যারলেস অপারেটর এসে আমাকে জানালেন, "স্যার চারলি, অসকার, মাইক, ডেল্টা-আর নেই।" অপারেটর থেকে কমান্ডার নেই এই দুর্ঘটনার কথা শুনে আমি ক্ষণিকের জন্য বিচলিত ও হতভম্ব হয়ে গেলাম। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কী করে জানলে যে কমান্ডার নেই, কী হয়েছে? সে বলল, "স্যার, রক্ষীবাহিনীর যে ওয়ারলেস সেট আমাদের নিকট ছিল সে সেটের অপারেটর এ খবরটি শুনা মাত্রই অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। সে সেরে ওঠার পর তার থেকে জানলাম খালেদ, হুদা ও হায়দার যেখানে ছিলেন সেখানে তাঁদেরকে হত্যা করা হয়েছে এবং লাশগুলো সি.এম.এইচ. এ নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ঢাকা সেনানিবাসে গোলাগুলি চলছে। ঢাকার অবস্থা খুবই ভয়াবহ।" আমি তাৎক্ষণিক ইউনিফর্ম পরিধান করে আমার ইউনিট ১৫ ইস্ট বেঙ্গলে আসি এবং জরুরি ভিত্তিতে অফিসারদেরকে ইউনিটে আসার জন্য নির্দেশ প্রদান করি। অফিসারদেরকে ঢাকার অবস্থা জানানো হলো এবং যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত থাকার পরামর্শ দেওয়া হলো আমরা আশঙ্কা করছিলাম, ঢাকার ঘটনার প্রতিক্রিয়া যে কোনো মুহূর্তে দেখা দিবে এবং রংপুরের ইউনিটগুলোর মধ্যে একটা বড় ধরনের সংঘর্ষ ও রক্তপাত ঘটতে পারে। কারণ জিয়ার খুব আপনজন প্রকাশ্য সমর্থক লেঃ কর্নেল ওয়ালী ও লেঃ কর্নেল হান্নানশাহ তখন রংপুরে অবস্থান করছিল। হান্নানসা ৬ষ্ঠ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়ক হিসেবে তার নিজস্ব ইউনিট ও অন্যান্যদের সহযোগিতায় ঢাকা থেকে কোনো নির্দেশ পেলে আমাদের নিয়ন্ত্রিত ইউনিটগুলোর সাথে বড় ধরনের সংঘর্ষে লিপ্ত হতে পারে–এ ধরনের একটা পরিবেশ রংপুর সেনানিবাসে বিরাজ করছিল। কিন্তু ঐদিন ১২টার মধ্যে জাসদকে বাদ দিয়ে ঢাকাতে জিয়াউর রহমান পরিস্থিতি যখন নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসল তখন রংপুরসহ দেশের অন্যান্য সেনানিবাসে জিয়ার নের্তৃত্বের প্রতি সবাইকে এক রেখে সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা নিশ্চিত করাই ছিল জিয়ার পক্ষের সেনা অফিসারদের অন্যতম প্রয়াস। সেই কারণে রংপুরে ঐদিন ১২টার পরে পূর্বে উল্লিখিত আশঙ্কা অনেকটা কেটে

গেল। ৭ই নভেম্বর ও ৮ই নভেম্বর ঢাকায় পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে কোনো ঘটনা ঘটেনি। আমরা সবাই নিজ নিজ দায়িত্বে বহাল থেকে কর্তব্য পালন করে যাচ্ছিলাম। খালেদের হত্যার পরে তার পক্ষে কোনো বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়ার অবকাশও আর রইল না। যদিও রংপুরে খালেদের পক্ষে আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ও শক্তিশালী ছিলাম কিন্তু উদ্দেশ্যবিহীন পাল্টা কোনো অ্যাকশান ফলপ্রসূ হতো না বরং রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে কিছু অফিসার ও সৈনিক প্রাণ হারাত এবং এর দায় দায়িত্ব আমাদেরকেই বহন করতে হতো। এছাড়া সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটত। আমরা এ মন মানসিকতা নিয়ে এবং একই সাথে যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলার প্রস্তুতি সহকারে নীরবে জিয়ার পরবর্তী নির্দেশ ও কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করতে থাকলাম। জিয়ার সমর্থকরাও বসে না থেকে আমাদের ওপর কড়া নজর রেখে চলল। যদিও ৭ই নভেম্বরের সিপাহি বিপ্লবের প্রেক্ষাপটে দেশের কোনো সেনানিবাসে ভয়াবহ পরিস্থিতি ছিল না, সব কিছু জিয়ার নিয়ন্ত্রণে এসে গিয়েছিল এবং জিয়া ও জিয়ার সমর্থকরা এ পর্যায়ে খালেদের সমর্থক সেনা অফিসারদেরকে চিহ্নিত করে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করলেন। ৯ই নভেম্বর সন্ধ্যার পর রংপুরে জিয়ার সমর্থকদের ইঙ্গিতে জাসদের সৈনিক সংস্থার স্টাইলে সিপাহিদের মধ্যে একটি বিদ্রোহের পরিবেশ সৃষ্টি করা হলো। রংপুরে জিয়ার সমর্থক ইউনিটগুলো থেকে সৈনিকরা ট্রাকে করে সেনানিবাসের ভিতরে ও রংপুর শহরে মিছিল শুরু করল এবং ট্রাক থেকে আকাশের দিকে রাইফেলের গুলি ছুঁড়তে লাগল। পুরো এলাকায় আতঙ্কের সৃষ্টি হলো। এদের মূল উদ্দেশ্য ছিল খালেদ সমর্থক অফিসারদেরকে শেষ করে ফেলা। বিশেষ করে আমি ছিলাম তাদের মূল টার্গেট। আমি ঐ দিন সন্ধ্যায় বুঝতে পেরেছিলাম যে এ ধরনের ঘটতে পারে ঘটবে। তাই সন্ধ্যার মধ্যেই আমি আমার পরিবারসহ আমার অন্যান্য অফিসারদের পরিবারগুলোকে শহরে আমার এক অফিসারের আত্মীয়ের বাসায় পাঠিয়ে দিয়েছিলাম এবং তাদের নিরাপত্তার জন্য মেজবাহ ও ক্যাপঃ রহমানকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম। সাথে আমার শ্যালক (যিনি কয়েকদিন আগ থেকে আমার সাথে রংপুরে অবস্থান করছিলেন) আরজুকেও পাঠালাম। সে ছিল একজন সাহসী যুবক।

সন্ধ্যার পর রংপুর সেনানিবাসে যখন গোলাগুলি শুরু হয়ে গেল তখন আমি সেনানিবাসে কয়েকজন অফিসারসহ মেজর হারুনের বাসায় (পরবর্তীতে মেজর জেনারেল) বসে ঐ অবস্থায় পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে আলাপ করছিলাম। ঐ বাসায় বসেই আমার ১৫ বেঙ্গল ইউনিটকে নির্দেশ দিলাম যেন পাল্টা কোনো কিছু না করে শুধু ইউনিটের চারপাশে অবস্থান গ্রহণ করে যে কোনো পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকে এবং কারো উস্কানির কারণে যেন কোনো সংঘর্ষে লিপ্ত না হয়। আমি

ইউনিটকে এও জানালাম যে, ইউনিটের বাকি অফিসারদেরকে আমি ইউনিটে পাঠিয়ে দিচ্ছি এবং আমাকে হয়তো ঢাকায় যেতে হতে পারে। মেজর হারুনের বাসায় বসে আমরা যে কোনো সংঘর্ষ এড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলাম এবং সবাই একমত হলাম যে, আমি যেহেতু মূল টার্গেট সে জন্য ঢাকায় যাওয়ার অজুহাতে আগামী কয়েকদিন ইউনিটের বাহিরে থাকাই আমার জন্য বাঞ্ছনীয় হবে। আমি যদি ইউনিটে থাকি আর আমার জন্য যদি অন্য কোনো ইউনিট থেকে ১৫ বেঙ্গলের উপরে কোনো আঘাত আসে তাহলে সেক্ষেত্রে ব্যাপক রক্তপাত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। উপরের সিদ্ধান্তের পেছনে এটাই ছিল মূল কারণ। আমি অফিসারদেরকে ইউনিটে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে সেনানিবাসের বাহিরে নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করি। কয়েকজন অফিসার আমার সাথে সেনানিবাসের বাহিরে রংপুর মেডিকেল কলেজের শেষ সীমানা পর্যন্ত আসে এবং সেখান থেকে আমি তাদেরকে ইউনিটে ফিরে যেতে পরামর্শ দিয়ে বলেছিলাম "তোমরা যে কোনো পরিস্থিতিতে ধৈর্যের পরিচয় দিবে, কোনো সংঘর্ষে লিপ্ত হবে না। আমার সম্পর্কে ইউনিটের অথবা ঢাকা থেকে কেউ জানতে চাইলে বলবে ইতোমধ্যেই আমি ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছি।" আমি রংপুর মেডিকেল কলেজের পেছনে একটি বাসায় উঠি। সেখানে তাদেরকে পরিস্থিতি উল্লেখ করে আমাকে কিছু সিভিল পোশাক দেওয়ার অনুরোধ জানালে তারা আমাকে একটি শার্ট ও একটি প্যান্ট প্রদান করেন। আমি আমার ইউনিফর্ম পরিবর্তন করে ঐ শার্ট প্যান্ট পরিধান করে কোথায় নিরাপদ থাকা যায় সে ব্যাপারে তাদের সাথে আলোচনা করে সে বাসা থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কমপক্ষে ১০ মাইল দূরে যে কোনো একটি গ্রামে গিয়ে আত্মগোপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। রাত প্রায় ৯-১০টা হবে তখন রংপুর সেনানিবাসসহ রংপুর শহরে মিছিল ও গোলা বর্ষণের শব্দ শুনা যাচ্ছিল। সেই মুহূর্তে আমি ও আমার অফিসারেরা শহরে আমাদের পরিবারবর্গ যেখানে আশ্রয় নিয়েছিল ঐ জায়গায় কোনো আক্রমণ হলো কিনা সে ব্যাপারে দুশ্চিন্তায় রইলাম। তাদের কাছ থেকে পরে শুনলাম শহরে কয়েক ঘণ্টার এ ব্যাপক গোলাগুলি ও মিছিলের মধ্যে তারা ৩-৪ টি বাসা পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছিল। কারণ যে বাসায়ই যাচ্ছিল সেনা অফিসারের পরিবার বিধায় তাদের উপরও আক্রমণ আসতে পারে এ ভয়ে অনেকে তাদেরকে আশ্রয় দিতে অপরাগতা জানায়। অফিসারদের এই পরিবারগুলো সতর্কতার সাথে একের পর এক বাসা পরিবর্তন করে সাহসিকতার সাথে পরিস্থিতির মোকাবেলা করে চলছিল। এক পর্যায়ে একটি বাসা থেকে বেরিয়ে অনেক দূর হেঁটে এসে অন্য আরেকটি বাসায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে যে মুহূর্তে তারা রাস্তা অতিক্রম করবে ঠিক সেই মুহূর্তে কয়েকশত গজের মধ্যে সৈনিকদের একটি ট্রাক মিছিল গুলি বর্ষণ করতে করতে

ঐ রাস্তা দিয়ে দ্রুত এগিয়ে আসছিল। তারা সবাই অত্যন্ত ক্লান্ত থাকা সত্ত্বেও সাহস, ধৈর্য ও বুদ্ধির সাথে পরিস্থিতির মোকাবেলা করে। ঐ রাস্তার পার্শ্বে একটি বাস পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়া ছিল। তারা সবাই ঐ মিছিলের ট্রাকের হেড লাইটের আলোতে পড়ার আগেই ঐ বাসের নিচে ও রাস্তার ঢালে শুয়ে পড়ে। আল্লাহর রহমত বলতে হবে, ট্রাক মিছিলটি তাদেরকে অতিক্রম করে চলে গেল। মিছিল থেকে কেউ তাদের দেখেনি। যদি দেখত তাহলে হয়তো একটি করুণ দৃশ্যের অবতারণা হতো। আমার শ্যালক আরজু ও ক্যাপঃ রহমান ১২ই নভেম্বর রংপুর থেকে ভোরে ট্রেনে করে ঐ পরিবারগুলো নিয়ে ঢাকায় চলে আসেন। রংপুর স্টেশনে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে প্রত্যেকটা ট্রেন তল্লাশি হচ্ছিল। সে অবস্থায় কেউ বোরকা পরে, কেউবা বড় ঘোমটা দিয়ে সাধারণ পুরুষ ও মহিলা যাত্রীদের সাথে মিশে গিয়েছিল এবং স্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়ার আগ পর্যন্ত আমার শ্যালক ও (ক্যাপঃ) রহমান ট্রেনের দুইটি কমপার্টমেন্টের ২টি টয়লেটে নিজেদেরকে লুকিয়ে রেখে জীবন রক্ষা করে। এদিকে আমি রংপুর মেডিকেল কলেজের পেছনের ওই বাসা থেকে সিভিল পোশাক পরিধান করে একজন সি.এন্ড.বির কর্মচারীর সহযোগিতায় শহর থেকে অনেক দূরে একটি বিল এলাকায় ছোট একটি গ্রামে ঐ কর্মচারীর এক আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নিই। তখন রাত গভীর। চারদিকে নিস্তব্ধতা। চাঁদনি রাত। ঐ বাড়ির অদূরে প্রশস্ত বিলের পানিতে চাঁদের আলো ঝিকমিক করছিল।

বাড়িওয়ালা গরিব হলেও তার মনটা ছিল খুব বড়। তিনি আমাকে আদর, যত্ন ও মেহমানদারি করতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন এবং আমার থাকার ব্যবস্থা করে কিছু মুড়ি ও গুড় খেতে দিলেন। আমি তাকে অনুরোধ করলাম, আমার এ অবস্থান সম্পর্কে গ্রামের কেউ যেন না জানতে পারে এবং সে ব্যাপারে তিনি যেন বাড়ির সবাইকে সতর্ক করে দেন। তিনি আমাকে আশ্বস্ত করলেন এ বলে যে, কেউ জানবে না আপনি এ ব্যাপারে চিন্তা করবেন না। ১০ তারিখে আমি ঐ কর্মচারীকে রংপুরে তার অফিসে যেতে না দিয়ে আমার সাথে রাখলাম। বেলা প্রায় ৩-৪ টা হবে, হঠাৎ করে ঐ গ্রামের উপরে একটি হেলিকপ্টারের আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি প্রথমে ধারণা করেছিলাম, যেহেতু জিপ ও ট্রাক যোগে রংপুর থেকে এ অঞ্চলে আসা সম্ভব নয় হয়তো সে কারণে হেলিকপ্টার থেকে সৈন্য অবতরণ করে আমার বিরুদ্ধে অপারেশন চালাবে। হেলিকপ্টারটি ঐ গ্রামের এক প্রান্তরে অবতরণ করল। ইতোমধ্যেই আমার সাথের ঐ কর্মচারী গ্রাম থেকে খবর নিয়ে আসল যে ঐ হেলিকপ্টারটি করে ঢাকা থেকে একটি সৈনিকের লাশ এসেছে। আমরা তখন ঐ বাড়িগুলো থেকে ক্রন্দন, বিলাপ ও আর্তনাদের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম। আমি তখন ঐ কর্মচারীকে বললাম, এ গ্রামে আর থাকা যাবে না

কারণ যেহেতু গ্রামে এই সৈনিকের মৃত্যুতে একটি শোকের ছায়া ও ক্ষোভ বিরাজ করছে, পাশাপাশি এই সংক্রান্ত একটি বিভ্রান্তিও সবার মধ্যে রয়েছে, এ মুহূর্তে আমার ব্যাপারে যদি জানাজানি হয়ে যায় তাহলে হয়তো আমি গ্রামবাসীর ভুল বুঝাবুঝি ও ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশের শিকার হতে পারি। ঐ কর্মচারী আমার সাথে এ যুক্তিতে একমত হলো এবং সন্ধ্যার পর আমাকে কয়েক মাইল দূরে আরেকটি গ্রামে তার আরেক আত্মীয় বাড়িতে নিয়ে যায়। ঐ বাড়িতে প্রায় ১০-১২ দিন অবস্থান করি এবং ঐ কর্মচারীর মাধ্যমে আমি রংপুরের দৈনন্দিন খবরাখবর নিচ্ছিলাম। সে প্রত্যেক দিন তার কর্মস্থল রংপুরে অফিস করে ফিরে আসত এ গ্রামের বাড়িতে। তার মাধ্যমে আমি রংপুরে আমার এক ভাগিনা নাজুকে আমার সাথে যোগাযোগ করার জন্য খবর পাঠাই সে একদিন এসে বলল নাজুর সাথে দেখা হয়েছে এবং সে বাসায় আমার আরেক শ্যালক মুক্তিযোদ্ধা ওবাইদুল হক ঢাকা থেকে এসে আমার খোঁজে ঐ বাসায় অবস্থান করছে। সে আমাকে বলল, আমি যে বেঁচে আছি আমার শ্যালক সেটাই বিশ্বাস করতে পারছিল না। শ্যালক নাকি গুজব শুনেছে যে ঐদিন রাতে রংপুরে আমাকে হত্যা করে লাশ গুম করা হয়েছে। আমি পরের দিন আবার তার মাধ্যমে খবর পাঠালাম, আমি না বলা পর্যন্ত তারা যেন আমার এই গোপন আস্তানায় না আসে। রংপুর থেকেই কী করে আমি ঢাকা যেতে পারি তা তারা আমাকে জানাবে। তারপরেই শুধু ঢাকা যাওয়ার চূড়ান্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। ইতোমধ্যে প্রায় দুই সপ্তাহ অতিক্রান্ত হয়েছে। আমার শ্যালক রংপুরের এ বাসায় থেকে ঐ কর্মচারীর মাধ্যমে আমাকে জানাল যে খালেদের পক্ষের অনেক অফিসারকে ঢাকাতে বন্দী অবস্থায় গণভবনে রাখা হয়েছে। কর্নেল শাফায়াত জামিল ও বিমান বাহিনীর অফিসারেরা ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে রয়েছে। সে আরো জানাল, যেসব অফিসার এখনও বাইরে রয়েছে তারা যদি ৩রা ডিসেম্বরের মধ্যে সেনাবাহিনীতে রিপোর্ট না করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং তাদের ভবিষ্যৎ জীবন ও নিরাপত্তার দায়-দায়িত্ব কারো থাকবে না।

আমার সঠিক তারিখ মনে নেই, সম্ভবত নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ হবে, ভাগিনা নাজুকে নিয়ে রংপুরের ঐ গ্রাম থেকে ট্রেনে, বাসে ও বিভিন্নভাবে ছদ্মবেশে খুলনা শহরে আসি। খুলনা শহরে ঐ রাতে ফাল্গুনি অথবা বেগুনি নামের একটি হোটেলে উঠি। তখন আমার ও ভাগিনা নাজুর কাছে ঢাকায় পৌঁছার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব ছিল এবং আমার পরনের বস্ত্র ছাড়া আর কোনো পোশাক ছিল না। হাদি নামে কর্নেল হুদার এক আত্মীয় খুলনায় থাকত। রংপুর থেকে প্রায় সময় কর্নেল হুদা ও আমি মাঝে মধ্যে টেলিফোন করে কুশল বিনিময় করতাম। হোটেল বসে ঐদিন হঠাৎ করে তার টেলিফোন নাম্বার মনে পড়ার সাথে সাথে আমি ঐ নম্বরে

তার বাসায় ফোন করি। সে তখন বাসায় ছিল না। হাদি ভাইয়ের মায়ের কাছে আমার হোটেলের ফোন নম্বর দিয়ে অনুরোধ করে রেখেছিলাম হাদি ভাই বাসায় আসলে যেন আমার ঐ নাম্বারে ফোন করে। কিছুক্ষণ পরে হাদি ভাই হোটেলে ফোন করল। আমি তাকে একটি শার্ট, প্যান্ট ও ৫০০ টাকা নিয়ে হোটেলে আসার অনুরোধ জানালাম এবং বললাম সাক্ষাতে বিস্তারিত আলোচনা হবে। এর কিছুক্ষণ পর সে হোটেলে এসে আমাকে ৫০০ টাকা ও ১টি শার্ট ও ১টি প্যান্ট প্রদান করলেন। তার সাথে অনেকক্ষণ আলাপ আলোচনা করলাম। তাকে স্টিমারে ঢাকায় যাওয়ার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে রাত্রের মধ্যেই যে কোনো স্টিমারে একটি কেবিন বরাদ্দ করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানালাম। স্টিমারে ঢাকায় যাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে গেল। হাদি ভাই আমাদেরকে এ রাতেই স্টিমারের কেবিনে পৌঁছে দিয়ে আসল। পরের দিন সকালে ঢাকা এসে পৌঁছে আমি সরাসরি এলিফ্যান্ট রোড আমার বাসায় না গিয়ে ফার্মগেটের আনন্দ সিনেমা হলের নিকট আমার ছোট বোন ডাঃ নাজনিন ইসলামের বাসায় উঠলাম এবং সেখান থেকে সেনা সদরে ডি.এম.আই বিগ্রেডিয়ার মহসীনকে টেলিফোন করে সর্বশেষ আমাদের সম্পর্কে কী নির্দেশ রয়েছে তা জানার চেষ্টা করি। তিনি আমাকে জানালেন, "সব ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই, তুমি সেনা সদরে চলে আস, আসলে সাক্ষাতে সব আলাপ হবে।" আমার একজন পরিচিত অফিসারসহ একটি জিপ পাঠানোর জন্য আমি তাকে অনুরোধ করলাম। তিনি কয়েকজন অফিসারের নাম উল্লেখ করে জিজ্ঞাস করলেন এদের মধ্যে কাকে পাঠালে তুমি খুশি হবে। আমি তাকে বললাম লেঃ কর্নেল মাহবুবকে আনন্দ সিনেমা হলের সামনে পাঠাতে। ইচ্ছে করে আমি বাসার ঠিকানা গোপন রাখলাম, অবস্থা ও পরিস্থিতি বুঝার জন্য। আমার বোনের বাসা থেকে আনন্দ সিনেমা হল দেখা যায়। কিছুক্ষণ পর দেখি একটি আর্মির জিপ সিনেমা হলের সামনে থামল এবং জিপ থেকে কর্নেল মাহবুব নেমে আশপাশে পায়চারী করছিলেন। আমি বুঝলাম তিনি আমার অপেক্ষায় আছেন। আমি ফোনে আমার এলিফ্যান্ট রোডের বাসায় ইতোমধ্যেই আলাপ সেরে নিয়েছিলাম। বোনের বাসা থেকে আমি সরাসরি জিপের সামনে আসলে কর্নেল মাহবুব আমাকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করেন। আমি ঐ জিপে করে সেনা সদরে ব্রিগেডিয়ার মহসীনের কক্ষে আসলাম। তিনি আমাকে চা, বিস্কিট দিয়ে আপ্যায়ন করলেন এবং আমাকে জানালেন যে সেনা সদর থেকে আমাকে গণভবনে যেতে হবে। আমি তাকে অনুরোধ জানিয়েছিলাম আমাকে ২/১ ঘণ্টা সময় দেওয়ার জন্য যাতে আমি এলিফ্যান্ট রোডে আমার পরিবারের সাথে সাক্ষাৎ করে আসতে পারি। তিনি বললেন, এখন আর সম্ভব নয়। পরিবার ইচ্ছে করলে অনুমতি নিয়ে পরে গণভবনে দেখা করতে পারবে। আমি উত্তেজিত হয়ে বললাম, "Hell with you,

আমাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গণভবনে পাঠানোর ব্যবস্থা কর।" কয়েক মিনিটের মধ্যে একটি Officers Escort দিয়ে আমাকে গণভবনে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হলো। গণভবনে এসে পৌঁছলাম। Escort অফিসার আমাকে গণভবনের দোতলায় নিয়ে গেলেন। ঐ ফ্লোরের একটি কক্ষে শেখ সাহেবের অফিস ছিল। বাকি কক্ষগুলোতে তোফায়েল, কর্নেল জামিল ও অন্যান্য অফিসাররা বসতেন। শেখ সাহেবের অফিস কক্ষটি তালাবদ্ধ ছিল বাকি অফিস কক্ষগুলো কর্নেল মালেক, কর্নেল গাফফার, মেজর হাফিজ, মেজর নাসির, ক্যাঃ হাফিজ উল্লাহ, ক্যাঃ হুমায়ুন, ক্যাঃ তাজ, মেজর আমিনুল ইসলাম ও মেজর ইকবালসহ অন্যান্যরা বিভিন্ন রুমে বন্দী অবস্থায় ছিলেন। প্রত্যেক রুমের সামনে সেনা রক্ষী ছিল। আমার উপস্থিতির খবর শুনে সবাই নিজ নিজ কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে আমার সাথে কুশল বিনিময় করলেন। কর্নেল মালেক তখনও তার রুমে বসে কুরআন তেলাওয়াত করছিলেন। কিছুক্ষণ পরে কর্নেল মালেকের কুরআন তেলাওয়াত শেষে আমি তার কক্ষে গিয়ে তার সাথে কুশল বিনিময় করলাম। অতঃপর আমাকে কর্নেল গাফফারের রুমে থাকার ব্যবস্থা করে দেয়া হলো। প্রায় তিন মাস সময় আমরা গণভবনে বন্দী অবস্থায় ছিলাম। প্রায় প্রত্যেক দিন আমরা নিজেদের মধ্যে পরিস্থিতি ও পরবর্তী কৌশল নিয়ে আলাপ আলোচনা করতাম। অন্য দিকে সেনাবাহিনীতে আমাদের বিচার কার্য শুরু করার জন্য প্রস্তুতি চলছিল। আমরা জানতাম, বিচার হবে শুধু দেখানোর জন্য– আমাদের ফাঁসি কার্যকর করার জন্য যথার্থতা প্রমাণ করাই ছিল এই বিচারের উদ্দেশ্য। আমরা অনেকেই বিভিন্ন তদন্তের সম্মুখীন হচ্ছিলাম। তখন অনেক জেনারেলের উক্তি থেকে আমরা জানতে পেরেছিলাম যে আমাদের মধ্যে একটি অংশকে শেষ পর্যন্ত ফাঁসি দেওয়া হবে এবং আরেকটি অংশকে দীর্ঘদিন কারাবরণ করতে হবে। গণভবনে বন্দী থাকা অবস্থায় আমাদের পরিবারকে মাঝে মাঝে দেখা করার অনুমতি প্রদান করা হতো। পরিবারের সদস্যরা আমাদের ব্যাপারে আশা সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছিল। যখনই তারা আসত তাদেরকে খুবই বিষণ্ন ও হতাশাগ্রস্ত মনে হতো। আমরা তাদেরকে সাহস ও মনোবল ঠিক রাখার জন্য উৎসাহ দিতাম। একদিন মেজর জেনারেল মীর শওকত আলী গণভবনে আমাদের সাথে দেখা করতে আসলেন। এসে সবার উদ্দেশ্যে বললেন, অতি তাড়াতাড়ি তোমাদের সবার বিচার কার্য শুরু হবে। ইচ্ছে করলে তোমরা নিজস্ব উকিল রাখতে পারবে, "এছাড়া সবাইকে অভিযুক্ত করে তিনি অনেক কটূক্তি করলেন। শওকতের কথায় সবাই উত্তেজিত হয়ে কঠিন ভাষায় তাকে অনেক পাল্টা প্রশ্ন করেছিলেন। তাকে বলা হলো, "যাই করবেন কিছুই Unchallenged যাবে না। আমাদের উকিলের প্রয়োজন নেই। আমরা নিজেরাই নিজেদের উকিল। আপনি এখান থেকে চলে যেতে পারেন।" কয়েকজন চিৎকার করে শওকতকে এ

কথাগুলো শুনালেন। এর কিছু দিন পর কালো চশমা পরিহিত জেনারেল মঞ্জুর আসলেন। তিনি খুব ঠান্ডা প্রকৃতির লোক। আমাদের সাথে বিভিন্ন প্রশ্নে উনি মত বিনিময় করছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি মেজর নাসিরকে প্রশ্ন করলেন, "ডালিমদের প্রথম অভ্যুত্থানে তুমি শরিক হতে পারনি, সে জন্য কি ভারতের ট্রেনিং ক্যাম্প থেকে পালিয়ে এসে খালেদের এই অভুত্থানে শরিক হলে?" মেজর নাসির মৃদু হেসে বলল, "আপনার এ ধারণা সঠিক নয়। আমি অনেক আগ থেকেই খালেদের এই অ্যাকশানের অপেক্ষায় ছিলাম। আসলে আপনি সেনাবাহিনী ও দেশের খবরাখবর পুরোপুরি রাখেন না।" মেজর নাসির ভারতে একটি প্রশিক্ষণ কোর্স করছিলেন। ৩রা নভেম্বরের খবর শুনেই ঐ কোর্স সমাপ্ত না করেই ভারতের ঐ স্কুল থেকে ৩রা নভেম্বরে অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করার জন্য দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে পালিয়ে এসেছিলেন বাংলাদেশে। মঞ্জুর এসেছিলেন জিয়ার পক্ষ থেকে আমাদের তখনকার মন মানসিকতা পরীক্ষা করার জন্য, সবার মধ্যে উত্তেজিত মনোভাব দেখে মঞ্জুরও আমাদের থেকে বিদায় নিলেন।

কর্নেল শাফায়াত জামিল ও এয়ার ফোর্সের অফিসারেরা ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী ছিলেন। তাদের সাথে আমাদের কোনো যোগাযোগ ছিল না। তবে সবার ভাগ্যের পরিণতি একই হবে এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত ছিলাম। গণভবনে প্রধান মন্ত্রীর ঐ ফ্লোরে যে সব Bearer কাজ করত তারাই আমাদের খাওয়া সরবরাহ করত। তারা আমাদের প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল ছিল। তাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক দিনে দিনে খুবই গভীর হয়ে ওঠার পর আমরা অনেক গোপনীয় কথা তাদের সাথে আলাপ করতাম। তারা সবাই শেখ সাহেবের ভক্ত ছিল।

১৯৭৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যখন আমরা বুঝলাম যে সেনা কর্তৃপক্ষ আমাদের ব্যাপারে যে কোনো মুহূর্তে কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে পারে। তখন আমরাও গণভবন থেকে পালিয়ে যাওয়ার চূড়ান্ত পরিকল্পনায় ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। একদিন হঠাৎ নির্দেশ আসল, কর্নেল পদবির উপরের অফিসারদেরকে আজই ঢাকা সেনানিবাসে ড.এফ.আই Cell এ নিয়ে যাওয়া হবে। সেই নির্দেশ মোতাবেক আমাদের ঢাকা সেনানিবাসে নিয়ে যাওয়া হলো। যাওয়ার সময় আমরা মেজর হাফিজ, ক্যাঃ তাজ, মেজর ইকবাল, ক্যাঃ হুমায়ূন ও ক্যাঃ হাফিজ উল্লাকে বলে গেলাম, তোমরা তোমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী এগিয়ে যাবে। আমরাও সেনানিবাস থেকে বিভিন্ন উপায়ে খবরাখবর পৌঁছানোর চেষ্টা করব। পালিয়ে যাওয়ার মূল পরিকল্পনাকারী ও রূপকার যেহেতু তারাই ছিল সে জন্য সে দিন আমরা এ বিষয়ে তাদের সাথে বিস্তারিত আলাপ করার প্রয়োজন মনে করি।

সেনানিবাসের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরুর মুহূর্তে তাদের সাথে কুশল বিনিময় করলাম ও বলে গেলাম যে পরিস্থিতি খুব খারাপ দেখলে যে অফিসারটি (লেঃ

ইকবাল) আমাদেরকে সেনানিবাসে নিয়ে যাচ্ছে তার মাধ্যমে এমন একটি খবর পাঠাব যেন সেও বুঝতে না পারে। খবর পাওয়ার সাথে সাথে তোমাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন তরান্বিত করতে হবে। লেঃ ইকবাল আমাকে ও কর্নেল গাফফারকে একটি অন্ধকার প্রকোষ্ঠের পৃথক পৃথক দুটি কামরায় পৌঁছে দিলেন। সেই বাড়িতে আগ থেকেই অপেক্ষা করছিল রুম ও বাড়ির নিরাপত্তা রক্ষীর একটি বড় দল। আমাদেরকে তাদের নিকট হস্তান্তর করে যখন লেঃ ইকবাল গণভবনের উদ্দেশে যাওয়ার জন্য আমাদের থেকে সৌজন্য বিদায় নিচ্ছিলেন আমরা শুধু লেঃ ইকবালকে অনুরোধ করলাম, তিনি যেন ফিরে গিয়ে আমাদের সহকর্মীদেরকে বলে, আমরা এখানে ভালো আছি আর আমাদের পড়ার কয়েকটি বই ভুলে তাদের কাছে রেখে এসেছি, সেগুলো যেন পরবর্তীতে কারো মাধ্যমে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। এই খবরটি লেঃ ইকবাল তাদেরকে গণভবনে পৌঁছে দিয়েছিলেন। এই খবরের পেছনে লুকানো আসল উদ্দেশ্য লেঃ ইকবালের বুঝার কথা নয়। খবর পাওয়ার সাথে সাথে ঐ রাতে তাদের নিজস্ব পরিকল্পনা মোতাবেক জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শেখ সাহেবের রুমের মধ্য দিয়ে অন্য রুম পাশ কাটিয়ে (ডুপ্লিকেট চাবি ঐ Bearer দের মাধ্যমে আগেই সংগ্রহ করেছিল) নিচের করিডর অতিক্রম করে যখন ১০০/১৫০ ফিট প্রশস্ত লন অতিক্রম করে Main রাস্তার পাশে ৬ ফিট উঁচু দেয়াল [যার উপরে কয়েক ফিট আবার তারকাঁটার বেড়া] অতিক্রম করে জীবন বাজি রেখে সবাই যখন ধাবিত হচ্ছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে নিরাপত্তা রক্ষীদের হুঁশিয়ারি বাঁশির সংকেত ও চারদিক থেকে গুলি বর্ষণ শুরু হয়ে যায়। প্রথম যে রক্ষী গ্রুপটি সামনে পড়েছিল তারা কিছুক্ষণের জন্য বিচলিত ও হতভম্ব হয়ে পড়েছিল। সেই কয়েক সেকেন্ড সময়ের সুযোগে গুলি বর্ষণ শুরু হওয়ার আগেই লনের প্রায় অর্ধেক রাস্তা তারকাঁটার বেড়া অতিক্রম করে ফেলেছিল। গুলিবর্ষণের মধ্য দিয়ে চারদিকের সার্চ লাইটের আলোয় দেওয়াল ও তারকাঁটার বেড়া অতিক্রম করে Main সড়কে পূর্ব পরিকল্পিত দণ্ডায়মান একটি কারে চড়ে সোজা সবাই ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টের উদ্দেশে রওয়ানা দেয়। ইতোমধ্যে পুরো শহরে পুলিশের সাইরেনের আওয়াজ শুনা যাচ্ছিল। এই অপারেশনটি ছিল Top class commando operation. সারা রাত Drive করে মেজর হাফিজ, মেজর ইকবাল, ক্যাপঃ তাজ, ক্যাঃ হুমায়ুন কবির ও ক্যাঃ হাফিজ উল্লাহ পৌঁছল ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টে। এই রেজিমেন্টটি মেজর হাফিজের নিজস্ব ইউনিট ছিল ও অন্যান্য অফিসারদের অনুগত ছিল। এই রেজিমেন্টে আশ্রয় নিয়ে সৈনিকদেরকে সব খুলে বলল যে একে একে আমাদের সমস্ত মুক্তিযোদ্ধাদেরকে শেষ করে দেওয়ার পরিকল্পনা চলছে। ৩রা নভেম্বর সম্পর্কে ভুল ধারণা দূর করা হলো।

সম্ভবত ২৭ শে ফেব্রুয়ারি অথবা ২৮ শে ফেব্রয়ারি ১৯৭৬ সালে এই ইউনিটে হেলিকপ্টারে করে প্রথমে এরশাদ ও পরে জেনারেল মঞ্জুরকে জিয়া পাঠালেন সমঝোতা করতে। তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসার পর জিয়া নিজেই ১ মার্চ হেলিকপ্টারে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রথম বেঙ্গলে যান। জিয়া প্রথমে প্রথম বেঙ্গলকে Confidence এ এনে এই অফিসারদেরকে বন্দী করার কৌশল নিয়েছিলেন এবং অনেক ধরনের Offer দিয়েছিলেন। তারা শুধু বলেছিলেন, রাখলে সবাইকে সেনাবাহিনীতে রাখবেন না হয় সবাইকে বের করে দেবেন। প্রথম দিন জিয়া সমঝোতায় ব্যর্থ হলেন। ঐ দিন রাতে জিয়া আর ঢাকা ফিরলেন না। ২রা মার্চ জিয়া দেখলেন যে প্রথম বেঙ্গল পুরো এই অফিসারদের পক্ষে। বিকল্প কিছু করা সম্ভব নয়। সবশেষে জিয়া ঐ দিন এদের সাথে একমত হলেন যে সবাইকে ছেড়ে দেওয়া হবে, কোনো বিচার করা হবে না। অফিসারেরা বললেন, আপনি এখান থেকে Fly করার আগেই ঢাকাতে এই খবরটি ওয়্যারলেসের মাধ্যমে পাঠাবেন যে, কারাগার ও সেনানিবাসে বন্দী অফিসারদেরকে যেন মুক্তি দেওয়া হয়। জিয়া তাই করলেন এবং নির্দেশ কার্যকর হওয়ার পর ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে হেলিকপ্টারে ঢাকার উদ্দেশে রওয়ানা দিলেন। ঐ অফিসারেরাও ঢাকার উদ্দেশে সড়ক পথে রওয়ান দিলেন। ঐ দিন সকাল ১০/১১টার দিকে আমাদেরকে সেনানিবাস থেকে গুলশানে ডিএফআই এর একটি বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলো। আমরা তখনও কিছুই জানি না। অনেক কিছু আমরা জল্পনা কল্পনা করছিলাম। ঐ বাড়িতে পৌঁছার কিছুক্ষণ পর জেঃ শওকত আসলেন ও আমাদেরকে মুক্তির কথা শুনালেন। ডিএফ আই আমাদেরকে জিপ দিয়ে নিজ নিজ বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন। আমরা যেন সবাই পুনঃ জীবন লাভ করলাম। কয়েক ঘণ্টার পর আমরা প্রায় সবাই সবার সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম হলাম এবং কুশল বিনিময় করলাম। এই ঘটনাটি আজও অনেকের কাছে অজানা রয়েছে।

ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস! সে দিন যারা জিয়াকে সর্বাত্মক সাহায্য সহযোগিতা করেছিলেন এবং যাদের সক্রিয় সমর্থন ছাড়া জিয়া সেনাবাহিনীর Command Structure ঢেলে সাজাতে পারতেন না, তাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ মঞ্জুরের নের্তৃত্বে জিয়া হত্যায় অভিযুক্ত হলেন। জেনারেল মঞ্জুর ও তার ভাগিনা লেঃ কর্নেল মাহবুব বীর উত্তম চট্টগ্রামে সেনানিবাসের গেইটে প্রাণ হারালেন। জিয়া হত্যার অপরাধে ব্রিগেডিয়ার মহসীন, কর্নেল নওজিস...ফাঁসির কাষ্ঠে প্রাণ দিলেন। সে দিন তাদের অনেকে নিজেদেরকে নিরপরাধ বলে দাবিও করেছিলেন। তাদের আর্তনাদে কারাগারে এক শোকের ছায়া বিরাজ করছিল। বাকিরা অনেক দিন কারাভোগের পর ছাড়া পান। এমনি করে প্রত্যেকটি সামরিক অভ্যুত্থানে কয়েকজন করে মুক্তিযোদ্ধা অফিসার হত্যা এবং ফাঁসির শিকার হতে

থাকলেন। মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের একটি বৃহত্তম অংশকে বিভিন্ন সময় পর্যায়ক্রমে সেনাবাহিনী থেকে বের করে দেওয়া হলো। যখন অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করেছে বিরোধী গ্রুপকে বাধ্যতামূলক চাকরি থেকে বিদায় দেওয়া হয়েছে– এই প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল দীর্ঘদিন। অভ্যুত্থান প্রথম যে করল সে সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা ভঙ্গ করল, না পাল্টা যারা করল তারা শৃঙ্খলা ভঙ্গ করল এই প্রশ্ন আমাদের অনেকের রয়েছে। সেনাবাহিনীতে একটি Chain of Command সব সময় থাকে তাই যে জেনারেলের নের্তৃত্বে অভ্যুত্থান হয় তার প্রত্যক্ষ সহযোগীরা ছাড়া অংশগ্রহণকারী সবাই কেন দোষী হবে? যদিও সেনাবাহিনীর নিয়ম অনুযায়ী সবাই দোষী হওয়ার কথা, কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই ঘটনাগুলোর সাথে পরে যেহেতু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের সম্পর্ক রয়েছে তাই এগুলো জাতীয় পর্যায়ে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন হয়নি। যেমন– আমাদের মধ্য থেকে যাদেরকে বাধ্যতামূলক অবসর বা বহিষ্কার করা হলো এবং যিনি বা যাঁরা তা করলেন (জিয়ার আমলে) তিনি বা তাঁরা একতরফা আদৌ কতটুকু সঠিক ন্যায় বিচার করলেন এই বিষয়টি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের প্রেক্ষাপটে দেখা হয়নি।

মুক্তিযুদ্ধ ও চেতনা
পত্রিকায় প্রকাশিত
আমার লেখা

বাঙালি সেনাদের ওরা সব সময় বাঁকা চোখে দেখত

মার্চ মাস বাঙালি জাতির ঐতিহ্য সত্তা আর স্বকীয়তা রক্ষার সংগ্রামের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। ঘটনাবহুল এ মাসেই জাতি শুরু করেছিল মহান মুক্তিযুদ্ধ। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ একদিকে ছিল দীর্ঘ সংগ্রামের পর চূড়ান্ত ধাপের সূচনা ঘটানোর নির্দেশনা, অন্যদিকে ছিল স্বাধীনতার ঘোষণা; পৃথিবীর ইতিহাসে নতুন জাতি সৃষ্টির প্রয়াসে একটি স্বপ্ন; এবং পুরো জাতির জন্য চূড়ান্ত বিজয় না হওয়া পর্যন্ত একটি সার্বিক দিকনির্দেশনা, দৃঢ় অঙ্গীকার ও শপথ। আমি তখন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একজন সিনিয়র ক্যাপ্টেন পদমর্যাদার অফিসার হলেও আমরা বৈষম্যের শিকার ছিলাম। সব সময় বাঁকা চেখে দেখা হতো আমাদের। এ মার্চ মাসের ঘটনাপ্রবাহ, বিশেষ করে ৭ মার্চের ভাষণের পরপরই লক্ষ করলাম আমাদের সঙ্গে তাদের বিমাতাসুলভ ব্যবহার। আমাদের প্রতি তাদের বিশ্বাসের ঘাটতি চরমে পৌঁছেছিল। নজরদারি বৃদ্ধি করা হয় এ মাসে। অধিকাংশ অফিসার ও সৈনিক (যারা পরবর্তী সময়ে সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন) বঙ্গবন্ধুর বলিষ্ঠ ভূমিকা সর্বোপরি ৭ মার্চের ভাষণে এত অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন যে, অনেকে তাদের আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ না করে পারেননি। সবাই একটি মুহূর্তের অপেক্ষায় ছিলেন কখন আসবে আমাদের দেশের স্বাধীনতার জন্য দেশের জনগণকে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দেওয়ার সে সুযোগ। এ মাসে আমরা লক্ষ করেছি, তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান এ অঞ্চলে বাড়তি সৈনিক ও গোলাবারুদ আসা অব্যাহত রেখেছে। ৭ মার্চের ভাষণের পর এর মাত্রা আরও বৃদ্ধি পায়। লক্ষ করেছিলাম, তারা আঘাত হানার জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার সুবিধার্থে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনার নামে সময় ক্ষেপণ করছিল। রাজনৈতিক দূরদর্শিতাসম্পন্ন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুও তাদের এ কৌশল বুঝতে পেরেছিলেন বলেই আলোচনার পাশাপাশি তিনি স্বাধীনতার চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনে প্রস্তুত করে গড়ে তুলছিলেন পুরো জাতিকে। এ মাসেই আমার কমান্ডিং অফিসার আমার সম্পর্কে একটি গোপনীয় নোট পাঠিয়েছিলেন সংশ্লিষ্টদের কাছে এই বলে যে, 'এই অফিসারটি

প্রাদেশিকইজমে মোটিভেটের। একে ঠিকমতো গাইড না করলে যে কোনো সময় চলার পথ বিচ্যুত হয়ে যেতে পারে।' এ ধরনের উক্তি আরও অনেক বাঙালি অফিসার সম্পর্কে করা হয়েছিল। এ মাসেই বঙ্গবন্ধুর নের্তৃত্বে স্বাধীনতার প্রশ্নে সেদিন দলমত নির্বিশেষে মুক্তিকামী মানুষের এক বৃহত্তম ঐক্য সৃষ্টি হয়েছিল। সবাই যেন বঙ্গবন্ধুর শেষ বাঁশির আওয়াজের অপেক্ষায় ছিল। গোটা দেশ তখন উত্তাল। এ অঞ্চলের বিভিন্ন সেনানিবাসে পাকিস্তানি সেনাদের চলছিল যুদ্ধের চূড়ান্ত প্রস্তুতি। বাঙালি অফিসারদের ইতোমধ্যে নিরস্ত্রীকরণ করা হয়েছে। ২৫ মার্চ সে কালরাত। তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল ঢাকার পিলখানা এবং রাজারবাগের ইপিআর ও পুলিশের ওপর। শুরু করল হত্যাযজ্ঞ। পাশাপাশি তারা বেরিয়ে পড়ল বাংলার বিভিন্ন জনপদে। হাটবাজার, বাড়িঘরে আগুন লাগাতে শুরু করল। দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল বাংলার জনপদ। এক বিভীষিকাময় চিত্র প্রত্যক্ষ করল বিশ্ববাসী। বিশ্ববাসী সেদিন শুনতে পেয়েছিল মানবতার আর্তনাদ। এ হাহাকার মুক্তিকামী মানুষের চেতনাকে করেছিল আরও শানিত। ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণে উদ্বুদ্ধ সর্বস্তরের জনগণ যার যা কিছু ছিল তা নিয়ে ব্যারিকেড সৃষ্টি করল প্রতিটি জনপদে। এটাই ছিল স্বাধীনতাযুদ্ধের সূচনালগ্ন। লক্ষ করলাম প্রতিটি জনপদে সর্বস্তরের মানুষের চোখে-মুখে মরণপণ এক সংগ্রামের স্বপ্ন নিয়ে পাকিস্তানিদের প্রতিহত করার দৃঢ়সংকল্পতা। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ মুখে 'জয় বাংলা' শ্লোগানে মুখরিত হচ্ছিল বাংলার আকাশ-বাতাস। স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের বিশাল অংশের এতে অংশ নিতে দেখা যায়। এদের অনেকে পাকিস্তানিদের ট্যাংকের সামনে যেতেও দ্বিধা করেনি। যেন বাংলা মায়ের মুক্তির জন্য এক আবেগময় মুহূর্ত। একটি অত্যাধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের নেতার মন্ত্রে দীক্ষিত জনগোষ্ঠী ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এই ব্যারিকেড যুদ্ধে। এ শুধু অতুলনীয় সাহসিকতার নিদর্শনই নয়, একটি যুদ্ধ শুরুর প্রারম্ভে এ ধরনের ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। এই তুমুল ব্যারিকেড যুদ্ধ স্থায়ী হয়েছিল মাত্র কয়েক দিন। এ ছাত্র-জনতা-শ্রমিকরাই সশস্ত্র গেরিলা ও সম্মুখযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। এই সময় সেনাবাহিনী, ইপিআর ও পুলিশের অফিসার এবং সৈনিকদের সঙ্গে সশস্ত্র যুদ্ধে শামিল হয়ে নের্তৃত্ব দিতে পেরে আমি গর্বিত। স্বাধীন বাংলা সরকারের অধীনে সৃষ্টি হয়েছিল ১১ টি সেক্টর। পর্যায়ক্রমে গঠিত হলো 'এস' 'জেড' ও 'কে' ফোর্স এবং স্বীকৃত বাহিনী। এ পর্যায়ে ভারত আমাদের আশ্রয়, অস্ত্র গোলাবারুদ সরবরাহ, কিংবা আমাদের মুক্তিবাহিনীকে সামরিক প্রশিক্ষণ না দিলে এত কম সময়ে আমরা সংগঠিত হতে পারতাম না। এ ছাড়া ভারত প্রায় এক কোটি শরণার্থীকে আশ্রয়, খাদ্য-বস্ত্র-স্বাস্থ্যসেবা দিয়েছে। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তার মহান ও হিমালয়সম নের্তৃত্বের দিকে তাকিয়ে, সর্বোপরি দেশবাসীর স্বপ্নসাধ

পূরণে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের স্বাধীনতার সপক্ষে, পাকিস্তানের গণহত্যার বিরুদ্ধে বিশ্বের ২৬ টি দেশ সফর করে আমাদের দাবি তুলে ধরেছেন। এমনকি আমাদের দাবির সপক্ষে তিনি জাতিসংঘে ভাষণ দিয়েছেন, সৃষ্টি করেছেন বিশ্ব জনমত। ১৯৭১ সালের মার্চে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ শুরু হয় তাতে আমরা ভারতীয় সেনাবাহিনীর সর্বাত্মক সহযোগিতা পেয়েছিলাম। আর এর মাধ্যমে পাকিস্তানি বাহিনীকে প্রায় দুর্বল ও পর্যুদস্ত করে চূড়ান্ত আঘাত হানার লক্ষ্যে জেনারেল অরোরার নের্তৃত্বে মিত্রবাহিনী গঠন করা হয়। ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়। নয় মাসের যুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর চার হাজার অফিসার ও সৈনিক হতাহত হন। প্রশ্ন জাগে, আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি কিন্তু ভারত কী পেয়েছে। কারণ তাদের আত্মত্যাগ ছাড়া এত কম সময়ে আমাদের স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব ছিল না। ঘটনাবহুল এই মার্চ মাস শুধু ৭ মার্চের ভাষণ নয়, এ ঐতিহাসিক ভাষণের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা এসেছিল। এরই ধারাবাহিকতায় জিয়াউর রহমানও বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেছিলেন। জিয়াউর রহমান ঘোষণা পাঠ শেষ করেন 'জয় বাংলা' বলে। জিয়াউর রহমানের এ ঘোষণাকে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা থেকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখি না। জিয়াউর রহমানের এ ঘোষণায় যুদ্ধকামী জনগণ, বিশেষ করে বাঙালি সৈনিক ও অফিসাররা বাড়তি একটা অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। আমি মনে করি, এ বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক কাদা ছোড়াছুড়ির ঊর্ধ্বে থাকাই সমীচীন। ৪৩ বছর পর আজকের বাংলাদেশে রাজনৈতিক কাদা ছোড়াছুড়ির আর ক্ষমতার লড়াই দেখে মনে হয়, বলতে হয়, মুক্তিযোদ্ধারা এই বাংলাদেশের জন্য যুদ্ধ করেননি। আজও অনেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা স্বীকার পর্যন্ত করেন না। যুদ্ধের বছরকে গণ্ডগোলের বছর বলার দুঃসাহস দেখান। এদের চিহ্নিত করে বিচারের পাশাপাশি ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিতে হবে। কোনো অবস্থায় জাতিকে বিভক্ত দেখতে চাই না। সব দলের বর্তমান প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাস করতে হবে। যুদ্ধকালীন যারা সরাসরি বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন তাদের ঘৃণা ও বর্জন করতে হবে।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
১২ মার্চ ২০১৫

গোটা দেশ তখন উত্তাল

একাত্তরের স্বাধীনতার এই মাসটি বাঙালি জাতির স্বকীয় ঐতিহ্য, নিজস্ব সত্তা তথা আবেগময় একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। ঘটনাবহুল এ মাসেই বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনসহ দীর্ঘ মুক্তির সংগ্রাম জাতি পদার্পণ করেছিল মুক্তিযুদ্ধের আরেকটি অধ্যায়ে। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ যেমন একদিকে ছিল দীর্ঘ সংগ্রামের সমাপনী, অন্যদিকে ছিল স্বাধীনতার ঘোষণা; পৃথিবীর ইতিহাসে নতুন জাতি সৃষ্টির প্রয়াসে একটি স্বপ্ন; এবং পুরো জাতির জন্য চূড়ান্ত বিজয় না হওয়া পর্যন্ত একটি সার্বিক দিকনির্দেশনা, দৃঢ় অঙ্গীকার ও শপথ। আমি তখন তৎকালীন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একজন সিনিয়র ক্যাপ্টেন পদমর্যাদার অফিসার হলেও আমরা বৈষম্যের শিকার ছিলাম। সব সময় বাঁকা চোখে দেখা হতো আমাদের। এই মার্চ মাসের ঘটনাপ্রবাহ, বিশেষ করে ৭ মার্চের ভাষণের পরপরই লক্ষ করলাম আমাদের সঙ্গে বিমাতাসুলভ ব্যবহার। আমাদের প্রতি তাদের বিশ্বাসের ঘাটতি চরমে পৌঁছেছিল। নজরদারি বৃদ্ধি করা হয় এ মাসে। অধিকাংশ অফিসার ও সৈনিক (যারা পরবর্তী সময়ে সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন) বঙ্গবন্ধুর বলিষ্ঠ ভূমিকা সর্বোপরি ৭ মার্চের ভাষণে এত অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন যে, অনেকে তাদের আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ না করে চাপিয়ে রাখতে পারেননি। সবাই একটি মুহূর্তের জন্য অপেক্ষায় ছিল কখন আসবে আমাদের দেশের স্বাধীনতার জন্য দেশের জনগণকে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের নের্তৃত্ব দেওয়ার সে সুযোগ। এ মাসে আমরা লক্ষ করছি, তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান এ অঞ্চলে বাড়তি সৈনিক ও গোলাবারুদ আসা অব্যাহত রেখেছে। ৭ মার্চের ভাষণের পর এ মাত্রা আরও বৃদ্ধি পায়। লক্ষ করেছিলাম, বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তারা আলোচনার নামে তাদের প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে সময়ক্ষেপণ করছিল। রাজনৈতিক দূরদর্শিতাসম্পন্ন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুও তাদের এ কৌশল বুঝতে পেরেছিলেন বলেই আলোচনার পাশাপাশি তিনি স্বাধীনতার চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনে প্রস্তুত করে গড়ে তুলেছিলেন পুরো জাতিকে। এ মাসেই আমার কমান্ডিং অফিসার আমার সম্পর্কে একটি

গোপনীয় নোট পাঠিয়েছিল সংশ্লিষ্টদের কাছে এই বলে যে, 'এই অফিসারটি প্রাদেশিকইজমে মোটিভেটেড। একে ঠিকমতো গাইড না করলে যে কোনো সময় চলার পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যেতে পারে।' এ ধরনের উক্তি আরও অনেক বাঙালি অফিসার সম্পর্কে করা হয়েছিল।

আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, এ মাসেই বঙ্গবন্ধুর নের্তৃত্বে স্বাধীনতার প্রশ্নে সেদিন দলমত নির্বিশেষে মুক্তিকামী মানুষের এক বৃহত্তম ঐক্য সৃষ্টি হয়েছিল। সবাই যেন বঙ্গবন্ধুর শেষ বাঁশির আওয়াজ শোনার অপেক্ষায় ছিল। গোটা দেশ তখন উত্তাল। এ অঞ্চলের বিভিন্ন সেনানিবাসে পাকিস্তানি সেনাদের চলছিল যুদ্ধের চূড়ান্ত প্রস্তুতি। বাঙালি অফিসারদের ইতোমধ্যে নিরস্ত্রীকরণ করা হয়েছে। ২৫ মার্চ সে কালরাত। তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল ঢাকার পিলখানা এবং রাজারবাগের ইপিআর ও পুলিশের ওপর। শুরু করল হত্যাযজ্ঞ। পাশাপাশি তারা বেরিয়ে পড়ল বাংলার বিভিন্ন জনপদে। হাটবাজার, বাড়িঘরে আগুন লাগাতে শুরু করল। দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল বাংলার জনপদ। এক বিভীষিকাময় চিত্র প্রত্যক্ষ করল বিশ্ববাসী। বিশ্ববাসী সেদিন শুনতে পেয়েছিল মানবতার আর্তনাদ। এ হাহাকার মুক্তিকামী মানুষের চেতনাকে করেছিল আরও শাণিত। ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণে উদ্বুদ্ধ সর্বস্তরের জনগণের যার যা কিছু ছিল তা নিয়ে ব্যারিকেড সৃষ্টি করল বাংলার প্রতিটি জনপদে। একটি অত্যাধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের নেতার মন্ত্রে দীক্ষিত জনগোষ্ঠী ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এই ব্যারিকেড যুদ্ধে। এ শুধু অতুলনীয় সাহসিকতার নিদর্শনই নয় একটি যুদ্ধ শুরুর প্রারম্ভে এ ধরনের ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। এই তুমুল ব্যারিকেড যুদ্ধ স্থায়ী হয়েছিল মাত্র কয়েক দিন। এই ছাত্র-জনতা-শ্রমিকরাই সশস্ত্র গেরিলা ও সম্মুখযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। আমি গর্বিত তৎকালীন সেনাবাহিনী, ইপিআর ও পুলিশের অফিসার এবং সৈনিকদের সঙ্গে সশস্ত্র যুদ্ধে শামিল হয়ে নের্তৃত্ব দিতে পেরেছিলাম বলে। স্বাধীন বাংলা সরকারের অধীনে সৃষ্টি হয়েছিল ১১টি সেক্টর। পর্যায়ক্রমে গঠিত হলো 'এস' 'জেড' ও 'কে' কোর্স এবং স্বীকৃত বাহিনী। এ পর্যায়ে তৎকালীন ভারত আমাদের আশ্রয়, অস্ত্র, গোলাবারুদ সরবরাহ, কিংবা আমাদের মুক্তিবাহিনীকে সামরিক প্রশিক্ষণ যদি না দিত, তাহলে এত কম সময়ে আমরা সংগঠিত হতে পারতাম না। এ ছাড়া ভারত প্রায় এক কোটি শরণার্থীকে আশ্রয়, খাদ্য-বস্ত্র-স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করেছে। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তার মহান ও হিমালয়সম নের্তৃত্বের দিকে তাকিয়ে সর্বোপরি দেশবাসীর স্বপ্নসাধ পূরণে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের স্বাধীনতার সপক্ষে, পাকিস্তানের গণহত্যার বিরুদ্ধে বিশ্বের ২৬টি দেশ সফর করে আমাদের দাবি তুলে ধরেছেন। এমনকি আমাদের দাবির সপক্ষে তিনি জাতিসংঘে ভাষণ দিয়েছেন, সৃষ্টি করে

বিশ্ব জনমত। ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমরা ভারতীয় সেনাবাহিনীর সক্রিয়, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অংশগ্রহণ, সর্বাত্মাক সহযোগিতা পেয়েছিলাম। তার মাধ্যমে পাকিস্তানি বাহিনীকে প্রায় দুর্বল ও পর্যুদস্ত করে চূড়ান্ত আঘাত হানার লক্ষ্যে জেনারেল আরোরার নের্তৃত্বে মিত্রবাহিনী গঠন করা হয়। ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়। ৯ মাসের যুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর চার হাজার অফিসার ও সৈনিক হতাহত হন। প্রশ্ন জাগে, আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি কিন্তু ভারত কী পেয়েছে? কারণ তাদের এ আত্মাহুতি ছাড়া এত কম সময়ে আমাদের স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব ছিল না। ঘটনাবহুল এই মার্চ মাস শুধু ৭ মার্চের ভাষণ নয়। এ ঐতিহাসিক ভাষণের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা এসেছিল। এরই ধারাবাহিকতায় জিয়ার রহমানও বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেছিলেন। জিয়াউর রহমান 'জয় বাংলা' বলে এ ঘোষণাপত্র পাঠ শেষ করেছিলেন। জিয়াউর রহমানের এ ঘোষণাকে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা থেকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখি না। জিয়াউর রহমানের এ ঘোষণায় যুদ্ধকামী জনগণ বিশেষ করে বাঙালি সৈনিক ও অফিসাররা বাড়তি একটি অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। আমি মনে করি, এ বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক কাদা- ছোড়াছুড়ির উর্ধ্বে থাকাই সমীচীন।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
২৫ মার্চ, ২০১৪

দেশে প্রাতিষ্ঠানিক গণতন্ত্র ও সরকার জরুরি

রাজনীতি কিংবা অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক গণতন্ত্র ও সরকার থাকা প্রয়োজন। এখন ক্ষমতায় যাওয়া ও প্রতিহিংসার রাজনীতি চলছে। দেশপ্রেমের রাজনীতি নেই। অপ্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নেও বাধা। আজ বিদ্যুৎ-গ্যাসের অভাবে দেশি বিদেশি বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। বর্তমানে নিজেরা যদি মাইন্ড সেট করতে পারি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী হই তাহলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব। এ জন্য দৃঢ় সরকার ব্যবস্থা ও গণতন্ত্রের প্রয়োজন। এতে করে সরকার পরিবর্তন হলেও উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকবে। ক্ষমতা লাভের রাজনীতি বর্জন করতে হবে। সরকারি ও বিরোধী দলের মধ্যে এমন সম্পর্ক থাকতে হবে যেন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কাজ করা যায়। প্রতিহিংসার রাজনীতি আমরা কেউ চাই না। এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৪

৩ নভেম্বরের অজানা অধ্যায়
খন্দকার মোশতাকের সেই জবানবন্দি কোথায়

জেল হত্যার স্বীকারোক্তি দিয়ে মোশতাক জবানবন্দি দিয়েছিলেন। তা রেকর্ড করা হয়েছিল। সেই ক্যাসেটটি আর্মির ৪৬ ব্রিগেড (বিএম)-এর কক্ষে সংরক্ষিত ছিল। বিএনপির বর্তমান ভাইস চেয়ারম্যান মেজর (অব) হাফিজউদ্দিনের এ বিষয়ে পুরো তথ্য জানা থাকার কথা। অনুসন্ধান করে এই ক্যাসেটটি যদি জাতির সামনে প্রকাশ করা হয় তাহলে জেলহত্যার বিচার সম্পন্ন করার পথ আরও প্রশস্ত হবে ১৯৭৫-এর ৩ নভেম্বর অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারীদের কাছে।

প্রতি বছর আমরা ৩ নভেম্বর জেলহত্যা দিবস পালন করি। যে নির্মম হত্যাকাণ্ডের বিচারের বাণী আজও নিভৃতে কাঁদে। অথচ ৩ নভেম্বর খালেদ মোশাররফের নের্তৃত্বে যে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটল তার সঠিক ধারাবাহিকতার ইতিহাস এবং এর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য জাতি যদি না জানে তা হবে প্রকৃত ইতিহাস বিকৃতির শামিল। ৩ নভেম্বর খালেদের নের্তৃত্বে এই সামরিক অভ্যুত্থান যদি সেদিন না হতো তাহলে– এক. খন্দকার মোশতাক যে মন্ত্রিপরিষদ নিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করছিলেন মোশতাকের সেই টুপির রাজনীতি অব্যাহত থাকত। দুই. মোশতাক যদি আর দুই থেকে তিন মাস সময় পেতেন তাহলে আওয়ামী লীগের অবশিষ্ট নেতা-কর্মীরাও তার সঙ্গে একীভূত হয়ে যেত। এতে করে আওয়ামী লীগের আবার পুনরুজ্জীবিত হওয়ার শক্তি হারিয়ে যেত এবং দলটিকে কঠিন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হতো। তিন. মোশতাককে অপসারণ করে খালেদ নিজে সেনাপ্রধান হয়ে সায়েমকে নতুন করে প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত করলেন। এতে করে আওয়ামী লীগ আবার পুরো শক্তি উদ্যম নিয়ে সব ধরনের ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে দল পুনর্গঠনে একটি বিরাট সুযোগ পেল। যদি এই সুযোগ না পেত তাহলে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আজকের এই দলে পরিণত হতে পারত না। তাই বলব খালেদ যদিও মোশতাককে অপসারণ করে সায়েমকে বসিয়ে পরে নিজেই জাসদের হঠকারী অভ্যুত্থানের কারণে নিহত হলেন কিন্তু এর আগ মুহূর্তে

মোশতাককে সরিয়ে সায়েমকে বসিয়ে তৎকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তনে বিরাট সফলতা দেখিয়েছেন। ৭ নভেম্বর জাসদের হঠাকারী ভূমিকার ও সিদ্ধান্তের কারণে বন্দী জিয়া রাজনীতিতে নতুনভাবে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন। এর কৃতিত্ব তৎকালীন জাসদের। আমি তখন ক্যান্টনমেন্টে ১৫ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করছিলাম। সেখানে কমান্ডার ছিলেন কর্নেল হুদা। তিনি যুদ্ধ চলাকালে সেনাবাহিনীর চাকরিতে ছিলেন না। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় তিনি আসামি ছিলেন। যুদ্ধে অংশগ্রহণের কারণে স্বাধীনতার পর তাকে চাকরিতে পুনর্বহাল করা হয়েছিল। ৩ নভেম্বরের আগে ঢাকায় খালেদ মোশাররফ ও কয়েকজন অফিসারের সঙ্গে দেশের মধ্যে ও সেনাবাহিনীতে বিরাজমান বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি ও করণীয় সম্পর্কে কর্নেল হুদা ও আমার আলাপ হয়েছিল। ২ নভেম্বর রাতে খালেদ মোশাররফ রংপুরে কর্নেল হুদার বাসায় টেলিফোন করেন। আমি সেই বাসায় আগে থেকেই কর্নেল হুদার আমন্ত্রণে অপেক্ষা করছিলাম এ জন্য যে, যে কোনো মুহূর্তে অপারেশন প্যানথারের নির্দেশ আসবে। খালেদ মোশাররফ কর্নেল হুদার সঙ্গে আলাপ রেখে আমাকে টেলিফোন দিতে বললেন এবং বললেন, কনেল হুদা থেকে তোমরা ইউনিটের অনেক সুনাম শুনলাম। কিপ ইট আপ। তিনি আরও বললেন, হুদা তার যুদ্ধের অভিজ্ঞতার ওপর একটি বই লিখবে। আমাদের ২ নম্বর সেক্টরে তোমার বিলোনিয়া যুদ্ধের কাহিনিও হুদাকে শোনাবে এবং তার বইতে উল্লেখ করতে বলবে। টেলিফোনে যেহেতু এ সম্পর্কে আলাপ করা নিরাপদ নয় সে কারণে খালেদ ওই কৌশল বিনিময়ের মাধ্যমে আমাকে পূর্বের সিদ্ধান্ত কার্যকর হতে যাচ্ছে এই মেসেজটি পরোক্ষভাবে দিলেন। আমি ও কর্নেল হুদা ৩ নভেম্বর খালেদ মোশাররফের সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ করি এবং তাকে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী জানানো হয় যে, ১০ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে ইতোমধ্যেই ঢাকায় উদ্দেশে রওনা হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ ইউনিট যুদ্ধের সময় আমার অধীনেই অধিষ্ঠিত হয়েছিল। এবং এর প্রতিষ্ঠাতা অধিনায়ক হিসেবে আমি এর দায়িত্ব পালন করেছিলাম। এবং যুদ্ধের সময় এই রেজিমেন্টকে 'কে' ফোর্স অর্থাৎ খালেদ মোশাররফ ফোর্সের অধীনে একটি ইউনিট ছিল বিধায় তার প্রতি আনুগত্য থাকবে। কর্নেল হুদা উপরোল্লিখিত কথাগুলো খালেদকে স্মরণ করিয়ে দিলেন এবং ১০ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে প্রথম ঢাকা পাঠানোর যৌক্তিকতা তুলে ধরলেন। এবং আরও বললেন, প্রয়োজনে জাফর ইমামের বর্তমান ইউনিট ১৫ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকেও ঢাকায় পাঠানো হবে। এ ছাড়া খালেদের পক্ষ থেকে কর্নেল হুদা আর আমার ওপর আরেকটি বাড়তি দায়িত্ব ছিল যশোর সেনানিবাস থেকে খালেদের বিরুদ্ধে যেন কোনো ইউনিট ঢাকার দিকে রওনা না হয় সে

ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ব্রিগেডিয়ার শওকত যশোর সেনানিবাসের দায়িত্বে ছিলেন। যদিও যশোর থেকে কোনো ইউনিট ঢাকা অভিমুখে রওনা হয়নি তবুও আমাদেরকে ফেরিঘাট পর্যন্ত কড়া সতর্কতা ও নজর রাখতে হয়েছিল। এই ব্যাপারে প্রস্তুতির কারণে আমরা খালেদের সঙ্গে একমত হলাম যে ৩ নভেম্বর আমরা উল্লিখিত দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত থাকব এবং সব ঠিকঠাক করে ৪ তারিখ ভোরে ফ্লাই ক্লাবের সেনা উড়োজাহাজ নিয়ে আমরা ঢাকায় আসব। এমনিতে আমরা ঢাকার সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করছিলাম। ২ নভেম্বর মধ্যরাত থেকে ৩ নভেম্বর ভোররাত পর্যন্ত অপারেশন সফল করার জন্য ঢাকায় অবস্থানরত ইউনিটগুলো পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন পয়েন্টে অবস্থান গ্রহণ করে।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
৪ নভেম্বর, ২০১৫

দেখেছি আনন্দাশ্রু স্বজন হারানোর বেদনা

'৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর বিজয়ের মুহূর্তে দেখেছি মানুষের চোখে আনন্দের অশ্রু। দেখেছি স্বজন হারানোর বেদনা। বিজয়লগ্নে বাংলার জনপদগুলোতে চলছিল উল্লাসের মিছিল। আকাশ-বাতাসে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল 'জয় বাংলা' শ্লোগান। সেদিন ছিল না দলীয় পরিচয়। স্বাধীনতার পক্ষের সব শক্তি ছিল ঐক্যবদ্ধ। সবার একটাই স্বপ্ন ছিল– নিজের মতো করে নিজেদের দেশটা গড়ব। থাকবে না কোনো হিংসা বিদ্বেষ। সেই উচ্ছ্বাস আর আবেগ আজ হারিয়ে যাচ্ছে। আজ তাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রাখতে হলে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে শহিদদের স্বপ্ন-সাধ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে কোনো গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিগুলোর ঐক্যের পথ রাখতে হবে উন্মুক্ত। সজাগ থাকতে হবে। আমাদের কোনো ভুলের জন্য জাতি যেন দ্বিধাবিভক্ত না হয়ে পড়ে। বিজয়ের মুহূর্তে সবার একটাই আশা ছিল– কাঁধ মিলিয়ে নিজের দেশ গড়ব। যেখানে থাকবে না কোনো হানাহানি বা ক্ষমতার লড়াই। মহান মুক্তিযুদ্ধে যে যেভাবেই স্বাধীনতার জন্য কাজ করেছে তারা সবাই মুক্তিযোদ্ধা। কিন্তু যারা জীবন বাজি রেখে সম্মুখযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন তাদের পৃথকভাবে চিহ্নিত করা উচিত ছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের প্রায় চার হাজার সেনা অফিসার ও সৈনিক আমাদের স্বাধীনতার জন্য তাদের বুকের রক্ত দিয়ে বাংলার মাটি রঞ্জিত করেছিলেন। তাদের সম্মান দিতে আমরা কার্পণ্য করি কেন? শুনেছি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য ভারতীয় শহিদ পরিবারের সদস্যরা বাড়তি সুযোগসুবিধা পান না। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের করণীয় রয়েছে। আমাদের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ভারত থেকে পূর্ণাঙ্গ তালিকা সংগ্রহ করে মরণোত্তর সংবর্ধনা দেওয়া, তাদের নামে স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা যেতে পারে। মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার বিদেশিদের সম্মাননা দিচ্ছে। দেরিতে হলেও এটি

প্রসংসনীয় উদ্যোগ। স্বাধীনতার ৪৪ বছর পর মুক্তিযোদ্ধারা বিভিন্ন গ্রুপে বা রাজনৈতিক দলে থাকাটাই স্বাভাবিক। যে যেখানেই থাকুক না কেন সবাই দেশপ্রেমিক। দলীয় কারণে তাদের বিতর্কিত করা সমীচীন নয়।

মুক্তিযুদ্ধ আমাদের অন্যতম জাতির ঐতিহ্য, অহংকার এবং গর্ব। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, যে চেতনা নিয়ে জীবন বাজি রেখে মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম সে চেতনা আজ প্রায় বিলুপ্তির পথে। জাতি বীরদের সম্মান দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে। এ জাতি বড়ই অভাগা। শুধু বিজয় আর স্বাধীনতা দিবস এলেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে সবাই সোচ্চার হয়। মুক্তিযুদ্ধ হঠাৎ ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা নয়। ৫২-এর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু হয়েছিল মুক্তির সংগ্রাম। মুক্তিযুদ্ধের প্রথম লগ্ন থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সর্বাত্মক সহযোগিতা এবং নয় মাসের যুদ্ধে তাদের অংশগ্রহণ এবং বিভিন্ন রণাঙ্গনে তাদের প্রায় চার হাজার সেনা সদস্য হতাহত হয়েছিলেন। আজ আমাদের শহিদদের স্মরণের পাশাপাশি তাদের আত্মাহুতিকেও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। ৪৪ বছর আগে যে স্বপ্ন নিয়ে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলাম হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে, সে স্বপ্নের সঙ্গে আজকের বাংলাদেশের তফাত আকাশ-পাতাল। কেন এ তফাত, এর কারণগুলো চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নিতে হবে। দেশ মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অভাবের কারণে অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত হবে। তাই আমাদের জাতীয় বা আইনিভাবে যে বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে তা হলো– মুক্তিযুদ্ধকে যারা এখনও স্বীকার করে না গণ্ডগোলের বছর বলে, তাদের অবশ্যই চিহ্নিত করে তাদের নাগরিকত্ব বাতিল করতে হবে, অন্যথায় দেশের উন্নয়ন ও জাতির বিকাশে তারা অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। যারা যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করে গাজী তারা আজ চরম উপেক্ষিত। আমাদের চাওয়া-পাওয়ার কিছুই নেই। জাতি যেন আমাদের করুণা না করে। আমরা শহিদদের কাছে চলে যাওয়ার আগে দেখে যেতে চাই বীরদের যেন সম্মান দেওয়া হয়। গণযুদ্ধে আমাদের সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের পাশাপাশি রণাঙ্গনে যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তারাও সহযোগী মুক্তিযোদ্ধা। মহান মুক্তিযুদ্ধে শত্রুপক্ষের শেলিংয়ের আক্রমণে অনেকে ঘরবাড়ি, সম্ভ্রমসহ সবকিছু হারিয়েছেন। সবাই সহযোগী মুক্তিযোদ্ধা। যারা মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করেছেন, প্রশিক্ষণ দিয়েছেন সবাই আমরা মুক্তিযোদ্ধা। তাদের অবদান রয়েছে। কিন্তু যারা জীবন বাজি রেখে রণাঙ্গনে সশস্ত্র যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন তাদের ইতিহাস যদি লিপিবদ্ধ না করি তাহলে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কখনো স্বাধীনতাযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানতে পারবে না। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে পারবে না। স্বাধীনতার ৪৪ বছরে অর্জন নেই তা নয়। যদি সবাই এক হয়ে একাত্তরের মনমানসিকতা ও উদ্দীপনা নিয়ে দেশ গড়তে পারতাম তাহলে অর্জন আরও বেশি হতে পারত।

ফেনী পাক হানাদারমুক্ত হয় ৬ ডিসেম্বর। '৭১-এর এই দিনে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মুখসমরে পাক হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে ফেনীর মাটিতে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা ওড়ে। ফেনী অঞ্চলের মুক্তিবাহিনীর অধিনায়ক হিসেবে কর্মরত আমি তৎকালীন ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম (পরবর্তীতে লে.কর্নেল) ভারতের বিলোনিয়া ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল থেকে ১০ ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের অভিযান চালিয়ে বিলোনিয়া, পরশুরাম, মুন্সিরহাট, ফুলগাজী হয়ে যুদ্ধ করতে করতে এগোতে থাকলে পর্যুদস্ত হয়ে ফেনীর পাক হানাদার বাহিনীর একটি অংশ নোয়াখালীর সোনাইমুড়ী হয়ে কুমিল্লা সেনানিবাসের রাস্তায় এবং অন্য অংশ শুভপুর ব্রিজের ওপর দিয়ে চট্টগ্রামের দিকে পালিয়ে যায়। মুক্তিযুদ্ধে ফেনীর অনেক রণাঙ্গনের মধ্যে মুন্সিরহাটের মুক্তারবাড়ি ও বন্ধুয়ার প্রতিরোধের যুদ্ধ ইতিহাসখ্যাত হয়ে আছে। প্রথম বিলোনিয়া যুদ্ধে মুন্সিরহাটে পাক বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে প্রথম শহিদ হন হাবিলদার নূরুল ইসলাম। এ যুদ্ধে পাকিস্তানের প্রায় ৩০০ সেনা হতাহত হয়েছিল। হাবিলদার নূরুল ইসলাম বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। বিধ্বস্ত নূরুল ইসলাম বলেছিলেন, 'স্বাধীনতা দেখে যেতে পারলাম না। স্যার, আপনারা চালিয়ে যান। আমাদের রক্ত যেন বৃথা না যায়।' কালিমা পড়ে জয় বাংলা বলে আমাদের থেকে বিদায় নেন নূরুল ইসলাম। তখন নূরুল ইসলামের রক্তে আমাদের বাংকার রক্তাক্ত হয়েছিল। তারও ভবিষ্যৎ ছিল। আজকের বাংলাদেশে তারও স্বজনদের নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার ছিল। আমরা যারা সশস্ত্র যুদ্ধ করেছি শহিদদের আর্তনাদ শুনতে পাই। তারা বলেন, তাদের স্বপ্ন যেন বাস্তবায়ন হয়। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর দেশ বিজয় লাভ করেছিল। কিন্তু আগেই ফেনীসহ দেশের যে জেলাগুলো মুক্ত হয়েছে, যে তারিখে যে জেলা মুক্ত হয়েছে ওই তারিখে সংশ্লিষ্ট জেলায় সরকারিভাবে ছুটি ঘোষণার আহ্বান জানাচ্ছি।

বাংলাদেশ প্রতিদিন

২ ডিসেম্বর ২০১৫

সংসদ বহাল রেখে নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব নয়

মুক্তিযুদ্ধের সাব সেক্টর কমান্ডার, সাবেক মন্ত্রী লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব.) জাফর ইমাম বীরবিক্রম বলেছেন, জাতীয় সংসদ বহাল রেখে নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব হবে না। সংসদ বহাল থাকলে নির্বাচনের লেভেল প্লেয়িং গ্রাউন্ডও সৃষ্টি হবে না। সংসদ সদস্যরা নির্বাচনী এলাকায় প্রভাব বিস্তার করে নির্বাচনকে প্রভাবান্বিত করবেন। নির্বাচনের সময় মাঠের দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসাররা দায়িত্ব পালনে ইতস্তত করবেন। এ ছাড়া ৯০ দিন সংসদ থাকবে, কিন্তু অধিবেশন বসবে না– এ কথাও অস্পষ্ট। কারণ নিয়মানুযায়ী ৬০ দিনের মধ্যে সংসদ অধিবেশন বসতে হয়। তিনি আরও বলেন, নির্বাচন নিয়ে প্রধান দুই দলের মধ্যে সমঝোতা না হলে নির্বাচনের আগে ও পরে ভয়াবহ রাজনৈতিক দুর্যোগ সৃষ্টি হতে পারে। এ অবস্থায় রাষ্ট্র পরিচালনায় বিরাট শূন্যতা দেখা দিলে তখন রাষ্ট্রের হাল ধরবে কে? এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হওয়ার আগেই শেখ হাসিনাকে প্রধানমন্ত্রিত্বের ঊর্ধ্বে উঠে বঙ্গবন্ধুর কন্যা হিসেবে সঠিক দায়িত্ব পালন করতে হবে। একইভাবে বিরোধীদলীয় নেতা বেগম খালেদা জিয়াকেও দল-মতের ঊর্ধ্বে উঠে বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সহধর্মিণী হিসেবে এগিয়ে আসতে হবে। আগামী সংসদ অধিবেশনে এ বিষয়গুলো আলোচনার মাধ্যমে উভয় পক্ষকে সমঝোতায় আসতে হবে। গতকাল বাংলাদেশ প্রতিদিনের সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায় এ কথা বলেন তিনি। জাফর ইমাম বলেন, গণতন্ত্রচর্চার জন্য নির্বাচন অপরিহার্য বটে কিন্তু নির্বাচনের জন্য উপাযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। জাতিকে বিভক্ত করে নির্বাচন-পরবর্তী গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিলে সংবিধানে কী রয়েছে তা সাধারণ মানুষের কাছে বড় ইস্যু হিসেবে পরিগণিত হবে না। স্বাধীনতাযুদ্ধের চেতনা পরিপন্থী কোনো পদক্ষেপে যদি ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনে সে জন্য জাতি দুই নেত্রীকে দোষারোপ করবে। তাদের আহ্বান জানাব, নির্বাচন-উত্তর পরিস্থিতি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, বৃহত্তম জাতীয় ঐক্য, শহিদদের স্বপ্নসাধ বাস্তবায়ন আজ সময়ের দাবি।

একতরফাভাবে নির্বাচন নিয়ে জটিলতা সৃষ্টির আশঙ্কা প্রকাশ করে মুক্তিযুদ্ধের এই বীর সেনানী বলেন, এরই মধ্যে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দিয়েছেন, ২৪ জানুয়ারি ২০১৪ সালের মধ্যে নির্বাচন হবে। এ নিয়ে বিভিন্ন মহলে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তার সৃষ্টি হয়েছে। জনমনে আজ প্রশ্ন– নির্বাচন আদৌ হবে কি না। বিরোধী দলের দাবি তত্ত্বাবধায়ক না মানলে নির্বাচনে আসবে না। নির্বাচন প্রতিহত করবে বলেও হুঁশিয়ারি দিচ্ছে। এদিকে সরকারের পক্ষে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে সংসদ ও মন্ত্রিসভা বহাল রেখে নির্বাচন হবে। এ নিয়ে দুটি দল স্নায়ুযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় শেখ হাসিনা আজ অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন। এখনও কিছু কিছু ছাড় দিয়ে মধ্যস্থতার মাধ্যমে সমঝোতায় আসা সম্ভব। এ জন্য দুটি দলের মাইন্ড সেটআপ পজিটিভ হতে হবে। কারণ এই তত্ত্বাবধায়ক একসময় বর্তমান সরকারি দলেরই দাবি ছিল। বিরোধী দলের বর্তমান মনোভাব হুবহু আগের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ফরমেটে না হলেও চলবে। কিন্তু দলীয় সরকারের অধীনে নয়। মনে করি, সরকার যে ফর্মুলা দিয়েছে এতেও চরম আতঙ্ক থাকবে না যদি উভয় পক্ষ সারা দেশে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন পরিচালনার জন্য গ্রহণযোগ্য নীতিমালায় একমত হতে পারে। কিন্তু দুই পক্ষেই কিছু কিছু মহল নিজেদের মধ্যে কানকথা ও উপদেশের কারণে দুই নেত্রীই সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে মাঝেমধ্যে বিভ্রান্ত হচ্ছেন। সমস্যার সমাধান প্রসঙ্গে তিনি বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে নির্বাচনের প্রশ্নে এখনও ঐকমত্যেও আসা সম্ভব। এর জন্য আগামী সংসদ অধিবেশনে উভয় পক্ষকে প্রস্তাব আনতে হবে। সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি সংসদ বিলুপ্ত করলে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান থেকে নির্বাচনের আগ পর্যন্ত পলিসি মেটার বাদ দিয়ে রুটিন কাজ করবেন পরবর্তী সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করা পর্যন্ত। এখানে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পর্দার অন্তরালে আপসের মাধ্যমে উভয় পক্ষ পছন্দের প্রতিনিধি বাছাই করতে পারে। পাশাপাশি বিরোধীদলীয় নেতাকে অন্তর্বর্তী সরকারপ্রধানের প্রটোকল তথা বাড়তি নিরাপত্তা ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে। প্রধানমন্ত্রীর অধীনে অন্তর্বর্তী একটি সমঝোতা মন্ত্রিসভা থাকবে। তিনি বলেন, দুই নেত্রীর সংলাপের কোনো প্রয়োজন নেই। সংলাপে কোনো লাভ হবে না। দুই জোটের বাইরের জাতীয় নেতাদের এই মধ্যস্থতায় সম্পৃক্ত করতে হবে। মধ্যস্থতার মাধ্যমে কিছু কিছু বিষয়ে সমঝোতা ফলপ্রসূ হবে। যেমন অন্তর্বর্তী সরকারে যদি বিএনপির প্রতিনিধি থাকার ঐকমত্য হয় তাহলে স্বরাষ্ট্র ও জনপ্রশাসন ভাগাভাগি করে নিতে হবে যেন মাঠপর্যায়ের অফিসাররা নিরপেক্ষ থাকতে বাধ্য হন। এতে শেখ হাসিনা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান হলেও মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। পাশাপাশি নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে নানান বিচারসহ যেসব জটিল ইস্যু চলমান সেগুলোর কার্যক্রম

নির্বাচন পর্যন্ত স্থগিত রাখা উচিত। বিএনপি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনে অংশ নিয়ে বিএনপি নের্তৃত্বাধীন ১৮ দলীয় জোট যে পরিমাণ আসন পাবে, তার চেয়ে কয়েকটি আসন বেশি পাবে যদি সরকার ঘোষিত ফর্মুলা কিছুটা পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে নির্বাচনে অংশ নেয়। তিনি বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি আজীবন চলতে পারে না। এর অবসান হওয়া দরকার। ২০০১ সালের নির্বাচন সুষ্ঠু ছিল না। আজকে মধ্যস্থতার মাধ্যমে সমঝোতায় সরকার ঘোষিত নীতিমালা কিছু পরিবর্তন করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীনে নির্বাচন সফল হলে ভবিষ্যতে যুগ যুগ ধরে যারা ক্ষমতায় থাকবে, এ প্রশ্ন নিয়ে আর বিতর্ক থাকবে না; যা গণতন্ত্রচর্চার জন্য অপরিহার্য। এটাই বাংলাদেশে শেষ নির্বাচন নয়, নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে হবে।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
৪ সেপ্টেম্বর ২০১৩

বিএনপির লংমার্চ রাজনৈতিক স্টান্টবাজি

কর্নেল জাফর ইমাম (অব.) বীর-বিক্রম বলেছেন, বিএনপি দুবার ক্ষমতায় থাকাকালীন তিস্তার পানি আদায়ে এত সোচ্চার ছিল না। সে কারণে অনেকের দৃষ্টিতে বিএনপির এ লংমার্চ রাজনৈতিক স্টান্টবাজি বলে মনে হয়। বিএনপির লংমার্চ চলাকালে তিস্তায় পানির প্রবাহ বেড়েছিল। বিএনপি বলছে, এটা তাদের আন্দোলনের ফসল। আর সরকার বলছে, কূটনৈতিক তৎপরতার ফসল। তিনি বলেন, এ নিয়ে কোনো পক্ষের বাহবা পাওয়ার কিছু নেই। এটা স্থায়ী সমাধান নয়। স্থায়ী সমাধানের জন্য জাতীয় ঐকমত্যের পাশাপাশি সরকারের বলিষ্ঠ ভূমিকার প্রয়োজন রয়েছে। আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর করতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে এ আন্দোলন যেন ভারত বিদ্বেষী না হয়। গতকাল বাংলাদেশ প্রতিদিনের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেন তিনি। সাবেক মন্ত্রী জাফর ইমাম বলেন, তিস্তাসহ অভিন্ন নদীগুলোতে ভারতের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্যিক ভারসাম্য রক্ষাসহ করিডর ও বিভিন্ন ইস্যুতে ভারত সরকারের সঙ্গে আমাদের সমঝোতার উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে। ভারতকে এ পর্যন্ত আমরা যা দিয়েছি তা আমাদের পাওনার পাল্লা থেকে অনেক বেশি ভারী। এসব বিষয়ে আমাদের কূটনৈতিক প্রয়াসের পাশাপাশি দলমত নির্বিশেষে সর্বস্তরের জনগণও অধিকার আদায়ের প্রশ্নে ঐকমত্যে থাকতে হবে। বিষয়গুলো আমাদের হঠাৎ করে সৃষ্টি হয়নি। স্বাধীনতার পর গত ৪৩ বছরেই দুই পক্ষের মধ্যে এই বিষয়েগুলো প্রাধান্য পেয়ে আসছে। যদিও স্থায়ী সমাধানের পথ এখনও মনে হচ্ছে অনেক দূরে। আমাদের আন্দোলন ভারতের জনগণের বিরুদ্ধে নয়। আন্দোলন ভারত বিদ্বেষী নয়। পানি নিয়ে বাংলাদেশে সোচ্চার কণ্ঠ, কিন্তু এ নিয়ে ভারতের মিডিয়াতে ভারতের জনগণের কোনো বিরোধিতা নেই। স্থায়ী সমাধানে কালক্ষেপণ হচ্ছে মূলত ভারতের আমলাতান্ত্রিক জটিলতা। এক্ষেত্রে ভারত ধীরেচলার নীতি অবলম্বন করে ইতোমধ্যে বাঁধ নির্মাণ করে বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনসহ তিস্তার পানি অন্যদিকে প্রবাহিত করে প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ ব্যাপারে আমাদের পক্ষ থেকে অতীতে সরকার এবং জনগণ বিভিন্ন মহলের তৎপরতার ঘাটতি ছিল। তিনি

বলেন সম্প্রতি বিএনপিসহ অন্যান্য দলের এ বিষয়ে লংমার্চ আমাদের অধিকার আদায়ের দাবিকে শুধু জোরদারই করেনি এ বিষয়টি জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির প্রয়াস বটে। তবে পাশাপাশি সরকারের কূটনৈতিক তৎপরতার মধ্যে একটা শিথিলতা মন্থরগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। তিস্তাসহ অন্যান্য বিষয়ে সরকারের তৎপরতায় আরও গতিশীলতা আনতে হবে। কেউ যেন একে নতজানু পররাষ্ট্রনীতি হিসেবে আখ্যায়িত করতে না পারে। যুদ্ধকালীন সাব সেক্টর কমান্ডার ১০ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়ক কর্নেল জাফর ইমাম (অব.) বীরবিক্রম নির্বাচন প্রসঙ্গে বলেন, সময়ের ব্যাপার। এই সরকার আরেকটি নির্বাচন অবশ্যই দেবে। প্রশ্ন হচ্ছে সেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার প্রস্তুতি এ মুহূর্তে বিএনপির আছে কিনা? তাদের কর্মকাণ্ডে মনে হচ্ছে নির্বাচনের জন্য দলটির দুই বছর সময় লাগবে। তবে সরকার যদি দুই বছরের অধিককাল সময় উন্নয়নসহ বিভিন্ন জাতীয় ইস্যুতে সমাধান দিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্যতা আরও সুদৃঢ় করতে পারে। পাশাপাশি জনগণের বিদ্বেষভাব পরিলক্ষিত না হয়। আন্দোলনে জনগণের জনসম্পৃক্ততা না থাকে। বিরোধী দলগুলো আন্দোলনের ইস্যু খুঁজে না পায় তাহলে তারা আশানুরূপ ফল পাবে না। সরকার যদি দুই বছরের অধিককাল বিএনপির প্রস্তুতির সময় কাজে না লাগাতে পারে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বৃহত্তর ঐক্য সৃষ্টি করতে না পারে। বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টি না করতে পারে। স্বাধীনতার ফসল ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে না পারে, তাহলে ভবিষ্যতে জনগণের উত্তাল জোয়ার সৃষ্টি হলে সব পক্ষের রাজনৈতিক নেতারা ভেসে যাবে। দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রসঙ্গে বলেন, গত নির্বাচনে যে অবস্থায় ও পরিস্থিতিতে ভোট হয়েছে সরকারের দাবি সংবিধানের বাধ্যবাধকতা ছিল। কিন্তু বিএনপি ওই নির্বাচনে অংশ না নিয়ে আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এতে করে বাকি সব বিতর্ক ম্লান করে দিয়েছে। যদি বিএনপি ভোটে আসত এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে সম্ভাবনা না থাকত সে পর্যায়ে বিএনপির দাবি অনুযায়ী যদি ৫০ থেকে ৭০টি আসন তারা ভোট কারচুপি বা যে কোনো কারণে কম পেত তাহলেও ন্যূনতম ১০০ আসন থাকত। এতে সরকারের পতনের আন্দোলন আজ অব্যাহত রাখতে পারত। এখন বিএনপি গরু হারিয়েছে। তাই দিশাহারা। সঠিক জায়গায় আসতে আরও কয়েক বছর লেগে যাবে। তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আশঙ্কা কী হবে? আর আওয়ামী লীগ প্লাস পয়েন্টে রয়েছে। এ অর্থে যে কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দলকে ঢেলে সাজিয়ে বৃহত্তম জনগোষ্ঠীকে পক্ষে আনার সুযোগ পাবে। তাই তাদেরও ব্যর্থতার অবকাশ নেই। তিনি বলেন, আগামী নির্বাচন মেয়াদ উত্তীর্ণ হবে কিনা বছর খানেক আগে, সরকারের মেয়াদ দুই বছর পার হওয়ার পর দৃশ্যমান হবে। ওই পর্যায়ে সরকার নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে ডায়ালগ শুরু করলে

তখন সময় লাগবে। সে ব্যাপারে জনমত আন্তর্জাতিক চাপ কী ধরনের তার ওপর নির্ভর করবে কত সময় লাগবে। ওই সময়ে দেশের পরিস্থিতি শুধু উত্তপ্তই না ভয়ানক বিপজ্জনক অবস্থানে চলে যেতে পারে। জাতীয় পার্টি প্রসঙ্গে বলেন, দলটি বর্তমানে জাতীয় সংসদের প্রধান বিরোধী দল। কিন্তু দেশের বিরোধী দল বলে মনে করি না। এইচ এম এরশাদ যদি দলের মধ্যে নের্তৃত্ব দিতে পারেন তাহলে দলটির সাংগঠনিক অবস্থা আরও শক্তিশালী হতে পারে। বর্তমান মন্ত্রিসভা প্রসঙ্গে বলেন, শেখ হাসিনার নের্তৃত্বে বর্তমান মন্ত্রিসভার একটি ভালো সমন্বয় লক্ষ করা যাচ্ছে। এ প্রয়াস অব্যাহত রাখতে পারলে দেশের সার্বিক উন্নয়ন বেগবান হবে। তিনি বলেন, শুধু উন্নয়ন দিয়ে ভোট সমর্থন অর্জন করা যায় না। এর পাশাপাশি জনগণ চায় সুশাসন, আইনশৃঙ্খলার উন্নয়ন, দৈনন্দিনের খুন গুম বন্ধ। তিনি বলেন, শেখ হাসিনার দেশের উন্নয়নের প্রশ্নে সম্পূর্ণ সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন মহল ও স্তরে কোথাও কোথাও এর বাস্তবায়নে সুফল অর্জনে ঘাটতি ও অনীহা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী আরও সচেতন হবেন এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রশ্নে আপসহীন ভূমিকা রাখবেন এটাই প্রত্যাশা। ওয়ার ফেডারেল ভেটারন চেয়ারম্যান জাফর ইমাম বলেন, সম্প্রতি ৭১ জন মুক্তিযোদ্ধা ও বুদ্ধিজীবীর একটি দলের নেতা হিসেবে ভারত সফর করেছি। ভারতীয় জনগণ এবং সেনাবাহিনীর মধ্যে আন্তরিকতা ও আবেগের বহিঃপ্রকাশে আমরা' ৭১-এর যুদ্ধকালীন সৃষ্ট বন্ধুত্বের প্রতিফলন দেখেছি। ভারতের সম্ভাব্য সেনাপ্রধান দালবীর সিং সেনাবাহিনীর এক অনুষ্ঠানে 'জয় বাংলা' বলে তার বক্তব্য শেষ করেছেন। পরে আড্ডার আলোচনায় তিনি জানান, তোমাদের রণাঙ্গনের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে জয় বাংলা শ্লোগান দিলাম কেমন লাগল?

বাংলাদেশ প্রতিদিন
২৭ এপ্রিল ২০১৪

এটা পাপ ও প্রতারণা

সম্প্রতি মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে এ কে খন্দকারের লেখা '১৯৭১: ভেতরে বাইরে' বইয়ের বিভিন্ন উক্তি বা তথ্য নিয়ে বিভিন্ন মহল নিজ নিজ অবস্থান থেকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আরও নতুন নতুন বিভ্রান্তিকর ও অসত্য তথ্য পরিবেশন করছেন। এর মাধ্যমে নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধ তথা বঙ্গবন্ধুর ভাবমূর্তিকে আরও খাটো করা হচ্ছে। সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ দুই ক্ষেত্রেই একক নের্তৃত্ব ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের। যে কোনো ভুল তথ্য, বিভ্রান্তিকর বক্তব্য সংগ্রাম বা মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে হোক তা যদি বঙ্গবন্ধুর ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ন করার অপপ্রয়াস হয় তাহলে তা শুধু দুঃখজনকই নয়; এটা একটি পাপ এবং নিজের বিবেকের প্রতারণার শামিল।

'৫২-এর ভাষা আন্দোলন থেকে দীর্ঘ সংগ্রামের পথ ধরে '৭১-এর মার্চে আমরা স্বাধীনতা যুদ্ধে পদার্পণ করি। এই দীর্ঘ সফল সংগ্রামের ফলশ্রুতিতে শুরু হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধ। সংগ্রাম ও যুদ্ধ একই মুদ্রার দুদিক, একই সূত্রে গাঁথা বাঙালির সংগ্রামের ঐতিহ্য। এ কে খন্দকারের বইতে কয়েকটি তথ্য অবশ্যই বিভ্রান্তি এবং দুঃখজনক। তবে সঠিক ইতিহাসের খাতিরে অবশ্যই মূল্যায়ন এবং বিশ্লেষণের দাবি রাখে। বিচক্ষণ ও দূরদর্শী বঙ্গবন্ধু যে মাপের নেতা ছিলেন,' ৭১-এর ২৫ মার্চের আগমুহূর্ত পর্যন্ত পাকিস্তানের সঙ্গে তার যে বৈঠক হচ্ছিল– কার্যত তিনি একটি স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নই লালন করছিলেন। ২৫ মার্চের আগে সে মুহূর্তগুলোতে পাকিস্তানের নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা হিসেবে তিনি কৌশল খুব সাবধানতার সঙ্গে ধীর পদক্ষেপ এগিয়ে যাচ্ছিলেন বাঙালির অভীষ্ঠ লক্ষ্য অর্জনে। খন্দকার সাহেব বইয়ের দাবি করলেন, 'বঙ্গবন্ধু ধরা না দিয়ে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা উচিত ছিল।' বঙ্গবন্ধু যদি তাই করতেন তাহলে বিশ্বব্যাপী তার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হতো এবং স্বাধীনতার এই যুদ্ধের পক্ষে যত দ্রুত বিশ্বজনমত গড়ে উঠেছিল তা প্রশ্নবিদ্ধ হতো। বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে ভারত সরকার আমাদের নিঃশর্ত সহযোগিতা দিয়েছিল। পাকিস্তানিদের গণহত্যার বিরুদ্ধে বিশেষ করে ইন্দিরা গান্ধী আমাদের

স্বাধীনতার পক্ষে ও বঙ্গবন্ধুর মুক্তির লক্ষ্যে বিশ্বের ২২টি দেশে সফর করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি জাতিসংঘে বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার কথা তুলে ধরেছিলেন এবং পাকিস্তান কারাগার থেকে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির আওয়াজ তুলেছিলেন। যা গোটা বিশ্বে ধ্বনি-প্রতিধ্বনি হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু যদি পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নিতেন তাহলে এটা শুধু কাপুরুষতাই হতো না, ভারত তথা ইন্দিরা গান্ধীর ভূমিকা তেমন জোরদারও হতো না। পাশাপাশি ভারতে অবস্থানরত আমাদের বিভিন্ন স্তরের নেতারা এই যুদ্ধকালীন সময়ে বিভিন্ন ইস্যুতে শুধু স্বাধীন বাংলা সরকারের সঙ্গে নয়, নিজের মধ্যেও মতবিরোধ ও কোন্দল অব্যাহত রেখেছিলেন। যুদ্ধকালীন সময়ে খন্দকার মোশতাক কলকাতায় বাংলাদেশের দূতাবাসে বসে তৎকালীন রাষ্ট্রদূত হোসেন আলী, মাহবুব আলম চাষী গংদের সঙ্গে স্বাধীন বাংলা সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী থাকা সত্ত্বেও যুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে তার ষড়যন্ত্র অব্যাহত রেখেছিলেন। একপর্যায়ে মোশতাক প্রস্তাব দিয়েছিলেন, 'আপনারা কি পাকিস্তানের সঙ্গে কনফেডারেশন চান না বঙ্গবন্ধুর মুক্তি চান।' আজ যারা যুদ্ধকে নানান কথা বলে অবমূল্যায়ন করছেন তারা সেদিন কোথায় ছিলেন। তখন প্রতিবাদ দূরের কথা '৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের পরে মোশতাকের এ ভূমিকা প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধুকে অবহিত করা হয়েছিল কিনা আমার জানা নেই। তবে মোশতাক তার ষড়যন্ত্র অব্যাহত রেখেছিলেন। স্বাধীনতার পর মুজিববাহিনী থেকে একটা বৃহৎ অংশ বের হয়ে জাসদ ও গণবাহিনী সৃষ্টি করে। অনেকে অস্ত্র জমা দেননি। তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মনসুর আলীর বাড়ি আক্রমণ করা হয়েছিল। ওই মুহূর্তে আপনাদের নতুন আবির্ভাব তৎকালীন আওয়ামী লীগকে শুধু দুর্বলই করেনি, বঙ্গবন্ধুকে হত্যার লক্ষ্যে মোশতাকের ষড়যন্ত্রকে আরও জোরদার করেছিল। যাই হোক মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস যুদ্ধ পরিচালনাসহ সার্বিক কর্মকাণ্ড স্বাধীন বাংলা সরকারের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। যে সরকারের রাষ্ট্রপতি ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। উনার অনুপস্থিতিতে দায়িত্বে ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তাজউদ্দিন আহমদ। স্বাধীন বাংলা সরকারের প্রধান যদি বঙ্গবন্ধুকে না দেখানো হতো তাহলে এ সরকারের গ্রহণযোগ্যতা শুধু ভারতে নয় গোটা বিশ্বে ঘাটতি থাকত এবং যুদ্ধে এত বিশ্বজনমত আমাদের পক্ষে থাকত না। এ কে খন্দকারের মতে বঙ্গবন্ধু যদি পালিয়ে যেতেন তাহলে ২৫ মার্চের রাতে ঘুমন্ত জাতির উপর আঘাত চরম আকার ধারণ করত। ক্ষয়ক্ষতি আরও ১শো গুণ পর্যন্ত বাড়ত। বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলো পাকিস্তানি বাহিনী ধূলিসাৎ করে দিত। এ কে খন্দকারে বইয়ের জবাব দিতে গিয়ে অনেকে নয় মাসের স্বাধীনতা যুদ্ধকে ভিন্নখাতে মূল্যায়নের অপচেষ্টা করেন। অনেকে মুক্তিযুদ্ধকে জনযুদ্ধ, গেরিলা যুদ্ধ এ কথা বলে বোঝাতে চান। এই যুদ্ধ অবশ্যই জনযুদ্ধ ছিল

কারণ এর মাধ্যমে সর্বস্তরের জনগণের বিভিন্নভাবে অংশগ্রণ ও অবদান ছিল। ৭ মার্চের ভাষণে উদ্বুদ্ধ হয়ে জাতির দলমত নির্বিশেষে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল। ২৫ মার্চ থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন জনপদে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের মূলমন্ত্রের উন্মাদনায় গড়ে উঠেছিল প্রতিরোধ যুদ্ধ। রক্তাক্ত হয়েছিল বাংলার জনপদ। এই প্রতিরোধ যুদ্ধ একটি অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে লাঠিসোটা, দা-কুড়াল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সাধারণ মানুষ। যা বিশ্বের ইতিহাসে বিরল। এই ছাত্র-জনতার যারা ব্যারিকেড ভেঙে যুদ্ধ শুরু করেছিল এরাই এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে সশস্ত্র গেরিলা ও সামরিক যুদ্ধে অংশ নেয়। তাই বলব, জনযুদ্ধকে ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে স্বাধীন বাংলা সরকারের অধীনে সংঘটিত ১১টি সেক্টরের নের্তৃত্বে গেরিলা ও সামরিক যুদ্ধকে অবমূল্যায়ন করা সঠিক নয়। স্বাধীন বাংলা সরকারের বাইরে বিচ্ছিন্নভাবে কাল্পনিক কোনো যুদ্ধের কথা বলা অত্যন্ত দুঃখজনক। প্রশিক্ষিত মুজিববাহিনী যারা ভারত থেকে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করেছিল তারা সীমিত অস্ত্র নিয়ে সীমিত আকারে গেরিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল এবং বাংলাদেশের অনেক জায়গায় মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে যৌথভাবে বিভিন্ন অপারেশনে অংশ নিয়েছিল। তবে মূলত পলিটিক্যাল মোটিভেশন ছিল জেনারেল ওভানের নের্তৃত্বে। যেন স্বাধীনতার পর অন্য কেউ ক্ষমতার লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করতে না পারে। বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে তা হয়তো স্বাধীন বাংলাদেশে দৃশ্যত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে মুজিববাহিনীর কোথাও ছোটখাটোও ভুল-বোঝাবুঝি যে ছিল না, তা নয়। তবে বঙ্গবন্ধুর প্রশ্নে দেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে সবার মানসিকতা ছিল অভিন্ন। স্বাধীন বাংলা সরকারের অধীনে যে ১১টি সেক্টরে যুদ্ধ পরিচালনা হয়েছিল সেখানে সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এমন অনেকেই বলেন, আপনারা আর্মি, পুলিশ ইপিআর সব মিলিয়ে সর্বোচ্চ ২০ হাজার ছিলেন। আর লক্ষাধিক মুক্তিযোদ্ধা ছিল। এ পর্যায়ে এই সংখ্যাগরিষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে আমাদের রেগুলার ফোর্সের সঙ্গে যুদ্ধরত ছিল। এরাই গেরিলা যুদ্ধ এবং সামরিক যুদ্ধ দুই পর্যায়ে অংশ নিয়েছিল। তাই এই অংশটাকে সেক্টরগুলোর সামরিক বাহিনীর সদস্যদের থেকে পৃথক করলে সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানকে খাটো করা হয়। সেই সঙ্গে শুধু মুক্তিযুদ্ধকেই অবমূল্যায়ন করা নয়, এটি বঙ্গবন্ধুকে বিতর্কিত করারও অপপ্রয়াস। কারণ স্বাধীন বাংলা সরকারের প্রধান ছিলেন বঙ্গবন্ধু। তার নামের ওপর যুদ্ধ হচ্ছিল। তার বিশাল নের্তৃত্বের দিকে তাকিয়ে ভারত সরকার এক কোটি লোককে আশ্রয় দিয়েছিল। ১১টি সেক্টরের বিপরীতে আমাদের অস্ত্র গোলাবারুদ, প্রশিক্ষণ এবং সীমিত আকারে তাদের অংশগ্রহণ এবং

রণকৌশল নির্ধারণ করার জন্য ৬টি ভারতীয় সেনাবাহিনীর সেক্টর চালু হয় যুদ্ধের শুরু থেকেই। পর্যায়ক্রমে এই ভারতীয় সেনাবাহিনীর সহযোগিতা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। যুদ্ধের শেষলগ্নে অক্টোবর-নভেম্বরে ১১টি সেক্টরে পরিচালিত গোরিলা যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। তখন ভেতরে মুজিববাহিনীর অনুপ্রবেশ ও গোরিলা অপারেশনের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর পাশাপাশি হেমায়েত বাহিনী ও কাদেরিয়া বাহিনী তাদের আঞ্চলিক গেরিলা তৎপরতা বৃদ্ধি করে। যুদ্ধের এই লগ্নে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সহায়তায় নৌ কমান্ডো, বিমান বাহিনীর সদস্যরা সীমিত আকারে অপারেশন পরিচালনা শুরু করে। এ সময়ে রণাঙ্গনে সৃষ্টি করা হয় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনী। সেনাবাহিনীর নিউক্লিয়াস বাহিনী গঠিত হয়। ১১টি সেক্টরের পাশাপাশি ‘কে’ ‘এস’ ‘জেড’ ফোর্স। স্বাধীন বাংলা সরকারের অধীনে ১১টি সেক্টরেকে এস জেড ফোর্সের তত্ত্বাবধানে গেরিলা ও সামরিক অপারেশনগুলোতে তথা যুদ্ধের মূল চালিকা শক্তিকে এখন অনেকে অবমূল্যায়ন করে বলেন, জনযুদ্ধকে সামরিকীকরণ করা হচ্ছে। তাদের এই উক্তি একটি দুরভিসন্ধিমূলক আচরণ। স্বাধীনতা-উত্তর বঙ্গবন্ধু তিন বাহিনীকে ঢেলে সাজিয়ে আধুনিকীকরণের উদ্যোগ নেন। স্বাধীনতার পর আমরা মুক্তিযোদ্ধাদের শ্রেণিবিন্যাস করিনি বিধায় এ যুদ্ধের অপব্যাখ্যা এবং দিন দিন মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। শ্রেণিবিন্যাস করলে যারা খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয় দিয়ে সহায়তা করেছিলেন তাদের নামকরণ হতো মুক্তিযোদ্ধা ব্র্যাকেটে সহযোগী। যারা কূটনীতিক মিশন ছিলেন তারা হতেন কূটনীতিক। যারা গান গেয়ে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন তারা হতেন শব্দ-সৈনিক। যারা কলকাতায় ফুটবল খেলে অর্থ জোগাড় করেছিলেন তারা হতেন ক্রীড়াবিদ এবং সম্মুখ সামরিক যুদ্ধে যারা অংশ নিয়েছিলেন তারা সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা। আর যারা ছাত্র-জনতাকে সংগঠিত করেছিলেন তারা হতেন মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, বিলম্ব হলেও এ কাজটি করা উচিত। এ কে খন্দকার-এর লিখনীর জন্য ধিক্কার দিতে গিয়ে সামরিক বাহিনীর যুদ্ধে অংশগ্রহণ ও অবদানকে খাটো করার অপপ্রয়াস লক্ষ করা যাচ্ছে। যা মোটেও সঠিক কাজ নয়। পাকিস্তান কারাগারে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ও তাদের বিদেশি দোসররা মিলে বঙ্গবন্ধুকে এই বলে বোঝাচ্ছিলেন যে, তোমরা ভারত হয়ে গেছ। ভারতীয় সেনাবাহিনী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে এবং তোমার দেশ পরবর্তীতে ভারতের একটি অঙ্গরাজ্যে পরিণত হবে। এ ধরনের শর্তে ভারত বাংলাদেশকে সহযোগিতা করছে। তুমিও থাকবে না। তোমার দেশও থাকবে না। তুমি যদি আন্তর্জাতিক মিডিয়াতে সাক্ষাৎকারে তোমার দেশবাসীকে আহ্বান জানাও ভারতের এ ধরনের ষড়যন্ত্র থেকে বের হয়ে আসতে তাহলে তোমাকে আর ফাঁসিতে ঝুলতে হবে না। কিন্তু বঙ্গবন্ধু বুঝতে পেরেছিলেন এটি পাকিস্তানের

একটি নীলনকশা। তিনি ফাঁসির কাষ্ঠে যেতে প্রস্তুত ছিলেন। তাদের ফাঁদে পা দেননি। ভারতীয় সেনাবাহিনীর আমন্ত্রণে গত ১৬ ডিসেম্বর ৭০ জন মুক্তিযোদ্ধা ও শিক্ষাবিদদের সঙ্গে নিয়ে ভারতের লিডার অব দ্য ডেলিগেশনে গিয়েছিলাম। ১৬ ডিসেম্বর তারাও বিজয় দিবস পালন করেন। পোর্ট উইলিয়াম সেনানিবাস স্টেডিয়ামের অনুষ্ঠানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি দেখে অভিভূত হয়ে গেলাম। ভারতীয় সেনাবাহিনীর তৎকালীন ইস্টার্ন কমান্ডার বর্তমান সেনাপ্রধান দালবির সিং ভাষণের শেষে জয় হিন্দ ও জয় বাংলা দিয়ে শেষ করেন। বঙ্গবন্ধুকে বিতর্কিত না করার জন্য তার ভাবমূর্তিকে সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সংগ্রাম এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পৃথক পৃথকভাবে তুলে ধরতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে কারও কোনো উক্তি ভুল ব্যাখ্যা বা ভুল তথ্য স্বাধীনতা যুদ্ধে সংগ্রাম তথা বঙ্গবন্ধুর একক বিন্দুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে না। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যারা কটূক্তি করেন, সে ব্যাপারে অনেকে সোচ্চার হতে গিয়ে অনেক সময় আরও জটিলতার সৃষ্টি করেন। তবে সঠিক ইতিহাসের স্বার্থে সব ধরনের তথ্য বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করা জাতীয় দায়িত্ব।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
১০ সেপ্টেম্বর, ২০১৪

জাতি বীরদের সম্মান দিতে ব্যর্থ হয়েছে

মহান মুক্তিযুদ্ধে যে যেভাবেই স্বাধীনতার জন্য কাজ করেছে সবাই মুক্তিযোদ্ধা। কিন্তু যারা জীবন বাজি রেখে সম্মুখযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন তাদের পৃথকভাবে চিহ্নিত করা উচিত ছিল। মুক্তিযোদ্ধের সময় ভারতের প্রায় চার হাজার সেনা অফিসার ও সৈনিক তাদের বুকের রক্ত দিয়ে বাংলার মাটি রঞ্জিত করেছিলেন। তাদের সম্মান দিতে আমরা কৃপণতা করি কেন? শুনেছি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার বিদেশিদের সম্মাননা দিচ্ছে। দেরিতে হলেও এটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। স্বাধীনতার ৪২ বছর পর মুক্তিযোদ্ধার বিভিন্ন গ্রুপে বা রাজনৈতিক দলে থাকাটাই স্বাভাবিক। যেখানেই থাকুক না কেন সবাই দেশপ্রেমিক। দলীয় কারণে তাদের বিতর্কিত করা সমীচীন নয়। মুক্তিযুদ্ধ আমাদের অন্যতম জাতীয় ঐতিহ্য, অহংকার এবং গর্ব। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, যে চেতনা নিয়ে জীবন বাজি রেখে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম সে চেতনা আজ প্রায় বিলুপ্তির পথে। জাতি বীরদের সম্মান দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে। এ জাতি বড়ই অভাগা। শুধু বিজয় আর স্বাধীনতা দিবস এলেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে সবাই সোচ্চার হয়। কিন্তু মনে-প্রাণে সে চেতনাকে কতটুকু লালন করি, তার প্রতিফলন দেখা যায় পরবর্তী কার্যক্রমে। মুক্তিযুদ্ধ হঠাৎ করে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা নয়। '৫২-র ভাষা অন্দোলন থেকে শুরু হয়েছিল মুক্তির সংগ্রাম। মুক্তিযুদ্ধের প্রথম লগ্ন থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনী সর্বাত্মক সহযোগিতা এবং নয় মাসের যুদ্ধে তাদের অংশগ্রহণ এবং বিভিন্ন রণাঙ্গনে সেনাসদস্য হতাহত হয়েছেন। ৪২ বছর পরও ভারতীয় আত্মাহুতি দেওয়া সেনাদের স্বজনরা আমদের ওইসব অঞ্চলে এসে স্বজনদের বীরত্বগাথা, ইতিহাস জানতে চান। নিজের কাছে প্রশ্ন জাগে, তারা এ সম্মানটুকু আর কবে পাবেন? ৪২ বছর আগে যে স্বপ্ন নিয়ে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলাম হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে, সে স্বপ্নের সঙ্গে আজকের

বাংলাদেশের তফাৎ আকাশ-পাতাল। কেন স্বাধীনতা যুদ্ধের সেদিনের চেতনার অবমূল্যায়ন ও ঘাটতি থাকবে? দেশকে এগিয়ে নিতে হলে এর কারণগুলো চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নিতে হবে। এটি অমীমাংসিত রেখে আগামী নির্বাচনসহ যে কোনো জাতীয় বিষয় কখনো প্রাধান্য পেতে পারে না। অন্যথায় স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব সব সময় হুমকির সম্মুখীন থাকবে। এই প্রয়াস গ্রহণে সবাইকে দলীয় রাজনীতির সংকীর্ণতা থেকে বেরিয়ে আসত হবে। পাশাপাশি লক্ষ্য রাখতে হবে, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিগুলো যেন চেতনার প্রশ্নে বিভক্ত না হয়। আমরা যারা সশস্ত্র যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করে গাজী হয়ে আছি, তারা আজ চরম উপেক্ষিত। আমাদের চাওয়া-পাওয়া কিছুই নেই। জাতি যেন আমাদের করুণা না করে। আমরা শহিদদের কাছে চলে যাওয়ার আগে দেখে যেতে চাই বীরদের যেন সম্মান দেওয়া হয়। কারণ যে জাতি তার বীরদের সম্মান দিতে জানে না, সে জাতি মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহ্য নিয়ে গর্ব করতে পারে না। গর্ব করার অধিকার নেই। সেই জাতিতে বীর জন্ম নেয় না। গণযুদ্ধে আমাদের সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের পাশাপাশি রণাঙ্গনে যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তারাও সহযোগী মুক্তিযোদ্ধা। মহান মুক্তিযুদ্ধে শত্রুপক্ষের শেলিংয়ের আক্রমণে অনেকে ঘরবাড়ি, সম্ভ্রমসহ সব হারিয়েছেন। এরা সবাই সহযোগী মুক্তিযোদ্ধা। যারা মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করেছেন, প্রশিক্ষণ দিয়েছেন সবাই আমরা মুক্তিযোদ্ধা। তাদের অবদান রয়েছে। কিন্তু যারা জীবন বাজি রেখে রণাঙ্গনে সশস্ত্র যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন তাদের ইতিহাস যদি লিপিবদ্ধ না করি তাহলে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজম্ম কখনো স্বাধীনতা যুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানতে পারবে না। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে পারবে না। স্বাধীনতার ৪২ বছরে অর্জন নেই তা নয়। যদি সবাই এক হয়ে একাত্তরের মনমানসিকতা ও উদ্দীপনা নিয়ে দেশ গড়তে পারতাম, তাহলে অর্জন আরও বেশি হতে পারত। ফেনী পাক হানাদারমুক্ত দিবস ৬ ডিসেম্বর। '৭১-র এ দিনে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মুখ সমরে পাক বাহিনীকে পরাজিত করে ফেনীর মাটিতে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা ওড়ে। ফেনী অঞ্চলে মুক্তিবাহিনীর অধিনায়ক হিসেবে আমি তৎকালীন ক্যাপ্টেন, পরবর্তীতে লেফটেন্যান্ট কর্নেল অব. বীরবিক্রম) ভারতের বিলোনিয়া ও তৎসলগ্ন অঞ্চল থেকে ১০ ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের অভিযান চালিয়ে বিলোনিয়া, পরশুরাম, মুন্সিরহাট, ফুলগাজী হয়ে যুদ্ধ করতে এগুতে থাকি। পর্যুদস্ত হয়ে ফেনীর পাক হানাদার বাহিনীর একটি অংশ নোয়াখালীর সোনাইমুড়ি হয়ে কুমিল্লা সেনানিবাসের রাস্তায় এবং অপর অংশ শুভপুর ব্রিজের ওপর দিয়ে চট্টগ্রামের দিকে পালিয়ে যায়।

মুক্তিযুদ্ধে ফেনীর অনেক রণাঙ্গনের মধ্যে মুন্সিরহাটের মুক্তারবাড়ি ও বন্ধুয়ার প্রতিরোধের যুদ্ধ ইতিহাসখ্যাত হয়ে আছে। বিলোনিয়ার মুন্সিরহাটে পাক বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে প্রথম শহিদ হন হাবিলদার নূরুল ইসলাম। এই যুদ্ধে পাকিস্তানের প্রায় ৩০০ সেনা হতাহত হয়। হাবিলদার নূরুল ইসলাম বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। বিধ্বস্ত নূরুল ইসলাম বলেছিলেন, স্বাধীনতা দেখে যেতে পারলাম না। স্যার আপনারা চালিয়ে যান। আমাদের রক্ত যেন বৃথা না যায়। কালেমা পড়ে জয় বাংলা বলে আমাদের থেকে বিদায় নেন নূরুল ইসলাম। তার রক্তে আমাদের বাঙ্কার রক্তাক্ত হয়েছিল। আমরা যারা সশস্ত্র যুদ্ধ করেছি– শহীদের আর্তনাদ শুনতে পাই। তারা বলেন, তাদের স্বপ্ন যেন বাস্তবায়িত হয়।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
৬ ডিসেম্বর, ২০১৩

যৌথভাবে না করলে কেয়ামত পর্যন্ত সঠিক তালিকা হবে না

বীরমুক্তিযোদ্ধা, ওয়্যার ভেটার্ন ফোরামের আহ্বায়ক ও সাবেক মন্ত্রী কর্নেল (অব.) জাফর ইমাম বীরবিক্রম বলেছেন, মুক্তিযুদ্ধের ৪৩ বছর পর হলেও বর্তমানে মুক্তিযোদ্ধাদের সঠিক তালিকা প্রণয়নের উদ্যোগ অবশ্যই প্রশংসনীয়। স্বাধীনতার পর থেকে ৪৩ বছর ধরে স্বাধীন বাংলা সরকারের বিভিন্ন কর্মকর্তা যারা যুদ্ধ পরিচালনা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদির সঙ্গে জড়িত ছিলেন সর্বোপরি স্বাধীন বাংলা সরকারের অধীনে যুদ্ধরত ১১ সেক্টরের বিভিন্ন পর্যায়ের আঞ্চলিক কমান্ডার এবং যুদ্ধকালীন কমান্ডার পাশ কাটিয়ে বা বাদ দিয়ে এ পর্যন্ত যে তালিকা প্রণীত হয়েছে তা আরও প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে আছে। তিনি বলেন, বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই প্রশংসনীয় উদ্যোগকে সফল করতে হলে ৭১-এর যুদ্ধকালীন কমান্ডার এবং স্বাধীন বাংলা সরকারের সংশ্লিষ্ট (যুদ্ধের সঙ্গে) সবাইকে নিয়ে যৌথভাবে প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। তা না হলে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তালিকা সম্পন্ন করা যাবে না এবং এই ব্যর্থতার জন্য ইতিহাসের কাঠগড়ার দাঁড়াতে হবে এক দিন। এর কারণ ব্যাখ্যা করে বাংলাদেশ প্রতিদিনকে জাফর ইমাম বলেন, এটা শুধু সঠিক তালিকা প্রণয়ের উদ্যোগ নয়, এর সঙ্গে সম্পৃক্ত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রণয়ন ও মুক্তিযুদ্ধের সঠিক চেতনা। তাই এ তালিকা প্রণয়ন ও রণাঙ্গনের ইতিহাস ও চেতনাকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখার কোনো অবকাশই নেই। সঠিক ও প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধারা নিজ নিজ অঞ্চলের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরবেন। অঞ্চলগুলোর সমষ্টিগত ইতিহাস হবে পুরো জাতির রণাঙ্গনের ইতহাস। যা আজও পরিপূর্ণতা পায়নি। তাই এ চেতনা হয়েছে এতিম। হাহাকার দেখি জীবন বাজি রাখা প্রত্যেকটি মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে। মাত্র কয়েক বছর আগে ঢাকা সেনানিবাসে খেতাবপ্রাপ্তদের এক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী আমাদের সবাইকে আহ্বান জানিয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সঠিক তালিকা প্রণয়নে সহযোগিতা করতে। তারই ধারাবাহিকতায় আজকের এই উদ্যোগ। রণাঙ্গনের সশস্ত্র

মুক্তিযোদ্ধারাসহ স্বাধীনতাকামী আমরা সবাই এর সফলতা প্রত্যাশা করি। তিনি বলেন, প্রকৃত তালিকা তৈরি করতে অতীতের ভুল ও ত্রুটিপূর্ণ নিয়ম পরিহার করতে হবে। মনে রাখতে হবে একাত্তরের এই যুদ্ধ গ্রাম, ইউনিয়ন, থানা, জেলাভিত্তিক কাঠামোতে পরিচালিত হয়নি। তাই আজ যুদ্ধকালীন কোনো থানা কমান্ডার বা কাল্পনিক কোনো উপজেলা ও জেলা কমান্ডার বা কারও প্রতিনিধি দ্বারা কমিটি করলে অতীতের মতো ত্রুটি থেকে যাবে। তাদের হতে হবে স্বাধীন বাংলা সরকারের অধীনে যুদ্ধরত অঞ্চলিক যুদ্ধকালীন কমান্ডারদের প্রতিনিধি। এ ব্যাপারে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়কে সজাগ থাকতে হবে। এ ছাড়া মন্ত্রণালয়ের আরও সজাগ থাকা বাঞ্ছনীয় যে, বর্তমানে সর্বস্তরের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিনিধিত্ব করার সংগঠন নেই। মুক্তিযোদ্ধাদের শ্রেণিবিন্যাসে সরকারি উদ্যোগে এই তালিকা প্রণয়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন করার জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। তিনি বলেন, সার্বিক সফলতার জন্য জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের (জামুকা) প্রধান পৃষ্ঠপোষক প্রধানমন্ত্রীর একটি তদারকি সেল থাকা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি। কারও ভুল সিদ্ধান্ত, খামখেয়ালিপনা সর্বোপরি কোনো অজুহাতে মুক্তিযোদ্ধাদের হয়রানি করা, মুক্তিযুদ্ধকে কোনো কারণে খাটো করা এবং রণাঙ্গনের জীবিত মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পৃক্ত না করে একতরফাভাবে কোনো তালিকা প্রণীত হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না বলে তিনি উল্লেখ করেন।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
১৬ অক্টোবর ২০১৪

রক্তের হোলি উৎসবের সেই দিনটি

৭ নভেম্বর ছিল ইতিহাসের একটি ব্যর্থ ও হঠকারিমূলক অভ্যুত্থান। যার ফলশ্রুতিতে জেনারেল জিয়া ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ৭ নভেম্বর ৩ নভেম্বরের কোনো পাল্টা অভ্যুত্থান ছিল না। খালেদের কিছু মারাত্মক ভুল সিদ্ধান্তের কারণেই ৭ নভেম্বরের নায়করা এই সময়টিকে বেছে নিয়েছিলেন। ৭ নভেম্বর ভোররাতে জেনারেল খালেদ মোশাররফ বীরউত্তম, কর্নেল হুদা বীরবিক্রম ও কর্নেল হায়দার বীরউত্তম নির্মমভাবে নিহত হয়েছিলেন। এছাড়া তাহেরের নের্তৃত্বে সৈনিক সংস্থার বিপদগামী সৈনিকদের হাতে আরও ১১-১২ জন টগবগে তরুণ লে. ক্যাপ্টেন নিহত হয়েছিলেন। আরও নিহত হয়েছিলেন সিএমএইচে কর্তব্যরত একজন কর্নেল পদমর্যাদার মহিলা ডাক্তার। সেক্টর কামান্ডার ওসমান সাহেবের স্ত্রী। খালেদ মোশাররফসহ এই অফিসারদের হত্যার বিচার আজও হয়নি।

৭ নভেম্বর: একটি পর্যালোচনা : সায়েম দায়িত্ব গ্রহণ করার পর আগের পার্লামেন্ট বাতিল করা হলো এবং দেশবাসীকে নতুন নির্বাচনের আশ্বাস দেওয়া হলো। দেশের মধ্যে গত দুই দিনের নানা ধরনের জল্পনা-কল্পনা অনিশ্চয়তার অবসান ঘটল। খালেদের এত সতর্কতা সত্ত্বেও রাজনৈতিক মহল বলাবলি করছিল, খালেদ আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং খালেদ থাকলে শেষ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ রাজনৈতিকভাবে লাভবান হবে। তবে এ ব্যাপারে জনগণের মধ্যে কোনো খারাপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়নি, যেহেতু নতুন নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি ছিল। সেনাবাহিনীতে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ খালেদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। ইংরেজিতে একটি কথা আছে 'Defeat is an orphan', ৭ নভেম্বরের কারণে খালেদকে ব্যর্থ অভ্যুত্থানের নায়ক হিসেবে চিহ্নিত করা হলো ইতিহাসে। আমি আগেও বলেছি, ৭ নভেম্বরের ঘটনা ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের পাল্টা কিছু নয়। অনেক আগ থেকেই সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলোতে কয়েকজন করে প্রতিনিধি গোপন সৈনিক সংস্থার কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিল। তাদের হাইকমান্ডের নির্দেশে ৭ নভেম্বরকে তারা বেছে নিয়েছিল সঠিক সময় হিসেবে। ৬ নভেম্বর রাতে এলিফ্যান্ট রোডে

কর্নেল তাহেরের ভাই আনোয়ার সাহেবের বাসায় জাসদ, গণবাহিনী ও বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা গোপন বৈঠক করে এবং পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী মোটামুটি তাদের প্রস্তুতি সম্পন্ন করে। ঢাকার সর্বত্র তারা একটি লিফলেট বিতরণ করে। সন্ধ্যায় ওই লিফলেট বিতরণের পর ঢাকাতে বিভিন্ন মহলে গুজব ছড়িয়ে পড়ে কিছু একটা হতে যাচ্ছে, পাশাপাশি সেনাবাহিনীতেও সৈনিক সংস্থার একটা ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছিল। তাদের সিদ্ধান্ত ছিল, সেনানিবাসে রাত ১২টা ১ মিনিটে সৈনিক সংস্থার নের্তৃত্বে "Motivated" সৈনিকরা উপরের দিকে গুলি শুরু করবে এবং এটাই হবে জাসদ, গণবাহিনীর জন্য সংকেত। সঙ্গে সঙ্গে তারা বিভিন্ন এলাকা থেকে মিছিল বের করবে। আদমজি থেকে একটা বড় মিছিল বের করার পরিকল্পনা ছিল। সেনানিবাসে সৈনিক বিদ্রোহের সমর্থনে বাইরে মিছিল চলবে এবং জনসমর্থন পক্ষে আনার প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হবে। ১২টা ১ মিনিটে ঢাকা সেনানিবাসে গোলাগুলি শুরু হয়ে গেল, একই সময়ে বাইরে পরিকল্পনা অনুযায়ী যে মিছিলটি ঢাকাতে হয়েছিল তা আকারে খুব একটা বড় ছিল না। সকালের দিকে যদিও খণ্ড খণ্ড মিছিল রাস্তায় ছিল, সে মিছিলগুলোর মধ্যে জাসদ ছাড়াও অনেক আওয়ামী লীগবিরোধী লোক ছিল।

৪ নভেম্বর খালেদের বৃদ্ধা মাতাকে সামনে রেখে রাশেদ মোশাররফ ও মোস্তফা মহসীন মন্টুর নের্তৃত্বে যে মৌন মিছিল বেরিয়েছিল অনেকে পরবর্তীতে এই মিছিলকে খালেদের ৩ নভেম্বর অভ্যুত্থানের সমর্থনে ছিল বলে অপপ্রচার শুরু করে। ৬ নভেম্বর সন্ধ্যায় ৩ নভেম্বরকে কেন্দ্র করে যে লিফলেট প্রচারিত হয়, এতে করে জনগণের মধ্যে নতুনভাবে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। ঢাকা সেনানিবাসে সিপাহিদের বিদ্রোহের ঘটনার সমর্থনে যদি জাসদের পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী রাজধানীতে ব্যাপক মিছিল ও সমাবেশের মাধ্যমে রাজনৈতিক সমর্থন ব্যাপক জোরদার করতে পারত, তাহলে জিয়াউর রহমান লংমার্চের পরিকল্পনা বাতিলসহ আরও অনেক সিদ্ধান্ত নিতে সংকটে পড়তেন। জনগণের মধ্যে জাসদের সমর্থন ব্যাপক ছিল না এবং পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার সঠিকভাবে পরিকল্পনা মোতাবেক না করতে পারায় সকাল ১০-১১টার মধ্যেই জাসদের প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছিল। ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের অনেক আগেই এ মৌন মিছিলের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছিল। তাই এই মিছিলের সঙ্গে খালেদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। ঢাকা সেনানিবাসের ভিতরে ৬ নভেম্বর মধ্যরাত থেকে নিয়ে ৭ নভেম্বর সকাল ১০টা-১১টা পর্যন্ত সৈনিক সংস্থার 'সিপাহি সিপাহি ভাই ভাই, অফিসারের রক্ত চাই' শ্লোগান সহকারে অফিসার হত্যার এক ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল। কর্নেল তাহের সেনানিবাসের বাইরে থেকে সৈনিক সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছিল। যদিও অধিকাংশ সিপাহি এর সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছিল, কিন্তু

বেশির ভাগ সৈনিক আসল পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য জানত না। অনেকেই অফিসার হত্যাকে সমর্থন না করে সেনাবাহিনীতে Chain of Command ফিরে আসুক চেয়েছিল, অফিসার হত্যা অব্যাহত রেখে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে যেন না আসে সে জন্য জাসদের একটি অংশ ছাড়াও দেশি-বিদেশি আরও একটি চক্রও জড়িত ছিল বলে অনেকের অভিযোগ রয়েছে। জাসদের একটি অংশও এ ব্যাপারটিকে সমর্থন করছিল না। পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে অনার লক্ষ্যে কর্নেল তাহেরদের পরামর্শক্রমে সৈনিক সংস্থার সদস্যরা অন্যান্য জিয়াভক্ত সৈনিকদের নিয়ে জিয়াকে গৃহবন্দি থেকে উদ্ধার করে দ্বিতীয় ফিল্ড রেজিমেন্ট অর্থাৎ কর্নেল রশিদের ইউনিটে নিয়ে আসে। সৈনিক সংস্থা ও জাসদ চেয়েছিল, সেই মুহূর্তে যেহেতু জিয়ার গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে তাকে সামনে রেখে সিপাহিদের একতাকে তাদের পক্ষে আরও সুদৃঢ় করা এবং তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। জিয়া বিষয়টি বুঝে ওঠার জন্য বিশেষ করে সেনাবাহিনীর কমান্ড ঠিক করে আনার জন্য প্রথম কয়েক ঘণ্টার জন্য সব ব্যাপারে জাসদের সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করেন। ঢাকা সেনানিবাসে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার উদ্যোগের পাশাপাশি জিয়া জাসদের রব, জলিলসহ অন্যদের জেল থেকে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন এবং ১২টার মধ্যে জিয়া সেনাবাহিনীর Chain of Command মোটামুটিভাবে ঠিক করে ঢাকা সেনানিবাসের শৃঙ্খলা অনেকটা ফিরিয়ে আনেন। এক কথায় সেনানিবাসের পরিস্থিতি জিয়া নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন।

ঢাকাতে তখন কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে জাসদের লংমার্চের প্রস্তুতি চলছিল। খন্দকার মোশতাক সেনাবাহিনীর ভ্রাম্যমাণ ট্রাকে বসে জনগণকে বুঝানোর চেষ্টা করছিলেন, সব কিছু তার পক্ষে হচ্ছে, জিয়া তো তার সেনাপ্রধানই ছিলেন। তাই তিনি যেহেতু সেনানিবাসকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন, জিয়া তার অনুগত থাকবেন। সেনাবাহিনীর সৈন্যবোঝাই কয়েকটি ট্রাকবহর মিছিল করে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে যায়। জিয়ার ১২টার পরে লংমার্চে যোগদানের জন্য শহিদ মিনারে আসার কথা ছিল। তিনি আর এলেন না। আর্মির যেই অংশটি সেই সময়ে শহিদ মিনারে গিয়েছিল তারা লংমার্চের উদ্দেশ্যে সমবেত জাসদ কর্মী ও নেতৃবৃন্দকে আল্লাহু আকবর ধ্বনি দিয়ে মারধর করে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। জাসদ এর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত জিয়া এবং তাহেরের নামে শ্লোগান দিচ্ছিল। শহিদ মিনারের আশপাশে মোশতাকের কিছু পোস্টার ও ছবি ছিল। জাসদের উত্তেজিত নেতা-কর্মীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়ার পর সেগুলো ছিঁড়ে ফেলে দেয় ও মোশতাকের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিতে থাকে। এর আগে কর্নেল তাহের রেডিও স্টেশনে এসেছিলেন ভাষণ দেওয়ার জন্য। সেখানে তখন মোশতাকও উপস্থিত ছিলেন। তাহের বা মোশতাক কাউকেই ভাষণ দিতে দেওয়া হলো না। জিয়াকে গৃহবন্দি অবস্থা থেকে মুক্ত

করার আগে কর্নেল তাহের যদি ইচ্ছা করতেন তাহলে ৭ নভেম্বর ভোরে রেডিওতে ভাষণ দিতে পারতেন এ জন্য যে, তখন পরিস্থিতি অনেকাংশে তাহেরের নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং সর্বত্র একটা বিভ্রান্তি ও থমথমে ভাব বিরাজ করছিল। সেক্ষেত্রে সেনানিবাসের বাইরে জাসদের রাজনৈতিক Mobilisation ব্যাপক হতো এবং ভাষণের পর পর জিয়াকে গৃহবন্দি অবস্থা থেকে মুক্ত করলে কর্নেল তাহের কিছু সময়ের জন্য সেনাবাহিনীতে তার একটা গ্রহণযোগ্যতা ও সমর্থন বৃদ্ধি করার চেষ্টা করতে পারতেন। সেনাবাহিনীতে বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে চাপা ক্ষোভ, একের প্রতি অন্যের হিংসা ও প্রতিশোধের অভিপ্রায় বিরাজ করছিল। সব কিছু উপেক্ষা করে একক তাহেরের পক্ষে শুধু সৈনিক সংস্থার নের্তৃত্বে পুরো বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে একটি কমান্ডের অধীনে এনে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পরিচালনা করা সম্ভব ছিল না। এই বাস্তবতা উপলব্ধিতেই জিয়াকে গৃহবন্দি থেকে মুক্ত করে এনে প্রাথমিক পর্যায়ে জিয়াকে সামনে রেখে তার মাধ্যমে সব কিছু সামাল দেওয়ার কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। গৃহবন্দি থেকে জিয়াকে মুক্ত করে আনার সময় তাকে ধারণা দেওয়া হয়েছিল, দেশব্যাপী বিশেষ করে ঢাকাতে তাদের সমর্থনে ছাত্র, শ্রমিক, জনতার ঢল নামবে এবং পুরো সেনাবাহিনীর সৈনিকরাও একতাবদ্ধ রয়েছে। জিয়া দ্বিতীয় ফিল্ডে বসে দেখলেন, সেনাবাহিনীর সৈনিকদের মধ্যে যে অংশটি বিদ্রোহের নের্তৃত্ব দিচ্ছে তাদের সমর্থনে বাইরে কোনো ব্যাপক রাজনৈতিক সমর্থন নেই অর্থাৎ জাসদ তাদের পরিকল্পনায় ব্যর্থ হয়েছে। ওই পরিস্থিতিতে কারও পক্ষে সেনাবাহিনীকে একতাবদ্ধ করা হয়তো সম্ভব ছিল না বিধায় জিয়া সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে জোর দেন এবং তার নিজস্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিস্থিতির মোকাবেলা করেন। এক্ষেত্রে জিয়া অন্যের সৃষ্ট সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছিলেন। শুধু প্রশ্ন থেকে যাবে যে, জিয়ার কি আর কোনো বিকল্প ছিল? জিয়ার পরবর্তী কার্যক্রমগুলো কি জাতীয় স্বার্থে ছিল? ওই পরিস্থিতিতে জিয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসতে কি বাধ্য হয়েছিলেন? ওই সময়ের সৃষ্ট পরিস্থিতিতে জিয়ার জায়গায় অন্য কোনো সেনা অফিসার থাকলে তার কী করণীয় ছিল? ইতিহাস এর মূল্যায়ন করবে। আমি আগেও বলেছি, ৩ নভেম্বর ও ৭ নভেম্বর অভ্যুত্থানের সুবাদেই জিয়াউর রহমান পর্যায়ক্রমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন। পরের দিন জিয়ার পূর্ব প্রতিশ্রুতি মোতাবেক রব ও মেজর জলিল কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে আসেন। জিয়া যদি লংমার্চে আসতেন এবং নের্তৃত্ব দিতেন, দেশের অবস্থা কী হতো তা উল্লেখ না করে বলব, জাসদ পরবর্তীতে জিয়াকে কখনো তাদের নেতা হিসেবে গ্রহণ করে নিত না। শেষ পর্যন্ত তাহেরই নের্তৃত্বে আসার চেষ্টা করতেন। জিয়ার এ ব্যাপারে সজাগ উপলব্ধি ছিল। তাই জিয়া বেলা ১১টা পর্যন্ত জাসদের সঙ্গে ঐকমত্যে ছিলেন। ১১টার পরে

লংমার্চে শরিক না হয়ে জিয়া জাসদের সঙ্গে তার সম্পর্ক অনানুষ্ঠানিকভাবে ছিন্ন করে জিয়া-মোশতাক গংদেরও ক্ষতি না করে তাদেরও পাশ কাটিয়ে সব কিছু নিজের নিয়ন্ত্রণে এনে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার স্বপ্ন দেখেন, সেই মোতাবেক তিনি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসেন।

জিয়া বেলা ১১টার পরে জাসদের সঙ্গে তার পূর্ব প্রতিশ্রুতি মোতাবেক আর কোনো সমঝোতা রক্ষা করছিলেন না এবং আরও পরবর্তীতে একের পর এক জাসদের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে অ্যাকশনে গিয়েছিলেন। সে জন্য জাসদ জিয়াকে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে আখ্যায়িত করে। জিয়াও ১১টার পরে লংমার্চে না গিয়ে প্রশাসন ও বিভিন্ন মহলের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেন। বিশেষ করে আমেরিকান দূতাবাসের সঙ্গে লংমার্চের নির্ধারিত সময় দুপুর ১২টার আগেই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সেরে নিয়েছিলেন। জিয়া লংমার্চে না গিয়ে কৌশলে সব কিছু নিয়ন্ত্রণে এনে বিচারপতি সায়েমকে প্রেসিডেন্ট ও Cheif Martial Law Administrator রেখে জিয়া নিজে সেনাপ্রধান ও Deputy Cheif Martial Law Administrato হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেই দিনের এবং সে সময়কার বিরাজমান পরিস্থিতিতে বৃহত্তম জাতীয় স্বার্থে জিয়ার এর বিকল্প হয়তো আর কিছু করণীয় ছিল না। জিয়ার কৌশলগত এই ভূমিকার বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে তখন কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া ছিল না। সবাই আশা পোষণ করছিল জিয়া নতুন নির্বাচন দিয়ে সাংবিধানিক প্রক্রিয়া পুনরায় চালু করবেন। ৭ নভেম্বরের প্রথম পর্বে সৈনিক সংস্থার নের্তৃত্বে জিয়াকে গৃহবন্দি থেকে দ্বিতীয় ফিল্ড রেজিমেন্টে নিয়ে আসা, জিয়ার সঙ্গে জাসদের সমঝোতা, পরে সমঝোতা ভেঙে যাওয়া এবং সর্বোপরি দ্বিতীয় পর্বে জাসদ ও মোশতাক গংদের বাদ দিয়ে ব্যক্তি সমর্থনে ও কৌশলে এগিয়ে যাওয়ার কারণে ৭ নভেম্বর বিপ্লব দিবস হিসেবে সঠিক মূল্যায়ন অনেকের কাছে এখনও বিতর্কিত। আমি ৬ নভেম্বর খালেদ মোশতাক সহকর্মীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে Flying Club- এর একটি Cassna Aircraft করে রংপুরে আমার ইউনিটে ফিরে যাই। যাওয়ার সময় খালেদ আমাকে বলেছিলেন, 'রংপুর ব্রিগেড যেন নিয়ন্ত্রণে থাকে। রংপুরে অবস্থানরত রক্ষীবাহিনীর ইউনিটগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে। প্রয়োজনে ইউনিট নিয়ে ঢাকার দিকে আসতে হতে পারে।' সর্বশেষ বললেন, 'যশোর ব্রিগেডের দিকে নজর রাখবে এবং ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে।' আমার যুদ্ধকালীন ইউনিট ১০ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ইতোমধ্যেই রংপুর থেকে ঢাকায় এসে শেরেবাংলানগরে অবস্থান করছিল। এই ইউনিট যেহেতু যুদ্ধ চলাকালীন আমার অধিনায়কত্বে 'কে' ফোর্সের অধীনে ছিল সে কারণে এই ইউনিটের ওপর খালেদের আস্থা ছিল অনেক বেশি।

৬ নভেম্বর রাতে ওই ভয়াবহ পরিস্থিতির সময় খালেদ, রক্ষীবাহিনীর প্রধান নুরুজ্জামান, কর্নেল হায়দার ও কর্নেল হুদা ১০ম বেঙ্গলে আশ্রয় নেওয়ার উদ্দেশ্যে কাঁঠালবাগান খালেদের এক আত্মীয়ের বাসা হয়ে শেরেবাংলানগরের দিকে যাত্রা শুরু করেন। আসাদ গেট পৌঁছার পর ব্রিগেডিয়ার নুরুজ্জামান সাভার অভিমুখে চলে যান, বাকি তিনজন ১০ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে এসে উপস্থিত হন। সারা রাত খালেদ-হুদাদের সঙ্গে জিয়াভক্ত অফিসারদের কথা কাটাকাটি চলছিল। যুদ্ধ চলাকালীন পাকিস্তান আর্টিলারি সেলে কপালে আঘাতপ্রাপ্ত এই বীর মুক্তিযোদ্ধা সেক্টর কমান্ডার খালেদ মোশাররফ শান্তভাবে সব প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন। তিনি এক বাসায় শেষ রাত পর্যন্ত প্রায় ২-৩ প্যাকেট সিগারেট শেষ করলেন। রংপুর থেকে ঢাকা আসা এই ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে সৈনিকদের কোনো বিদ্রোহ ছিল না। মাত্র কিছু সংখ্যক অফিসার ও সৈনিকের মধ্যে উপরের ইঙ্গিতে কিছুটা উত্তেজনা ছিল। বড় ধরনের কোনো ষড়যন্ত্র ও ঢাকা সেনানিবাস থেকে কারও যোগসাজশ ছাড়া এই সুপরিকল্পিত নির্মম হত্যাকাণ্ড ভোর রাতে সংঘটিত হতে পারে না। বিদ্রোহীদের হাতে যদি খালেদ-হুদা-হায়দার নিহত হতেন তাহলে সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে ও ব্যবস্থাপনায় তাদের লাশ ঢাকা সিএমএইচে এনে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করা, তাদের আত্মীয়স্বজনকে খুব স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় খবর পৌঁছানো, এমনকি কর্নেল হুদার স্ত্রীকে রংপুর থেকে আনার জন্য হেলিকপ্টার পাঠানো ইত্যাদি ওই দিন ওই উত্তেজিত পরিস্থিতিতে সম্ভব হতো না। সেদিন খুব সুপরিকল্পিতভাবে এও প্রচার করা হয়েছিল, খালেদ ইন্ডিয়ান এজেন্ট ছিলেন এবং তার কাছে ইন্ডিয়ান টাকা পাওয়া গেছে যা ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এ প্রচার শুধু খালেদের বিরুদ্ধে ছিল না, পরোক্ষভাবে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধেও ছিল। অন্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের হত্যাকাণ্ডের বিচারের পাশাপাশি এই বীর সেক্টর কমান্ডার মে. জেনারেল খালেদ, কর্নেল হুদা ও কর্নেল হায়দার হত্যাকাণ্ডের বিচার হওয়া উচিত এবং এই হত্যাকাণ্ডের রহস্য জাতির জানার অধিকার রয়েছে।

খালেদের পরে দেশের রাজনীতির পটপরিবর্তন, ঘটনাপ্রবাহ ও অনেকের জাতীয় রাজনীতিতে আবির্ভাবের প্রেক্ষাপট মূল্যায়ন করলে দেখা যাবে, ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থান ছিল ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। যদি খালেদের নের্তৃত্বে ৩ নভেম্বর অভ্যুত্থান না ঘটত তা হলে:

প্রথমত : মোশতাক গংরা ক্ষমতায় আরও অনেক দিন অধিষ্ঠ থেকে নিজেদের অবস্থান পাকাপোক্ত ও সুদৃঢ় করত। এতে আওয়ামী লীগের মধ্যে আরও ভাঙন সৃষ্টি হতো এবং আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক অবস্থা আরও দুর্বল হয়ে পড়ত। আওয়ামী লীগের যেসব নেতা-কর্মী মোশতাকের পক্ষে আসতেন না,

অথবা তার বিরুদ্ধাচারণ করতেন তাদের জেল-জুলুম নির্যাতন প্রহসনের বিচারে ফাঁসি, এমনকি গোপন হত্যার শিকার হতে হতো।

দ্বিতীয়ত : জাসদের ৭ নভেম্বরের এই বিদ্রোহ-বিপ্লব অবশ্যই অন্য কোনো সময়ে সংঘটিত হতো (যেহেতু ৭ নভেম্বর ৩ নভেম্বরের পাল্টা অভ্যুত্থান ছিল না), তখন হয়তো জিয়ার গৃহবন্দির প্রেক্ষাপটও থাকত না, জাসদ জিয়াকে গৃহবন্দি থেকে নিয়েও আর প্রশ্ন থাকত না, খালেদকে কেন্দ্র করে জিয়া-জাসদের সমঝোতা হতো না। কিন্তু এটা সত্য যে, জাসদ যখনই যার আমলে এই বিপ্লব বা বিদ্রোহ সংঘটিত করত সেই বিপ্লব ৩ নভেম্বরের প্রেক্ষাপটের সময় ও সুযোগের পরিস্থিতিতে ঘটত না। সে অবস্থায় জাসদ যদি এ ধরনের বিদ্রোহ ও বিপ্লব ঘটাত সেই সময়ে দেশে ভিন্ন রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও পরিবেশের সৃষ্টি হতো।

তৃতীয়ত: জিয়া হয়তো অন্য কোনো সময়ে, সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিস্থিতিতে ও ভিন্ন প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসতেন। আমার মূল্যায়নে জিয়া সময়মতো মোশতাক থেকে ক্ষমতা নিয়ে নিতেন এবং সেক্ষেত্রে মোশতাকের পরিবর্তনের প্রশ্নে জিয়া খালেদের সমর্থন পেতেন, কারণ জিয়ার সঙ্গে মোশতাক গংদের সম্পর্ক দিন দিন দ্রুত অবনতি ঘটছিল। জিয়াও একজন তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন উচ্চাভিলাষী অফিসার হিসেবে সময়ের অপেক্ষায় ছিলেন।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
৭ নভেম্বর ২০১৪

আমি বিজয় দেখেছি মুক্ত আকাশের নিচে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছি

বিজয়ের মাসে বিজয়ের মুহূর্তে '৭১-এ মুক্তিযোদ্ধারা দেখেছি, সর্বস্তরের মানুষ দলমত নির্বিশেষে বিজয়ের আনন্দে আবেগ অনুভূতিতে একাকার হয়ে গেছে। সেদিন দেখেছি মানুষের চোখে আনন্দের অশ্রু। দেখেছি স্বজন হারানোর বেদনা। বাংলার মুক্ত আকাশের নিচে সবাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে এই স্বপ্নে বিভোর হয়ে যে, শহিদদের স্বপ্নসাধ তথা অর্থনৈতিক মুক্তি ও স্বনির্ভর দেশ গড়ে উঠবে। একটাই আশা ছিল, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশ গড়ব। যেখানে থাকবে না কোনো হানাহানি বা ক্ষমতার লড়াই। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ভবিষ্যতে যেন বৃহত্তর জাতীয় ঐক্য সমুন্নত রাখতে পারে এটাই হবে আমাদের কাম্য। মহান মুক্তিযুদ্ধে যে যেভাবেই স্বাধীনতার জন্য কাজ করেছে সবাই মুক্তিযোদ্ধা। কিন্তু যারা জীবন বাজি রেখে সম্মুখযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন তাদের পৃথকভাবে চিহ্নিত করা উচিত ছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের প্রায় চার হাজার সেনা অফিসার ও সৈনিক আমাদের স্বাধীনতার জন্য তাদের বুকের রক্ত দিয়ে বাংলার মাটি রঞ্জিত করেছিলেন। তাদের সম্মান দিতে আমরা কৃপণতা করি কেন? শুনেছি মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য ভারতীয় শহিদ পরিবারের সদস্যরা বাড়তি কোনো সুযোগ-সুবিধা পান না। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের করণীয় রয়েছে। আমাদের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ভারত থেকে তালিকা সংগ্রহ করে মরণোত্তর সংবর্ধনা দেওয়া, তাদের নামে স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা উচিত। মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য সরকার বিদেশিদের সম্মাননা দিচ্ছেন। দেরিতে হলেও এটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। স্বাধীনতার ৪৩ বছর পর মুক্তিযোদ্ধারা বিভিন্ন গ্রুপে বা রাজনৈতিক দলে থাকাটাই স্বাভাবিক। যেখানেই থাকুক না কেন সবাই দেশপ্রেমিক। মুক্তিযুদ্ধ আমাদের অন্যতম জাতীয় ঐতিহ্য, অহংকার এবং গর্ব। কিন্তু যে চেতনা নিয়ে জীবন বাজি রেখে মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম সেই চেতনা আজ প্রায় বিলুপ্তির পথে। জাতি বীরদের সম্মান দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে। শুধু বিজয় দিবস আর স্বাধীনতা দিবস এলেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে সবাই সোচ্চার হয়। কিন্তু মনে-

প্রাণে সে চেতনাকে কতখানি লালন করি তার প্রতিফলন দেখা যায় পরবর্তী কার্যক্রমে। মুক্তিযুদ্ধ হঠাৎ করে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা নয়। '৫২-এর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু হয়েছিল মুক্তির সংগ্রাম। মুক্তিযুদ্ধের প্রথম লগ্ন থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সর্বাত্মক সহযোগিতা এবং যুদ্ধে তাদের অংশগ্রহণ ও বিভিন্ন রণাঙ্গনে তাদের প্রায় চার হাজার সেনা সদস্য হতাহত হয়েছিলেন। আজ আমাদের শহিদদের স্মরণের পাশাপাশি তাদের আত্মাহুতিকেও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। ৪৩ বছর পরও আত্মহুতি দেওয়া ভারতীয় সেনাদের স্বজনরা ওইসব অঞ্চলে এসে তাদের বীরত্বগাথা ইতিহাস জানতে চান। অনেকে স্বজনদের আত্মাহুতির জায়গাটা কেন সংরক্ষণ করা হলো না আবেগপ্রবণ হয়ে জানতে চান। এখনও অনেকে বিভিন্ন রণাঙ্গনে আত্মাহুতির স্থান অনুসন্ধানে আসেন। আবেগপ্রবণ হয়ে যান এই বলে, স্থানগুলো রক্ষাবেক্ষণ দূরের কথা স্বাধীনতার জন্য এদের অবদানের স্বীকৃতি ইতিহাসে নেই কেন? আমরা কি তাদের কাছে ঋণী নই? ভারতীয় সেনাবাহিনীর শহিদদের স্মরণে বাংলাদেশেও তাদের নামে ওয়ার মেমোরিয়াল থাকবে না কেন? যে স্বপ্ন নিয়ে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলাম হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে। সেই স্বপ্নের সঙ্গে আজকের বাংলাদেশের তফাত আকাশ-পাতাল। কেন স্বাধীনতাযুদ্ধের সেদিনের চেতনার অবমূল্যায়ন ও ঘাটতি থাকবে? দেশকে এগিয়ে নিতে হলে এর কারণগুলো চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নিতে হবে। বিষয়টি অমীমাংসিত রেখে নির্বাচনসহ যে কোনো জাতীয় বিষয় কখনো প্রাধান্য পেতে পারে না। তাই আমাদের জাতীয় বা আইনিভাবে একটি বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে তা হলো মুক্তিযুদ্ধকে যারা এখনও স্বীকার করে না গণ্ডগোলের বছর বলে তাদের চিহ্নিত করে নাগরিকত্ব বাতিল করতে হবে। নইলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বৃহত্তম ঐক্য সৃষ্টির পথে বাধার পাশাপাশি দেশের উন্নয়ন ও জাতীয় সত্তার সার্বিক বিকাশে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। দেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ঐক্য সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষণীয়। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন এই চেতনা লালন করতে পারে সেজন্য মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস বিলম্ব হলেও প্রণয়নের জন্য এটাই সঠিক সময়। এ প্রয়াসে সবাইকে দলীয় রাজনীতির সংকীর্ণতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। পাশাপাশি লক্ষ্য রাখতে হবে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিগুলো যেন চেতনার প্রশ্নে বিভক্ত না হয়ে পড়ে। আমরা যারা সশস্ত্র যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছি তারা আজ উপেক্ষিত। আমাদের চাওয়া-পাওয়ার কিছুই নেই। জাতি যেন আমাদের করুণা না করে। দেখে যেতে চাই বীরদের যেন সম্মান দেওয়া হয়। কারণ যে জাতি তার বীরদের সম্মান দিতে জানে না, সে জাতি মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহ্য নিয়ে গর্ব করতে পারে না। সেই জাতিতে বীর জন্ম নেয় না। আমাদের সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের পাশাপাশি রণাঙ্গনে যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তারাও সহযোগী মুক্তিযোদ্ধা। মহান মুক্তিযুদ্ধে শত্রুপক্ষের শেলিংয়ের আক্রমণে অনেকে

ঘরবাড়ি, সম্ভ্রমসহ সবকিছু হারিয়েছেন। যারা মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করেছেন, প্রশিক্ষণ দিয়েছেন সবাই আমরা মুক্তিযোদ্ধা। কিন্তু যারা জীবন বাজি রেখে রণাঙ্গনে সশস্ত্র যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন তাদের যদি ইতিহাসে লিপিবদ্ধ না করি তাহলে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কখনো স্বাধীনতাযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানতে পারবে না। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে পারবে না। স্বাধীনতার ৪৩ বছরে অর্জন নেই তা নয়। যদি সবাই এক হয়ে একাত্তরের মনমানসিকতা ও উদ্দীপনা নিয়ে দেশ গড়তে পারতাম তাহলে অর্জন আরও বেশি হতে পারত। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত রাখা ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সঠিকভাবে তুলে ধরার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সবার সমন্বয়ে বিশেষ করে জীবিত কমান্ডারদের নিয়ে সঠিক তালিকা প্রণয়নে প্রধানমন্ত্রী তথা বঙ্গবন্ধুকন্যার আহ্বানকে বিভিন্ন স্তরে খাটো করার অপপ্রয়াস এবং বানচাল করার পাঁয়তারা লক্ষ করা যায়।

ফেনী পাক হানাদার মুক্ত দিবস ৬ ডিসেম্বর। '৭১-এর এই দিনে মুক্তিযোদ্ধারা পাক হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে ফেনীর মাটিতে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা ওড়ান। ফেনী অঞ্চলের মুক্তিবাহিনীর অধিনায়ক হিসেবে আমি তৎকালীন ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম (পরবর্তীতে লে. কর্নেল অব. বীরবিক্রম) ভারতের বিলোনিয়া ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল থেকে ১০ ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের অভিযান চালিয়ে বিলোনিয়া, পরশুরাম, মুন্সিরহাট, ফুলগাজী হয়ে যুদ্ধ করতে করতে এগোতে থাকলে ফেনী পাক হানাদার বাহিনীর একটি অংশ সোনাইমুড়ি হয়ে কুমিল্লা সেনানিবাসের রাস্তায় এবং অন্য অংশ শুভপুর ব্রিজের ওপর দিয়ে চট্টগ্রামের দিকে পালিয়ে যায়। মুক্তিযুদ্ধে ফেনীর রণাঙ্গনের মধ্যে মুন্সিরহাটের মুক্তারবাড়ি ও বন্ধুয়ার প্রতিরোধের যুদ্ধ ইতিহাসখ্যাত হয়ে আছে। প্রথম বিলোনিয়া যুদ্ধে মুন্সিরহাটে পাকবাহিনীর সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে প্রথম শহিদ হন হাবিলদার নূরুল ইসলাম। এ যুদ্ধে পাকবাহিনীর প্রায় ৩০০ সদস্য হতাহত হয়েছিল। হাবিলদার নূরুল ইসলাম বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। নূরুল ইসলাম বলেছিলেন, 'স্বাধীনতা দেখে যেতে পারলাম না। স্যার আপানারা চালিয়ে যান। আমাদের রক্ত যেন বৃথা না যায়।' কালিমা পড়ে জয় বাংলা বলে আমাদের থেকে বিদায় নেন নূরুল ইসলাম। তখন নূরুল ইসলামের রক্তে আমাদের ব্যাংকার রক্তাক্ত হয়েছিল। আমরা যারা সশস্ত্র যুদ্ধ করেছি শহিদদের আর্তনাদ শুনতে পাই। তারা বলেন, তাদের স্বপ্ন যেন বাস্তবায়ন হয়। '৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর দেশ বিজয় লাভ করেছিল। কিন্তু আগেই ফেনীসহ বিভিন্ন জেলা মুক্ত হয়েছে। যে তারিখে যে জেলা মুক্ত হয়েছে ওই তারিখে সংশ্লিষ্ট জেলায় সরকারি ছুটি ঘোষণার আহ্বান জানাচ্ছি।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
২ ডিসেম্বর ২০১৪

জিয়াকে সেনাপ্রধান করলে খুন হতেন না বঙ্গবন্ধু

সাবেক মন্ত্রী কর্নেল (অব.) জাফর ইমাম বীরবিক্রম বলেছেন, জিয়াউর রহমানকে সেনাপ্রধান করা হলে ১৫ আগস্টের দুঃখ জনক ঘটনা না-ও ঘটতে পারত। তিনি বলেন, আমি তখন সেনাবাহিনীতে কর্মরত। বঙ্গবন্ধুর হত্যার খবর ছড়িয়ে পড়ায় দেশজুড়ে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছিল। তখন সেনা সদস্যদের চোখে অশ্রু দেখেছি। রণাঙ্গন থেকে সদ্য ফিরে আমরা সেনাবাহিনীতে। তখন সেনাবাহিনীর বৃহত্তম অংশ ছিল যুদ্ধফেরত। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের খবর পেয়ে আমরা বাকরুদ্ধ হয়েছিলাম। অমরা অনেকে কেঁদে কেঁদে বলেছিলাম, এ জন্যই কি আমরা যুদ্ধ করেছিলাম? এ কী হয়ে গেল? কর্নেল (অব.) জাফর ইমাম বীরবিক্রম গতকাল বাংলাদেশ প্রতিদিনের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেন। তিনি মনে করেন, দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেজর জেনারেল সফিউল্লাহকে সেনাপ্রধান করেছিলেন। কিন্তু সফিউল্লাহকে সেনাপ্রধান না করে তখন যদি তিনি মেজর জিয়াকে সেনাপ্রধান করতেন, তবে ১৫ আগস্টের মতো দুঃখজনক ঘটনা না-ও ঘটতে পারত। জাফর ইমাম বলেন, ১৫ আগস্ট যারা এ দুঃখজনক ঘটনা ঘটিয়েছিল তারা ছিল সেনাবাহিনীর একটি ক্ষুদ্র অংশ এবং দুটি ইউনিট। এর একটি সেকেন্ড আর্টিলারি, যা ছিল কর্নেল রশীদের অধীনে। অন্যটি আর্মড ইউনিট, ছিল কর্নেল ফারুকের অধীনে। তাদের সঙ্গে জড়িত ছিল সেনাবাহিনী থেকে সদ্য বহিষ্কৃত মেজর ডালিম, নূরসহ কিছু অফিসার; যারা পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে সেনাবাহিনীতে ঢুকেছিল। তারা মুক্তিযুদ্ধ করেনি। বঙ্গবন্ধু বলেছেন, যারা পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসেছে তারাও মুক্তিযোদ্ধা। কিন্তু এ দুই ইউনিটে ছিল বঙ্গবন্ধু হত্যার ঘাতকরা। তারা যখন অপারেশন চালিয়েছে তখন বাংলার মানুষ ছিল ঘুমন্ত অবস্থায়। তারা নাইট ট্রেনিংয়ের নামে রাত ১২টায় বর্তমান বিমানবন্ধরের রানওয়েতে সমবেত হয়েছিল। এখানেই তারা মায়ের দুধের কসম খেয়ে বঙ্গবন্ধুর ৩২ নম্বর বাড়ি ও অন্যদের টার্গেট নিয়ে অগ্রসর হয়। তাদের লক্ষ্য ছিল রাতের মধ্যে অপারেশন শেষ করা। কিন্তু তাদের অপারেশন ১ ঘণ্টা বিলম্ব হয়। যখন এক গ্রুপ বঙ্গবন্ধুর বাড়ির দিকে ট্যাংকবহর নিয়ে যায়, একই

সময়ে অন্য গ্রুপ যায় মণি ভাইকে (শেখ ফজলুল হক মনি) টার্গেট করে। তাদের অপারেশন ১ ঘণ্টা বিলম্ব হওয়ায় সঠিক সময়ে তারা বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে যেতে পারেনি। তিনি বলেন, ঘটনার আগ মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু সেনাপ্রধান জেনারেল সফিউল্লাহসহ অন্যদের সঙ্গে আলাপও করেছিলেন। কিন্তু জেনারেল সফিউল্লাহ সময়মতো ঢাকা সেনানিবাস তথা ৪৬ ব্রিগেডকে নির্দেশ দিতে ব্যর্থ হন। তিনি যদি সময়মতো সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিতেন এবং বঙ্গবন্ধুকে (বাড়ির দ্বিতীয় তলায়) বেরিয়ে না আসতে পরামর্শ দিতেন তাহলে এদের অপারেশন আরও বিলম্বিত হতো। কিন্তু তিনি বঙ্গবন্ধুকে এমন পরামর্শ দিয়েছিলেন কি না তা আমি জানি না। ঘটনার আগ মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু দিতীয় তলায় সিঁড়ি দিয়ে এগিয়ে এসে বলেছিলেন– এই! তোরা কী চাস? তখন ঘাতকের গুলিতে সিঁড়িতে লুটিয়ে পড়ে বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধু হাতে ছিল পাইপ। আশপাশের এলাকায় মাইকে ভেসে আসছিল সুমধুর আজানের ধ্বনি– আসসালাতু খাইরুম মিনাননাউম........। এ সময়ে অন্যদিকে ঘাতকরা মণি ভাইয়ের বাড়িতে অপারেশন চালায়। এমনকি তার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকেও হত্যা করে। এ সময় ঢাকার রাজপথে হাজার হাজার মানুষ মর্নিংওয়ার্কে নেমে পড়েছিল। ঘাতকদের অপারেশনের আগে বঙ্গবন্ধু যদি বাড়ির দ্বিতীয় তলায় না আসতেন আর সেনাপ্রধান সেনাবাহিনীর ৪৬ ব্রিগেডকে আক্রমণের নির্দেশ দিতেন তখনই তারা চলে আসত। তখন হয়তো দুঃখজনক এ ঘটনা না-ও ঘটতে পারত। ইতিহাস ভিন্ন হয়ে যেত। যদি সেনাবাহিনী আপারেশনে যেত সঙ্গে থাকত হাজার মানুষ। ঘাতকদের ঘেরাও করতে পারত। তাদের পালানোর সুযোগ ছিল না। কেননা ঘাতকদের ট্যাংকবহর ছিল শুধু শোডাউনের জন্য। এমনকি ট্যাংকে গোলাবারুদও ছিল না। এ ছাড়া কর্নেল জামিল একাই বঙ্গবন্ধুকে বাঁচাতে বঙ্গবন্ধুর ৩২ নম্বরের বাড়িতে গিয়েছিলেন। প্রবেশপথে তিনি ঘাতকের গুলিতে নিহত হন। কিন্তু সেনাপ্রধান বঙ্গবন্ধুর জন্য কিছুই করেননি। কর্নেল জাফর বলেন, দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই জেনারেল সাফিউল্লাহকে সেনাপ্রধান করেছিলেন। কিন্তু সফিউল্লাহ প্রটোকলে জুনিয়র ছিলেন। আর তখন জেনারেল জিয়াউর রহমানও অত্যন্ত বিচক্ষণ ও দক্ষ অফিসার ছিলেন। তার রাজনৈতিক দিক নিয়ে কথা বলছি না। তবে ওই সময়ে বঙ্গবন্ধু যদি সফিউল্লাহকে সেনাপ্রধান না করে তৎকালীন মেজর জিয়াকে সেনাপ্রধান করতেন তবে ১৫ আগস্টের মতো দুঃখজনক ঘটনা না-ও হতে পারত। কারণ, জিয়া ছিলেন উচ্চাবিলাষী অফিসার। তার মধ্যে সেনাপ্রধান না হওয়ার ক্ষোভও ছিল। অন্যদিকে ঘাতকদের ক্ষুদ্র অংশের সঙ্গে জিয়ার পরোক্ষ যোগাযোগ ছিল। বিক্ষুব্ধ জিয়া সেদিন ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে নাটকীয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। সেটা হয়তো তার কৌশল ছিল। তিনি

হয়তো আর একটি সেনা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে মোশতাকের কাছ থেকে ক্ষমতা নেবেন– এটা তার উদ্দেশ্য ছিল। আর যদি জিয়া সেনাপ্রধান থাকতেন তবে এ ক্ষুদ্র অংশের ষড়যন্ত্রকে প্রাধান্য দিতেন না। এ ছাড়া রণাঙ্গনফেরত সেনাবাহিনীর সদস্যদের ৯০ ভাগ ছিল বঙ্গবন্ধুর ভক্ত। ১৫ আগস্টের দুঃখজনক ঘটনায় আমি লক্ষ্য করেছি সেনা সদস্যদের চোখে পানি। অনেকের মধ্যে এ নিয়ে ক্ষোভও দেখেছি। তিনি বলেন, যুদ্ধকালে বঙ্গবন্ধু হত্যার নীলনকশা তৈরি করা হয়। ওই সময় কলকাতায় বাংলাদেশ দূতাবাসে মাহবুব আলম চাষী ও তৎকালীন দূতাবাসের হাইকমিশনার হোসেন আলী ও অন্যদের যোগসাজশে এ ষড়যন্ত্র করা হয়, পরে যার বাস্তবায়ন স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে মোশতাকরা ত্বরান্বিত করে। তিনি বলেন, স্বাধীনতা-উত্তর মুজিব বাহিনীর একটা বিরাট অংশ জাসদের নের্তৃত্বে বের হয়ে গিয়ে গণবাহিনী তৈরি করে, এটা আওয়ামী লীগকে অনেকটা দুর্বল করে। এ ছাড়া তখন আওয়ামী লীগের মধ্যে সংগঠনিক দুর্বলতাও ছিল। এ পরিস্থিতিতে মোশতাকরা বঙ্গবন্ধু হত্যার ষড়যন্ত্র চালিয়ে যায়। ফলে ১৫ আগস্ট আরও ত্বরান্বিত হয়। আমি মনে করি, ঘাতকদের বিচারের পাশাপাশি যারা ওই দিন মুজিব হাহিনী থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল এবং বঙ্গবন্ধুকে প্রটেকশন দিতে ব্যর্থ হয়েছে তদেরও বিচারের মুখোমুখি করা উচিত। জাফর ইমাম বলেন, আজ মহান নেতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার জন্য জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। তবে এটাকে দলীয়করণের গণ্ডিতে রাখলে চলবে না।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
১৫ আগস্ট ২০১৫

ফেনী–বিলোনিয়া যুদ্ধ

ফেনী-বিলোনিয়া : রণাঙ্গনের এক প্রান্তর

ফেনী বিলোনিয়া রণাঙ্গনের একপ্রান্তর এই অধ্যায়ে কিছু সংযোজন করলাম। উল্লেখ থাকে যে এখনও অনেক তথ্য আমাদের অজানা রয়েছে। তবে হাজী মোঃ ফখরুল ইসলামের লেখা "মুক্তিযুদ্ধে বৃহত্তর নোয়াখালী" এই বইটি অনেকাংশে যুদ্ধকালীন সময়ে বৃহত্তর নোয়াখালীর একটি চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন তার উদ্যোগ অবশ্যই আমাদের সবার প্রশংসার দাবি রাখে।

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের বৃহত্তর নোয়াখালীর বিশাল অংশই ছিল ২ নম্বর সেক্টরের অধীনে। ২ নম্বর সেক্টরের হেড কোয়ার্টার ছিল ভারতের মেঘালয়ে। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন- কর্নেল খালেদ মোশাররফ (এপ্রিল থেকে অক্টোবর)

খালেদ মোশাররফ অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহে কসবায় এক সম্মুখযুদ্ধে গুরুতর আহত হলে ২ নম্বর সেক্টর বাহিনীর অধিনায়ক পরিবর্তন করা হয়। পূর্ব সিদ্ধান্ত মোতাবেক মেজর সালেক "কে" ফোর্সের অধিনায়ক এবং মেজর এটিএম হায়দার ২ নম্বর সেক্টরের অধিনায়ক নিযুক্ত হন। তিনি অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত এ দায়িত্ব পালন করেন।

দায়িত্বপূর্ণ এলাকা : বৃহত্তর নোয়াখালী, আখাউড়া, ভৈরব রেল লাইন পর্যন্ত, কুমিল্লা জেলা, ঢাকা ও ফরিদপুরের কিছু অংশ। অর্থাৎ নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর, কুমিল্লা, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ি, শরিয়তপুর মহকুমা (বর্তমান জেলা) এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও ফরিদপুর জেলায় অংশ বিশেষ যার আয়তন প্রায়-১৯, ৫২৬ বর্গ কিঃ মিঃ।

২ নম্বর সেক্টরে ৬টি সাব সেক্টর ছিল। যথাক্রমে (১) গঙ্গা সাগর, (২) মন্দভাগ, (৩) সালদানদী, (৪) মতিন নগর, (৫) নির্ভয়পুর, (৬) রাজনগর।

বৃহত্তর নোয়াখালী জেলা ছিল রাজনগর সাব সেক্টরের অধীন। সাব সেক্টর কমান্ডার ছিলেন ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম (বীর বিক্রম)। তাঁর সাথে ছিলেন ক্যাপ্টেন শহিদুল ইসলাম (বীর প্রতীক) ও মেজর জেনারেল ইমাম-উজ-জামান (বীর বিক্রম) দায়িত্ব প্রাপ্ত এলাকা-বিলোনিয়া, লাকসামের দক্ষিণ এলাকা এবং নোয়াখালী পর্যন্ত।

২নং সেক্টরে আমাদের বৃহত্তর নোয়াখালীর রাজনৈতিক সংগঠক ও সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করেন (১) নুরুল হক এমএনএ রাজনৈতিক সমন্বয়কারী নোয়াখালী অঞ্চল (২) খাজা আহমেদ (খাজু মিয়া) এমএনএ রাজনৈতিক/সমন্বয়কারী ফেনী অঞ্চল।

বৃহত্তম নোয়াখালী ও কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম থানা নিয়ে গঠিত হয়েছিল রাজনগর সাব সেক্টর। এই সাব সেক্টর ছিল একটি উত্তাপ্ত রণাঙ্গন, বৃহত্তম নোয়াখালী বর্তমান ফেনী, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর এ তিন জেলা নিয়ে গঠিত। নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ চৌরাস্তাকে চার ভাগে ভাগ করা হয়। এ চার অংশের দায়িত্বে দেওয়া হয় যথাক্রমে– (১) সুবেদার লুৎফর রহমান ও গাজী আমিন উল্লাহ, (২) সুবেদার ওয়ালিউল্লাহ, (৩) শ্রমিক নেতা রুহুল আমিন ও (৪) সুবেদার সামছুল হক ও সুবেদার এসহাক। এদের সাথে আরো ছিলেন আবুল খায়ের ভূঁঞা, ছাত্র নেতা আওম সফিউল্যা; হাবিলদার মন্তাজ, হাবিলদার রুহুল আমিন, হাবিলদার জামাল, আলী আহম্মদ চৌধুরী, কারী করিম উল্লাহ, আবদুর রব চেয়ারম্যান, গোলাম মোস্তফা ভূঁঞা, আবদুল ওয়াসেক মিন্টু আরো অনেকে। এরা নয় মাস ব্যাপী যুদ্ধ করে পাক হানাদার বাহিনীর প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি সাধন করেন।

আমি রাজনগর সাব সেক্টর তথা বৃহত্তম নোয়াখালীর যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্বে ছিলাম। বিলোনিয়ার সম্মুখযুদ্ধ পরিচালনার পাশাপাশি আমি নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর ও ফেনীর বাকি অংশের গেরিলাযুদ্ধ সমন্বয় সাধন করতাম। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে গেরিলাযুদ্ধের পরিকল্পনার দায়িত্বও পালন করতাম। তবে সুবেদার লুৎফর রহমান, ওয়ালিউল্লাহ, রুহুল আমিন ওরা নিজ নিজ এলাকায় গণযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণও যুদ্ধ পরিচালনা করছিলেন।

যুদ্ধরত এই গ্রুপগুলোকে যাঁরা প্রয়োজনীয় অস্ত্র সরবরাহ ও সমন্বয় সাধন করেন– স্থানীয় এম এন এ /এম পি এ ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন যথাক্রমে আবদুল মালেক উকিল, খাজা আহম্মেদ, নুরুল হক, অধ্যাপক মোঃ হানিফ, শহিদ উদ্দিন ইস্কেন্দার (কচি ভাই), খালেদ মোহাম্মদ আলী, আবদুর রশীদ, এবিএম তালেব আলী, বিছমিল্লা মিয়া, মাস্টার রফিক উল্লা, দেলোয়ার হোসেন অ্যাডভোকেট, একেএম শাহজাহান কামাল, আজিজুল হক এম.এ., গাজী আমিন উল্লাহ, এডভোকেট সাখায়েত উল্লাহ, আবদুস সোবহান, আবু নাছের চৌধুরী, আ.স.ম আবদুর রব, মাহমুদুর রহমান বেলায়েত, ফজলে এলাহি, মিজান, মোস্তাফিজুর রহমান, মমিন উল্লা প্রমুখ।

রাজনগর বড় কাসারিতে ১০ম ইস্ট বেঙ্গল এর রিয়ার হেড কোয়াটার গঠন করা হয় সেপ্টেম্বর/অক্টোবর মাসে। আসলে ১০ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের নিউক্লিয়াস মে/জুন এ মুন্সিরহাট যুদ্ধে গঠিত হয়। অঘোষিতভাবে ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও সাব সেক্টরের গণযোদ্ধা/মুক্তিযোদ্ধারা মে/জুন থেকে অর্থাৎ বিলোনিয়া যুদ্ধ চালিয়ে আসছিল।

বিলোনিয়ার প্রথম যুদ্ধে উইড্রয়াল সম্পর্কে যারা রণকৌশল না বুঝে কথা বলেন এটা তাদের– সামরিক অভীক্ষার ও দূরদর্শিতার ঘাটতি– বুঝায়। সেদিন শত্রু পক্ষের চতুর্মুখী আক্রমণে আমরা সামরিক কায়দায় Withdraw করে পশুরামের মুহুরি নদীর পাড়ে শত্রু পক্ষকের মুখামুখি ডিফেন্সিব অবস্থান গ্রহণ করি। এই যুদ্ধের প্রথম লগ্নে আমরা বিরাট ক্ষয় ক্ষতি এড়াতে সক্ষম হই। পাকিস্তান হানাদার বাহিনী সম্মুখে ট্যাংক আক্রমণ, দুই পাশে ট্যাংক ও পদাতিক বাহিনীর আক্রমণ একযোগে রাতের অন্ধকারে হেলিকপ্টার দিয়ে পিছনে কমান্ডো অবতরণ করে আমাদেরকে প্রায় অবরুদ্ধ করে ফেলেছিল।

ফেনীর শহরের দিকে মুখ করে প্রায় ৩/৪ মাইল দীর্ঘ ডিফেন্স প্রায় দুই মাস স্থায়ী হয়েছিল। শত্রু পক্ষ কালির বাজারের ৮০০/১০০০ গজ দূরে ফেনী শহরের উপকণ্ঠে অবস্থান নিয়েছিল। মে/জুন/জুলাইয়ের মাঝা মাঝি সময় হবে। আমরা আমাদের সামনে ঘন মাইন ফিল্ড (anti tank and anti personal মাইন ছিল) প্রায় ৮০০ গজ ব্যাপী বিস্তৃত ছিল। ভারতীয় সেনা বাহিনী থেকে। On CALL আর্টিলারি ফায়ার Support ছিল। ই.পি আর, মুজাহিদ / পুলিশ / আনসার সশস্ত্র বাহিনী ও গণযোদ্ধাদের সমন্বয়ে গঠিত বাহিনী এই ডিফেন্সে অবস্থানে ছিল। মুন্সিরহাট ডিফেন্সের এই বাহিনী ছিল পরবর্তীতে ঘোষিত ১০ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট এর নিউক্লিয়াস– এই বাহিনীতে তখন প্রায় ১, ২০০ সশস্ত্র বাহিনী সদস্য ও প্রায় ৫০০ ছিল গণযোদ্ধা। আমাদের ডিফেন্সের উপর দিয়ে রেল লাইন ও ফেনী বিলোনিয়া রাস্তা ফেনী শহরে পর্যন্ত সমান্তরালভাবে বিস্তৃত ছিল। রেলওয়ে ব্রিজগুলো– আমরা আগেই ধ্বংস করে– রাস্তায় প্রচুর Anti Tank মাইন পুঁতে ছিলাম। এই দায়িত্বে ছিল ১০ম ইস্ট বেঙ্গলের পাইওনিয়ার প্লাটুনের। মোস্তফা, মোমেন, বাশার, মহম্মদউল্লাহ, বাহার, হাবিবুল্লাহ বাহার, কাজী মনির উদ্দিন মানু এরা সেদিন অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। ডিফেন্সের সামনের কাতারে মুক্তার বাড়ি পুকুর পাড়ে ছিল আমার কমান্ড পোস্ট। আমার এক পার্শ্বে লেঃ টি ইমামুজ্জামান অন্য পার্শ্বে অর্থাৎ ডানে ছিলেন ক্যাপ্টেন শহিদ।

এই দুই মাস সময়ে তারা আমাদের উপর প্রায় নয়টি আক্রমণ পরিছালনা করেছিল। যা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। জুলাই মাসের প্রথমার্ধে একটি পুরো বিগ্রেড। আক্রমণ করে– প্রায় ৫০০০। পদাতিক সৈন্য, ট্যাংক বহর সহ। এই আক্রমণ আমরা সেদিন আমরা প্রতিহত করি। পাকিস্তানের ইস্টার্ন কমান্ড জেনারেল হামিদ এই অভিযান পর্যবেক্ষণ করেন। বিদেশি সংবাদিক পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে এই বলে প্রশ্ন করে ছিলে যে বিলোনিয়ার তোমরা মুক্তি বাহিনীর নিকট পরাজিত এবং বিলোনিয় তাদের দখলে রয়েছে। A.A.K. NIAZI জেঃ নিয়াজি তার বই "THE BE TRAYAL OF EAST PAKISTAN" (PAGE 209) স্বীকার করেছেন এই বলে যে– "A Brigade action which launched at Belonia was repulsed." এটা ছিল প্রথম বিলোনিয়া সম্মুখযুদ্ধে গণযোদ্ধা ও নিউক্লিয়াস অব ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ঐতিহাসিক সামরিক অভিযান। পরে অবশ্য রণ কৌশলগত কারণে এই ডিফেন্স আমরা মুহুরি নদীর পাড়ে প্রতিষ্ঠা করি এবং দ্বিতীয় বিলোনিয়া যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছিল।

সেদিনের সেই সফল উইথড্রয়াল প্রাণ রক্ষা করেছিল প্রায় ৫০০ এর অধিক গণযোদ্ধা ও পুরো একটি ব্যাটেলিয়ন– সর্বমোট প্রায় ১, ৭০০ মুক্তিযোদ্ধার। উইথড্রয়াল একটি সামরিক অভিযান/ অপারেশন। এই রণকৌশল ও আমাদের সফল উইথড্রয়ালে সেদিন আমাদের সহযোগী বিএসএফ এবং ভারতীয় সেনা বাহিনীও প্রশংসা করেছিল। ব্রিগেডিয়ার আনন্দ স্বরূপ আমাদেরকে তাদের আক্রমণের পর পর প্রায় ৬-৩০ মি. হবে উইথড্র করার পরামর্শ দেওয়ার পরও আমরা প্রায় ৬/৭ ঘণ্টা তাদেরকে প্রতিহত করে আসছিলাম। আমার সাথে যারা দুর্ধর্ষ এই আক্রমণ মোকাবেলা করেন তারা হলেন ক্যাপ্টেন গাফফার (বীর উত্তম), ক্যাপ্টেন শহিদুল ইসলাম (বীর প্রতীক), ল্যাফটেন্যান্ট

ইমাম উজ জামান (বীর বিক্রম), ক্যাপ্টেন মুজিবুর রহমান ইউ ও টি সি। এই যুদ্ধের বিস্ত ারিত বিবরণ এই বই এ "রণাঙ্গনের এক প্রান্তের" অধ্যায়ে রয়েছে।

পাকিস্তান সেনাবাহিনী বৃহত্তর নোয়াখালীতে প্রবেশের জন্য চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা থেকে যাত্রা শুরু করে। কুমিল্লা থেকে রেল পথে লাকসাম হয়ে নোয়াখালী থেকে যাত্রা শুরু করে। কুমিল্লা থেকে রেল সড়ক পথে ফেনীতে প্রবেশের জন্য যাত্রা শুরু করে। মুক্তিকামী সাধারণ মানুষ ইতোমধ্যে বিভিন্ন স্থানে আগুন লাগিয়ে সোনাইমুড়ির বগাদিয়া, বেগমগঞ্জ কালাপুল, ফেনী ছাগলনাইয়া সড়কে চাঁদপুর কাঠের ব্রিজ ধ্বংস করে। যে সব রাস্তা দিয়ে পাকিস্তানি সেনারা ফেনী- নোয়াখালীতে প্রবেশের জন্য ব্যবহার করতে পারে বলে মনে করা হয় সেসব স্থানে একের পর এক ব্যারিকেড তৈরি করে মুক্তিকামী ছাত্র-জনতা।

ইতোমধ্যে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ছাত্র-যুবকদের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে মোতায়েন করা হয়। জেলার বিভিন্ন গ্রামগঞ্জ থেকে আসা সাধারণ ছাত্র-জনতা আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ কর্মীরা ছুটিভোগরত ও অবসরপ্রাপ্ত নিয়মিত সৈনিক, ইপিআর, পুলিশ, আনসার সদস্যকে সংগ্রহ করে মুক্তিবাহিনীকে সমৃদ্ধ করা হয়।

এর আগে ৫ এপ্রিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর তিনটি যুদ্ধ বিমান ফেনী শহরের ওপর নির্বিচারে বোমা ও মেশিনগানের গুলি বর্ষণ করে। এই সময়ে ফেনী বাজারের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ফেনী জামে মসজিদ থেকে মুসল্লিগণ নামাজ শেষে বেরিয়ে আসছিলেন। এ অবস্থায় মসজিদ ও মুসল্লিদের লক্ষ্য করে হানাদার বাহিনীর নিক্ষিপ্ত বোমা ও মেশিন গানের গুলিতে বহু মুসল্লি আহত হন। এর মধ্যে ফেনী থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক পথ পত্রিকার সম্পাদক আবদুল অদুদ গুরুতর আহত হন এবং তাঁর একটি পা দেহ থেকে বিছিন্ন হয়ে যায়। শহরের সর্বত্র মেশিনগানের গুলিতে অনেকেই গুলিবিদ্ধ হন। এ ঘটনার পর থেকে ফেনীতে প্রতিরোধ ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়। ফেনীর তৎকালীন সবচাইতে উচ্চ ইমারত ভবন ফেনী আদালত ভবনসহ অন্যান্য কয়েকটি ভবনের ছাদে বালির বস্তা দিয়ে ব্যাংকার তৈরি করে সম্ভাব্য বিমান হামলা প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা হয়।

৫ এপ্রিল রাত থেকে সাধারণ মানুষ ফেনী শহর ছেড়ে গ্রামাঞ্চলে নিরাপদ স্থানে আশ্রয়ের জন্য চলে যেতে থাকে। দিনের বেলায় কিছু লোকজন থাকলেও রাতে ফেনী শহর একটি ভুতুড়ে নগরীতে পরিণত হতো। রাতে ফেনী শহর এর আশপাশের এলাকাতে বাতি জ্বালানো নিষিদ্ধ ছিল। এ সময় জনসাধারণের বাড়িঘর দোকানপাট লুটপাট হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেজন্য খাজা আহম্মেদ, এবিএম তালেব আলী, আবদুল মালেক প্রমুখের পরামর্শে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা ফেনী শহরে সারারাত পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এদের মধ্যে জয়নাল হাজারী, ভিপি জয়নাল, জাফর উল্লাহ, সাংবাদিক তাহের, আওয়ামী লীগ নেতা আবদুর রহমান, তাজিম, মানিক, মোতালেব গংদের ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়।

শহিদদের শ্রদ্ধার স থে স্মরণ রাখতে হবে ও এদের আত্মহুতির ইতিহাস জাতি সংরক্ষণ করতে হবে। এখন ঃ অনেক শহিদ আমাদের অজানা রয়েছে এছাড়াও গণহত্যার অনেক বধ্যভূমি সংরক্ষণের অভাবে অযত্ন ও অবহেলায় পড়ে আছে।

ভূমিকা

আজ মুক্তিযুদ্ধের ২৬ বছরের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে ৭১-এর রণাঙ্গনের স্মৃতিচারণ নিজের কাছে এক বিরাট অপরাধ বলে মনে হচ্ছে। বাংলাদেশ আজ এক মহান বাস্তবতা। এক সংগ্রামের ঐতিহ্য রয়েছে এ দেশের স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রীয় অস্তিত্ব লাভের নেপথ্যে। এদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ এবং শতাব্দীর সাড়া জাগানো বাঙালির দীর্ঘ সংগ্রামের চূড়ান্ত বিজয়লগ্ন সূচিত হয়েছিল ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে। কত বীরের রক্তধারা, কত মায়ের অশ্রু, হাজারো বোনের হাহাকার, শিশুর আর্তনাদ, আর এতিমের ঝাপসা দৃষ্টিতে আচ্ছন্ন হয়ে আছে এই ত্যাগের সংগ্রামী ঐতিহ্য। কিন্তু এই বিশ্ব কাঁপানো মুক্তিযুদ্ধের এমন অনেক কাহিনি, এমন অনেক রণাঙ্গনের স্মৃতি আছে যা এখনো দেশবাসী ও বিশ্ববাসীর কাছে অজানা। বিলম্বে হলেও এই স্মৃতিচারণের মাধ্যমে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি সঠিক ইতিহাস উপহার দেওয়ার এই প্রয়াসে আমি গর্বিত।

যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে আমি ছিলাম বৃহত্তম নোয়াখালী জেলা ও কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম এলাকার অংশ নিয়ে গঠিত সাব সেক্টর কমান্ডার ও দশম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রতিষ্ঠাতা অধিনায়ক। এই সাব সেক্টরে গেরিলা ও সামরিক যুদ্ধের পাশাপাশি বিচ্ছিন্নভাবে জানা অজানা অনেক অভিযান ও মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছিল পাক হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসর রাজাকার আলবদরদের বিরুদ্ধে। সেদিন সেসব সংঘর্ষে জীবন বাজি রেখে বাংলা মায়ের অসংখ্য দামাল ছেলেরা অসীম সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছিলেন এবং তাদের বর্তমানকে উৎসর্গ করেছিলেন আমাদের ভবিষ্যতের জন্য। সেসব বীর শহীদের অনেকের নামই আজ স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে নেই। এঁদের বীরত্বগাঁথা ইতিহাস আমাদের অনেকেরই অজানা।

এই সাব সেক্টরের অনেক সামরিক ও গেরিলা যুদ্ধের মধ্যে বিলানিয়ার যুদ্ধ ছিল একটি অন্যতম স্বীকৃত সামরিক অভিযান। অত্যন্ত গর্বের সাথে বলতে হয়, এই বিলোনিয়া যুদ্ধের রণকৌশল আজ আমাদের বাংলাদেশের সামরিক একাডেমি ও বিদেশের কয়েকটি সামরিক কলেজে অধ্যয়ন করা হয়। এ যুদ্ধের নানান সামরিক কৌশল ও যুদ্ধের গুরুত্ব সম্পর্কে পরে আলোকপাত করব।

পাকিস্তান আর্মি থেকে পলায়ন ও মুক্তিযুদ্ধে যোগদান

১৯৭১ সনের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণের আগ মুহূর্তে আমি ছিলাম পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমি থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত, পাকিস্তান ফ্রান্টিয়ার ফোর্স রেজিমেন্টে চাকরিরত কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে অবস্থানরত পদাতিক বাহিনীর একজন ক্যাপ্টেন পদমর্যাদার অফিসার। আমার ইউনিট ছিল ২৪–এফ. এফ রেজিমেন্ট। কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে ২৬ শে মার্চ রাতে আমার সাথে আরেকজন বাঙালি অফিসারকে নিরস্ত্র করে বন্দী অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয় চট্টগ্রাম। চট্রগ্রাম থেকে আমাকে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে বদলির উদ্দেশ্যে আরো কয়েকজন অফিসারসহ হেলিকপ্টার যোগে পাঠিয়ে দেয়া হয় ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে। হেলিকপ্টারটি ঢাকা পুরাতন বিমান বন্দরে অবতরণের সাথে সাথে পূর্ব পরিকল্পনানুযাটী আমি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সবার অগোচরে আমার হ্যান্ডব্যাগ নিয়ে এয়ারপোর্ট টয়লেটে ঢুকে তাৎক্ষণিকভাবে ইউনিফর্ম খুলে সিভিল পোশাক পরিধান করে ঝটপট টয়লেট থেকে বেরিয়ে এয়ারপোর্টের গেটের বাইরে চলে আসি। তখন এমন একটা ভাব দেখাচ্ছিলাম যে, যদি ধরা পড়ে যাই, তাহলে বলব আমি ক্যান্টনমেন্টে যাওয়ার জন্য আর্মি ট্রান্সপের্টি খুজছি, না পেলে সিভিল টেক্সি অথবা বেবি ট্রেক্সিতে ক্যান্টনমেন্টে চলে যাব– এই উত্তর দেব (যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে)।

আল্লাহর রহমত বলতে হবে, এয়ারপোর্টের বাইরে এসেই একটি বেবিটেক্সি পেয়ে যাই। কাল বিলম্ব না করে বেবির ড্রাইভারকে সোজা ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের দিকে যাওয়ার নির্দেশ দিই। ড্রাইভারও সময় ক্ষেপণ না করে খুব দ্রুতগতিতে ক্যান্টনমেন্টের দিকে রওনা দেয়। মনে মনে এই ভাবি যে, কেউ যদি আমাকে অনুসরণ করে তাহলে বলতে পারব, আমি ক্যান্টনমেন্টে যাচ্ছি। কেউ অনুসরণ করেছিল কিনা জানি না। বেবি টেক্সিটি ক্যান্টনমেন্টের মূল গেটের কাছাকাছি পৌছে যাওয়ার মুহূর্তে বেবি টেক্সিকে মোড় ঘুরিয়ে সোজা এলিফ্যান্ট রোডের দিকে যেতে বলি। ড্রাইভার তাৎক্ষণিক গাড়ি ঘুরিয়ে আমাকে সোজা নিয়ে আসল ২৬২ এলিফ্যান্ট রোডে আমার শ্বশুর বাড়িতে। এখানে পৌছেই আমি টেলিফোনে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের কয়েকজন বাঙালি অফিসারের সাথে আলাপ করি এবং তাদেরকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ জানাই। অফিসারদের মধ্যে অনেকে তাদের সুবিধা অসুবিধার কথা উল্লেখ করে যুদ্ধে অংশগ্রহণে অপারগতার কথা জানান। আর যারা আগ্রহ প্রকাশ করলেন, মনে হলো পালিয়ে যাওয়ার জন্য তাদের পূর্ব পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি ছিল। পাকিস্তান আর্মি থেকে পালিয়ে ২৬২ এলিফ্যান্ট রোড হয়ে অন্যান্য বাঙালি অফিসারসহ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু পর্যন্ত উপরোক্ত ঘটনা প্রবাহগুলো সম্ভবত এপ্রিলের ১-৭ তারিখের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল। যারা ২৬২ নং এলিফ্যান্ট রোডে আমার সাথে যোগ দিলেন

তারা সবাই পদাতিক বাহিনীর ক্যাপ্টেন পদ মর্যাদার অফিসার ছিলেন। তারা হলেন কর্নেল আকবর হোসেন বীর প্রতীক (সাবেক মন্ত্রী), বিগ্রেডিয়ার আমিনুল হক বীর উত্তম (সাবেক ডি জি, এন এস আই) ও ক্যাপ্টেন সালেক বীর উত্তম। এরা ২৬২ নং এলিফ্যান্ট রোডের বাসায় পৌঁছার সাথে সাথে আমার শ্যালক প্রাক্তন সারগোদিয়ান ক্যাডেট অফিসার ওবায়দুল হক সবাইকে লুঙ্গি আর পাঞ্জাবি দিলেন। সবাই তাৎক্ষণিক পরনের বস্ত্র পরিবর্তন করে লুঙ্গি পরিধান করেন, যেন পথিমধ্যে কেউ সন্দেহ না করে।

কর্নের আকবর যাওয়ার আগে আমার শ্যালককে অনুরোধ করে গেলেন, তাঁর পত্মীকে ক্যান্টনমেন্ট থেকে এনে দেশের বাড়িতে অথবা ভারতে নিয়ে আসার জন্য। আকবর হোসেন তার পত্মীকে এভাবে অরক্ষিত অবস্থায় রেখে আমাদের সাথে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের যে দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করলেন তাতে আমরা অভিভূত হলাম এবং আমাদের সাহস ও মনোবল সেদিন আমাদের আবেগ ও অনুভূতির সাথে একাকার হয়ে গেল। পরবর্তীতে ওবায়দুল হক তার পত্নীকে ক্যান্টনমেন্ট থেকে সরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। পরিচয় দিলেন অসীম সাহসিকতার।

সম্ভবত, এপ্রিলের ১–৭ আমরা কয়েকজন পদাতিক অফিসার ঢাকার বাসাবো, ত্রিমোহনী হয়ে রওয়ানা দিলাম কুমিল্লার ভারত সীমান্তের উদ্দেশে। আমরা ২৬২ নং এলিফ্যান্ট রোড ছেড়ে যাওয়ার পর সন্ধ্যার দিকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে অস্ত্র সস্ত্রে সজ্জিত একজন অফিসারের নেতৃত্বে ২টি সামরিক জিপ আমার খোঁজে এলিফ্যান্ট রোডে এসে আমার শ্বশুর মরহুম আব্দুস সাত্তারের বাসা খোঁজা-খুঁজি করে। ইতোমধ্যে পাড়ার সবার মধ্যে জানাজানি হয়ে গেল যে, আমার খোঁজে আমার শ্বশুর আব্দুর সাত্তারের বাসা খুঁজতে এসেছে পাক হানাদার বাহিনী। পাড়ার মধ্যে না জানি সবাই আতংকিত ছিল যে জাফর ইমামকে না পেয়ে তারা আজ পাড়ার মধ্যে কী অঘটন না ঘটায়। সেই মুহূর্তে পাড়াতে একটা থমথমে ভাব বিরাজ করছিল। পাক বাহিনী যখন আমাকে খোঁজাখোঁজি করছিল ঠিক সেই সসময় আমার স্ত্রী, শ্বশুর-শাশুড়ি, শ্যালক-শ্যালিকা সবাই বাসায় উপস্থিত ছিল। তখন তারা আমার আর্মির ইউনিফর্ম পোড়াচ্ছিল। যেই মুহূর্তে তারা আমার ইউনিফর্ম পোড়াচ্ছিল সেই মুহূর্তে যদি পাকিস্তান আর্মি বাসায় সরাসরি ঢুকত তাহলে হয়তো তাদের কাউকেও আর জীবিত পাওয়া যেত না। সৃষ্টি হতো এক বেদনা বিধুর করুণ ইতিহাস।

আল্লাহর কি রহমত, আমাদের পরের গলিতে আব্দুস সাত্তার নামে আরেকজন থাকতেন। কে বা কারা, আমাদেরকে সহযোগিতা করার উদ্দেশ্যে কিনা জানি না, ঐ আব্দুস সাত্তারের বাসা দেখিয়ে দেয়। তারা জিপ নিয়ে সরাসরি ঐ বাসায় চলে

যায়। এ সময়ের মধ্যে আমার শ্যালক মুক্তিযোদ্ধা ওবায়দুল হক আমার পত্নী, শ্বশুর, শাশুড়ি ও আত্মীয় স্বজন সবাই বাসা ছেড়ে পালিয়ে যায়। ঐ আব্দুস সাত্তারের বাসায় গিয়ে আমার খোঁজাখুঁজি করলে আব্দুস সাত্তার উত্তর দেয় যে, আমি জাফর ইমামকে জানিনা, এমনকি জাফর ইমামের বাসাও চিনিনা। সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করে তাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল না পেয়ে তারা আবার এলিফ্যান্ট রোড হতে ফেরত চলে যায়। সেদিনের পাড়ার জনগণের সহযোগিতা ও সাহসী মন মানসিকতার প্রশংসা করতে হয়।

আমরা যাত্রা শুরু করলাম বাসাবো ত্রিমোহনী থেকে কুমিল্লার ভারতীয় সীমান্তের উদ্দেশে। বাসাবো ত্রিমোহনী হয়ে কসবা যেতে আমাদের প্রায় তিন দিন সময় লেগেছিল। কারণ আমরা খুব সতর্কতার সাথে পথ অতিক্রম করতাম। অবস্থা বুঝে কখনও দিনে কখনও বা রাতে একের পর এক গ্রাম অতিক্রম করতাম। যেসব গ্রামগুলোর মধ্য দিয়ে আমরা যাচ্ছিলাম প্রায় সময়ে সেসব গ্রামের মসজিদ ছিল আমাদের নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্র। কখনো কখনো আবার রাত্রে বিশ্বস্ত কোনো বাড়িতে অবস্থান নিতাম। যেহেতু আমরা চারজন তৎকালীন পাক আর্মির পদাতিক বাহিনীর ক্যাপ্টেন পদ-মর্যাদার অফিসার ছিলাম, স্বাভাবিক কারণেই পাক বাহিনীর সীমান্ত রক্ষী বাহিনী ও তাদের দোসররা সমস্ত সীমান্ত এলাকায় আমাদেরকে ধরার জন্য একটি তৎপরতা ও সতর্কতা অবলম্বন করছিল বলে আমাদের ধারণা। তাই পুরো পরিস্থিতি বুঝে অতি সাবধানে গোপনীয়তা রক্ষা করে পথ চলতাম।

সম্ভবত আমরা কুমিল্লার বুড়িচং এলাকা দিয়ে এগুচ্ছিলাম। সকাল ৮টা কি ৮.৩০টা হবে। আমরা বুড়িচং এলাকার একটি গ্রামের প্রাইমারি স্কুলের পাশ দিয়ে সীমান্তের দিকে যাচ্ছিলাম। সন্দেহ প্রবণ হয়ে গ্রামের কিছু লোক হঠাৎ আমাদের গতি রোধ করে বিভিন্ন ধরনের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। আমরা তখন সন্দেহ করেছিলাম যে এরা হয়তো পাক বাহিনীর দোসর হবে এবং তাদের কাছে আমাদের সম্পর্কে কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য আছে। এদের মধ্য থেকে মুরুব্বি শ্রেণির একজনকে আমি ও কর্নেল আকবর হোসেন একা ডেকে কিছুটা দূরে নিয়ে গোপনীয়ভাবে আমাদের পরিচয় ও অবস্থানের কথা বললাম। তবে সামরিক বাহিনীর অফিসার পরিচয় না দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের কথা ব্যক্ত করছিলাম এবং তাকে আমরা মোটামুটি বুঝাতে সক্ষম হই। তখন কিন্তু আমাদের বাকি দুজনের সাথে বট গাছের নিচে গ্রামের জনগণের মধ্যে তুমুল তর্ক বিতর্ক চলছিল। ক্যাপ্টেন সালেক ও ক্যাপ্টেন আমিনুল হক দুজনই ইংলিশ মিডিয়ামের ছাত্র যার কারণে এবং জনগণের সম্মুখে দুইজনের মধ্যে নিজেরা ইংরেজিতে কথাবার্তা বলায় জনগণ তাদেরকে অবাঙালি হিসেবে সন্দেহ করে এবং আটক রেখে

নাজেহাল করার পরিস্থিতি প্রায় সৃষ্টি করে ফেলছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে আমাদের ঐ মুরব্বি চিৎকার করে সবার উদ্দেশে বললেন, উনাদেরকে যেতে দাও এতে করে সবাই ক্ষান্ত হলো।

আমরা আবার যাত্রা শুরু করলাম। প্রায় ২/৩ শো গজ সামনে যাওয়ার পর পিছন থেকে হঠাৎ আওয়াজ আসল, দাঁড়ান–দাঁড়ান–দাঁড়ান। আমরা থমকে দাঁড়িয়ে পিছনের দিকে তাকালাম। প্রায় একশোর অধিক অর্ধবস্ত্র স্কুলের ছেলে পেলে হইচই করে আমাদের দিকে দৌড়ে আসছে। ছেলেরা এসে বলল যে হেড মাস্টার স্যার আপনাদেরকে ডেকেছেন। আমরা ছেলেদের কথায় কর্ণপাত না করে চলে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের বর্তমান অবস্থানের কথা চিন্তা করে আমি ও কর্নেল আকবর হোসেন হেড মাস্টারের সাথে কথা বলার জন্য আবার পিছনের দিকে অগ্রসর হতেই দেখি মুরব্বি শ্রেণির একজন লোক আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। আমরা ধারণা করেছিলাম যে, ঐ মুরব্বি লোকটি হয়তো হেড মাস্টার হবে। আমাদের ধারণা সঠিক হলো। তখন আমরা হেড মাস্টারকে বললাম যে, আমরা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য ভারতের সীমান্তের দিকে যাচ্ছি। এতে হেড মাস্টার সাহেব বললেন, আমি শুনে খুশি হয়েছি। "এখন আর আপনাদের কোনো ভয় নেই। আমাদের কাছ থেকে সব ধরনের সহযোগিতা পাবেন।" কিন্তু আপনারা যে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছেন এবং আপনারা পাক বাহিনীর এজেন্ট নন তারই বা প্রমাণ কী? আমরা তো স্বাধীনতার পক্ষের লোক। হেড মাস্টারের কথা শুনে আমরা আশ্বস্ত হলাম যে, এখন আর বিপদদের কোনো আশঙ্কা নেই। আমরা খুশি মনে আত্মবিশ্বাস নিয়ে তার কাছে আমাদের আসল পরিচয় ব্যক্ত করলাম। হেড মাস্টার আমাদের পরিচয় পেয়ে অভিভূত হয়ে আমাদেরকে জড়িয়ে ধরলেন। সেই মুহূর্তটা ছিল একটি অভূত আবেগের দৃশ্য। হেড মাস্টার আর সময় নষ্ট না করে ছেলেদেরকে স্কুলে যেতে নির্দেশ দিলেন। ছেলেরা হইচই করে আবার স্কুল রুমের দিকে ধাবিত হল। ছেলেদের ইহ্‌ইচই এর আওয়াজের মধ্যে আমরা সেদিন বিজয়ের গন্ধ পেয়েছিলাম। হেডমাস্টার আমাদেরকে "জয় বাংলা" বলে বিদায় দিলেন। আমরা সবাই অশ্রুসজল নয়নে আবেগ ভরা মন, আকাশ সম আশা ও দু'চোখ ভরা স্বপ্ন নিয়ে আবার সম্মুখের দিকে যাত্রা শুরু করলাম। চলার পথে ছোটখাটো এ ধরনের আরো কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটেছিল। সম্ভবত, পরের দিন '৭১ এর এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহ অথবা তৃতীয় সপ্তাহের প্রথম দিকে (সঠিক তারিখ মনে নেই) আমরা কুমিল্লার কসবা সীমান্ত অতিক্রম করি। সেখান থেকে আমরা ভারতের মেলা ঘরে ২নং সেক্টর কমান্ডার খালেদ মোশাররফের সাথে সাক্ষাৎ করি। সেদিন সেখানে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক কর্নেল এম.এ.জি. ওসমানীও উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমাদের সবার সাথে আলিঙ্গন করলেন। বললেন

সাবাস। এবার আমরা ২নং সেক্টরকে সুসংহত করতে পারব বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করলেন।

আমাকে প্রথম অবস্থায় পাঠালেন বিলোনিয়া সেক্টরে। যেদিন আমি বিলোনিয়াতে আসি ঐ দিন আমার সাথে ছিলেন কর্নেল আকবর ও ক্যাপ্টেন আমিনুল হক। উদ্দেশ্য ছিল, আমাকে বিলোনিয়া সেক্টরে রেখে তারা চলে যাবেন অন্য অঞ্চলে। তাই হলো। তারা কয়েকদিন আমার সাথে অবস্থান করার পর চলে যান ২নং সেক্টরের অন্য রণাঙ্গনের দায়িত্বে।

আমি বিলোনিয়াতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিগ্রেডিয়ার সিন্ধু ও বিলোনিয়া সেক্টরের বি.এস.এফ কমান্ডার মেজর প্রধানের সাথে সাক্ষাৎ করি এবং ঐ অঞ্চলের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সামরিক অবস্থান জেনে নিই। আমি যেহেতু পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পদাতিক বাহিনীর অফিসার ছিলাম ঐ কারণে ঐ সেক্টরে যুদ্ধ পরিচালনায় মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সুসংগঠিত করে পাক হানাদার বাহিনীকে মোকাবেলা করার ব্যাপারে তাদের মধ্যে একটা আত্মবিশ্বাস ও উৎসাহ লক্ষ করলাম। আমিও আমার দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করলাম এ ব্যাপারে।

সম্ভবত এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহ হবে, আমি মেজর প্রধানকে সাথে নিয়ে ঐ অঞ্চলে বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সুসংগঠিত করার কাজ শুরু করলাম। ৩-৪ দিনের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধা (ছাত্র, শ্রমিক, জনতা) ও প্রাক্তন ই.পি. আর, বাঙালি সৈনিক, পুলিশ এদেরকে একাতাবদ্ধ করে মোটামুটি ২নং সাব সেক্টর গঠন করে পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে পরিকল্পিতভাবে সামরিক অভিযান পরিচালনার প্রস্তুতি গ্রহণ করলাম। ভারত সীমান্তের রাজনগর ও বড় কাসারীতে পর্যায়ক্রমে স্থাপন করলাম আমাদের ট্রেনিং ক্যাম্প। এপ্রিলের শেষ সপ্তাহ হবে। আমরা শুরু করলাম পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্ন সামরিক ও গেরিলা অভিযান। ফেনীর দিকে মুখ করে বিখ্যাত মুন্সিরহাট ডিফেন্স তৈরি করে পজিশন গ্রহণ করি। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল মুন্সিরহাট ডিফেন্সকে শক্তিশালী মুক্তিবাহিনীর ঘাঁটি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে পরবর্তীতে ফেনী মুক্ত করা। এর পাশাপাশি বৃহত্তম নোয়াখালীতে সুবেদার লুৎফর রহমান, শ্রমিক নেতা রুহুল আমীন ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সহযোগিতায় সংগঠিত করতে থাকলাম বৃহত্তম নোয়াখালীর বিভিন্ন থানার মুক্তিযোদ্ধাদেরকে। তারা নিজ অঞ্চলে থেকে নিজস্ব এলাকাতে যুদ্ধ পরিচালনা করবে। কারণ ঐসব অঞ্চলের বিভিন্ন মুক্তিযোদ্ধা গেরিলা গ্রুপ ও মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারসহ প্রত্যেকটি মুক্তিযোদ্ধার সাথে আমাদের দৈনন্দিন যোগাযোগ সম্ভব ছিল না। তাই আমরা তাদের কমান্ডার ও ঐসব অঞ্চলের তৎকালীন আওয়ামী লীগ এম.পি ও নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে সামরিক ও গেরিলা যুদ্ধের রণকৌশল ও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করতাম। এসব

নেতৃবৃন্দের মধ্যে জনাব নূরুল হক, জনাব হানিফ, জনাব মুহম্মদ আলী, তালেব আলী, কচি ভাই, ছাত্রনেতা বেলায়েত, রশিদ এম.পি সফদার, এম,পি, কালু ভাই, এম.পি প্রমুখ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। সেদিন বাংলাদেশের ভিতরে এই গ্রুপগুলোকে এবং মুক্তিযোদ্ধাদেরকে আশ্রয়, খাদ্য, বস্ত্র ও বিভিন্নভাবে পাক হানাদার বাহিনীর খবরাখবর দিয়ে সাহায্য সহযোগিতা করেছিল তাই তাদেরকে আমরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে সহযোগী মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে অবশ্যই স্বীকৃতি দেব। মুক্তিযুদ্ধের শেষ লগ্নে যদিও এদের তৎপরতা খুব সীমিত আকারে ছিল কিন্তু যুদ্ধ শেষে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বাস্তাবায়নে এরা ছিল সদা সজাগ ও তৎপর। যুদ্ধ শেষে মুক্তিযুদ্ধের মূল চালিকা শক্তি সেক্টরগুলো ও কে, জেড, এস, ফোর্সগুলোর রেগুলার বাহিনী ও বেঙ্গল রেজিমেন্টগুলো (তৎকালীন ইপিআর পুলিশ ও অন্যান্যদের সমন্বয়ে গঠিত) ফিরে গেল ক্যান্টনমেন্টে। ১৬ই ডিসেম্বর পরবর্তীতে এলাকাভিত্তিক গণবাহিনী/মুজিব বাহিনীর নেতৃত্বে গঠিত হতে থাকল মুক্তিযোদ্ধা সংসদ/মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন সংগঠন। যারা স্বাধীন বাংলা সরকারের বিভিন্ন সেক্টর ও কে, জেড, এস, ফোর্স এর অধীনে বেঙ্গল রেজিমেন্টগুলোর নেতৃত্বে মূল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল তারাও ঐসব আঞ্চলিক মুক্তিযোদ্ধা সংগঠনগুলোতে নাম লেখাতে বাধ্য হলো। অবশ্য অনেকে আজও এই সব সংসদ ও মুক্তিযোদ্ধাদের নামে গঠিত বিভিন্ন সংগঠনের সাথে জড়িত নেই। এছাড়া সংসদ ও এইসব সংগঠন রাজনৈতিক প্রভাব মুক্ত নয়। তাই বাংলাদেশের সর্বস্ত রের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিনিধিত্ব এরা দাবি করতে পারে না।

১৬ই ডিসেম্বরের পর পর সেক্টরের নিয়মিত বাহিনী ও কে, জেড,এস ফোর্সগুলো সেনানিবাসে ফিরে যাবার পর এই সেক্টর ও কে, জেড, এস ফোর্সগুলোর কোনো আনুষ্ঠানিক সহযোগিতা ছাড়াই মুক্তিযোদ্ধাদেরকে আঞ্চলিকভাবে চিহ্নিত করে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রনয়নের ব্যর্থ প্রয়াস গ্রহণ করা হয়। এবং এই ভুল প্রক্রিয়া আজও বিদ্যমান বিধায় সঠিক পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন করা সম্ভব হয়নি। এই রাজনৈতিক প্রভাবান্বিত প্রক্রিয়ার কারণে আজও অনেক থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের সহযোগী মুক্তিযোদ্ধা হয়ে গেলেন প্রথম সারির মুক্তিযোদ্ধা। অনেক ক্ষেত্রে যুদ্ধকালীন সময়ে যুদ্ধ করার বয়সই হয়তো অনেকের ছিল না, তারাও সেজে বসল মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে। স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন সেক্টরকে ঠিক রেখে এদের সহযোগিতা নিয়ে আঞ্চলিকভাবে প্রথম থেকে যদি মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রণয়ন করা হতো তাহলে যুদ্ধের ২৫ বছর পর আমরা সঠিক ও প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রণয়নে সংকটে পড়তাম না। স্বাধীনতার পর পর সর্বস্তরের মুক্তিযোদ্ধা, সহযোগী মুক্তিযোদ্ধা এক কথায় স্বাধীনতা বিরোধীদেরকে বাদ দিয়ে স্বাধীনতার স্বপক্ষের শক্তিগুলোকে নিয়ে

মুক্তিযোদ্ধের চেতানায় উদ্বুদ্ধ একটি জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির প্রয়াস গ্রহণ করা হয়। শুরুতে এই প্রয়াসের বিপক্ষে কেউ ছিল না, কারণ সর্বস্তরের মুক্তিযোদ্ধারা তখন বঙ্গবন্ধুর আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিল। কিন্তু এ প্রয়াস সফল হলো না। অতি অল্প সময়ে দেখা দিল আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দল। পার্টির ভিতরে লুকিয়ে থাকা ষড়যন্ত্রকারীরা বঙ্গবন্ধুর জীবদ্দশায় ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে জয়ী হওয়ার জন্য ষড়যন্ত্রের নীল নকশা বাস্তবায়নে তৎপর হয়ে অপেক্ষায় ছিল সুযোগের। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত একটি শিশু রাষ্ট্রের ছিল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক নানান সমস্যা। সেগুলো গুছিয়ে আনতে প্রচুর সময়ের প্রয়োজন ছিল। সেই প্রয়োজনীয় সময় উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ের কারণে তৎকালীন সরকারের ব্যর্থতার বিরুদ্ধে আওয়াজ ওঠে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে যে সরকারের ব্যর্থতা ছিল না তা নয় অর্থনৈতিক ও আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি সে সময়ে ছিল লক্ষণীয়। কিন্তু সার্বিক মূল্যায়নে দেখা যাবে যে স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৩/৪ বছরের মধ্যে সব সমস্যা সমাধান করে অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন ছিল একটি কঠিন চ্যালেঞ্জের ব্যাপার। আমি মনে করি, সফল বা ব্যর্থ হয়েছে এ মূল্যায়নের জন্য যুদ্ধ বিধ্বস্ত একটি দেশের জন্য সরকারের যে সময়ের প্রয়োজন ছিল সেই সময় তৎকালীন সরকার পায়নি। সব মিলিয়ে তৎকালীন সময়ে বিপর্যস্ত অর্থনীতি, রাজনৈতিক অস্থিরতা, মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্তি, ষড়যন্ত্রকারীদের নীল নকশা বাস্তবায়নে তৎপরতা এবং এসবের ফলশ্রুতিতে আমরা দেখলাম জাসদের আত্মপ্রকাশ এবং তাদের বিপ্লবী ভূমিকা, ১৫ আগস্ট '৭৫ বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা, মুশতাকের ক্ষমতা দখলের হীন ষড়যন্ত্র, সেনাবাহিনীর ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে অসংখ্য অভ্যুত্থান এবং পাল্টা অভ্যুত্থান। যুদ্ধ যদি দীর্ঘস্থায়ী হতো সেক্ষেত্রে যুদ্ধকালীন সময়ের মধ্যেই স্বাধীন বাংলা সরকারের নিয়ন্ত্রিত/স্বীকৃত বিভিন্ন সেক্টর, কে, জেড, এস ফোর্স ও বিভিন্ন বাহিনী যুদ্ধ পরিচালনার পাশাপাশি স্বাধীনতা উত্তর ক্ষমতার অংশীদারিত্বের প্রশ্নে উচ্চাবিলাসী অভিপ্রায় নিয়ে হয়তো আঁতাতের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতো। যার বহিঃপ্রকাশ ঘটত স্বাধীনতার পরবর্তী মুহূর্তে। এতে দেশে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ের কারণে দেশের পরিস্থিতি অনেকাংশে সাময়িকভাবে আফগানিস্তানের মতো হয়তো রূপ ধারণ করত। তবে এই পরিস্থিতি কতদিন চলত এবং সমাধানসহ সবকিছু নির্ভর করত বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের উপর। যদি বঙ্গবন্ধুর প্রত্যাবর্তন বিলম্বিত হতো এবং জটিলতা দেখা দিত তাহলে ষড়যন্ত্রের গভীরতা আরো বৃদ্ধি পেত। আর যদি বঙ্গবন্ধুর প্রত্যাবর্তন যেভাবে ১৬ই ডিসেম্বরের পর স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ত্বরান্বিত হয়েছিল সে অবস্থায় দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ সমাপ্তির পর উপরে উল্লেখিত ভয়াবহ পরিস্থিতি যদি সাময়িকভাবে সৃষ্টিও হতো তাহলেও বঙ্গবন্ধুর প্রত্যার্তনের ঘোষণার মাধ্যমে দেশের বৃহত্তম

জনগোষ্ঠী অর্থাৎ স্বাধীনতার স্বপক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ তাঁর নেতৃত্বের প্রতি একতাবদ্ধ হতো এবং বাকি অংশ বিদ্রোহী গ্রুপ হিসেবে চিহ্নিত হতো।

এ অবস্থায়ও দেশের সার্বিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন হতো। এই বাস্তব উপলব্ধির কারণে মুজিব বাহিনী সুদূর প্রসারী রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে সংগঠিত হয়েছিল। যুদ্ধ যেহেতু দীর্ঘস্থায়ী হয়নি সেহেতু অন্য কোনো শক্তি সাময়িকভাবে ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেনি এবং স্বাধীনতা পরবর্তী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের প্রশ্নে কোনো প্রতিপক্ষ না থাকার কারণে যুদ্ধকালীন সময়ে যে মূল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে মুজিব বাহিনী সংগঠিত হয়েছিল যুদ্ধ পরবর্তীতে তাদের সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সহজ হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে গঠিত হলো স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার এবং এই নেতৃত্বের প্রতি সর্বস্তরের স্বাধীনতার স্বপক্ষের শক্তিগুলো, এক কথায় পুরো দেশ একতাবদ্ধ ছিল। এই রাজনৈতিক নেতৃত্বের যদিও কোনো প্রতিপক্ষ ছিল না, কিন্তু এই অবস্থা ও পরিস্থিতি বেশিদিন স্থায়ী হলো না। পরবর্তীতে যত ষড়যন্ত্র, ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপের আবির্ভাব ঘটল, সব কিন্তু এই স্বাধীনতার পক্ষের শক্তির মধ্যে থেকেই সংঘটিত হয়েছিল। যেমন মুজিব বাহিনী থেকে গণবাহিনী ও জাসদের আত্মপ্রকাশ এবং আওয়ামী লীগের ভিতরে অভ্যন্তরীণ কন্দোল, এমনকি সেনাবাহিনীতে মুক্তিযোদ্ধাদের ১টি অংশের মধ্যে রক্ষীবাহিনী সৃষ্টি ও সঠিক মূল্যায়নের অভাবের কারণে অনেকটা চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছিল। সাময়িক মূল্যায়নে দেখা যাবে যে স্বাধীনতা পরবর্তী যতগুলো অঘটন ও অভ্যুত্থান সংগঠিত হয়েছিল সবগুলো ঘটনা প্রবাহের নায়ক ও অংশগ্রহণকারীরা মুক্তিযোদ্ধা এবং আরো লক্ষণীয় এরা সবাই বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের প্রতি প্রাথমিক পর্যায়ে সম্পূর্ণ আস্তাশীল ও অনুগত ছিল। তারপরেও বলব, এদের মধ্যে অনেকে যুদ্ধকালীন সময়ে এবং পরে ক্ষমতা দখলের গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, শুধু অপেক্ষায় ছিল সময়ের ও সুযোগের।

স্বাধীনতা–পরবর্তী মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপ, যত অভ্যুত্থান, পাল্টা অভ্যুত্থান হয়েছে এগুলোর মধ্যে রাজাকার, আলবদর অথবা স্বাধীনতা বিরোধীদের কোনো অংশগ্রহণ বা প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ সম্পৃক্ততা বা চক্রান্ত ছিল না। তৎকালীন দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক যত খারাপ অবস্থায় থাকুন না কেন মূলত স্বাধীনতা স্বপক্ষের শক্তিগুলোর মধ্যে অনৈক্য, অভ্যন্তরীণ কোন্দল সর্বোপরি সামরিক বাহিনীর ভিতরে ও বাইরে একটি অংশের ক্ষমতা দখলের লিপ্সার ষড়যন্ত্র সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছিল মুশতাক গংদের। তাদের ক্ষমতা দখলে হীন চক্রান্তের নির্মম শিকার হয়েছিল বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পুরো পরিবার। রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে এই বাস্তব ও সঠিক মূল্যায়ন সময়ের ব্যাপার।

যুদ্ধ চলাকালীন বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে এবং পরে বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্র পরিচালনার সময়ে তাঁর পরামর্শ দাতাদের অনেকের অনেকক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত ও পরামর্শ সঠিক ছিল না। এদের মধ্যে অনেকে আবার হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে এমন কিছু সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করেছিলেন যাতে বঙ্গবন্ধু বিতর্কিত হয়ে উঠেন এবং এতে করে বিভিন্ন মহলে হিংসা ও বিদ্বেষের বীজ রোপণ হয়। স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগের একটি অংশ তাঁকে দলীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে এবং এরাই পরবর্তীতে কেউ দল ছেড়ে চলে যায়, আর বাকিরা ভিতর থেকে ষড়যন্ত্রের ফাঁদ রচনা করে। স্বাধীনতা–উত্তর ঘটনা প্রবাহে এদের ভূমিকা কারো অজানা নয়। বঙ্গবন্ধুর হত্যার পরে আওয়ামী লীগের এই নেতা-কর্মীদের ভূমিকা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠে। আওয়ামী লীগের একটা অংশের ক্ষমতার দখল/অংশীদারিত্ব এবং আরো পরবর্তীতে পূর্বে সৃষ্ট অভ্যন্তরীণ কোন্দলের ফলে অনেক নতুন নতুন ব্যক্তির নামে আওয়ামী লীগের আবির্ভাব। বঙ্গবন্ধুর হত্যার নৈপথ্যে জাসদ গণবাহিনীসহ শেখ সাহেবের জীবদ্দশায় এদের চক্রান্ত ও অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও কর্মকাণ্ড পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে বঙ্গবন্ধু হত্যা ষড়যন্ত্রের পরিস্থিতি ও পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক শক্তি হিসেবে যোগান দিয়েছিল।

মুজিব বাহিনী গঠন সম্পর্কে আরেকটি মূল্যায়নে দেখা যাবে– যুদ্ধ যদি দীর্ঘস্থায়ী হতো, তাহলে মুজিব বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর মধ্যে সমন্বয় ও ঐক্য রক্ষা করা এক দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত। ৯ মাস যুদ্ধকালীন সময়ে এবং পরবর্তীতে মুক্তিযোদ্ধা ও মুজিববাহিনীর মধ্যে কোনো বড় ধরনের ভুল বুঝাবুঝি বা সমস্যা সৃষ্টি হয়নি। যেহেতু অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে যুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হয়েছিল। সীমিত আকারে গেরিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণের পাশাপাশি মুজিব বাহিনীর উদ্দেশ্য ছিল প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রুপে বাংলাদেশের ভিতরে বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থান করে নিজ নিজ অঞ্চলে রাজনৈতিক নেতৃত্ব গ্রহণ করা এবং আঞ্চলিকভাবে নিজেদের রাজনৈতিক অবস্থান সুদৃঢ় করা যেন ঐসব অঞ্চলে স্বাধীনতা বিরোধীদের আধিপত্য বিস্তার না ঘটে। মূল লক্ষ্য ছিল, যুদ্ধকালীন সময়ে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে যুদ্ধের মূল চালিকা শক্তি সেক্টরগুলো ও কে, জেড, এস ফোর্সগুলোকে যুদ্ধে সম্ভাব্য সহযোগিতাকরত স্বাধীন বাংলা সরকারের অধীনস্ত এই রেগুলার সেক্টর ফোর্সগুলোর উপর নজর রাখা যেন এই ফোর্সগুলো রাজনৈতিকভাবে উচ্চাভিলাষী হয়ে না উঠে এবং সর্বশেষ মূল দায়িত্ব ছিল যুদ্ধশেষে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের প্রতিপক্ষ হিসেবে কোনো পক্ষ যেন আত্মপ্রকাশ না করে। আমি আগেও বলেছি, তাদের এই ভূমিকা বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের ব্যাপারে সেক্টরগুলো ও কে, জেড, এস ফোর্সগুলোর অধীনস্ত মুক্তিযোদ্ধাদের

কোনো দ্বিমত ছিল না বরং তারা যুদ্ধের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। কারণ সেক্টরগুলো এবং কে, জেড, এস ফোর্স সবাই কিন্তু বঙ্গবন্ধুর আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিল। পুরো যুদ্ধই বঙ্গবন্ধুর নামের উপরে চলছিল। তখন সবার কাছে বঙ্গবন্ধু ছিল বিতর্কের উর্ধ্বে। কিন্তু যুদ্ধ যদি দীর্ঘস্থায়ী হতো, তাহলে মুজিব বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর মধ্যে আধিপত্য ও ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে সময়ের ব্যবধানে গিয়ে সমঝোতা ও ঐক্যের ফাটল দেখা দিত এবং অনেক আঞ্চলিক গ্রুপের আর্বিভাব যুদ্ধ চলাকালীন বাহ্যিকভাবে না ঘটলেও ভিন্ন ভিন্ন মতের গ্রুপের অস্তিত্ব বিকাশের প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকত। এদের মধ্যে বহির্বিশ্বের অন্যান্য দেশের প্রভাব বিস্তারেরও যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল যার বহিঃপ্রকাশ স্বাধীনতার পরে ভয়াবহ হতে পারত।

মুজিব বাহিনী গঠন নিয়ে বিতর্ক না করে বলব, মুজিব বাহিনীর সাংগঠনিক নেতৃত্বে যারা ছিলেন তাদের সাথে স্বাধীন বাংলা সরকারের অধীনে সেক্টরগুলো ও কে, জেড, এস ফোর্সগুলোর নেতৃত্বে যারা ছিলেন, এই দুইপক্ষের নেতৃত্বদানকারীদের মধ্যে আনুষ্ঠানিক সমঝোতা বা সমন্বয় থাকা বাঞ্ছনীয় ছিল। এটা সম্ভব হতো এজন্য যে পুরো যুদ্ধই পরিচালিত হচ্ছিল স্বাধীন বাংলা সরকারের নির্দেশিত কাঠামোর মধ্যে। জেনারেল এম. এ. জি. ওসমানী তৎকালীন আওয়ামী লীগের এম. পি ছিলেন এবং ছিলেন যুদ্ধের সর্বাধিনায়ক। যুদ্ধকালীন সমন্বয় ও সমঝোতার অভাবের কারণে ছোটখাটো বিচ্ছিন্ন ভুল বুঝাবুঝি দু'পক্ষের মধ্যে হয়েছিল। যেহেতু পুরো যুদ্ধ স্বাধীন বাংলা সরকারের অধীনে হচ্ছিল সেহেতু মুক্তিবাহিনী ও মুজিব বাহিনী এক করে পৃথক পৃথক নেতৃত্ব কাঠামো সৃষ্টি করে অথবা এমনকি একক নেতৃত্বের কাঠামোর মাধ্যমে উভয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে যুদ্ধ পরিচালনা ও সুদূর প্রসারী রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বাস্তাবায়ন দু'টিই সম্ভব ছিল। পুরো মুক্তিযুদ্ধের কাঠামোকে স্বাধীনতা পক্ষের একক রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কাঠামোগত পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন তখন সম্ভব ছিল স্বাধীন বাংলা সরকারের পক্ষে। এই সমন্বয় সাধন নিয়ে সবার মধ্যে যুদ্ধকালীন সময়েও যেমন ঘাটতি ছিল যুদ্ধোত্তরও এই ঘাটতি পূরণে কোনো বাস্তব প্রয়াস গ্রহণ করা হয়নি। এই প্রশ্নে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে স্বাধীন বাংলা সরকারের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মত ছিল এবং পরে অনেক ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর আশপাশের অনেকে বঙ্গবন্ধুকে এর আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে অন্ধকারে রেখেছিলেন। স্বাধীনতার স্বপক্ষের সবাইকে এক পতাকাতলে সম্মিলিত করার বঙ্গবন্ধুর এই প্রয়াসকে দলের অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা ষড়যন্ত্রকারীরা সফল হতে দেয়নি। যুদ্ধের আগে এবং যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে যারা রাজনীতির নেতৃত্ব দিয়েছিল, যারা কবিতা ও বিভিন্ন লেখনীর মাধ্যমে জনগণকে স্বাধীনতার দৃপ্ত মন্ত্রে

উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, যারা গান গেয়ে স্বাধীনতার প্রেরণাকে উজ্জীবিত রেখেছিলেন, আর সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, কুটনীতিবিদ যারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে একনিষ্ঠ অবদান রেখেছিলেন, এছাড়া রণাঙ্গনে বাংলার দামাল ছেলেরা যারা জীবন বাজি রেখে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং দেশের ভিতরে বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর মধ্যে যারা মুক্তিযোদ্ধাদেরকে আশ্রয়, প্রশ্রয়, খাদ্য, বস্ত্র দিয়ে সহযোগিতা করেছিল, এমনকি যুদ্ধ চলাকালীন যেসব মা ও ভাই-বোন সেদিন নিভৃতে দু'হাত তুলে আল্লাহর দরবারে মুক্তিযোদ্ধাদের ও স্বাধীনতার জন্য প্রার্থনা করেছিল সবাই সেদিন স্বাধীনতার প্রশ্নে দলমত নির্বিশেষে ঐকমত্যের ভিত্তিতে একতাবদ্ধ ছিল। এক কথায় স্বাধীনতা বিরোধীদেরকে বাদ দিলে দেখা যাবে অবশিষ্ট বৃহত্তম জনগোষ্ঠী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে স্বাধীনতার স্বপক্ষের শক্তি।

এই উল্লেখিত শক্তিগুলোকে রাষ্ট্র পরিচালনায় ঐকমত্যের ভিত্তিতে সম্পৃক্ত রাখার কোনো বাস্তবমুখী এবং সবার কাছে গ্রহণযোগ্য পরিকল্পনা ছিল না। পাশাপাশি আওয়ামী লীগের ভিতরে ও বাইরে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও কোন্দল বৃদ্ধি পেতে থাকে। অথচ এর বিপরীত মূল্যায়নে দেখা যাবে, ঐকমত্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনায় সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে গণতান্ত্রিক পরিবেশে সমুন্নত রেখে সবাইকে এক রাখার প্রয়াস সময়মতো গ্রহণ করলে হয়তো পরবর্তীতে রাজনৈতিক অস্থিরতা অনেকটা এড়ানো সম্ভব হতো। এতে করে ষড়যন্ত্রের মাত্রা অনেকাংশে হ্রাস পেত এবং পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ হয়তো অন্য ধারায় প্রবাহিত হতো।

১৫ই আগস্ট : আমাদের জাতীয় জীবনের একটি বেদনাত্মক দিন

১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুর সপরিবারে হত্যার সময়কালে আমি সেনাবাহিনীতে রংপুর সেনানিবাসে ১৫তম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের দায়িত্বে ছিলাম। এর আগে কিছু সময়ের জন্য চট্টগ্রাম সেনানিবাসে ৮তম ও ১৮তম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সহ-অধিনায়কের দায়িত্বে ছিলাম এবং তারও পূর্বে স্বাধীনতার পর পর ঢাকা সেনানিবাসে প্রায় ২ বছরের অধিক কাল দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সহ-অধিনায়ক ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রভোস্ট মার্শালের দায়িত্ব পালন করি।

যুদ্ধচলাকালীন ও যুদ্ধোত্তর সময়ে রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আগেই আমি কিছুটা আলোকপাত করেছি। তৎকালীন সামরিক বাহিনীর একজন মুক্তিযোদ্ধা অফিসার হিসেবে বঙ্গবন্ধু হত্যার নেপথ্যে আমার দৃষ্টিতে এবং আমার জানা মতে সেনাবাহিনীর ভূমিকা কিছুটা তুলে ধরার চেষ্টা করব। এর আগে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মুশতাক গংয়েরা বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে যুদ্ধচলাকালীন সময়ে ক্ষমতা দখলের উচ্চাভিলাসি এই চিন্তা ভাবনা মনে প্রাণে লালন করে আসছিল।

সেদিন ভারতের মাটিতে মুশতাককে কেন্দ্র করে একটি চক্র গড়ে উঠেছিল। এদের মধ্যে তাহের উদ্দিন ঠাকুর, মাহবুর আলম চাষী, হোসেন আলী (কলকাতায় তৎকালীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত) এদের নাম উল্লেখযোগ্য। এই চক্রটি সেই সময়ে স্বাধীন বাংলা সরকারের দায়িত্বে থেকেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করত। এবং নিজেদের ভিন্ন সত্তা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তখন থেকেই অভ্যন্তরীণ কোন্দলকে প্রশ্রয় দিয়ে আসে। ভারতের সক্রিয় সহযোগিতায় রণাঙ্গনে মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয় সুনিশ্চিত জেনেও মুশতাকের নেতৃত্বে এই চক্রটি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে নিয়ে Condederation গঠনের মত প্রকাশ করেছিল এই বলে যে-আপনারা স্বাধীনতা চান, না কি শেখ সাহেবকে চান। কারণ সেদিন একটি সংবাদ বহুল প্রচারিত ছিল যে পাকিস্তানের কারাগারে শেখ সাহেবের বিচার প্রায় সমাপ্তির পথে এবং যে কোনো মুহূর্তে তাঁর ফাঁসি হয়ে যেতে পারে। ঠিক সেই সময়ে ভারতে বসে নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন মহলে মুশতাকের এই উক্তি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত একটি গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ ছিল। এমনও প্রচার আছে যে, মুশতাক সেদিন স্বাধীন বাংলা সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী থাকার সুবাদে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্বশাসনের প্রশ্নে গোপনে আমেরিকাসহ বিভিন্ন দেশের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেছিলেন।

স্বাধীন বাংলা সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও সরকারের মূল চালিকা শক্তি জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জনাব তাজউদ্দীন, জনাব মনসুর আলী, জনাব কামরুজ্জামানসহ অন্যান্য সহকর্মীদের সাথে পরোক্ষভাবে নিজের প্রাধান্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে নিজস্ব ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালাতেন। স্বাধীনতাত্তোর শেখ সাহেবকে কেউ মুশতাকের যুদ্ধকালীন সময়ের ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত করেছিল কিনা জানিনা। শেখ সাহেব তাকে তার সরকারের বাণিজ্য ও পরে পানি সম্পদ মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু মুশতাক তার ভিতরে লুকিয়ে রাখা ষড়যন্ত্র লালন পালন অব্যাহত রেখেছিলেন যার বহিঃপ্রকাশ আমরা পরবর্তীতে প্রত্যক্ষ করেছি। মুশতাক যুদ্ধচলাকালীন সময়ে যে কয়েকজনকে নিয়ে চক্র গঠন করেছিলেন, যুদ্ধপরবর্তী তার এই চক্রের সদস্য সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পায় সেই প্রমাণ আমরা পাই বঙ্গবন্ধু হত্যার পরে মুশতাকের নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রী পরিষদের দিকে তাকালে।

স্বাধীনতার পরবর্তীতে এরা অভ্যন্তরীণ কোন্দলকে নানানভাবে যোগান দিচ্ছিল এবং ষড়যন্ত্রের নীল নকশা বাস্তবায়নে একটি সময় ও সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। স্বাধীনতাত্তোর এই ষড়যন্ত্রে গভীরভাবে জড়িত ছিল সেনাবাহিনীর কিছু চাকরিরত অফিসার ও কিছু অবসরপ্রাপ্ত অফিসার। এই ঘটনাটি কোনো সামরিক অভ্যুত্থান ছিল না, কারণ ১৫ই আগস্ট রাতে পুরো বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

যখন ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল ঠিক সেই মুহূর্তে কর্নেল ফারুক, কর্নেল রশিদ ও কিছু সংখ্যক অফিসারের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর মাত্র দুটি ইউনিট নৈশ প্রশিক্ষণের নামে মাঝ রাতে ঢাকা সেনানিবাস থেকে বেরিয়ে এসে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ভোর রাতের মধ্যেই একের পর এক সমস্ত অপারেশন সমাপ্ত করে।

উল্লেখিত দুটি রেজিমেন্ট ঢাকা পুরাতন বিমান বন্দরের কাছাকাছি জায়গায় প্রথম বেঙ্গল লেন্সার সমবেত হয়। সেখান থেকে একটি অংশ প্রয়োজনীয় গোলা বারুদ সংগ্রহ করে সবাই বর্তমান জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের রানওয়ের নিকটবর্তী জায়গায় গভীর রাতে সর্বশেষ ব্রিফিং ও শপথ নেওয়ার উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়। সেখানে সংশ্লিষ্ট সবাই মায়ের দুধের কসম নিয়ে কয়েকটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে যায়। এক গ্রুপ বঙ্গ ভবন, এক গ্রুপ রেডিও স্টেশন, এক গ্রুপ রক্ষীবাহিনীর শেরে বাংলা নগরের অবস্থান এবং অন্যরা বঙ্গবন্ধুর বাড়ি, সেরনিয়াবাতের বাড়ি ও মণির বাড়ির জন্য নির্ধারিত হয়। হত্যাযজ্ঞ পরিচালনা করার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে রাত শেষ হওয়ার ঘণ্টা খানেক আগ মুহূর্তে নিজ নিজ টার্গেটে যাত্রা শুরু করে। যে দুটি গ্রুপ সেরনিয়াবাত ও মণির বাড়িতে গিয়েছিল তাদের নিকট কোনো ট্যাংক বহর ছিল না। সেরনিয়াবাতসহ প্রায় ৭ জনকে হত্যা করা হয় সেরনিয়াবাতের বাড়িতে। ফজলুল হক মণির অন্তঃস্বত্ত্বা স্ত্রীসহ তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

যে গ্রুপটি শেখ সাহেবের বাড়িতে গিয়েছিল তাদের ট্যাংকও ছিল। বাড়ির নিচ তলায় শেখ সাহেবের ভাই শেখ নাসের ও শেখ কামালকে হত্যা করা হয়। একজন পুলিশ অফিসারও এই হত্যার শিকার হয়েছিলেন। গোলাগুলির আওয়াজ শুনে শেখ সাহেব সেনা প্রধান সফিউল্লাহকে টেলিফোন করেছিলেন।। তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজননীয় নির্দেশ ও সময়ের অভাবের কারণে সেনাবাহিনী বা অন্য কোনো ফোর্স সফিউল্লাহর সাথে কথা বলার পর লাল টেলিফোনে অন্যদের সাথে যোগাযোগ করার আগেই নিচ তলায় প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দ শুনে শেখ সাহেব অসীম সাহস ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামার উদ্যোগ নেন এই ধারণা করে যে হয়তো তিনি পরিস্থিতি সামাল দিতে পারবেন। কিন্তু এই ঘটনা যে কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না, ছিল এক গভীর ষড়যন্ত্রের নীল নকশা তা তিনি তখনও অনুমান করতে পারেননি। তা না হলে সিঁড়ির প্রথম ধাপে দাঁড়িয়ে অত বড় বিশ্বাস নিয়ে জিজ্ঞেস করতেন না– "তোরা কী চাস?" কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই চাইনিজ গান এর গুলি স্তব্ধ করে দিল চিরতরে ঐ বজ্র কণ্ঠস্বর। লুটিয়ে পড়লেন সিঁড়ির পরবর্তী ধাপের মধ্যে। কয়েকজন তখন ঢুকে পড়ল দোতলায় শেখ সাহেবের শয়নকক্ষে। সেখানে অবস্থান করছিলেন বেগম মুজিব তাদের ছোট শিশু সন্তান রাসেল, লেঃ শেখ জামাল এবং শেখ কামাল ও জামালের নববধূদ্বয়।

এরা ঢুকেই সবাই অটোমেটিক গান দিয়ে বৃষ্টির মতো গুলি শুরু করল। সে এক করুণ দৃশ্য। ক্ষণিকের মধ্যে কক্ষে রক্তের বন্যা বয়ে গেল।

শেখ সাহেব যদি দোতলা থেকে না আসতেন, জেঃ সফিউল্লাহ বা অন্য কেউ যদি সংশ্লিষ্ট সবাইকে খবরটি সময়মতো পৌঁছিয়ে দিত তাহলে দোতলার গেট ভেঙে ঢুকতে বেশ কিছু সময়ের ব্যাপার ছিল। এতে করে পুরো অপারেশন বিলম্বিত হতো সেই ক্ষেত্রে শেখ সাহেবকে উদ্ধারের জন্য হয়তো সেনাবাহিনী ও অন্যান্য ফোর্সগুলো এগিয়ে আসতে পারত। কারণ অপারেশন যারা করেছিল তারাও প্রায় ভোর রাতের শেষ লগ্নে গিয়ে পৌঁছেছিল। ভোরে যখন শেখ সাহেব নেই এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল তখন কিন্তু পুরো ব্যাপারটি ভিন্ন খাতে মোড় নিয়েছিল।

যে গ্রুপটি ট্যাংক বহর নিয়ে শেরে বাংলা নগর রক্ষীবাহিনীর অবস্থানে গিয়েছিল তাদের কাছে কিন্তু ট্যাংক এর গোলা ছিল না এটা রক্ষীবাহিনী বা অন্যরা জানত না। গোলা ভর্তি ট্যাংককে মোকাবিলা করা সম্ভব নয় বলে কেউ কাউন্টার অ্যাটাক করেনি। ট্যাংক বহরের লোকেরাও সেদিন ঝুঁকিপূর্ণ সাহসের পরিচয় দিয়েছিল।

উপরে উল্লেখিত এই গ্রুপগুলোতে ট্যাংক রেজিমেন্ট ও দ্বিতীয় ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্টের চাকরিরত অফিসারেরা ছাড়াও চাকরিচ্যুত মেজর ডালিম, কেঃ নূর, মেজর শাহরিয়ার ও অন্যান্যরা ঐদিন ইউনিফর্ম পরিধান করেই নেতৃত্বে ছিল। জেনারেল সফিউল্লার সাথে শেখ সাহেবের শেষ কথা যে হয়েছিল সেই প্রেক্ষিতে বলতে হয় তার অনেক কিছু করণীয় ছিল।

(ক) শেখ সাহেব যেন দোতলার কক্ষ থেকে না বাইর হন এই পরামর্শ দিয়ে ঢাকা সেনানিবাস থেকে ৪৬ ব্রিগেড এর ট্রুপস জরুরি ভিত্তিতে মুভ করে একটি পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারত।

(খ) সফিউল্লাহ সাহেব পুলিশের আই.জি. রক্ষীবাহিনী সবার সাথে আলাপ করে শেখ সাহেবকে উদ্ধারের পরিকল্পনা দিতে পারতেন। কারণ সবকিছু কিন্তু সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলচিল। যদি কাউন্টার পদক্ষেপ সময়মতো নেওয়া যেত আধ ঘণ্টা এক ঘণ্টার মধ্যে হয়তো ওদের সার্বিক পরিকল্পনা পুরো না হলেও আংশিক বানচাল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল এবং পরবর্তীতে আংশিক বানচালের মুখে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল নিয়েও বিতর্ক গ্রুপিং দেখা দেওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। যাই হোক আমার এই মূল্যায়ন সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করবে শেষ মুহূর্তে শেখ সাহেবের সাথে জেঃ সফিউল্ল্যাহর যদি কথা হয়ে থাকে তার উপর ভিত্তি করে আর যদি একেবারেই না হয়ে থাকে তাহলে উপরে উল্লেখিত মূল্যায়ন সঠিক নয়। যতদূর আমরা জানতাম শেখ সাহবের সাথে সাফিউল্লার শেষ কথা হয়েছিল এই

ব্যাপারে জেঃ সফিউল্লাহ ভালো জানবেন। সেদিন সকালেই বঙ্গবন্ধুর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগদানের কথা ছিল। সেই অনুষ্ঠানে তাঁর আর যাওয়া হলো না।

মুশতাক গংয়েরা মনে করেছিল, দেশের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি সময়ের ব্যবধানে হয়তো আরো অবনতি ঘটবে। কিন্তু জেলায় জেলায় ইতোমধ্যে যে গভর্নর নিয়োগ করা হয়েছে তারা যদি পুরোদমে দায়িত্ব পালন শুরু করে এবং ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়া সমাপ্তির মাধ্যমে এই পদ্ধতি যদি প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তাহলে সরকারের রাজনৈতিক অবস্থান আরো সুদৃঢ় হবে। সেইক্ষেত্রে সরকার উৎখাত করার পর রাজনৈতিকভাবে টিকে থাকা তাদের পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে। ১৫ই আগস্টকে সুযোগ ও সময় হিসেবে বেছে নেওয়ার পেছনে অনেক কারণের মধ্যে এইটা এটা অন্যতম বিবেচ্য বিষয় ছিল। ঐদিন সকালে রংপুর সেনানিবাসে বসে আমি রেডিওতে মেজর ডালিমের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। সে বঙ্গবন্ধু হত্যা ও ক্ষমতার পট পরিবর্তনের কথা ঘোষণা করল। যদিও সেদিন সেনাবাহিনীর মধ্যে রক্ষীবাহিনী গঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অনেকের মনে অনেক প্রশ্ন ছিল, কিন্তু নির্মমভাবে সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যা সেনাবাহিনী সাধারণভাবে গ্রহণ করে নিতে পারেনি। এ পর্যায়ে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসবে সেনাবাহিনীর ভূমিকা সম্পর্কে।

যেহেতু এই ঘটনার সাথে জড়িত কর্নেল ফারুক ও কর্নেল রশিদ এর অধীনস্ত ইউনিট দুটি ছাড়া ঢাকায় অবস্থানরত ৪৬ পদাতিক ব্রিগেড তাই অন্যান্য ইউনিটগুলো এবং কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, রংপুর, যশোর সেনানিবাসগুলোতে অবস্থানরত বিগ্রেডগুলো অর্থাৎ এক কথায় পুরো আর্মি এই ঘটনায় জড়িত ছিল না, তাই তাৎক্ষণিকভাবে এই ঘটনার পক্ষে-বিপক্ষে অবস্থান নেওয়ার কোনো অবকাশ ছিল না। প্রত্যেকটি সেনানিবাসে নিজেদের মধ্যে Chain of command ঠিক রেখে সবাই অপেক্ষায় ছিল ঢাকা সেনানিবাসের সেনাবাহিনীর প্রধানের পরবর্তী নির্দেশের জন্য। সেই সময় প্রত্যেকটি সেনানিবাসে সর্বস্তরের সৈনিদের মধ্যে পুরো ঘটনা ব্যাখ্যাসহ কী করণীয় এই প্রশ্নে একটা অস্থিরতা কাজ করছিল। পাশাপাশি সেনা অফিসারেরা নিজেদের মধ্যে ঐকমত্য রেখে যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় মানসিক প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তখন কিন্তু বাইরে সর্বত্র একটি থমথমে ভাব বিরাজ করছিল। সর্বস্তরের সেনা অফিসারো, যার যেই অভিপ্রায় মনের মধ্যে থাকুক না কেন, বিচ্ছিন্নভাবে পাল্টা কিছু করার পরিস্থিতি ও পরিবেশ তখন ছিল না কারণ সবাই ধারণা করছিল বাইরে পুরো দেশে যে কোনো মুহূর্তে একটি গৃহযুদ্ধ শুরু হতে পারে, এমনকি কোথাও কোথাও বিক্ষুব্ধ জনতা সেনাবাহিনীর একটি ক্ষুদ্র অংশের অংশগ্রহণের কারণে সেনানিবাস ঘেরাও করতে পারে, এ

ধারণাসহ আরো অনেক জল্পনা কল্পনা সবার মধ্যে চলছিল। এ আশঙ্কা দেখিয়ে রংপুর সেনানিবাসে প্রতিরক্ষার জন্য বিভিন্ন ইউনিটগুলোকে সেনানিবাসের চারপাশে দায়িত্ব বণ্টন করে অবস্থান নেওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হলো। অন্যান্য সেনানিবাসেও এই পরিস্থিতিতে হয়তো একই ধরনের প্রস্তুতি ছিল। এই ধরনের প্রস্তুতির পেছনে আসল উদ্দেশ্য ছিল, মূলত সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলোর মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ সমুন্নত রেখে Chain of command ঠিক রাখা এবং যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় সদা প্রস্তুত থাকা এবং ইউনিটগুলোকে প্রস্ততিতে ব্যস্ত রাখা যেন একে অন্যের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করে নিজেদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার সুযোগ না পায়। পুরো ঘটনার ব্যাপারে সেনাবাহিনীতে একটি অংশের মধ্যে কিছুটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া থাকা সত্ত্বেও দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি যেন চরম সংঘাতের দিকে ধাবিত না হয় এবং বিভিন্ন ফোর্সগুলোর মধ্যে কোনো প্রকার ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি না হয়, সে জন্য নতুন সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করার জন্য ঢাকাতে বিভিন্ন মহলের জোর তৎপরতা চলছিল। ফোর্সগুলোর মধ্যে সেই মুহূর্তে এবং পুরো দেশের কোথাও এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের পক্ষে-বিপক্ষে কোনো বিক্ষোভ বা প্রতিবাদ মিছিল এক কথায় কোনো রাজনৈতিক তৎপরতা দেখা যায়নি। শুধু সর্বত্র একটি গম্ভীর ভাব বিরাজ করছিল। আওয়ামী লীগের অনেক নেতা ও কর্মী সাময়িকভাবে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যান।

স্বঘোষিত নতুন সরকারের বিরুদ্ধেও কোনো রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বা কোনো প্রকার ক্ষোভ-বিক্ষোভ পরিলক্ষিত হয়নি–স্বঘোষিত নতুন সরকার যেহেতু আওয়ামী লীগের নেতাদের একটি অংশের সমন্বয়ে গঠিত সেহেতু বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে বাকিরা এর বিরুদ্ধে রাজপথে নামাকে ঝুঁকিপূর্ণ মনে করেছিল। পাশাপাশি নিজেদের পক্ষে জন সমর্থনের প্রশ্নে সন্দেহ পোষণ করছিল কারণ এই ষড়যন্ত্রকারী চক্রসহ অনেক নেতা কর্মী বঙ্গবন্ধুর আদেশের ও নির্দেশের বাইরে নিজেদের কর্মকাণ্ডের কারণে জনপ্রিয়তা হারিয়েছিল। আর পরবর্তীতে এদের অনেকে দল ছেড়ে চলে যায়। এক কথায় সেই মুহূর্তে সঠিক রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্কটও ছিল দলের। সেনাপ্রধান মেঃ জেনারেল সফিউল্লাহকে মেজর ডালিমও কিছু অফিসার নিয়ে আসল প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টে সেখানে নৌ ও বিমান বাহিনী প্রধানদেরকেও আনা হলো। বেলা তখন প্রায় ৯-৩০ কি ১০-০০ টা হবে। সেখান থেকে সবাই গেলেন রেডিওতে দেশের সার্বিক পরিস্থিতি মূল্যায়নে অনিবার্য ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী সংঘাত এড়ানোর জন্য দেশের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার অভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়ে তিন বাহিনী প্রধানগণ রেডিওতে গিয়ে স্বঘোষিত নতুন সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করলেন। রেডিও স্টেশনে আগে থেকে খন্দকার মুশতাক ও তাহের উদ্দিন ঠাকুর বসা ছিলেন। এই ঘোষণার সাথে বিডিআর, পুলিশ ও

রক্ষীবাহিনী প্রতিনিধিও সামিল ছিলেন। ঘোষণার পর পর সাভারে রক্ষী বাহিনী সদর দপ্তরের উপরে বিমান বাহিনীর জঙ্গি বিমান False Fly করেছিল তাদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য। যদিও এই ঘোষণা বিভিন্ন বাহিনীতে অনেকের মধ্যে কিছুটা সংশয়ের সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু সেই মুহূর্তে সবার মধ্যে একতাকে সমুন্নত রেখে বিরাজমান সার্বিক পরিস্থিতির আলোকে যৌথভাবে যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবেলা সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের বিবেচ্য বিষয় হিসেবে প্রাধান্য পাচ্ছিল। সামরিকবাহিনীতে এই ঘোষণার প্রশ্নে যে একটি অংশ একমত ছিল না তার বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাই মাত্র আড়াই মাসের মাথায় খালেদ মোশারফের নেতৃত্বে ৩রা নভেম্বর সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে।

সেনা-প্রধান জে. শফিউল্ল্যাহ ও অন্যান্য প্রধানগণ কী বিকল্প ভূমিকা পালন করতে পারতেন? এই প্রশ্ন হয়তো অনেকের মাঝে আজও থাকবে। সামরিক বাহিনীতে যদিও নৈতিকভাবে সেনাবাহিনীর এই ক্ষুদ্র অংশটির নির্মম হত্যা ঘটনাকে কেউ বাহ্যিক সমর্থন দেয়নি, কিন্তু কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে তাদের বিরুদ্ধে এই বিলম্বিত অ্যাকশান আবার হয়তো ফোর্সেসগুলোর মধ্যে এবং বাইরে জনগণের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করে চরম সংঘাতে রূপ লাভ করবে এই আশঙ্কায় কোনো অ্যাকশান এর প্রশ্নে জোরালো মতামত/চিন্তা-ভাবনা বা কোনো প্রস্তাব ছিল না। এছাড়া ক্ষমতাসীন দলের মধ্যে থেকে একটি অংশ যেহেতু ক্ষমতা দখলের ঘোষণা দিয়েছে এবং অন্য কোনো অংশের প্রতিবাদ নেই, এমনকি তৎকালীন অর্থনৈতিক মন্দাবস্থা ও রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে জনগণের মধ্যেও তেমন কোনো জোরালো প্রতিক্রিয়া লক্ষণীয় ছিল না।

সকাল ১০টার দিকে আনুগত্য ঘোষণার পরিবর্তে যদি সেনাবাহিনী কোনো বিকল্প অ্যাকশানে যেত প্রথমত সেনাবাহিনী এক থাকত না, ফোর্সগুলোর মধ্যে গ্রুপিং হয়ে যেত। এমতাবস্থায় কোনো রাজনৈতিক সমর্থনবিহীন ও বহিঃবিশ্বের কারো পরোক্ষ বা প্রত্যেক্ষ আশীর্বাদ ছাড়া যে কোনো বিকল্প অ্যাকশান ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করত যা সামাল দেওয়া দুরূহ ব্যাপার হতো জনগণের মধ্যেও নিরাপত্তাহীনতা দেখা দিত এবং পুরো পরিস্থিতি গৃহযুদ্ধে রূপলাভ করতে পারত।

সেনাবাহিনীর অ্যাকশান এর প্রশ্নে এক না থাকার কতগুলো কারণ আগ থেকে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে কাজ করে আসছিল। স্বাধীনতার পর পর মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদেরকে দুই বছরের Antidate seniority দেয়ার সরকারি সিদ্ধান্ত পাকিস্তান ফেরত অফিসারেরা সহজে গ্রহণ করে নিতে পারেনি। দ্বিতীয়ত জিয়া শফিউল্লাহ থেকে সিনিয়র থাকা সত্ত্বেও তাকে প্রধান না করে উপ-প্রধান করে রাখা অনেকে, এটা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত হলেও, মেনে নিতে পারেনি। তৃতীয়ত রক্ষীবাহিনী গঠন নিয়ে সেনাবাহিনীতে অনেকের মধ্যে চাপা ক্ষোভ বিরাজ

করছিল। এই চাপা ক্ষোভের মুখে সৈনিক ও অফিসারদের মধ্যে একটি গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল এই বলে যে, গত রাতে শেখ সাহেব আর্মিকে রক্ষীবাহিনীর সাথে একত্রীকরণের নির্দেশ দিয়েছিলেন যা সেনাবাহিনী মেনে নিতে পারেনি এবং যারা জিজ্ঞেস করতে গিয়েছিলেন তারা বাধাগ্রস্ত হয় এবং বাড়ির রক্ষীদের সাথে গুলি বিনিময়ের এক পর্যায়ে ক্রস ফায়ারে এক দুর্ঘটনা ঘটে। আর নেপথ্যে যেসব যুক্তি কাজ করছিল সেগুলো হচ্ছে, দেশের তৎকালীন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সেনাবাহিনীর অনেকের মতে জনগণের অনুকূলে ছিল না। এছাড়া সেনাবাহিনী অ্যাকশান নিয়ে কাউকে ক্ষমতায় বসানোর পরিবেশ পরিস্থিতি ছিল বিতর্কিত, কারণ ক্ষমতাসীন দল ইতোমধ্যেই বিভক্ত। এক অংশ ক্ষমতার দাবিদার, বাকি অংশ গোপন আশ্রয়ে। সেনাবাহিনীর মধ্যে হবে বিভক্তি, ফোর্সগুলোর মধ্যেও এর প্রভাব পড়বে। আর এককভাবে সেনাবাহিনী ক্ষমতা (মার্শাল 'ল') দখল করবে– সেই ব্যাপারে জেনারেল ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অফিসারদের মধ্যে ঐকমত্যের অভাব দেখা দেওয়া ছিল স্বাভাবিক। জেনারেলদের একের প্রতি অন্যের আত্মবিশ্বাসের অভাবও ছিল। উপরে উল্লেখিত কারণগুলো ছাড়াও কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা সেনা অফিসারদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করে রেখেছিল। তার মধ্যে একটি ঘটনা আমার মনে পড়ে। স্বাধীনতার পর আমি সেনাবাহিনীর PROVOST MARSHAL ছিলাম। মেজর ডালিমের সাথে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল বন্ধুসুলভ। একদিন (তারিখ মনে নেই) হঠাৎ সে এসে আমাকে বলল, গাজী গোলাম মোস্তফার (তৎকালীন আওয়ামী লীগের ত্রাণ সভাপতি) বাড়ি সে কিছু সঙ্গী নিয়ে তছনছ করে এসেছে। আমি অবাক হলাম তার এই কথা শুনে এ জন্য যে এই ডালিম প্রায় সময় আমাদেরকে বলত, বঙ্গবন্ধু তাকে ব্যক্তিগতভাবে চিনে, জানে এবং খুব আদর করে। সে ৩২ নং বাসায় আসা যাওয়া কিরে– এসব বিষয়ে প্রায় গল্প করত। সেই ডালিম হঠাৎ শেখ সাহেবের ঘনিষ্ঠ সহচর গাজী গোলাম মোস্তফার বাড়ি তছনছ করবে কেন? যাই হোক, তাকে জিজ্ঞাস করলাম, কী ব্যাপার দোস্ত, কী হয়েছিল? সে উত্তরে বলল "তোমার ভাবি লেডিস ক্লাবে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়েছিল। সেখানে এক পর্যায়ে গাজী গোলাম মোস্তফার ছেলে ও সঙ্গীরা তোমার ভাবিকে অপমান করেই ক্ষান্ত হয়নি, তার পরনের শাড়ি টেনে প্রায় খুলে ফেলার অবস্থা সৃষ্টি করেছিল।" সেনাপ্রধান সফিউল্লাহ ইতোমধ্যে এসব শুনে ডালিমকে খোঁজাখুঁজি করছিলেন। শেখ সাহেব সফিউল্লাহ সাহেবকে সব জানিয়ে অ্যাকশন নিতে বলেছিলেন। ডালিম তখন আরও উত্তেজিত ছিল আমরা তাকে শান্ত হতে বললাম। এটা আর্মির প্রেস্টিজের ব্যাপার। আমরাও চিপকে বলব শেখ সাহেবের সাথে আলাপ করে একটা সুষ্ঠু বিচার করতে। পরবর্তীতে ডালিম গংদেরকে সেনাবাহিনী থেকে বিদায় নিতে হলো। দেখা যাচ্ছে যে ঐ বিদায়ের পর

যে চাপা ক্ষোভ তাদের মনের মধ্যে ছিল তার কারণে তারা লেঃ কর্নেল ফারুক ও কর্নেল রশিদের (চাকরিরত) গংদের সাথে পরে গভীর ষড়যন্ত্রে জড়িত হলো। প্রশাসনের ভিতরে-বাইরে ছোটাটো এই ধরনের আরও অনেক ঘটনা দেশের মধ্যে ঘটছিল। অনেক ক্ষেত্রে হয়তো অনেক ঘটনা শেখ সাহেব নিজেও জানতেন না। কিন্তু বিভিন্ন মহলে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছিল।

১৫ই আগস্টের ঘটনার প্রায় পর পর সূর্যোদয়ের মুহূর্তে পরিস্থিতি আলোচনার জন্য জেনারেল জিয়ার বাসায় গিয়েছিলেন মেজর গাফ্ফার বীর উত্তম, মেজর হাফিজ বীর বিক্রম ও মেজর সাখাওয়াত। তিনি মাত্র কিছুক্ষণ আগে সেভ সেরে নিয়ে সাদা পায়জামা পাঞ্জাবি পরিধান করে ড্রয়িং রুমে পায়চারি করছিলেন। যখন জিয়াকে ঘটনা জানানো হল, দেখা গেল যে উনি আগ থেকে ঘটনা জানতেন। তিনি খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে ঠান্ডা মাথায় এদেরকে উত্তরে বললেন "দেশের সংবিধান আছে প্রয়োজনে পরবর্তী জন ক্ষমতায় আসবে।" ইঙ্গিতে বুঝালেন, আমাদের অতিরিক্ত কোনো ভূমিকা পালনের অবকাশ নেই, সবকিছু স্বাভাবিক গতিতেই হবে।

সার্বিক পরিস্থিতি মুল্যায়নে স্বীকার করতে হবে যদিও হয়তো ঘটনার বরুদ্ধে কোনো অ্যাকশন নেওয়ার অনুকূল পরিবেশ তখন ছিল না কিন্তু এর অর্থ এই ছিল না যে মুশতাকের ক্ষমতা দখলের এই অবৈধ ও অস্বাভাবিক প্রক্রিয়ার পক্ষে জনগণ ছিল। দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল এবং দলের ভিতরে ঘাপটি মেরে বসে থাকা মুশতাক গংদের কারণেই সৃষ্টি হয়েছিল উপরে উল্লেখিত দেশের পরিবেশ পরিস্থিতি। শেখ সাহেব নিজেও বলতেন "আমাকে আপনারা কিছু সোনার মানুষ দিন, আমি আপনাদেরকে সোনার বাংলা দেব। আমার চারদিকে চাটুকারের দল, যা-ই বিদেশ থেকে ভিক্ষা করে আনা হয় তা এরাই শেষ করে ফেলে।" তিনিও এক পর্যায়ে এই ষড়যন্ত্রকারীদের ব্যাপারে সজাগ হয়েছিলেন। যদিও এদের বৃহত্তম অংশ নানানভাবে দল থেকে পর্যায়ক্রমে চলে যায় কিন্তু মূলত এদের বাড়াবাড়ির কারণে ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে নির্মমভাবে সপরিবারে জীবন দিতে হলো শেখ সাহেবকেই।

তৎকালীন দেশের অর্থনৈতিক ও আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কারণে জনগণ যে নারাজ ছিল সেটা আসলে সাময়িক সমস্যা ছিল, সময়ের ব্যবধানে সেগুলো হয়তো সমাধান হয়ে যেত। যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের জনগণ দ্রুত অর্থনৈতিক সামাজিক পরিবর্তন প্রত্যাশা করে আসছিল। মুশতাক গংয়েরাসময় ও সুযোগের সদ্ব্যবহার করে এই হীন চক্রান্তের মাধ্যমে সেনাবাহিনীসহ পুরো জাতিকে আচমকা কঠিন পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছিল। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে এই চক্রের কার্যকলাপ স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর কাছে যদি যথাযথভাবে তুলে ধরা হতো তাহলে এর

মূল্যায়ন করে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেত। মুজব বাহিনীর ভিতরে একটি উল্লেখযোগ্য অংশের কার্যকলাপ যদি সতর্কতার সাথে নিয়ন্ত্রণে রাখা যেত (যার থেকে পরে গণবাহিনী/জাসদ আত্মপ্রকাশ করল) এবং সার্বিকভাবে ষড়যন্ত্রকারীদেরকে চিহ্নিত করে দলের মধ্যে সময়মতো যদি শুদ্ধি অভিযান চালিয়ে দলকে ঢেলে সাজানো হতো এবং সেনাবাহিনীর মধ্যে সমস্যাগুলো আগ থেকেই সমাধান করে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করা হতো, সর্বোপরি স্বাধীনতার স্বপক্ষের শক্তিগুলো ষড়যন্ত্র ও বাড়াবাড়ির ঊর্ধ্বে এক থাকত এবং এর পাশাপাশি শেখ সাহেব যদি সরল মনে সবাইকে বিশ্বাস না করে কঠিন হাতে সব মোকাবেলা করতেন, তাহলে হয়তো এই নির্মম ঘটনা ঘটত না।

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মুশতাক আওয়ামী লীগ এম.পি ও অন্যান্যদের বঙ্গ ভবনে যে সভা ডেকেছিলেন সেখানে অনেকেই উপস্থিত হয়েছিলেন। কারা কারা ছিলেন, কেন ছিলেন, সেই মূল্যায়ন আওয়ামী লীগের মধ্যে হয়েছিল কিনা জানি না, তবে মুশতাক চেয়েছিলেন আওয়ামী লীগের একটি বৃহত্তম অংশকে তার পক্ষে নিয়ে আসা এবং আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক শক্তিকে আরও দুর্বল করে দেয়া। মুশতাক গংয়েরা বঙ্গভবনে বসে দেশের অর্থনৈতিক সামাজিক পরিবর্তনের চাইতে নিজেদের ক্ষমতা কুক্ষিগত করে আরো পাকাপোক্ত ও মজবুত করার কাজে বেশি ব্যস্ত ছিল। নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী সিভিল প্রশাসনে পরিবর্তন আনা এবং সুবিধা অনুযায়ী নিত্য নতুন ফরমান জারি করছিল। নতুন টুপির রাজনীতিও তিনি চালু করলেন।

৩রা নভেম্বর : অপারেশন প্যান্থার

সেনাবাহিনীতে জেঃ জিয়াকে নতুন সেনা প্রধান করে প্রকৃতপক্ষে বঙ্গভবনে মুশতাকের সাথে অবস্থানরত মেজর কর্নেলগণের অধীনে রাখা হলো– তাদের কথা মোতাবেক সেনাবাহিনীতেও পরিবর্তন আনতে হবে– এই ধরনের একটি জোর উদ্যোগ তাদের মধ্যে তখন ছিল। জিয়া প্রথম প্রথম নতুন সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেছিলেন কিন্তু পরবর্তীতে তাদের বাড়াবাড়ি খুব একটা পছন্দ করছিলেন না। সেনাবাহিনীতেও এ নিয়ে ক্ষোভ বৃদ্ধি পেল। ঘটনায় জড়ি মেজর কর্নেলগণ বঙ্গভবনে বসে সিভিল প্রশাসনেও হস্তক্ষেপ শুরু করেছিল। সেনাবাহিনীর কয়েকজন সিনিয়র অফিসার জেনারেল জিয়াকে এই সম্পর্কে অবহিত করলে উনি বলছিলেন "Give me Time, I shall take action "তখন অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি সময়। খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে এই অফিসারেরা যেহেতু জেঃ জিয়াকে এদের সম্পর্কে অভিযোগ দিয়ে ফেলেছেন এবং জিয়া সময় চেয়েছেন, খালেদ গংয়েরা মনে করলেন এখন আর সময় দিলে হয়তো আমাদের

বিরুদ্ধেই অ্যাকশান শুরু হবে। কারণ আমাদের উদ্দেশ্য জানাজানি হয়ে গেছে। আমাদের নিজেদেরকে OFFENSIVE হতে হবে। এমনিতেই খালেদদের একটি অংশ আগে থেকেই সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। এবার সবাই মিলে উপরে উল্লেখিত কারণে সিদ্ধান্ত নিল, ৩রা নভেম্বর ১৯৭৫ ভোর রাতেই Operation PANTHER কার্যকরী করবে অর্থাৎ সামরিক অভ্যুত্থান ঘটল সরকারের বিরুদ্ধে।

আমি তখন রংপুর ক্যান্টনমেন্টে ১৫ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেছিলাম। সেখানে কমান্ডার চিলেন কর্নেল হুদা। তিনি যুদ্ধ চলাকালীন সেনাবাহিনীর চাকরিতে ছিলেন না, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় তিনি একজন অভিযুক্ত আসামি ছিলেন। যুদ্ধে অংশগ্রহণের কারণে স্বাধীনতার পর তাকে চাকরিতে পুনর্বহাল করা হয়েছিল। কর্নেল হুদাও আমার সাথে ৩রা নভেম্বরের আগে ঢাকাতে খালেদ মোশাররফ ও কয়েকজন অফিসারদের সাথে দেশের মধ্যেও সেনাবাহিনীতে বিরাজমান বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি ও করণীয় সম্পর্কে আলাপ হয়েছিল। ২রা নভেম্বর রাতে খালেদ মোশাররফ রংপুরে কর্নেল হুদার বাসায় টেলিফোন করেন।

আমি সেই বাসায় আগে থেকেই কর্নেল হুদার আমন্ত্রণে অপেক্ষা করছিলাম এই জন্য যে, যে কোনো মুহূর্তে Operation Panther-এর নির্দেশ আসবে। খালেদ মোশাররফ কর্নেল হুদার সাথে আলাপ সেরে আমাকে টেলিফোন দিতে বললেন, আমার সাথে আলাপকালে তিনি শুধু কৌশল বিনিময় করলেন এবং বললেন "কর্নেল হুদা থেকে তোমার ইউনিট এর অনেক সুনাম শুনলাম Keep it up." তিনি আরো বললেন "হুদা তার যুদ্ধের অভিজ্ঞতার উপর একটি বই লিখবে। আমাদের ২ নং সেক্টরে তোমার বিলোনিয়া যুদ্ধের কাহিনিও হুদাকে শুনাবে এবং তার বইতে উল্লেখ করতে বলবে।" টেলিফোনে যেহেতু এই সম্পর্কে আলাপ করা নিরাপদ নয় সেই কারণে খালেদ ঐ কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে আমাকে পূর্বের সিদ্ধান্ত কার্যকরী হতে যাচ্ছে এই Message টি পরোক্ষভাবে দিলেন। সর্বশেষ টেলিফোনে কথা আর না বাড়িয়ে বললেন "তোমরা গল্প কর, আমি ঘুমাতে যাচ্ছি।" এই বলে তিনি টেলিফোনে আমার কাছ থেকে বিদায় নিলেন। আমি কর্নেল হুদার সাথে কথা বলার সময় তার কথার ধরনে ও ইঙ্গিতে বুঝে নিয়েছিলাম যে অপারেশন শুরু হতে আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাকি। টেলিফোন রাখার সাথে সাথে কর্নেল হুদা তার স্বাভাবিক ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকিয়ে একটু মৃদু হেসে জিজ্ঞাস করলেন "কী বুঝলে?" আমি উত্তর দিলাম খালেদ মোশাররফ যেভাবে চেয়েছে বিশেষ করে আপনার সাথে অপারেশনে আমাদের করণীয় সম্পর্কে যেভাবে পূর্বে আলাপ হয়েছে সব ঠিক আছে। আমার পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী রংপুরে সব ঠিকঠাক রেখে এক বা একাধিক ইউনিট ঢাকার সাহায্যে পাঠাতে হবে,

সে জন্য আমার নিজস্ব ইউনিট ১৫ ইস্ট বেঙ্গলকে রংপুরে সতর্ক অবস্থায় রেখে ঐ দিনেই রংপুরে থেকে ১০ ইস্ট বেঙ্গ রেজিমেন্টকে ঢাকার উদ্দেশ্যে পাঠানো হলো প্রয়োজনে পরে ১৫ ইস্ট বেঙ্গল ঢাকা যাবে।" আমি ও কর্নেল হুদা একদিন আগে ঢাকা থেকে Flying Club এর একটি Cessna Aircraft আগে থেকেই রংপুরে এনে রেখেছিলাম। কেউ যেন না বুঝতে পারে সেজন্য ঐ Aircraft এ রংপুরে একটি অনুষ্ঠানের জন্য একটি শিল্পী ও একজন মেহমান পাখি শিকারী শিকারের উদ্দেশ্যে রংপুরে এসেছিলেন কর্নেল হুদার ব্যক্তিগণ দাওয়াতে ঐ Cessna করে।

৩রা নভেম্বর আমি ও কর্নেল হুদা খালেদ মোশারফের সাথে টেলিফোনে আলাপ করি এবং তাকে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী জানানো হয় যে ১০ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টেকে ইতোমধ্যেই ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই ইউনিটটি যুদ্ধকালীন সময়ে আমার অধীনেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এর প্রতিষ্ঠাতা অধিনায়ক হিসেবে আমি এর দায়িত্ব পালন করেছিলাম এবং যুদ্ধকালীন সময়ে এই রেজিমেন্টটি "K" Force অর্থাৎ খালেদ মোশাররফ ফোর্সের অধীনে একটি ইউনিট ছিল বিধায় তার প্রতি অনুগত থাকবে। কর্নেল হুদা উপরোল্লিখিত কথাগুলো খালেদকে স্মরণ করিয়ে দিলেন এবং ১০ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে প্রথমে ঢাকা পাঠানোর যৌক্তিকতা তুলে ধরলেন এবং আরো বললেন প্রয়োজনে জাফর ইমামের বর্তমান ইউনিট ১৫ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকেও ঢাকায় পাঠানো হবে। এছাড়া খালেদের পক্ষ থেকে কর্নেল হুদা ও আমার প্রতি আরেকটি বাড়তি দায়িত্ব ছিল যশোর সোননিবাস থেকে খালেদের বিরুদ্ধে কোনো ইউনিট যেন ঢাকার দিকে রওয়ানা না হয় সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। বিগ্রেডিয়ার শওকত যশোর সেনানিবাসের দায়িত্বে ছিলেন। যদিও যশোর থেকে কোনো ইউনিট ঢাকা অভিমুখে রওয়ানা হয়নি তবুও আমাদেরকে ফেরিঘাট পর্যন্ত কড়া সতর্কতা ও নজর রাখতে হয়েছিল। এই ব্যাপারে প্রস্তুতির কারণে আমরা খালেদের সাথে একমত হলাম যে ৩রা নভেম্বর আমরা উল্লেখিত দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত থাকব এবং সব ঠিকঠাক করে ৪ তারিখ ভোরে Flying Club এর Cessna Aircraft নিয়ে আমরা ঢাকায় আসব। ৩রা নভেম্বর এমনিতে আমার ঢাকার সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছিলাম। ২রা নভেম্বর ম্যধরাত থেকে নিয়ে ৩রা নভেম্বর ভোর রাত পর্যন্ত অপারেশন সফল করার জন্য ঢাকায় অবস্থানরত ইউনিটগুলো পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন পয়েন্টে অবস্থান গ্রহণ করে।

১ম বেঙ্গলের একটি কোম্পানি মেজর ইকবালের নেতৃত্বে আগে থেকেই বঙ্গভবনে ছিল। তাদেরকে এই অপারেশনের পক্ষে আনা হয় এবং অন্যত্র দায়িত্ব দেওয়া হয়। ক্যাপ্টেন দীপকের নেতৃত্বে ২২তম বেঙ্গলের আরেকটি কোম্পানি

বঙ্গভবনে পাঠানো হয়। ২২ বেঙ্গলের আরেকটি কোম্পানি গাফফারের নেতৃত্বে মহাখালীতে অবস্থান গ্রহণ করে। উদ্দেশ্য ছিল কূটনৈতিক এলাকা গুলশান বনানীর দিকে কেউ যেন দায়িত্ব ছাড়া সংঘবদ্ধভাবে না যেতে পারে। পাশাপাশি ঐ এলাকাগুলো থেকে কূটনৈতিকরা যেন শহর অভিমুখে না আসে এ ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখা এবং কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ২ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের এক কোম্পানি ঢাকা-টঙ্গী হাইওয়েতে চেক পোস্ট স্থাপন করে এবং ইউনিট যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় সর্বদাই প্রস্তুত ছিল। সেনানিবাসের ভিতরে ও ইউনিটগুলো যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য সতর্ক অবস্থায় ছিল। কর্নেল শাফায়াত জামিল ছিলেন ৪৬ ব্রিগেড কমান্ডার। তিনি মূলত ইউনিটগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন দূরদর্শী সম্পন্ন Professional Officer. মেজর হাফিজ উদ্দিন ছিলেন তখন ৪৬ বিগ্রেডেন–বিগ্রেড মেজর। তিনিও খালেদ মোশাররফ, শাফায়াত জামিল ও অন্যান্য অফিসারদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব পালন করছিলেন। কর্নেল মালেক Director Military Operation এ থেকে বুদ্ধি পরামর্শ প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছিলেন।

৪ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট যেহেতু যুদ্ধ চলাকালীন খালেদ মোশারফের নেতৃত্বে ছিল স্বাভাবিক কারণে ঐ ইউনিটের অফিসার ও সৈনিকেরা খালেদের ব্যক্তিগত ভক্ত ছিল। এছাড়া অভ্যুত্থানের আরেকজন মূল নায়ক কর্নেল গাফফার ছিলেন এই ইউনিটের যুদ্ধ চলাকালীন অধিনায়ক। সেজন্য ৪ বেঙ্গলে অপারেশন পরিচালনার সমন্বয় কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। সেইদিন অন্যান্য ইউনিট অফিসারেরাও ৪ বেঙ্গলে আসা যাওয়া করছিল। ৪ বেঙ্গল আগস্টের অভ্যুত্থানে জড়িত ২ ফিল্ড আর্টিলারি ও ট্যাঙ্ক রেজিমেন্টের পাশাপাশি অবস্থান করেছিল সে জন্য কর্নেল রশিদ ও কর্নেল ফারুকের এই ইউনিট দুটির প্রতি কড়া নজর রাখার ইঙ্গিত ছিল। ৪ বেঙ্গলও এই ইউনিট দুটিকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখার লক্ষ্যে সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করে। সকাল থেকে এয়ার ফোর্সের হেলিকপ্টার ও জঙ্গি বিমান মুশতাক ও কর্নেল ফারুক রশিদের বঙ্গভবন ও রেসকোর্স এ তাদের অনুগত সাজোয়া ও পদাতিক বাহিনীর সৈনিকদের অবস্থানের উপর বার বার ফ্লাই ওভার করছিল। নেতৃত্বে ছিলেন স্কোয়ার্ডন লিডার আলম, লিয়াকত, ইকবাল ও অন্যান্যরা। তখন বঙ্গভবনে মুশতাক গংদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে সমঝোতা চলছিল পরবর্তী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় কে আসবে। কী করে আবার সাংবিধানিক প্রক্রিয়া চালু করা যায় ইত্যাদি নিয়ে।

এদিকে ঢাকা সেনানিবাসে জেঃ জিয়াকে অঘোষিতভাবে নিরাপত্তার অজুহাত দেখিয়ে গৃহবন্দি রাখা হয়। ক্যাপ্টেন হাফিজ উল্লার নেতৃত্বে তার বাসায়

টেলিফোন যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং নতুনভাবে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। জিয়াকে বন্দী অবস্থায় কয়েকজন অফিসার জানিয়েছিলেন যে, বঙ্গ ভবনে মুশতাকের সাথে পরবর্তী রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে অর্থাৎ ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে আলাপ আলোচনা চলছে। আপনি যদি আগ্রহী থাকেন তাহলে আপনি দেশের প্রেসিডেন্ট হতে পারেন। খালেদ সেনাবাহিনীর প্রধান থাকবে। এ প্রস্তাবে খালেদ মোশাররফের কোনো আপত্তি নেই। এই অফিসারেরা খালেদের পক্ষ থেকে কিংবা রসিকতা করে এই প্রস্তাব দিয়েছিল কিনা জানি না। জিয়া ঠান্ডা মাথায় তাদেরকে উত্তর দিয়েছিলেন "আমার প্রেসিডেন্ট হওয়ার সখ নেই, আমাকে কাগজ কলম দাও আমি অবস্র গ্রহণের জন্য দরখাস্ত করব। আমাকে পেনশনে পাঠালেই আমি খুশি থাকব।"

অভ্যুত্থানের প্রাথমিক পর্যায়ে খালেদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের কোনো মানসিক প্রস্তুতি এমনকি পরিকল্পনাও ছিল না। এ কারণে এই অভ্যুত্থানের সাথে সম্পৃক্ত অফিসারেরাও করণীয় সম্পর্কে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিল। খালেদ চেয়েছিল রক্তপাত এড়িয়ে সমঝোতার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় মুশতাককে সরিয়ে অন্য কাউকে বসানো এবং নিজে সেনা প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করা এবং পরবর্তীতে সময়মতো প্রয়োজনে মার্শাল 'ল' ঘোষণা করে রাষ্ট্র পরিচালনা করা এবং সময়মতো নতুন নির্বাচন দিয়ে সাংবিধানিক প্রক্রিয়া আবার চালু করা অথবা মুশতাকের পরিবর্তে যাকে বসাবে তার মাধ্যমে দেশে নতুন নির্বাচন দিয়ে সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠা করা। খালেদের দ্বিতীয় পর্যায়ের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বেশি সময় ক্ষেপণ করে ফেলেছিলেন যদিও মুশতাককে ক্ষমতাচ্যুত করেছিলেন এবং নিজে সেনাপ্রধান হয়েছিলেন কিন্তু পরবর্তী পরিকল্পনা নিয়ে আর আগাতে পারলেন না।

৪৮ ঘণ্টা রেডিও বন্ধ রেখে বঙ্গ ভবনে সমঝোতার যে নাটক চলছিল এতে করে অন্য ষড়যন্ত্র তড়িৎ দানা বেঁধে উঠল এবং ৭ নভেম্বর ঘটে গেলে রক্তক্ষয়ী আরেকটি অভ্যুত্থান। এই অভ্যুত্থান ৩রা নভেম্বর অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে কোনো পাল্টা অভ্যুত্থান ছিল না। ৭ই নভেম্বর অভ্যুত্থানের নায়করা ৩রা নভেম্বর অভ্যুত্থানের অনেক আগ থেকেই তাদের এই অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি সম্পন্ন করে শুধু একটু সময় ও সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। ৩রা নভেম্বর খালেদের অভ্যুত্থানের পর ৪৮ ঘণ্টা রেডিও বন্ধ রেখে দেশবাসীকে অন্ধকারে রাখা, রক্তপাত এড়িয়ে সমঝোতার চেষ্টা চালিয়ে সময়ক্ষেপণ করা, জিয়াকে গৃহবন্দি রাখা, মুশতাক, ফারুক, রশিদ গংদের ইউনিটগুলোকে নিয়ন্ত্রণে রেখে কোনো অ্যাকশানে না যাওয়া, জেলে চার নেতা হত্যার কারণে বাইরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ইত্যাদির কারণে ৭ই নভেম্বরের নায়করা তাদের পূর্ব পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ৭ই নভেম্বরকেই সুবর্ণ সময় ও সুযোগ হিসেবে বেছে নিয়েছিল। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ইতিহাসে ৩রা

নভেম্বর যদি সংগঠিত নাও হতো ৭ই নভেম্বরের এই রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের পূর্ব পরিকল্পনা অন্য কোনো সময়ে সংঘঠিত হতো। সৈনিক সংস্থার মাধ্যমে সেনানিবাসগুলোতে সৈনিকদের মধ্যে ঐদিন বিদ্বেষ ও বিদ্রোহের বীজ ছড়িয়েছিল, আওয়াজ উঠেছিল "সিপাহি সিপাহি ভাই ভাই অফিসারের রক্ত চাই।" যার কারণে অফিসারেরা সিভিল পোশাক পরিধান করে অনেকে সেনানিবাস থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং অনেক Young Officer এই বিদ্রোহী সৈনিকদের হাতে নিহত হয়েছিলেন। সেনানিবাসগুলো প্রায় বিদ্রোহী সিপাহিদের নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছিল কিন্তু তাদের মধ্যে Chain of Command এর অভাব ছিল। এ ঘটনা ৩রা নভেম্বরের সামরিক অভ্যুত্থানের কারণে ঘটেনি বা হঠাৎ করেও ঘটেনি বা এটা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনাও ছিল না। গোপন সৈনিক সংস্থা সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটে অনেকদিন ধরে নীরবে তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। এ অভ্যুত্থান সম্পর্কে পরে আমি আবার কিছু আলোকপাত করব।

ফিরে আসছি আবার খালেদ মোশাররফ প্রসঙ্গে। ৩রা নভেম্বর খালেদ মোশাররফ রক্তপাত এড়িয়ে অভ্যুত্থানকে সফল করার জন্য পর্যায়ক্রমে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত কেন নিয়েছিলেন। এর কারণ ছিল খালেদের অভ্যুত্থানের আগ থেকে সেনাবাহিনীতে মুশতাক, ফারুক, রশিদ, ডালিম গংয়েরা বঙ্গভবনে বসে জিয়ার মাধ্যমে তাদের সুবিধানুযায়ী সেনাবাহিনী পরিচালনা করার চেষ্টা করছিল এ প্রশ্নে সেনাবাহিনীর মধ্যে একটি চাপা ক্ষোভ ছিল এবং Chain of Command ঠিক করার একটা জোরালো দাবি সৈনিক ও অফিসারদের মধ্যে ছিল, তাই খালেদ অভ্যুত্থানের প্রাথমিক পর্যায়ে দেখাচ্ছিলেন তিনি ক্ষমতার লোভী নন তিনি সেনাবাহিনীকে এক কমান্ডে রাখার জন্য এই উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং পুরো সেনাবাহিনী মোটামুটিভাবে তার সমর্থনে ছিল; কিন্তু তিনি যদি মুশতাকের সাথে আর্মির যেই অংশটি জড়িত ছিল তাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশানে যেতেন তাহলে সেনাবাহিনীর মধ্যে ছোটখাটো ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারত। যদিও খালেদ মোশাররফ পক্ষের শক্তি এইসব ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটাতে সম্পূর্ণ সক্ষম ছিল। খালেদ মূল উদ্দেশ্যকে পাশ কাটিয়ে এ ধরনের বিচ্ছিন্ন ঘটনার জড়িত হতে চাননি। তিনি এ ব্যাপারে খুব সতর্ক ভূমিকা পালন করছিলেন। এক পর্যায়ে যখন এয়ার ফোর্সের হেলিকপ্টারগুলো মুশতাক গংদের অবস্থান বঙ্গভবনের উপর দিয়ে ফ্লাই ওভার করছিল তারা ঐসব অবস্থানের উপরে গুলি করতে খুব আগ্রহী ছিল প্রয়োজনে বিমান বাহিনীর জঙ্গি বিমানও ব্যবহার করতে চেয়েছিল। খালেদ সরাসরি এ প্রস্তাব নাকোচ করে তিনি বলেছিলেন "No fire, wait and see." খালেদ আরো বললেন, "আমরা যদি অ্যাকশানে যাই তাহলে আমরা ক্ষমতা দখলের জন্য এই অভ্যুত্থান করছি বলে সেনাবাহিনীর মধ্যে একটা ভুল বুঝাবুঝির

সৃষ্টি হতে পারে আর তারা যেহেতু প্রায় আত্মসমর্পণ করেছে অ্যাকশান ইচ্ছা করলে পরেও নেওয়া যাবে এই মুহূর্তে তাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশান নিলে বিভিন্ন সেনানিবাসে কেউ কেউ তাদের পক্ষ অবলম্বন করতে পারে। এ সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া আমাদের উচিত হবে না।

তিনি আরো বললেন, "সব কিছু নিয়ন্ত্রণে রেখে আমাদেরকে কৌশলগতভাবে পর্যায়ক্রমে এগিয়ে যেতে হবে।" যদি ৭ নভেম্বর সংগঠিত না হতো তাহলে মুশতাকের পরিবর্তে বিচারপতি সায়েমের মাধ্যমে খালেদ মোশাররফ সেনা প্রধান হিসেবে তার প্রতিশ্রুতি মোতাবেক একটি নির্বাচনের ব্যবস্থা করতেন। অথবা সময়ের ব্যবধানে রাজনৈতিক পরিস্থিতি যদি সামাল দেওয়া যেত তাহলে হয়তো খালেদের সময়মতো Cheif Marteal Law Administrator এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা ছিলেন এবং সেক্ষেত্রেও দেশে সুষ্ঠু একটি জাতীয় নির্বাচনের ব্যবস্থা করতেন অথবা জিয়াউর রহমান কিংবা এরশাদের মতো কৌশল অবলম্বন করতেন। রক্তপাত এড়ানোর এই প্রশ্নে সেনাবাহিনীর মধ্যেও অফিসারদের একটি অংশ বিশেষ ভূমিকা পালন করছিলেন। মূলত এদের উদ্যোগেই ডালিম গংয়েরা দেশ ত্যাগ করতে পেরেছিল। জেলের অভ্যন্তর চার নেতাকে যেভাবে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল এই খবরটি ডালিম গংদের দেশ ত্যাগের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত সেনাবাহিনীতে ও বাইরে সবার মধ্যে প্রচার করা হলো না। অফিসারদের একটা ক্ষুদ্র অংশ, তৎকালীন আই.জি. পুলিশ ও জেল কর্তৃপক্ষের মধ্যে খবরটি সীমাবদ্ধ ছিল। এদের দেশ ত্যাগের কিছুক্ষণের মধ্যেই সবার মধ্যেই ব্যাপকভাবে জানাজানি হয়ে গেল এবং প্রশ্ন উঠল, এক্ষেত্রে কে বা কারা এদেরকে দেশ ত্যাগের অনুমতি দিলেন। দেখা গেল, ৩রা নভেম্বর অভ্যুত্থানের সাথে জড়িত মূল নায়কদের অধিকাংশই এই জেল হত্যা সম্পর্কে পরে জেনেছিল। আমি ও কর্নেল হুদা ৪ তারিখ সকালে Flying Club এর Cessna Aircraft নিয়ে ঢাকা এসে খালেদের সাথে সাক্ষাৎ করি। কর্নেল হুদাকে খালেদের সাথে রেখে আমি ৪তম বেঙ্গলে আসি। সেখানে এই অভ্যুত্থানের সাথে জড়িত প্রায় সবার সাথেই সাক্ষাৎ হয়ে যায়। সবার মধ্যে একটা উত্তপ্ত ভাব লক্ষ্য করলাম। সবার মধ্যে একই প্রশ্ন, জেল হত্যা সম্পর্কে আমরা সময় মতো জানলাম না কেন? সবাই বলাবলি করছিল, "আমরা যদি সময়মতো জানতে পারতাম তাহলে ডালিম গংদেরকে দেশ ত্যাগ করতে দিতাম না। অভ্যুত্থান করলাম আমরা হত্যা করে তারা। এখন এই হত্যাকাণ্ডের দায় দায়িত্ব কে নেবে? অভ্যুত্থানের একদিন অতিবাহত হয়ে গিয়েছে, এখনও নাকি খালেদের পক্ষে মুশতাক গংদের সাথে বঙ্গভবনে সমঝোতা চলছে। এ কিসের সমঝোতা? কেন এত বিলম্ব?" ৪তম বেঙ্গলে এসব প্রশ্ন নিয়ে নানা জল্পনা কল্পনা ও উত্তপ্ত অবস্থা বিরাজ করছিল। এ অবস্থা প্রায় বিকেল ৪টা/৫টা

পর্যন্ত চলে। এক পর্যায়ে সবাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, এ অবস্থা চলতে দেয়া যেতে পারে না। যা করতে হবে আজ সন্ধ্যার মধ্যেই চূড়ান্ত করতে হবে এবং আমরা শাফায়াত জামিলের নেতৃত্বে বঙ্গভবনে গিয়ে এর একটা সমাধান করব। খালেদ তখন বঙ্গভবনে এদের সাথে সমঝোতায় ব্যস্ত। ৪তম বেঙ্গল থেকে সবাই বঙ্গভবনের উদ্দেশে রওয়ানা দেওয়ার আগেই আমরা কয়েকজন চলে আসলাম বঙ্গভবনে। বঙ্গভবনে তখন মন্ত্রী পরিষদ কক্ষে মুশতাক, তার মন্ত্রী পরিষদ ও ওসমানীর সাথে খালেদের নানা প্রশ্নে তুমুল বিতর্ক চলছিল। কক্ষের বাইরে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ উল্লাহ পায়চারি করছিলেন ও হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে কাঁদছিলেন। আমার সাথের একজন জিজ্ঞেস করল কী ব্যাপার তাকে খুব বিষণ্ন ভীত ও হতাশাগ্রস্ত দেখাচ্ছে। তিনি উত্তর দিলেন, "কী হয়ে গেল, কী হয়ে গেল।" ইতোমধ্যেই সন্ধ্যার পরে ৪তম বেঙ্গল থেকে কর্নেল গফফার কেঃ তাজ, কেঃ হাফিজ, মেজর হাফিজ উদ্দিন, মেজর ইকবাল, কর্নেল মালেক, কেঃ হুমায়ুন, কর্নেল শাফায়াত জামিলের নেতৃত্বে বঙ্গভবনে আসল। আমরা সবাই সরাসরি ঢুকে পড়লাম মন্ত্রী পরিষদের সভাকক্ষে। প্রায় সবার হাতে স্টেনগান, পিস্তল রয়েছে। সবাই তেড়ে গেল মুশতাক ও মন্ত্রীদের দিকে। অনেকে চিৎকার করে বলল, "You have seen Dalim – you have not seen Fathers of Dalim" অনেকে আবার চিৎকার করে বলতে থাকল, "You Bloody killers, we shall not spare you" আবার কয়েকজন বললেন, "কিসের সমঝোতা? কোনো সমঝোতা চলবে না। জেল হত্যার ব্যাপারে এখনই এই মুহূর্তে আমরা জানতে চাই এবং এর দায় দায়িত্ব কাউকে না কাউকে অবশ্যই নিতে হবে।" মুশতাক চেয়ারে বসেছিলেন, তার চারপাশে যে মন্ত্রীরা বসা ছিলেন তাদের অধিকাংশই চেয়ার ছেড়ে তখন তাদের সামনের টেবিলের নিচে অবস্থান গ্রহণ করে চিৎকার করে বলছিল, "আমরা না আমরা না, আমরা কিছু জানি না। জেল হত্যার প্রতিবাদে আমরা পদত্যাগপত্র দিয়েছিল, ঐ দেখেন এগুলো মুশতাকের সামনে আছে।" আসলে তখন মুশতাকের সামনের টেবিলের উপর কিছু দরখাস্ত ছিল। জেনারেল ওসমানী দিক-বিদিক ছুটাছুটি করছিলেন ও আগত অফিসারদেরকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করছিল। কারণ পুরো কক্ষের মধ্যে হইচই ও উত্তপ্ত বাক্য ব্যবহার হচ্ছিল একতরফাভাবে। অনেকে আবার স্টেনগান কক করে গুলি করার উদ্যোগ নিচ্ছিল। কক্ষের ভিতরে চলছিল অফিসারদের এক তরফা হুমকি ও গালিগালাজ। এক পর্যায়ে জেল হত্যা সম্পর্কে মুশতাককে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করা হলো তিনি স্বীকার করলেন, দু'দুবার জেল কর্তৃপক্ষের নিকট তিনি টেলিফোন করছিলেন এবং পুরো ব্যাপারটি সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন। তখন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে জেলার ছিলেন সম্ভবত ফরিদপুর নিবাসী মিন্টু করে এক ব্যক্তি।

রাত আস্তে আস্তে বাড়তে থাকল এবং মোটামুটি কয়েকটি সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হল। খালেদকে পদোন্নতি দিয়ে সেনাপ্রধান করা হলো, মুশতাককে বঙ্গভবনের উপরে একটি কক্ষে গৃহবন্দি করে রাখার সিদ্ধান্ত হলো। আমাকে ও ক্যাপ্টেন দীপককে দায়িত্ব দেওয়া হলো মুশতাককে Escort সহকারে ঐ কক্ষে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আমি ও ক্যাপ্টেন দীপক তাই করলাম। মুশতাককে রুমে রেখে ক্যাপ্টেন দীপককে দায়িত্ব দিয়ে আমি ঐ কক্ষ ত্যাগ করার আগে মুশতাককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এখন আপনার চিন্তা ভাবনা কী? মুশতাক ঠান্ডা মাথায় বিচলিত না হয়ে আমাকে উত্তর দিল, "Wait and see." তখন আমি বুঝলাম, এই লোকটি কোনো সহজ ব্যক্তি নয়। মনে হচ্ছিল তার ষড়যন্ত্র তখনও শেষ হয়নি। আমি নিচে নেমে আসলাম। সভাকক্ষে তখন মুশতাকের মন্ত্রীদেরকে পরবর্তী সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করতে বলা হলো। আমরা কয়েকজন আফসার খালেদকে রেডিও বন্ধ না রাখার জন্য পরামর্শ দিলাম এবং এও বলা হলো, Draft তৈরি আছে আপনি জাতির উদ্দেশে কিছু বলতে পারেন অথবা আপনার পক্ষ থেকে আমাদের একজন রেডিওতে ঘোষণা পাঠ করতে পারে। উত্তরে খালেদ মোশাররফ বললেন, "You want to be another Dalim" তিনি আরো বললেন, "বিচারপতি সায়েমের ব্যাপারে আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি দায়িত্ব দেওয়ার জন্য। সায়েম অথবা তার জায়গায় নতুন যিনি দায়িত্বে আসবেন তিনিই দেশবাকির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন। অপেক্ষা কর সব ঠিক হয়ে যাবে।" ঐ রাতে বিচারপতি গায়েম দায়িত্ব গ্রহণে তার সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। প্রায় সারারাত সবাই বঙ্গভবনে ছিল। অনেক রাজনীতিবিদ বিশেষ করে আওয়ামী লীগের অনেক নেতা সে রাতে বঙ্গভবনে খালেদকে টেলিফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলেন। খালেদ খুব ঠান্ডা মাথায় সব কিছুর মোকাবেলা করেছিলেন। ৩রা নভেম্বরের এই অভ্যুত্থানের পেছনে কোনো রাজনৈতিক সমর্থন আছে বা নতুনভাবে সমর্থন প্রয়োজন, খালেদের কমকাণ্ড এবং পদক্ষেপগুলোতে এ ধরনের কোনো আভাস যাতে না থাকে সে ব্যাপারে খালেদ খুব সর্তক ছিলেন এবং অন্যদেরকেও খুব সতর্ক করে দিয়ে ছিলেন। কারণ তা না হলে সেনাবাহিনীর ভিতর ও বাইরে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে। খালেদ ব্যক্তিগতভাবে বঙ্গবন্ধুর একজন ভক্ত ছিল এবং আওয়ামী লীগের প্রতি কিছুটা দুর্বলতা ছিল। আওয়ামী লীগের অনেক নেতার সাথে তার সুসম্পর্ক ছিল। এজন্য খালেদ আরোও বেশি সতর্কতা অবলম্বন করছিলেন। খালেদ যদি টিকে যেতেন এবং দেশে যদি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া শুরু হতো, সে অবস্থায় আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে অবশিষ্ট ষড়যন্ত্রকারীরা (যারা পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে দল ছেড়ে গেল) কোণঠাসা হয়ে পড়ত এবং শেখ সাহেবের বিশেষ অনুগত নেতা-কর্মীরা আবার নতুনভাবে

সুসংগঠিত হওয়ার সুযোগ পেতেন। তখন এদের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী হতো জাসদ, ন্যাপ ও বাম পন্থীরা।

৪ঠা নভেম্বর বঙ্গভবনে প্রায় শেষ রাতে সিদ্ধান্ত হলো মঞ্জু ও তাহের ঠাকুরকে বঙ্গভবন থেকে সরাসরি জেলে পাঠানো হবে এবং বাকিদেরকে নিজ নিজ বাসায় ফিরে যাওয়ার জন্য অনুমতি দেওয়া হলো। তবে শর্ত ছিল যে, কেউ বাসা ছেড়ে যেতে পারবেন না, এ ব্যাপারে সরকারেরও নজর থাকবে। রাত শেষ হয়ে গেল। নতুন দিনের আলো উঁকি দিল। সবাই ফিরে গেলেন নিজ নিজ অবস্থানে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান (বীর উত্তম)

বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা ঘোষণা প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলতে হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধের পরবর্তী সামরিক বাহিনীতে '৭৫ এর ৩রা নভেম্বর অভ্যুত্থানের পর সেনাবাহিনী হতে অবসরের পর থেকে অদ্যাবধি আমি দেশের রাজনীতির সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত আছি। তাই নিরপেক্ষভাবে উল্লেখ করব যে, '৭৫ সাল পর্যন্ত সেনাবাহিনীতে থাকাকালীন এবং পরে জিয়ার সাথে রাজনীতিতে জড়িত থাকা অবস্থায় বঙ্গবন্ধু নিয়ে কোনো বিতর্ক দেখিনি। এমনকি জিয়াও তার শাসনামলে এ নিয়ে কোনো বিতর্ক করেননি। নিজেও ব্যক্তিগতভাবে "বঙ্গবন্ধু" নিয়ে কোনো কটাক্ষ করেননি। আমি লক্ষ করেছি পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধুকে যতই দলীয়করণ করার প্রয়াস বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং পাশাপাশিভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিতর্ক হচ্ছিল, তখনই রাজনৈতিক কারণে বঙ্গবন্ধুকে মানা না মানা প্রশ্নটি স্বাভাবিক আলোচনায় এসে পড়ে। কে আগে বা কে পরে ঘোষণা দিয়েছিল সেই বিতর্কের ঊর্ধ্বে উঠে বলব শেখ সাহেবের পক্ষ থেকে জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা পাঠ শুধু স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এর আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক রয়েছে তার সাথে মিলিয়ে বিবেচনা করলে দেখা যাবে জিয়ার এই ঘোষণার পেছনে বিরাট ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। তৎকালীন এপিআর ও পাক বাহিনীতে অসংখ্য বাঙালি অফিসার সৈনিক ছিল। এদের স্বাধীনতা যুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে অংশগ্রহণের ব্যাপারে বা করণীয় সম্পর্কে স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালীন সময়ে (অর্থাৎ যুদ্ধের আগ মুহূর্তে) কোনো সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক আহ্বান বা বাঙালি অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যে কোনো পূর্ব পরিকল্পনা ছিল না। তা হয়তো সে সময়ে প্রকাশ্যে সম্ভবও ছিল না। প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক আহ্বান ও হয়তো প্রত্যাশিত ছিল না। জিয়া তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে চাকরিরত সিনিয়র অফিসারদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। সবার নিকট তার গ্রহণযোগ্যতাও ছিল তুলনামূলকভাবে বেশি। তাই সেদিন কালুর ঘাট থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে একজন

সিনিয়র বাঙালি সেনা অফিসারের স্বাধীনতার এই ঘোষণা পাঠ একদিকে যেমন দেশবাসী শুনে অনুপ্রাণিত হয়েছিল, পাশাপাশি পাকবাহিনীতে ও ইপিআর-এ চাকরিরত হাজার হাজার বাঙালি সৈনিক ও অফিসারকে নতুনভাবে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে বাড়তি অনুপ্রেরণা যোগান দিয়েছিল। অফিসারেরা সেদিন বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে জিয়ার এই ঘোষণা পাঠকে তাদের জন্য যুদ্ধে অংশগ্রহণের একটি আনুষ্ঠানিক আহ্বান হিসেবেও ধরে নিয়েছিলেন। এই ঘোষণায় আরো পেয়েছিলেন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ও নির্দেশ।

আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই যে সেদিন মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী আমরা সবাই জিয়ার এই ঘোষণাকে বঙ্গবন্ধু থেকে পৃথকভাবে বা বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনা করিনি। স্বাধীনতার ইতিহাস বিকৃত না করতে চাইলে বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে জিয়ার এই ঘোষণা পাঠ ইতিহাসে অবশ্যই উল্লেখ থাকবে। বিভিন্ন অপ্রত্যাশিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জিয়ার ক্ষমতার অধিষ্ঠিত হওয়া, তার শাসনামলে সেনাবাহিনীতে অসংখ্য স্বীকৃত ও অস্বীকৃত অভ্যুত্থান এবং এসব অভ্যুত্থানের কারণে অসংখ্য সেনা ও বিমান সদস্যের হত্যা, ফাঁসি, জেল-জুলুম এসব কিছুর উর্ধ্বেও স্বাধীনতা যুদ্ধে জিয়ার ভূমিকা ও ঘোষণা বিতর্কিত হওয়া উচিত নয়। স্বাধীনতার পর ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত শেখ সাহেবের জীবদ্দশায় জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনীর Deputy Chief হিসেবে সরকারের অধীনে একজন উচ্চপদস্থ সেনা অফিসার ছিলেন। তাই ঘোষণা সম্পর্কে বর্তমান বিতর্ক ঐ সময়ের মধ্যে সহজে মীমাংসা করা সম্ভব ছিল। আসলে ঐ সময়ে এ ঘোষণা নিয়ে এত বিতর্কও তিক্ততা ছিল না। তখন বাংলাদেশের রাজনীতিতে বি.এন.পির আত্মপ্রকাশই ঘটেনি এবং মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তিগুলোর মধ্যে বিভক্তি বা অন্তর্দ্বন্দ্ব যাই থাকুক না কেন, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে কোনো তর্ক-বিতর্ক ছিল না। সময়ের বিবর্তনে বঙ্গবন্ধুর হত্যা, দেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন, জিয়াউর রহমানের ক্ষমতায় আসা, বি. এন. পির আত্মপ্রকাশ এবং মুক্তিযোদ্ধারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যাওয়ায় নিজ নিজ দলের বা গোষ্ঠীর রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষার কারণে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস রচনায় সমন্বয়ের ও সততার অভাব সৃষ্টি হয়। স্বাধীনতার দুই যুগ অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর বঙ্গবন্ধু ও জিয়ার অবর্তমানে স্বাধীনতার সঠিক ইতিহাসের স্বার্থে এ সব প্রশ্নে রাজনৈতিক বিতর্ক ও সমালোচনা না থাকাই সমীচীন।

ইতিহাসে কারো অবদানকে খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। '৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে নিয়ে '৭১ এর স্বাধীনতা যুদ্ধ পর্যন্ত এই দীর্ঘ মুক্তির সংগ্রামে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং সেই পথ ধরেই এবং তাঁর আহ্বানেই সবাই স্বাধীনতার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল।

মুক্তিযুদ্ধে এটা যেমন সত্য তেমনি এটাও সত্য যে জিয়াউর রহমান মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা সরকারের অধীনে একটি সেক্টরের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বের স্বাক্ষর রেখেছিলেন এবং সরকার কর্তৃক বীর উত্তম খেতাবে ভূষিত হয়েছিলেন। জিয়ার কালুরঘাট থেকে ঘোষণা ঐ সময়ে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। তাই ইতিহাসে "বঙ্গবন্ধু" বঙ্গবন্ধুর জায়গায় থাকবেন, "জিয়াউর রহমান" জিয়াউর রহমানের জায়গায় থাকবেন। এতে করে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসও সঠিক ধারায় প্রবাহিত হবে। জিয়াউর রহমান যদি বাংলাদেশের রাজনীতিতে আত্মপ্রকাশ না করতেন এবং দেশের প্রেসিডেন্ট ও বি. এন. পির প্রতিষ্ঠাতা না হতেন, তাহলে হয়তো এই ঘোষণাসহ অন্যান্য প্রসঙ্গ নিয়ে অন্যরা এত বিতর্কের অবতারণা করত না। বি.এন.পির সমর্থকেরাও রাজনৈতিক কারণে বঙ্গবন্ধুর বিশাল অবদানকে খাটো করে দখতে না। মুক্তিযোদ্ধারা রাজনৈতিকভাবে যে যেখানেই থাকুক না কেন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত হোক, মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস দলীয়করণ হোক এটা কেউ প্রত্যাশা করে না। উপরে উল্লেখিত স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে আমার এই মূল্যায়নের সাথে কারো শাসনামলে রাষ্ট্র পরিচালনায় রাজনৈতিক সফলতা বা ব্যর্থতার কোনো সম্পর্ক নেই। মাঝে মধ্যে অনেক রাজনৈতিক নেতা তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে অন্যান্য দলে বিভক্ত মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন অরাজনৈতিক মহল যেমন সেনাবাহিনী, বিডিআর, পুলিশসহ বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন ও মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী অনেক ব্যক্তিত্বের অবদানকে সঠিক মূল্যায়ন না করে নিজের অথবা নিজ দলের অবদানকে এককভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের একক দাবিদার সেজে বসেন। এতে করে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চরমভাবে বিকৃত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য দলমত নির্বিশেষে সাড়ে সাত কোটি বাঙলিকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। সেইদিন সেই পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগ ছাড়াও অন্যান্য দলীয় অনেক নেতা ও কর্মী স্বাধীনতার সমর্থক জনগোষ্ঠী, পাক সেনাবাহিনীর বাঙালি সৈনিক, ইপিআর এবং পুলিশ বাহিনীর বাঙালি সদস্যরাও ব্যাপকভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল। তখনও কিন্তু জাসদ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টি বাংলাদেশের রাজনীতিতে আত্মপ্রকাশ করেনি। বঙ্গবন্ধু আরো আহ্বান জানিয়েছিলেন, "আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলতে।" সেই আহ্বানেও সর্বস্ত রের জনগণ সাড়া দিয়েছিল। এটা নির্ভেজাল সত্য যে, আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক নেতৃত্বে এ যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল, প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এ দলেরই নেতৃত্বে মুজিবনগরে স্বাধীন বাংলা সরকার, যার অধীনে এগারোটি সেক্টর এবং

কে, জেড ও এস ফোর্সের অধীনে বেঙ্গল রেজিমেন্টগুলো যুদ্ধের মূল চালিকা শক্তি হিসেবে দেশের বিভিন্ন রণাঙ্গনে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিল। এর পাশাপাশি মুজিব বাহিনী ও কাদেরিয়া বাহিনী তাদের ভূমিকা পালন করেছিল। এদের সবার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে আঞ্চলিক ও সেক্টর ভিত্তিতে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও তালিকা প্রণয়নের উদ্যোগের মাধ্যমে শুধু মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস ও সঠিক তালিকা প্রণয়ন সম্ভব। একথাটি আমি পুনরায় এখানে উল্লেখ করলাম এজন্য যে, অদ্যাবধি এ ধরনের কোনো প্রয়াস গ্রহণ করা হয়নি। বর্তমানে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ উল্লেখিত এই ফোর্সেস ও বাহিনীগুলোর সক্রিয় সগযোগিতা ছাড়া এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে কোনো ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে সক্ষম নয়। যখন যেই সরকারই ক্ষমতায় আসে, তারাই মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন, মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস প্রণয়নের অঙ্গীকার করেন যা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রেডিও ও টেলিভিশনের বক্তব্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে যায়। আমাদের অন্যতম ঐতিহ্য এই মুক্তিযুদ্ধ এবং এর চেতনাকে সমুন্নত রাখতে হলে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সবাইকে রাজনৈতিক সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে একতাবদ্ধ হতে হবে। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে এবং যুদ্ধের পর পর আমরা রণাঙ্গনের সাথিরা চিন্তা-চেতনায়, হাসি কান্নায় একই আবেগ-অনুভূতিতে ছিলাম একাকার। শহীদের স্বপ্ন–সাধ বাস্তাবায়নে সবাই ছিল দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধ ছিল সবার অহংকার। আজ দুঃখের সাথে বলতে হয় সময়ের বিবর্তনে আমরা ঐ সঙ্গীরা রাজনৈতিক কারণে অনেক ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছি। সেই দিনের আবেগ অনুভূতিতে ও যৌথভাবে দেশ গড়ার প্রতিশ্রুতি পালনে দেখা দিয়েছে ঘাটতি। সেই অপরাধ হয়তো আমাদের। বাংলাদেশে যত অভ্যুত্থান এবং পাল্টা অভ্যুত্থান হয়েছে, আমরাই একে অন্যের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছি। মুক্তিযোদ্ধারাই মুক্তিযোদ্ধাদেরকে হত্যা করেছে, ফাঁসি দিয়েছে। কোনো স্বাধীনতা-বিরোধী চক্র এসব ঘটনার সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল না। এ দুর্ভাগ্য দেশ ও জাতির।

রণাঙ্গনের স্মৃতির পাতা থেকে (টুকিটাকি)

(১) সম্ভবত মে/জুন '৭১ ভারতের পাহাড়ে আমাদের রাজ নগর

প্রশিক্ষণ ক্যাম্প এর কিছু অদূরে রাজনগর বিলোনিয়া সড়কের (ভারতের বিলোনিয়া) উপর আমার দেখা হলো কাজী জাফর আহমদের সাথে। তার সাথে আমার পূর্ব পরিচয় ও আত্মীয়তা ছিল সেই সুবাধে তিনি আমার নিকট বিলোনিয়া পর্যন্ত যাওয়ার জন্য জিপ চাইলেন এবং অনুরোধ করলেন তার সাথে যারা ছিল তাদেরকে যেন ভিতরে গিয়ে Operation করার জন্য কিছু অস্ত্র দেওয়া হয়। কাজী জাফরকে জিপ দিয়ে বেলানিয়া পাঠিয়ে দিলাম। সেখান থেকে তিনি চলে গেলেন আগরতলা। ঐ যুবকদেরকে পরবর্তীতে কিছু Grenade ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে

সহযোগিতা করেছিলাম। কিন্তু যুদ্ধের পরে এদের কারো সাথে আমাদের আর দেখা হয়নি।

(২) যুদ্ধের শেষ লগ্নে অক্টোবর মাসে ভারতের রাজনগর চৌত্তাখোলার মাঝামাঝি স্থানে রাস্তায় দেখা হয়ে গেল আ.স.ম. রবের সাথে। তিনি আমাকে বললেন আমাদের কিছু সংখ্যক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুজিববাহিনীর ছেলেরা ভিতরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রুপে প্রবেশ করবে আপনি প্রয়োজনীয় সাহায্য করবেন। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম এদের অবস্থান আমাদের জানা দরকার এবং এদের ভূমিকা ও ভিতরে যুদ্ধে লিপ্ত মুক্তিবাহিনীর সাথে এদের যোগাযোগ ও সমন্বয় কী ধরনের হবে। প্রথমে তিনি আমার কথায় চটে গিয়ে উত্তর দিলেন, আপনার তা জানার দরকার নেই– ওরা বাংলাদেশের ভিতরে যাবে যেন অসুবিধা না হয় সেই ব্যাপারে আপনি সহযোগিতা করবেন।

আমি তাকে বলেছিলাম আমি স্বাধীন বাংলা সরকার কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত বৃহত্তম নোয়াখালীর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার তথা ২ নং সাব সেক্টর কমান্ডার তাই অবশ্যই আমার অধিকার রয়েছে সব জানার, এছাড়া আপনার পরামর্শ শুনতে আমি বাধ্য নই। যাই হোক যেহেতু আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একই তাই সমঝোতার ভিত্তিতে কথা বলুন এবং অনুরোধ করলে অবশ্যই সহযোগিতা পাবেন। একথা শুনে তিনি আমার সাথে আলিঙ্গন করলেন এবং বললেন– তাহলে আমি যাই আপনি এদের ভিতরে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেবেন। আ.স.ম রবকে সেদিন আমি সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে বিদায় জানালাম।

(৩) বিলোনিয়া যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে একদিন শত্রুর আর্টিলারি সেলিং শেষে ব্যাঙ্কার থেকে বেরিয়ে পেছনের অবস্থান পরিদর্শনে যাই। এক পুকুরের পাড়ের ঢালে এক শ্রমিক মুক্তিযোদ্ধা (নাম মনে নেই) দুই পা ছড়িয়ে করে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে বসেছিলেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম এখানে কী করছ? সে তার দুই পায়ের কয়েক হাত দূরে ধান ক্ষেতের মধ্যে একটি জীবন্ত আর্টিলারি সেল অর্ধেক ক্ষেতের কাদা মাটির ভিতরে সেলের বাকি অংশ বাইরে কিছুটা হেলান অবস্থায় অবিস্ফোরিত দণ্ডায়মান ছিল। সে আমাকে ঐ সেল দেখিয়ে প্রশ্ন করল "স্যার এটা যদি বিস্ফোরিত হতো তা হলে কী হতো?" আমি উত্তরে বলেছিলাম তোমাকে খুঁজে পাওয়া যেত না– তাৎক্ষণিক সে দাঁড়িয়ে আমাকে বিনীতভাবে বলল– "স্যার আমাকে আর খুঁজে পাবেন না– আমি চললাম" বলে পিছনে দ্রুত হেঁটে গ্রামে ঢুকে নিমিষে যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। মনে হচ্ছিল সে সিলিং এর সময় ঐ ঢালে বসা ছিল এবং ঐ সেল বিস্ফোরিত না হওয়ায় সেলের দিকে এক ধ্যানে তাকিয়ে ছিল এবং হতভম্ব হয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়েছিল– আমি তার সেই ধ্যান ভেঙে ছিলাম। সে যে ঐ গেল সত্যিই আর কোনোদিন আসেনি। যুদ্ধের

অনেক পরে একদিন আমার সাথে তার দেখা হয়েছিল। জিজ্ঞেস করেছিলাম কোথায় ছিলে। উত্তরে বলেছিল "স্যার অসুস্থ অবস্থায় বাড়িতেই ছিলাম। আসলে মনে কিছু করেননি তো"! আমার বৃদ্ধ মাতা পিতা ছোট ভাই বোনের সাথে বাকি ৬ মাস কাটিয়েছি।"

(৪) '৭১ সেপ্টেম্বর মাসে একদিন খালেদ মোশাররফ মীর্জা নগর ইউনিয়নের সুবার বাজার মুক্ত এলাকা পরিদর্শনে আসেন। বাজারে শত শত লোক তাকে দেখার জন্য একত্রিত হয়। এক পর্যায় জনগণ কিছু বলার জন্য খালেদকে অনুরোধ জানান। বক্তব্য শুরু করার আগে আমি জনতার সম্মুখে খালেদকে কর্নেল খালেদ মোশাররফ বলে সম্বোধন করি এবং কিছু বলার অনুরোধ জানাই। বক্তব্যের পর খালেদ সহাস্যে জিজ্ঞেস করলেন– "কী ব্যাপার আমাকে তুমি কর্নেল পদে কবে থেকে প্রমোশন দিলে।" আমিও রসিকতা করে বললাম– "স্যার, আপনাকে কর্নেল পরিচয় না করিয়ে দিলে আমি কী করে মেজর পরিচয় দেব।" সাথে সাথে আমাদের সহকর্মীরা সবাই অট্টাহাসিতে মেতে উঠল।

(৫) মুক্ত এলাকা থেকে এসেছিলাম রাজনগর, নোয়াখালীর অন্যান্য অঞ্চলে গ্রুপ প্রতিনিধিদের মাধ্যমে অস্ত্রশস্ত্র ভিতরে পাঠানো এবং ভারতের বিএসএফ ও সেনাবাহিনীর প্রতিনিধিদের সাথে সমন্বয় করার জন্য। হঠাৎ কয়েকজন বিএসএফ সদস্য এসে আমাকে অভিযোগ দিলেন এই বলে যে, "আপকা ক্যাম্প-এর মুক্তিবাহিনী হামারা মাকো মার দিয়া।" আমি চিৎকার দিয়ে আমার সিকিউরিটি গার্ডকে নির্দেশ দিলাম যে, মেরেছে 'মা' কে তাকে ধরে নিয়ে এসে প্রকাশ্যে গুলি করে মেরে ফেল। তাৎক্ষণিক ওকে এনে সিকিউরিটি গার্ড গাছের সাথে বেঁধে আমার চূড়ান্ত নির্দেশের অপেক্ষায় ছিল। আমি বিএসএফ সদস্যদের সান্ত্বনা দিচ্ছিলাম এই বলে যে, "এটা Unchalenged যাবে না। আর আপনারা নিজেরাও এর বিরুদ্ধে অ্যাকশান যদি নিয়ে নিতেন আমি খুশি হতাম।" সেই মুহূর্তে আমাদের মধ্যেকার সম্পর্ক ঠিক রাখার খাতিরে অবশ্যই আমাকে কঠোর মনোভাব নিতে হয়েছিল। এরই মধ্যে আমার সিকিউরিটি গার্ড কমান্ডার নায়েব সুবেদার আব্দুর রশিদ আমাকে কানের কাছে এসে বললেন স্যার, ওরা কয়েকজন জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে গরু জবাই করেছিল, বিএসএফ-এর উঁচু Tower থেকে প্রহরী দেখে BSF Camp এ এই খবর দিয়েছে। ঐ গরু জবাইকেই তারা মাকে হত্যা করেছে বলে বলছে। বিএসএফ সদস্যরা দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিল যে Guard কমান্ডার কিছু বলছে, আমি শুনে আরো উত্তেজিত হয়ে উঠি এবং চিৎকার করে বললাম– বাকিদেরকেও গাছের সাথে বাঁধ এবং কয়েকজনকে দিয়ে Firing Squad Ready করতে বললাম এবং সাথে সাথে Guard কমান্ডারকে ডেকে গোপনে বললাম, বিএসএফ সদস্যদেরকে গিয়ে বল (আমার Reference না দিয়ে) "স্যার, খুব

গরম প্রকৃতির লোক সবাইকে মেরে ফেলবে– এই ঘটনা আর হবে না– তোমরা স্যারকে অনুরোধ করে একে বাঁচাতে পার।" তাকে আরো বললাম যদি তারা রাজি হয় আমাকে ইঙ্গিত দেবে। তাই হলো। আমি ইশারা পেলাম Guard কমান্ডার থেকে তখন আমি নিজেই Chines Stan Gun কাঁক করে দোষীদেরকে ফায়ার করতে উদ্যোগ নিলাম এবং চিৎকার করে বলতে থাকলাম তোমাদেরকে আমার আর দরকার নেই– সেই মুহূর্তে আমাদের লোকজন বিএসএফ সদস্যদেরকে জড়িয়ে ধরে অনুরোধ জানাচ্ছিল এই বলে যে স্যারকে থামান, থামান, এদেরকে বাঁচান। তারা তাই করল। বিএসএফ সদস্যরা আমার কাছে এসে এবারের মতো স্যার, মাপ করে দিতে অনুরোধ জানাল। আমি কিছুটা শান্ত হয়ে বললাম– না, না, এ হয়না কিছুক্ষণ পর নির্দেশ দিলাম এদেরকে রণাঙ্গন Banker এ পাঠিয়ে দাও।

(৬) রাজনগরে আমাদের একটি রাজাকার ক্যাম্পও ছিল– সংখ্যায় প্রায় ১০০ এর মতো। তাদেরকে দিয়ে ক্যাম্প-এর পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও মুক্তিযোদ্ধাদের খাওয়া পাকানো, কাপড় ধোয়া ও অন্যান্য কাজ কর্মে ব্যবহার করতাম। একদিন ধরা পড়ল শালধরের হাসু রাজাকার, বয়স তখন তার ২০/২১ বছর হবে। ছেলেটি আমার পায়ে পড়ে কান্নাকাটি শুরু করল ছেড়ে দেওয়ার জন্য। আমি তাকে শর্ত দিলাম যে, অদূরে যে শালধর–এ ১৫ বেলুচ রেজিমেন্টের ক্যাম্প রয়েছে সেখানে তুমি সন্ধ্যার পর পৌঁছে ১০০/২০০ গজ দূরে থেকে ক্ষেতের মধ্য দিয়ে Crawling করে ১৫/২০ গজের মধ্যে পৌঁছে গ্রিনেড নিক্ষেপ করে আসতে পারলে ছেড়ে দেব– তবে তোমার পেছনে আমাদের ১০/১২ জনের Protection Party থাকবে। যদি তারা তোমার আগমন বুঝে Firing শুরু করে আমাদের Protection Party LMG ও Chines রাইফেল দিয়ে তোমার পিছন থেকে Covering Fire দেবে ক্যাম্প এর উপর, তুমি তখন বামে বা ডাইনে গিয়ে পিছনে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে আসবে। কাজটি খুব সাবধানে করতে হবে। জিজ্ঞেস করলাম পারবে তো? সে অশ্রু সজল নয়নে বলল পারব স্যার। আরো বলল "স্যার আমাদের সবাই সমান মনমানসিকতার লোক নয়– আমরা অনেকে যুবতি বোন, বৃদ্ধ পিতা–মাতা, ভাইদের বাঁচানোর জন্য বাধ্য হয়ে হয়তো তাদের কিছু নির্দেশ পালন করি– আমরাও দেশেকে ভালোবাসি।" আমি বললাম Operation টা করে আস দেখা যাবে কতদূর দেশকে ভালোবাস।

সেদিন ঐ হাসু কয়েক মাইল পায়ে হেঁটে ৩০০/৪০০ গজ দূর থেকে ক্রলিং করে আমাদের Protection Party-র ছত্র ছায়ায় খুব নিকট থেকে শত্রু ব্যাঙ্কারে পর পর দুটি গ্রেনেড চার্জ করে এসেছিল এবং এতে তাদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। পরে হাসুকে ক্যাম্প এ রান্নার দায়িত্বে রেখে দিয়েছিলাম। আজ আমি যখন দেশের বাড়িতে যাই হাসু এসে পা ধরে সালাম করে এবং তার

পরিবারের পক্ষ থেকে সালাম জানায়– অত্যন্ত বিনীত সুলভের হাসু স্বাধীনতার পর বিজয় মিছিলে তার হাতে সোভা পেয়েছিল বাংলাদেশের পতাকা।

(৭) সেপ্টেম্বর '৭১ ঢাকা থেকে আমার স্ত্রী নূর মহল বেগম আমার শ্যালক ওবাইদুল হক আমার মামা এনামুল হকসহ কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামের উদ্দেশে রওয়ানা দেন। পথে বিভিন্ন জায়গায় পাক হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগী ফোর্স বাস চেক করে। মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের আগে আমি সর্বশেষ কুমিল্লা সেনানিবাসে চাকরিরত ছিলাম তাই এই অঞ্চলের কোনো অফিসার অথবা সেনা সদস্য চিনে ফেলতে পারে। সেজন্য আমার স্ত্রী বোরকা পরা অবস্থায় ছিল। যতবার বাস চেক হচ্ছিল সবার মধ্যে চরম আতঙ্ক বিরাজ করছিল এই চিন্তায়, যে কোনো মুহূর্তে কেউ সন্দেহ করে ধরে নিয়ে যেতে পারে। সর্বশেষ তল্লাশি করেছিল কুমিল্লা সেনানিবাসের মেইন গেট-এ সামরিক পুলিশ। আল্লাহর রহমতে কোনো জিজ্ঞাসাবাদ ছাড়াই রেহাই পেলেন। সন্ধ্যার দিকে পৌছলেন চৌদ্দগ্রাম এলাকায় সেখান থেকে গ্রামীণ রাস্তা দিয়ে খাড়ঘর গ্রামে আত্মীয়ের বাড়িতে পৌছেন ও রাতে ঐ বাড়িতেই অবস্থান নেন। পরের দিন আমার শ্যালক ও মামা গ্রামীণ রাস্তা দিয়ে চৌদ্দগ্রাম বাজার থেকে কয়েক মাইল অদূরে জগন্নাথ দিঘির কিছু দূর ঢাকা চট্টগ্রাম বিশ্বরোড এর পাশ থেকে ভারতে যাওয়ার রাস্তার অবস্থান ও পরিবেশ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন। ঐ অঞ্চল দিয়ে বিশ্ব রোড অতিক্রম করলে ভারত সীমান্ত প্রায় আধ মাইল আবার কোথাও কোথাও আরেকটু কম হবে। ফেনী থেকে চৌদ্দগ্রাম পর্যন্ত বিশ্ব রোডে প্রায় প্রত্যেক ২০/৩০ মিঃ পর পর পাক বাহিনীর মোবাইল পেট্রোল টহল দিচ্ছিল। প্রায় পুরো দিন পর্যবেক্ষণ করলেন কখন পাক বাহিনীর টহলের মাত্রা বেশি থাকে এবং কোন কোন সময় কম থাকে, কোন রাস্তায় কম সময় লাগবে এবং কোন পথ দিয়ে সীমান্ত পর্যন্ত বাড়ি ঘর টিলা গাছপালা ও নিচু জমি রয়েছে– সব বুঝে নিয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন পরের দিন সকাল ৯টায় ঢাকা-চট্টগ্রাম হাইওয়ে অতিক্রম করে বাংলাদেশের ভিতর সীমান্ত পর্যন্ত প্রায় ৬০০/৭০০ গজ হবে– এই দূরত্ব পাড়ি দিয়ে ভারত সীমান্তের গাছপালা পরিবেষ্টিত, পাহাড়ি এলাকায় পৌছে যেতে হবে। তখন টহল কম থাকে এবং মোটামুটি অফিসার ও সামরিক অন্যান্য যানবাহন চলাচল ঐ রাস্তায় সেই সময়ে কম থাকবে। পরের দিন নির্ধারিত সময় ৯টার দিকে অতি সাবধানতার সাথে ঢাকা-চট্টগ্রাম হাইওয়ে অতিক্রম করে উঁচু নিচু জমিন দিয়ে ক্ষেতের আইল ধরে অর্ধেক থেকে কিছু বেশি পথ অতিক্রম করার সাথে সাথে তাদেরকে লক্ষ্য করে পাক টহল বাহিনী বৃষ্টির মতো ফায়ারিং শুরু করে। মুহূর্তে তারা মাটিতে শুয়ে পড়েন এবং সম্মুখে ভারত সীমান্তের দিকে ক্রলিং করে এগুতে থাকেন– যেহেতু রাস্তা থেকে সীমান্ত পর্যন্ত এলাকা সমান্তরাল ছিল না উঁচু নিচু জমিন গাছপালা

কোথাও কোথাও ধান ক্ষেত ইত্যাদির মধ্য দিয়ে প্রায় ২০/২৫ মিঃ সময় জীবন বাজি রেখে প্রায় ৩০০ গজের মতো দূরত্ব ক্রলিং করে ভারতের পাহাড়ি এলাকায় ঢুকে পড়েন শত্রুর ফায়ারিং তাদের কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারেনি। এই ৩০০ গজ দূরত্ব অতিক্রমকালে তাদের মাথার উপর দিয়ে ব্রাস ফায়ারের ঝড় বয়ে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল যেন চারদিক থেকে ফায়ারিং হচ্ছে। ঠিক সেই সময়ে কিছু দূরে মুক্তি বাহিনীর ৭/৮ জনের একটি গ্রুপ হাইওয়ে অতিক্রম করে বাংলাদেশের ভিতরে যাওয়ার জন্য ভারত সীমান্ত ছেড়ে এসেছিল– তারা যখন প্রায় হাইওয়ের ২০০/৩০০ গজের মধ্যে ছিল। তখনই চারদিক থেকে দুই গ্রুপকে উদ্দেশ্য করে এই ফায়ারিং হচ্ছিল– ফায়ারিং এ মুক্তিবাহিনীর দুজন শহীদ হয়েছিল– বাকিরা ফিরে এসেছিল। মুক্তিবাহিনী ও তাদেরকে লক্ষ্য করে ফায়ারিং শুরু করেছিল যেন তারা তাদেরকে ধাওয়া না করে এবং তারা যেন নিরাপদে পিছনে চলে আসতে পারে। মুক্তিবাহিনীর সাথে তাদের ঐ মুহূর্তে গুলি বিনিময় আমার স্ত্রী ও শ্যালক এবং মামাকে ভারত সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছতে সহায়তা করেছিল। আমার স্ত্রী, শ্যালক ও মামা অত্যন্ত ক্লান্ত অবস্থায় পাহাড়ের ভিতরে প্রবেশ করে এক বাড়িতে এক ঘণ্টা বিশ্রাম নিয়ে বিএসএফ ক্যাম্প এর উদ্দেশে ভারতের বিলোনিয়া সড়ক বরাবর অগ্রসর হতে থাকেন দুপুরে তারা ডিমাতলী BOP তে রিপোর্ট করেন। আমার পরিচয় জানালে ক্যাম্পে বিএসএফ সদস্যরা তাদেরকে আপ্যায়ন করান এবং বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিয়ে রণাঙ্গনে আমকে খবর পাঠান। খবর পেয়ে আমি তাৎক্ষণিক আসতে পারিনি। সন্ধ্যার দিকে আমি ঐ BOP তে এসে বিএসএফ এর সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার স্ত্রী শ্যালক ও মামাকে নিয়ে জিপে করে বিলোনিয়া হয়ে প্রায় ৭০/৮০ কি. মি. দূরে ভারতের উদয়পুর শহরে পৌঁছয়ে দিয়ে আসি– সেখানে একটি ভাড়া ছোট্ট বাসায় আমার বাবা, মা, বোনেরা আগ থেকেই অবস্থান করছিলেন। ঐ এলাকায় চট্টগ্রামের এম,পি হারুন সাহেব ও নোয়াখালীর মালেক উকিল সাহেবের পরিবারও ছিল। তাদের সাথেও কুশল বিনিময় করে আসি। উদয়পুর ত্যাগের মুহূর্তে আমার বাবা–মা, ভাই-বোন, স্ত্রী আমাকে আলিঙ্গন করে দোয়া করেন এবং সাহস ও মনোবল অটুট রাখার উপদেশ দেন– সেদিনের তাদের সেই অনুভূতি রণাঙ্গনে আমাকে বাড়তি উৎসাহ যুগিয়েছিল।

আমার সাথে শ্যালক ওবায়দুল হককে নিয়ে আসি এবং প্রশিক্ষণের জন্য রাজনগর ক্যাম্প-এ পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। মামাকে বাড়ি পাঠানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম। যুদ্ধের শেষ দিন পর্যন্ত আমার পুরো পরিবার ভারতে উদয়পুরে ছিল। ফেনী বিজয়ের রাতে তারা ফেনী শহরে ফিরে আসলে ফেনী টেকনিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপালের খালি বাসায় তাদেরকে প্রথম ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম।

বিলোনিয়া যুদ্ধের ভয়াবহতা শুনে তারা এক পর্যায় আমার আশা ছেড়েই দিয়েছিলেন– তবুও দেশ স্বাধীন হোক এটাই ছিল তাদের লালিত বাসনা ও স্বপ্ন।

(৮) পরশুরাম যুদ্ধে পাক হানাদার বাহিনীর অনেক সৈন্য হতাহত হয়েছিল। আর যারা জীবন্ত ধরা পড়েছিল এদের মধ্যে ১২/১৫ জনের একটি গ্রুপকে আমার সম্মুখে আনা হয়। নির্দেশ ছিল এদেরকে ইন্ডিয়ান সেনাবাহিনীর নিকট হস্তান্তর করা। ওরা সবাই আমার সম্মুখে এসেই আমাকে তাদের পুরনো ২৪ এফ এফ রেজিমেন্টের অফিসার হিসেবে চিনল এবং অত্যন্ত বিনীতভাবে করুণা ভিক্ষা করল যেন যে কোনো অবস্থায় তাদেরকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর নিকট হস্তান্তর না করি। ওরা ছিল সবাই পাঠান। দীর্ঘদিন তাদের সাথে থেকে কিছু ভাঙা ভাঙা পোস্তু ভাষা শিখেছিলাম। সেই ভাষায় তাদের সাথে কিছু কথা বলে একটা আন্ত রিক পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলাম। তাদের আশ্বস্ত করলাম যে, তাদের নিজস্ব নিরাপত্তার জন্য পাঠাতে হবে। আমি নিজে খোঁজ খবর রাখব যেন অসুবিধা না হয়। তাদেরকে সম্পূর্ণ যুদ্ধবন্দির মর্যাদা দিলাম। তাদেরকে আপ্যায়ন করলাম এবং বলেছিলাম তোমাদেরকে অন্যায়ভাবে আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে– তোমাদের ভয় নেই। সেই মুহূর্তে পাক বাহিনীতে চাকরিরত অবস্থায় তাদের সাথে আমার সম্পর্কের অনেক স্মৃতি বার বার আমাকে আলোড়িত করেছিল।

(৯) যুদ্ধের প্রথম পর্ব থেকে আমার সাথে বিলোনিয়ার বিএসএফ উইং কমান্ডার মেজর প্রধান এর সাথে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। যখন কোনো সামরিক সমন্বয় সভায় বিলোনিয়ায় যেতাম– সভা শেষে তার বাসায় ভাবির রান্না পাক খেতাম।

তিনি তার অধীনে প্রত্যেকটি বিওপিকে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য আন্তরিকভাবে বাড়তি নির্দেশ প্রদান করতেন এবং আমাদের খোঁজ খবর সার্বক্ষণিক রাখতেন। এই অঞ্চলের কিছুদিনের জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার সিধু ও আনন্দ স্বরূপ এর সাথেও আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে উঠে এবং সেই সুবাধে আমি যুদ্ধের প্রথম থেকে তাদের ফোর্সের নিজস্ব মোটর গানগুলো ব্যবহার করার জন্য অনুমতি পেয়েছিলাম। এই অফিসারেরা ছাড়াও ভারত সেনাবাহিনীর দায়িত্বপ্রাপ্ত অনেক অফিসারের সাথে আমার সার্বক্ষণিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আমার অনুরোধে তাদের ব্যক্তিগত ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় মে/জুন থেকে আমরা বিভিন্ন সময় ভারত সেনাবাহিনীর আর্টিলারি সমর্থন পাচ্ছিলাম। পরবর্তীতে জেনারেল হীরা (যুদ্ধের শেষ লগ্নে) এই অঞ্চলের সার্বিক কমান্ডে আসেন। আমিসহ আমাদের ইউনিট অফিসার লেঃ ইমাম, ক্যাঃ শহীদ লেঃ দিদার, লেঃ মিজান, ক্যাঃ মোকলেস এবং ২য় বেঙ্গল থেকে আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসা ক্যাঃ মোর্শেদ সবার সাথে জেঃ হীরা তার ডিভিশন ও

ব্রিগেড ইউনিটগুলোর অফিসারদের সাথে আত্মবিশ্বাসের এক মধুর সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। জেঃ হীরার ডিভিশনাল হেড কোয়ার্টারে আমরা পরশুরাম চিথলীয়া যুদ্ধের বিভিন্ন দিক নিয়ে মডেল আলোচনায় অংশগ্রহণ করি। পাক বাহিনীর কমিশনপ্রাপ্ত পদাতিক অফিসার হিসেবে আমাদের উপর তাদের আত্মবিশ্বাস এতে আরো বেড়ে গিয়েছিল। বিলোনিয়ার বিভিন্ন রণাঙ্গনে যেমন পরশুরাম ফুলগাজী চিথলিয়া ও নীলক্ষী অপারেশনগুলোতে ভারতের রাজপুত, গুর্খা, জাঠ পদাতিক রেজিমেন্টগুলো ছাড়াও জেঃ হীরার ডিভিশনাল আর্টিলারি সমর্থন ছিল সরাসরি। তারা যুদ্ধের শেষদিন পর্যন্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা ছাড়াও গোলাবারুদ, মাইন, ওয়ারলেস সেট ও অন্যান্য সরঞ্জাম দিয়ে আমাদেরকে সাহায্য করেছিল।

জেনারেল হীরার সাথে আমার যে ওয়ারলেস সেট যোগাযোগ ছিল সেখানে পরশুরাম Operation এ Code Name ছিল "শবনাম" (নামটি আমার দেওয়া)। উল্লিখিত অপারেশনগুলোতে এই রেজিমেন্টগুলোর অনেক সৈন্য আমাদের মাটিতে আমাদের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেছিল। শুধু বিলোনিয়া রণাঙ্গণেই এর সর্বমোট সংখ্যা প্রায় ৫০/৬০ জন। অনেকে রাজনৈতিক মূল্যায়নে অনেক কিছু বলে থাকেন। আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি– ভারতের কী লাভ লোকসান হলো তার উর্ধ্বে বলতে হবে ঐ ভারতীয় সৈনিক যাদের তাজা রক্তে স্বাধীন বাংলার মাটি রঞ্জিত হয়েছিল তারা কী পেয়েছেন? নীলক্ষীর যুদ্ধে জাঠ রেজিমেন্টের একটি কোম্পানির প্রায় সৈন্য আহত হয়েছিলেন এবং এক-তৃতীয়ংশ শহীদ হয়েছিলেন। মুক্তি বাহিনীসহ যৌথ এই অপারেশন সেদিন পাক বাহিনীর ১৫ বেলুচ রেজিমেন্ট প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল।

১৬ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম জেঃ হীরা ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের আনুষ্ঠানিক গার্ড পরিদর্শন করেন ও রেজিমেন্টের পতাকা উত্তলন করেন। ১০ বেঙ্গল রেজিমেন্টের পক্ষ থেকে তাকে সর্বশেষ গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়েছিল। বিলোনিয়া রণাঙ্গনসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন রণাঙ্গনে ভারতের সেনাবাহিনীর যে সব সদস্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল এবং যারা জীবন উৎসর্গ করেছিল তাদের সবাইকে আমরা অবশ্যই স্মরণ করব। তাদের অবদান আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে একটি অধ্যায়।

(১০) ৭ই ডিসেম্বর সকালে খবর আসল পাক হানাদার বাহিনী নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর থেকে লাকসাম হয়ে পালিয়ে যাচ্ছে– খবর পেয়ে আমি ১০ম ইস্ট বেঙ্গলের প্রয়োজনীয় ফোর্স নিয়ে নোয়াখালীর উদ্দেশে রওয়ানা হই। পথে চৌমুহনী ঢুকার মুখে রাজাকার আলবদর আমাদের যানবাহনকে লক্ষ্য করে বিচ্ছিন্ন কিছু লক্ষভ্রষ্ট ফায়ারিং করে। আমরা যেদিন থেকে ফায়ার এসেছিল সে অবস্থান লক্ষ্য করে এলএমজি ও মর্টার ফায়ার করি এবং পরে এলাকায় ব্যাপক তল্লাশি

করে কাউকে পাইনি। প্রায় ১ ঘণ্টা পর আমরা আবার চৌমুহনী থেকে নোয়াখালী সদরের উদ্দেশে রওয়ানা দিই। নোয়াখালী ঢুকার মুখে কিছু পরিত্যক্ত বিল্ডিং থেকে আমাদেরকে লক্ষ্য করে প্রচুর ফায়ার আসতে থাকে। আমরা প্রথমে মনে করেছিলাম পাক হানাদার বাহিনী এখনও আছে, পরে জানলাম আলবদর রাজাকারের একটি শক্ত ঘাঁটি ঐ পরিত্যক্ত বিল্ডিংগুলো। আমি ঐ অঞ্চলের পেছন দিক ছাড়া তিন দিকে অবস্থান গ্রহণ করে LMG/Morter ও RR gun Fire এর নির্দেশ প্রদান করি। আমাদের প্রচণ্ড আক্রমণের চাপে তাদের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। অনেকে পেছনের রাস্তা দিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। পরে অবশ্য গ্রামবাসী তাদেরকে ধরে ফেলে। আমি সরাসরি নোয়াখালী সার্কিট হাউজে যাই। সেখানে ছাত্র নেতা বেলায়েতের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধা অন্যান্য সংগঠক ও মুক্তিযোদ্ধারা সার্কিট হাউজে আসেন। আমরা পরবর্তী পরিস্থিতি ও প্রয়োজনীয় আলাপ সেরে ফেনীর উদ্দেশে রওয়ানা হই। ফেনী ঢুকার সময় ট্রাংক রোডের মোড়ে রামপুরের ইলিয়াসসহ তিনটি লাশ ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পাই। জানলাম বিক্ষুব্ধ জনতা ও মুক্তিযোদ্ধারা এদেরকে হত্যা করেছে। আমি ফেনী পৌঁছে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে নির্দেশ প্রদান করি আর যেন কোনো হত্যাকাণ্ড না হয়, আইন যেন কেউ হাতে তুলে না নেয়। যেসব রাজাকার আমি যুদ্ধচলাকালীন আটক করেছিলাম তাদেরকে জেলে পাঠিয়ে দিই। এদের সংখ্যা প্রায় ২০০ জন হবে। ফেনী ঢুকার পর যারা আটক হয়েছিল তাদেরকেও জেলে পাঠানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সবাই প্রশাসন ও রাজনীতিবিদের সমন্বয়ের মাধ্যমে সবকিছু ঢেলে সাজানোর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

(১১) বিজয়ের বেশে আমরা যখন ফেনী প্রবেশ করলাম ক্ষণিকের মধ্যে ফেনী শহরে জনতার ঢল নেমে আসে। শুরু হয় বিজয় মিছিল জয় বাংলা শ্লোগানে শ্লোগানে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। রাস্তায় জনগণ যেখানেই মুক্তিযোদ্ধাদের সাতে সাক্ষাৎ হচ্ছে সেখানেই তৎক্ষণিক তারা আলিঙ্গন করে বিজয় উল্লাসে ফেটে পড়ছিল। অনেকে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদেরকে কোলে করে রাস্তা পরিদর্শন করছিল। রাস্তার দু'পাশ থেকে জনতা দু'হাত নেড়ে অভ্যর্থনা জানাচ্ছিল। মিছিলে মিছিলে শোভা পাচ্ছিল বাংলাদেশের পতাকা। সে এক আবেগ ভরা আনন্দঘন পরিবেশ। অনেককে বিজয়ের আনন্দে কাঁদতে দেখেছি। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে খাজা সাহেব কিছুক্ষণ পর ফেনী পৌঁছেছিলেন। আমার সাথে ১০ম ইস্ট বেঙ্গল ও সেক্টরের মুক্তিবাহিনীর বৃহত্তর অংশ ফেনী প্রবেশ, ভারতের সেনা বাহিনী আমাদের পেছন থেকে আমাদেরকে অনুসরণ করে ও ফেনী অভিমুখে অগ্রযাত্রায় অংশ গ্রহণ করেন। এ ছাড়াও ফেনী কলেজের প্রিন্সিপাল ক্যাপ্টেন মজিবুর রহমান খান, তৎকালীন (ছাত্রনেতা) মুক্তিযোদ্ধা

জয়নাল আবদীন হাজারী, গোলাম কাদের আরো অনেকেই আমাদের সাথে ছিলেন। ফেনীর অন্যান্য অঞ্চল থেকে প্রায় একই সময় শহরে প্রবেশ করে করেছিলেন ভি.পি. জয়নাল, করিম হাজারী, নুর মোহাম্মদ হাজারী, মোঃ সালেহ আহম্মদ সালু, মোতালেব, কাজী নুর নবী, শ্যামল বিশ্বাস, অ্যাডঃ মুসা মিঞা, জাহাঙ্গীর কবির। সবাই সেদিন বিজয়ের আনন্দে একাকার হয়ে গিয়েছিলেন। আমি রাস্তা অতিক্রম করে ফেনী সার্কিট হাউজে আসি সেখানেও জনতার ঢল- শুধু এক নজর আমাদেরকে দেখার জন্য। জনতাকে হাত নেড়ে সার্কিট হাউজের বারান্দা থেকে কেমন আছেন ভালো থাকুন বলে কুশল বিনিময় করি। সন্ধ্যায় জয়নাল হাজারী আমাকে মুজিব বাহিনীর সদস্য, যারা বিভিন্ন রণাঙ্গনে ও ভিতরে ছিলেন তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলার জন্য ট্রাঙ্ক রোডে নিয়ে গেলে ভি,পি জয়নাল, আব্দুল আজিজ সাখী, মেহরাজুল করিম, বর্তমান জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মোতালেব, মোশাররফ, কাইউম, কাজী নূরুন নবীসহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন। আমি তাদের উদ্দেশে আমার বক্তব্য রাখলাম। সন্ধ্যার আগেই ১০ম বেঙ্গল ও মুক্তিবাহিনীকে ফেনী শহরের বাইরে বিভিন্ন পয়েন্টে অবস্থানে সতর্ক অবস্থায় থাকার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। ভারতের সেনাবাহিনী ফেনী কলেজে অবস্থান নেন। ৯ তারিখ যৌথভাবে আমরা জেনারেল হীরার সরাসরি তত্ত্বাবধানে চট্টগ্রামের ব্যাপক অঞ্চল মুক্ত করার লক্ষ্যে ফেনী ত্যাগ করি।

চট্টগ্রাম অপারেশন আমার এই বইতেই বিস্তারিত উল্লেখিত রয়েছে। ১৬ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম মুক্ত হওয়ার পর সম্ভবত ১৭/১৮ ডিসেম্বর হবে চট্টগ্রাম রেডিও থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশে আমি ভাষণ দিয়েছিলাম। চট্টগ্রামে অবস্থান করলে চট্টগ্রাম সেনানিবাসে আমি পাকিস্তান আর্মিতে থাকাকালীন আমার সর্বশেষ ইউনিট ২৪ এফ এফ পরিদর্শন করি তারা সবাই বন্দী অবস্থায়। যখন শুনল আমি দেখা করতে আসছি সবাই ইউনিফরম পরিধান করে সাক্ষাতের জন্য তৈরি হচ্ছিল। সাক্ষাতে দেখলাম সবাই অত্যন্ত বিষণ্ন ও হতাশাগ্রস্ত ও একটি চরম ভয়ভীতির মধ্যে রয়েছে। আমি স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কুশল বিনিময় করলাম। হঠাৎ দেখি আমার Batman সিপাহি কফিল আমার সুটকেস নিয়ে দৌড়ে আসছে এসে বলল- স্যার, আপনার অপেক্ষায় অনেক দিন ছিলাম। আপনার জিনিসপত্র ও ইউনিফর্ম ভর্তি সুইটকেস্‌টি ব্যাটলিয়ান হেড কোয়ার্টারের স্টোর ছিল। আমার মন বলছিল একদিন এটা আমি আপনাকে ফেরত দিতে পারব। আপনাদের শুভ কামনা করি ভালো থাকেন। স্যার, আমাকে ভুলবেন না। আমি আবেগপ্রবণ হয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলাম এই ব্যাটম্যান সিপাহি আমাকে দীর্ঘ এক বছরেরও অধিককাল সেবা করেছে। আমি বিদায় নিয়ে আসার সময় বন্দী অবস্থায় নিরীহ এতিমের মতো দাঁড়িয়ে আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন ব্যাটলিয়ন অফিসার মেজর

আসিফ, মেজর হাদি, ক্যাপ্টেন খাঘওয়ানী ও অন্যরা। আমি জিপে উঠে সর্বশেষ হাত নেড়ে বিদায় জানালাম তারাও হাত নেড়ে বিদায় জানালেন।

মেজর খালেদ মোশাররফ বীর উত্তম এর নেতৃত্বে ২ নং সেক্টর

খালেদের নেতৃত্বে গড়ে উঠল যুদ্ধকালীন সময়ে অন্যতম দুই নম্বর সেক্টর। সেই সময়ে সংঘটিত ১১টি সেক্টরের মধ্যে এই সেক্টরটি ছিল সর্ববৃহৎ। প্রায় সেক্টর একটি বৃহত্তম জেলা অথবা দেড় বা দুটি বৃহত্তম জেলার সমন্বয় গঠিত হয়েছিল। দুই নম্বর সেক্টর গঠিত হয়েছিল বৃহত্তম ঢাকা, বৃহত্তম কুমিল্লা, বৃহত্তম ফরিদপুর ও বৃহত্তম নোয়াখালী জেলার অঞ্চল নিয়ে। এই চারটি বৃহত্তম জেলার সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন সেক্টর কমান্ডার হিসেবে সাহসী বীর পুরুষ, রণকৌশলে পারদর্শী, পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমির এককালের সেরা প্রশিক্ষক অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও মেধায় ভরপুর মেজর খালেদ মোশাররফ। সেক্টর কমান্ডার থাকাকালীন ভারতীয় সেনাবাহিনী ও বিএসএফ অফিসারদের সাথে সমান মর্যাদা রক্ষা করে নিজের ব্যক্তিত্ব অটুট রেখে যুদ্ধের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করতেন। ভারতীয় সেনাবাহিনীতে খালেদের ব্যক্তিত্বের একটা আলাদা কদর ছিল। আমরা সবাই তাকে নিয়ে গর্ব করতাম। খালেদ আমাদের কমান্ডার হওয়া সত্ত্বেও সবার সাথে বন্ধু সুলভ আচরণ করতেন, সবাইকে উৎসাহিত করতেন, প্রেরণা যোগাতেন যুদ্ধে আরো সাহসী ভূমিকা রাখার জন্য। দুই ২নং সেক্টরের প্রত্যেকটি অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সাথে তার গড়ে উঠেছিল একটি আন্তরিক সম্পর্ক। রণাঙ্গনের স্মৃতির পাতায় সবার সাথে তার অনেক ছোটখাটো ঘটনা রয়েছে যা আজও স্মৃতিচারণ করতে গেলে আবেগপ্রবণ হতে হয়। দুই নম্বর সেক্টর পরে এই অস্থায়ী হেড কোয়ার্টার থেকে স্থায়ী দুই নম্বর হেড কোয়ার্টার স্থাপন করা হয় "মেলাগড়"– বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে ৭/৮ কিলোমিটার এবং আগরতলা থেকে প্রায় ৬০/৭০ কিঃ মিঃ দূরত্বে ছিল এই হেড কোয়ার্টার।

বিলোনিয়া সাব সেক্টর কমান্ডার ও দশম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এর প্রতিষ্ঠাতা অধিনায়ক আমি ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম বীর বিক্রম। আমার সাথে অফিসার ছিলেন ক্যাপ্টেন শহীদ বীর প্রতীক (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত), লেঃ ইমামুজ্জামান, লেঃ মোকলেসুর রহমান, লেঃ দিদারুল আলম, লেঃ মিজানুর রহমান, ফেনঢ কলেজের ইউ. টি. সি –এর ক্যাপ্টেন মজিবুর রহমান খান ও লেঃ সোলায়মান। ক্যাপ্টেন গাফফার ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি কোম্পানি নিয়ে বিলোনিয়া যুদ্ধে মুন্সির হাট ডিফেন্সে অংশগ্রহণ করেন। প্রায় দু'মাসের এই যুদ্ধ শেষে ২৩ শে জুলাই ফিরে যান নিজস্ব সাব সেক্টর সালদা নদী মান্দাবাগ পরশুরাম চিতলিয়া যুদ্ধে। নভেম্বর '৭১-এ ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি

কোম্পানি নিয়ে ক্যাপ্টেন হেলাল মোরশেদ বীর বিক্রম বর্তমানে, রেজিমেন্টের জেনারেল শফিউল্লাহর সেক্টরে ফিরে যান।

রাঙ্গামুড়া সাব সেক্টর মান্ডার, লেঃ ইমামুজ্জামান বীর বিক্রম, বর্তমানে মেজর জেনারেল পি.এস.ও টু প্রধানমন্ত্রী, পরে অক্টোবর '৭১ এ সাব সেক্টর নিয়ে ১০ ইস্ট বেঙ্গলে যোগদান করেন।

নির্ভয়পুর সাব সেক্টর কমান্ডার ক্যাপ্টেন মাহবুব বীর উত্তম। উনার সাথে ছিলেন ক্যাপ্টেন কবির, বর্তমানে মেজর জেনারেল।

সালদা নদী ও মান্দবাগ সাব সেক্টর কমান্ডার ক্যাপ্টেন সালেক, তার ছোট ভাই, মতিনও সালেকের সাথে ছিলেন পরে ভারতে কমিশন প্রাপ্ত হয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী থেকে মেজর হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। সালেকের পরে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন ক্যাপ্টেন গাফফার, কোনবনসহ এই সাব সেক্টরের দায়িত্ব ছাড়াও ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়ক ছিলেন।

মনতলী ও কসবা সাব সেক্টর ও কমান্ডার ছিলেন ক্যাপ্টেন আইন উদ্দিন বীর প্রতীক, তার সাথে আরো ছিলেন ক্যাপ্টেন হারুন, বর্তমানে মেজর জেনারেল, ক্যাপ্টেন হুমায়ূন কবির (অবসর প্রাপ্ত)।

কুমিল্লা শহর ও কুমিল্লা সেনানিবাস সাব সেক্টরের দায়িত্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন দিদার (পাক কমিশন প্রাপ্ত আর্টিলারির একজন অফিসার)। তার সাথে সার্বক্ষণিক ছিলেন খোকন (খোকনের পিতা ছিল পাক বাহিনীর একজন অবসরপ্রাপ্ত সুবেদার মেজর)।

দুই নম্বর সেক্টরের অধীনে একটি ফিল্ড হাসপাতাল ভারতের বিশ্রামগঞ্জে ছিল।

বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতাল

ডাঃ জাফর উল্লাহ ও ডাঃ মবিন

ক্যাপ্টেন আক্তার

ক্যাপ্টেন সেতারা (মেজর হায়দারের বোন)

মেডিকেল ক্যাডেট ডাক্তার মনসুর

নার্সেস ও অন্যান্য স্টাফ

উপরে উল্লেখিত সাব সেক্টরগুলো ছাড়াও খালেদের অধীনে সরাসরি ফরিদপুরের গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন কর্নেল (অবঃ) শওকত আলী বর্তমান এমপি। মানিকগঞ্জের সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন আব্দুল হালিম চৌধুরী পরে মন্ত্রী হয়েছিলেন লেঃ মালেক ই এম ই কোরের অফিসার পরে ব্রিগেডিয়ার হয়েছিলেন– তিনি দুই নম্বর সেক্টরের এম.টি.ও (ম্যাকানিকেল

ট্রান্সপোর্ট অফিসার) ছিলেন। সুবেদার লুৎফর রহমান আমার সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে খালেদের পরামর্শক্রমে তৎকালীন এম.পি জনাব নূরুল হকের তত্ত্বাবধানে অপারেশন পরিচালনা করেছিলেন নোয়াখালীর বজরা অঞ্চলে। খালেদের সরাসরি তত্ত্বাবধানে ঢাকা অপারেশনে ছিলেন মোফাজ্জল হোসেন মায়া বীর বিক্রম-এর নেতৃত্বে ক্রেক প্লাটুন। এই প্লাটুনে অন্যান্য কমান্ডো সদস্য ছিলেন বাদল, আলম, চুল্লু, উৎলফাত, টিপু, সাদেক, কাজী, ফাতে.......................................

খালেদের পক্ষ থেকে মেজর হায়দার (যিনি পাক সেনাবাহিনী থেকে কমান্ডো ট্রেনিং প্রাপ্ত ছিলেন) এই প্লাটুনকে কমান্ডো ও Explosive ট্রেনিং দিয়েছিলেন এবং গেরিলা রণকৌশলে পারদর্শী করে গড়ে তুলেছিলেন। ঢাকায় তাদের অনেকগুলো ভয়ংকর দুর্ধর্ষ অপারেশন আজও স্মরণীয় হয়ে আছে এবং থাকবে।

বিলোনিয়ার পরে সালদা নদী অপারেশন আরেকটি বড় ধরনের সামরিক অভিযান ছিল। ক্যাপ্টেন সালেকের নেতৃত্বে সালদা নদী স্টেশন এলাকায় পাক বাহিনীর শক্ত ঘাঁটি সম্পূর্ণ ছিন্ন ভিন্ন ও ধ্বংস করে তাদের কবল থেকে মুক্ত করা দুই নম্বর সেক্টরের আরেকটি বড় বিজয় ছিল। সালেক এই অপারেশনে বীর উত্তম খেতাব পেয়েছিলেন।

এর পাশাপাশি রাঙ্গামুড়া নির্ভয়পুর কোনাবন মনতলী কসবা এই সাব সেক্টরগুলোর নেতৃত্বে যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ পাক হানাদার বাহিনীর সাথে হয়েছিল স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে এই যুদ্ধগুলো একটি স্মরণীয় অধ্যায় হিসেবে চিরদিন আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে।

আমাদের মাঝে আজ আমাদের বীর সেক্টর কমান্ডার খালেদ মোশাররফ নেই। ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে নির্মমভাবে প্রাণ দিতে হয়েছিল যার বিচার আজও হয়নি। যদি কেউ মনে করেন এই হত্যা কোনো রাজনৈতিক হত্যা ছিল না আমরা বলব পরে যারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় এসেছিলেন তারা যদি এই হত্যার সুবিধাভোগী হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই এটা রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড এবং তাই বিচার বিভাগীয় তদন্তের মাধ্যমে এর সুষ্ঠু সমাধান হওয়া উচিত। যুদ্ধ চলাকালীন বাংলাদেশের বৃহত্তম সেক্টরের কমান্ডার মেজর খালেদ বীর উত্তমের হত্যার যদি ন্যূনতম বিচার বিভাগীয় তদন্তও না হয় তাহলে বলব স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস শুধু নয় শহীদের আত্মার প্রতিও অবমাননা ও অন্যায় করা হবে।

আমাদের মাঝে মেজর সালেক বীর উত্তম নেই। নেই ক্যাপ্টেন (পরে লেঃ কর্নেল) মাহবুব বীর উত্তম।

মেলা গড় হেড কোয়ার্টার ছিল সব সময় প্রাণবন্ত। প্রত্যেক সাব সেক্টর থেকে কেউ না কেউ খবর নিয়ে অথবা অস্ত্র গোলাবারুদ আনার জন্য নিয়মিত যাচ্ছে আসছে। বিলোনিয়া সাব সেক্টর এর পক্ষ থেকে এই দায়িত্ব বেশির ভাগ সময়

পালন করতেন জনাব সোলেমান পরে লেঃ ও মেজর (অবঃ) মহিউদ্দিন- বর্তমানে ব্যবসায়ী। খালেদ মোশাররফের সাথে মাসুদ সব সময় সাব সেক্টরে আমাদের কাছে খুব সুপরিচিত হয়ে ওঠেন। তিনি প্রত্যেক সাব সেক্টর এর খবরাখবর সংগ্রহ করতেন ও খালেদকে মাঝে মধ্যে পরামর্শ দিতেন। পুরো সেক্টর সম্পর্কে তার একটা ভালো ধারণা হয়ে গিয়েছিল। খালেদ তাকে খুব আদর ও বিশ্বাস করতেন।

এই মেলাগড় হেড কোয়ার্টারে অ্যাডভোকেট সিরাজুল ইসলাম এম.পি, আজম, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সাচ্চু এম.পি, মিসেস দেলওয়ার আরো অনেকে তাঁবুতে ছিলেন। এছাড়া আরো অনেকে আসা যাওয়ার মধ্যে ছিলেন।

সেপ্টেম্বর/অক্টোবর '৭১ এ ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে ৯ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ১০ম ইস্ট বেঙ্গল নিয়ে গঠিত হয় খালেদের নামকরণে "

কে" ফোর্স। ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল পুনর্গঠন করে অধিনায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয় ক্যাপ্টেন গাফফারকে। ৯ম ইস্ট বেঙ্গল গঠন করে দায়িত্ব দওয়া হয় ক্যাপ্টেন আইন উদ্দিনকে। ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব অর্পিত হয় আমার উপর। এখানে উল্লেখ করতে চাই যে, লেঃ ইমামুজ্জামানের রাঙ্গামুড়া সাব সেক্টর এর সৈনিক বিলোনিয়া সাব সেক্টরে বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রাক্তন সৈনিক ও ই.পি.আর বর্তমান বি.ডি.আর এর একটি বড় অংশ এবং কিছু সংখ্যক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্র যুবক নিয়ে গঠিত হয়েছিল এই রেজিমেন্ট। যুদ্ধের শেষ লগ্নে খালেদ মোশাররফ .... '৭১ মাসে .... স্থানে শত্রুর আর্টিলারি সেলের স্পিন্টারে কপালে আঘাতপ্রাপ্ত হন।

খালেদের আহত হওয়ার পর চিকিৎসা কালীন সময় সেক্টরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন মেজর হায়দার এবং "কে" ফোর্স এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন মেজর ছালেক।

ডিসেম্বর '৭১ যখন আমরা যুদ্ধের চূড়ান্ত লগ্নে তখন এই অঞ্চলের দায়িত্ব গ্রহণ করেন জেঃ আর. ডি হীরা।

আমাদের সাব সেক্টরের অনেক অফিসারের সঠিক মূল্যায়ন আজও হয়নি। এর মধ্যে লেঃ মিজান, লেঃ দিদার, ক্যাপ্টেন মুখলেসুর রহমান অন্যতম। নীলক্ষীর যুদ্ধে দিদারের অসীম সাহসী ভূমিকা ও মিজান মুকলেসের পরশুরাম চিথলিয়া যুদ্ধে দায়িত্বের উর্ধ্বে জীবন বাজি রেখে যে অসীম সাহসিকতা প্রদর্শন করেন তা আজও আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে।

১০ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ফেনী-বিলোনিয়ার যুদ্ধ

স্বাধীনতা যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে এবং শেষ লগ্নে ভারতে প্রশিক্ষণ শেষে মুজিব বাহিনীর কয়েকটি গ্রুপ বৃহত্তর নোয়াখালী তথা ফেনীর বিভিন্ন অঞ্চলে প্রবেশ করেছিল। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এইসব নেতা ও কর্মীদের একটি বড় অংশ বৃহত্তম

নোয়াখালী তথা ফেনীর বিভিন্ন রণাঙ্গনে আমার নেতৃত্বে সাব সেক্টর-২ এবং ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এর অধীনে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।

এছাড়া জনাব গোলাম কাদের, তোফায়েল, নুরুল আলম চৌধুরী, মোঃ শাহজাহান পাটোয়ারী, মৃত মোঃ শাহাবুদ্দীন পাটোয়ারী, রাখাল চন্দ্র ধর, কাজী সেলিম উল্লাহ মাস্টার, খোরশেদ আলম ভুঁঞা, মতজাত উদ্দিন আহমেদ, রুস্তম আলী, আব্দুল আউয়াল, নজীর আহম্মদ, সহিদুল হক, সৈয়দ নুরুল হুদা, মোহাম্মদ সলিম উল্যা ভুঁঞা, মাস্টার তোফাজ্জল হোসেন ও আব্দুর রহিম প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির পর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমদের সাথে ছিলেন। যে মূল গ্রুপটি ফেনীর ভিতরে যুদ্ধের শেষ লগ্নে সেপ্টেম্বর/অক্টোবর এর দিকে প্রবেশ করে ফেনীর রাজাপুরে অবস্থান নিয়েছিল সেই গ্রুপের সদস্য ছিলেন জনাব জয়নাল আবেদীন, মোতালেব ভুঁইয়া, আঃ আজিজ, জাহাঙ্গীর চৌধুরী আব্দুল কাদের ভুঁইয়া, আমিনুল হক, ধীরাজ বাবু প্রমুখ। এরা রাজাপুর বাজারে বড় ধরনের অপারেশন চালিয়ে বাজার হানাদার দোসর মুক্ত করে এবং লক্ষ্মীপুরের দুই নম্বর সাব সেক্টরের সাব সেক্টর কমান্ডার শ্রমিক নেতা রুহল আমিনকে সোনাইমুড়ি যুদ্ধে সক্রিয় সহযোগিতা করা ছাড়াও বিভিন্ন গেরিলা যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করে সবাই অসীম বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিল। নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর জেলার সেই অঞ্চলের তৎকালীন ছাত্রলীগ নেতা বেলায়েত, মুস্তাফিজুর রহমান এলাহীর নেতৃত্বে সেক্টর মুক্তি বাহিনীর সাথে সার্বক্ষণিক সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে অনেকগুলো গ্রুপে অপারেশন করেছিল বৃহত্তম নোয়াখালীর বিভিন্ন অঞ্চলে জয়নাল আবেদীন ও মোতালেবদের গ্রুপ ছাড়াও আরোও একটি উল্লেখযোগ্য গ্রুপ কাজী নুরু নবীর নেতৃত্বে ভারতে ট্রেনিং প্রাপ্তির পর ভিতরে প্রবেশ করেছিল। সম্প্রতি তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। ভিতরে এই গ্রুপের তৎপরতা সম্পর্কে তার নিজস্ব লেখা একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

৭ই মার্চ ১৯৭১। ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ দানের পর আমরা যার যার এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে থাকি। এই ঐতিহাসিক ঘটনার পর থেকে সারা দেশের মানুষ স্বাধীনতার দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে। এলাকায় এসেও আমাদের সাথে ঢাকার যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। দৈনন্দিন ঘটনাবলি আমরা জেনে নিতাম এবং কর্মসূচি ও সিদ্ধান্ত নিতাম। ২৫ শে মার্চ রাতে ঢাকায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী গণহত্যা ও ধ্বংসলীলা শুরু করলে আমরা অ্যাকশনে যাই। ফেনী শহরে একদিন পাক বাহিনী বোমাবর্ষণ করে, পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠে। আমরা কয়েকজন মিলে সিদ্ধান্ত নিলাম ভারতে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং নিয়ে পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়ব। এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে সম্ভবত ২৫ শে এপ্রিল আমি ফেনী

শহরের বর্তমান এমপি জয়নাল হাজারী ও ছাগলনাইয়া-পরশুরামের তৎকালীন এম.পি ওবায়দুল্লা মজুমদার ঋষমুখ সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করি।

বিলোনিয়া মডেল হাই স্কুলে কয়েকজন অবস্থানের পর ডাকসু ভিপি আসম আব্দুর রবের সাথে দেখা হয়। তিনি বললেন, ছাত্রদের জন্য আলাদা ট্রেনিং এর ব্যবস্থা হচ্ছে কিছুদিন অপেক্ষা করো।

মে মাসের কোনো এক সময় আসম রব আমাদের কয়েকজনকে আগরতলা নিয়ে যায়। সেখান থেকে শিলিগুড়ি হয়ে ভারতের উত্তর প্রদেশের তান্দুয়া ট্রেনিং সেন্টারে পৌঁছি। এখানে ভারতের সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান জেনারেল ওবানের সরাসরি তত্ত্বাবধানে প্রায় ৪০ দিনের সামরিক গেরিলা ট্রেনিং সমাপ্ত করি। আমাদের দলই ভারতের তান্দুয়া ট্রেনিং সেন্টারে গেরিলা ট্রেনিংপ্রাপ্ত প্রথম দল। প্রায় ৪০০ জন ছাত্র ও শ্রমিক এখানে ট্রেনিং সমাপ্ত করি। যুদ্ধের পাশাপাশি বাংলার স্বাধীনতাকামী মানুষদেরকে রাজনৈতিক সচেতন করা ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা- যা দীর্ঘ মেয়াদি কোনো যুদ্ধের জন্য ছিল একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। এই দায়িত্বে নিয়োজিত বাহিনীর নাম দেয়া হয় বিএলএফ বা বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স। যারা পরবর্তীতে মুজিব বাহিনী নামে পরিচিতি লাভ করে। আমাদের দলই হচ্ছে বিএলএফ-এর প্রথম গ্রুপ।

আমাদের দলের এই ৪০০ জন গেরিলা ট্রেনিং প্রাপ্তদের মধ্যে যাদের এই মুহূর্তে মনে পড়ে তাঁরা হচ্ছে সর্বজনাব আ.ফ.ম. মাহবুবুল হক, হাসানুল হক ইনু, খসরু, শরীফ নুরুল আম্বিয়া, কুমিল্লার আব্দুল মান্নান (মরহুম) জাকারিয়া চৌধুরী, চট্টগ্রামের গোফরানুল হক, ডাঃ মাহফুজুর রহমান, ফেনীর কামাল উদ্দিন (শহীদ), রুহুল আমিন ভূইয়া (মরহুম), সায়দুল হক সাদু (মরহুম) প্রমুখ।

ট্রেনিং শেষে ভারতের উদয়পুর ট্রানজিট ক্যাম্প হয়ে ১০ জনের একটি গ্রুপ নিয়ে আমি নোয়াখালী সেনবাগ থানার বটতলী বাজারের পাশে ক্যাম্প করি। সময়টা জুন মাসের মাঝামাঝি হবে। পরবর্তীতে আরো ১০ জনের মতো যোদ্ধা এসে আমাদের সাথে যোগ দেন। এখানে আমরা ১০ দিনের মতো ছিলাম। পূর্বেই বলেছি, আমাদের মূল দায়িত্ব হচ্ছে স্বাধীনতাকামী বাংলার মানুষদের রাজনৈতিকভাবে সচেতন ও সংগঠিত করা এবং তাদের মনোবল চাঙ্গা রাখা এবং পাক বাহিনীর দোসরদের বিরুদ্ধে ভিতরে অভিযান চালানো। কানকিরহাটের নিকটবর্তী স্থানে আমরা আক্রান্ত হলে সেখানে আমরা তাদেরকে প্রতিহত করি এবং তারা পিছু হটে চলে যায়। কিছুদিন পর আমরা ফেনী এলাকায় চলে আসি।

২০ জনের এই গ্রুপের সদস্যদের যাদের নাম মনে আছে তারা হচ্ছে- মাহফুজুর রহমান (মরহুম), জহির উদ্দিন বাবর, গোলাম কবির ভুঁইয়া, মোহাম্মদ মুছা মিয়া, শামসুদ্দীন আহমদ (দুলাল), মোহাম্মদ শাহজাহান কবির, বাবুল, রুহুল

আমিন, আইয়ুবুর রহমান, সফিউল্লা, আকরাম হোসেন প্রমুখ। দীর্ঘ ২৬ বছরেরও বেশি সময় আগে আমরা এক সাথে যুদ্ধ করেছি। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল একটিই দেশকে শত্রুমুক্ত করা, স্বাধীন করা, স্বাধীন জাতি হিসেবে বেঁচে থাকা। রণাঙ্গনের সাথিদের অনেকেই আজ বেঁচে নেই। তাঁদের স্মৃতির প্রতি জানাচ্ছি অসীম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। যাঁদের নাম মনে করতে পারছি না তাঁদের কাছে চাচ্ছি ক্ষমা, তাঁদেরকে শুভেচ্ছা।

আমরা ফেনীর অনতিদূরে কোরস মুন্সিরহাট এলাকায় অবস্থান নেই। রাজাপুরে ছিল রাজাকার ক্যাম্প, আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম এই ক্যাম্প আক্রমণ করব। স্থানীয় একজনকে রেকি করার দায়িত্ব দেয়া হলো। কিন্তু সামান্য এক ভুলের কারণে বিরলী ব্রিজ ধ্বংস করা যায়নি। সরারাত ধরে তুমুল যুদ্ধ হলো। এই যুদ্ধে আমাদের সাথে ভিপি জয়নালের গ্রুপও ছিল। যৌথভাবে আমরা আক্রমণ চালাই। ভিপি জয়নালের অনুপস্থিতিতে কাজী ফরিদ আহমদ (বর্তমানে কোনো এক জেলার প্রশাসক) ঐ গ্রুপের নেতৃত্বে ছিলেন। আমাদের জেলা কমান্ডার ছিলেন নোয়াখালীর সাবেক এমপি মাহমুদুর রহমান বেলায়েত।" আ.স.ম রবের তত্ত্বাবধানে মুজিব বাহিনীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলো দল ভারত সীমান্ত অতিক্রম করে ভিতরে প্রবেশ করে। এদের মধ্যে একটি বড় অংশ পরে আ.স.ম রবের নেতৃত্বে জাসদে যোগদান করে। এরাই মুজিব বাহিনী হিসেবে পরিচিত ছিল।

এই ঘটনাটি ছাড়া সেদিন মুক্তিযোদ্ধারা সবাই ২ নং সাব ও ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধীনে বৃহত্তম নোয়াখালীর বিভিন্ন রণাঙ্গনে পরিকল্পিত সামরিক ও গেরিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। ভারত সীমান্ত অতিক্রম করে চলে আসা মুক্তি যোদ্ধাদেরকে সংগঠিত করা হলো এ সেক্টরের অধীনে। অনেক মুক্তিযোদ্ধাকে বাংলাদেশের ভিতরে বিভিন্ন অঞ্চলের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

সাব সেক্টর–২ এর অধীনে বর্তমান নোয়াখালী জেলার চৌমুহনীর চৌরাস্তাকে বিভক্তি রেখা ধরে নোয়াখালী ও বর্তমানের লক্ষ্মীপুর জেলাকে চার ভাগে ভাগ করা হয়। সুবেদার লুৎফর রাহমান, শ্রমিক নেতা রুহুল আমীন, সুবেদার আবু তালেব এদের নেতৃত্বে গড়ে উঠে এই সাব–সাব সেক্টরগুলো।

এখানে একটি কথা উল্লেখ না করলেই নয় যে, এপ্রিলের শেষ সপ্তাহ থেকে ৬ই ডিসেম্বর ফেনী মুক্ত হওয়া এবং ৯ই ডিসেম্বর নোয়াখালী মুক্ত হওয়া পর্যন্ত দীর্ঘ ৮ মাসের ফেনী তথা নোয়াখালীতে পাক-হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসরদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন গেরিলা ও সামরিক অভিযান ও সংঘর্ষের বীরত্বগাথা তথা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস আজও অনেকের অজানা। ইতোমধ্যে আমি বিভিন্ন লেখকের ফেনী ও নোয়াখালীর যুদ্ধের উপরে রচিত কয়েকটা লেখা পড়েছি এবং আমি লক্ষ করেছি যে তারা সবাই ২৫ শে মার্চ থেকে এপ্রিলের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত

বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনা দিয়ে ফেনী তথা বৃহত্তম নোয়াখালী যুদ্ধের পরিসমাপ্তি টেনেছেন। আমি তাদেরকে কোনো দোষ দেব না। ২নং সাব সেক্টর ও ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মুক্তিযোদ্ধাদের কেউ এই পর্যন্ত এই বৃহত্তম রণাঙ্গনের যুদ্ধের কাহিনি বিশেষ করে বিখ্যাত বিলোনিয়া যুদ্ধ সম্পর্কে কোনো লেখা বা বই প্রকাশ করেনি। তাই বৃহত্তম নোয়াখালী ও বিখ্যাত বিলোনিয়ার যুদ্ধ সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানা কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। অথচ বিশ্বের বিভিন্ন সামরিক কলেজ ও মিলিটারি একাডেমিতে (বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমিসহ) বিখ্যাত বিলোনিয়া যুদ্ধের সামরিক রণ কৌশল পড়ানো হয়। ফেনীর ভৌগোলিক অবস্থান ছিল সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ফেনীর উপর দিয়ে যেতে হয়। ঢাকা চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী অঞ্চলে। ফেনীর দখল যেন পাক হানাদার বাহিনী না হারায়, ফেনীর উপর যেন মুক্তিবাহিনীর সামরিক অভিযান না হয়, সে জন্য এই বিলোনিয়া পকেটে পাক হানাদার থেকে পরিচালনা করছিল মুক্তিযোদ্ধাদের মুন্সিরহাট ডিফেন্সের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান। কারণ তারা জানত যে বিলোনিয়া পকেটে যদি মুক্তি বাহিনীরা একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে, তাহলে সর্বশেষ তারা ফেনীর উপরে তাদের সামরিক প্রভাব হারাবে। এতে করে মুক্তিবাহিনী যদি ফেনী দখল নাও করতে পারে তবুও যুদ্ধ ফেনী শহর এবং শহরের আশপাশে ছড়িয়ে পড়বে এবং তাতে করে ফেনীর উপর দিয়ে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা যাতায়াত, চট্টগ্রাম থেকে কুমিল্লা ও নোয়াখালীর দিকে যাতায়াত, সর্বোপরি তাদের সামরিক মুভমেন্টের ব্যাপক বিঘ্ন ঘটবে, তাদের পতন হবে তরান্বিত। আমরা মুক্তিযোদ্ধারাও বিলোনিয়ার পকেটকে একই উদ্দেশ্যে শক্তিশালী ঘাঁটিতে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনায় দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ ছিলাম। তাই এ বিলোনিয়ার রণাঙ্গন ছিল সেদিন দুই পক্ষের জন্য একটি উত্তপ্ত রণক্ষেত্র। আর দুই পক্ষই এ অঞ্চলকে দখলে রাখার জন্য লিপ্ত ছিল মুখোমুখি যুদ্ধে। এই যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীকে ৩রা নভেম্বর ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ভারতীয় সেনাবাহিনী ও বি.এস.এফ সর্ব প্রকারের সাহায্য সহযোগিতা করেছিল। তাদের এই পরোক্ষ সহযোগিতা ছাড়া হয়তো আমাদের অভিযানের সাফল্য আরো বিলম্বিত হতো। আমাদের ক্ষয়ক্ষতিও আরো অনেক গুণ বেড়ে যেত।

৩রা নভেম্বর ১৯৭১ সাল থেকে ৬ই ডিসেম্বর ফেনী মুক্ত হওয়া পর্যন্ত ও ৯ই ডিসেম্বর নোয়াখালী মুক্ত হওয়া পর্যন্ত এবং ১৬ই ডিসেম্বর চট্টগ্রামে পাক হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণ পর্যন্ত এ সময়টুকু ভারতীয় সেনাবাহিনী আমাদেরকে সর্বপ্রকারের অস্ত্রশস্ত্র ও গোলা-বারুদ সরবরাহ করেন। আমরা বেশ ভালোভাবেই সংগঠিত ছিলাম বিশেষ করে আমার অধীনে সাব সেক্টর-২ ছাড়াও প্রাক্তন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে, ইপিআর ও পুলিশের বাঙালি সৈনিক ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত

মুক্তিযোদ্ধাদেরকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট যার প্রতিষ্ঠাতা অধিনায়ক ছিলাম আমি নিজেই। ৩রা নভেম্বর থেকে আমার এ অঞ্চলে অপারেশন-কমান্ডার হিসেবে নিয়োজিত হন ভারতীয় সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল হীরা। সাব সেক্টর–২ ও ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট যেহেতু আগে থেকেই এ বিলোনিয়ার রণাঙ্গনে পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে মুখোমুখি সংঘর্ষে দীর্ঘদিন ধরে লিপ্ত রয়েছিল, সে জন্য তিনি নির্দেশ দিলেন তার অধীনস্ত ভারতীয় সেনাবাহিনীর রাজপুত ও গুরখা রেজিমেন্ট আমাদের পিছনে থেকে যুদ্ধে সহযোগিতা করবে এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে চূড়ান্ত বিজয় পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। ভারতীয় আর্টিলারি আরো অনেক পিছন থেকে প্রয়োজনীয় সমর্থন যোগাবে। আমরা গর্বিত যে ভারতীয় বাহিনীকে যুদ্ধের কোনো চরম মুহূর্তেই আমাদের সম্মুখে আসতে হয়নি। এমনকি ৬ই ডিসেম্বর আমরা যখন ফেনীতে প্রবেশ করি, তারা আমাদেরকে অনুসরণ করেছিল। তবে তারা সব সময় সতর্ক ছিল যে, যদি পাক হানাদার বাহিনীর আক্রমণের তীব্রতা এককভাবে আমাদের দ্বারা মোকাবেলা সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে তারা আমাদের সাথে যৌথভাবে অগ্রভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। আমরা মুক্তিযোদ্ধারা ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টসহ ভারতীয় বাহিনীর সর্বাত্মক সহযোগিতায় পাক হানাদার বাহিনীর সাথে বিলোনয়া যুদ্ধে অসংখ্যবার মুখোমুখি সংঘর্ষে তাদেরকে পর্যুদস্ত করতে সক্ষম হয়েছিলাম। তবে বিলোনিয়ার পকেটে ৩রা নভেম্বর থেকে ৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত আমরা সম্মুখে থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে সাথে নিয়ে পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যেসব বিচ্ছিন্ন মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলাম তাতে আমাদের মধ্যে অনেকেই শহীদ হয়েছিল। পাশাপাশি ভারতীয় সেনাবাহিনীর গুরখা ও রাজপুতের অনেক বীর সৈনিক আমাদের এই স্বাধীনতার জন্য আমাদের বাংলাদেশের মাটিতে সেদিন আত্মাহুতি দিয়েছিল। বিলম্বে হলেও আমার এই লেখার মধ্য দিয়ে আমি জাতীয় পক্ষ থেকে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমাদের মধ্য দিয়ে আমি জাতির পক্ষ থেকে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে তাদের আত্মাহুতি এবং অবদান স্বীকৃত হওয়া উচিৎ বলে আমি মনে করি। ১৯৭১ সালের এপ্রিল ও মে তে মুন্সিরহাট ডিফেন্সে আমরা ছিলাম পাক হানাদার বাহিনীর মুখোমুখি। এই ডিফেন্স ছিল একটি সামরিক ও কৌশলগত প্রস্তুতি এবং পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ। মুন্সিরহাটে আমাদের ডিফেন্সের অবস্থান সম্পন্ন করার আগে ফেনী থেকে বিলোনিয়া পর্যন্ত যে রেল লাইন রয়েছে এর উপর যাতে কোনো ট্রেন চলাচল না করতে পারে অর্থাৎ ট্রেনের মাধ্যমে তারা যেন সৈন্য, অস্ত্র-শস্ত্র ও রসদ সামগ্রী সরবরাহ করতে না পারে সেই জন্য আমার নেতৃত্বে পাইওনিয়ার প্লাটুন

ফুলগাজী ও বন্ধুয়া ব্রিজ এক্সপ্লোসিভ দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই ব্রিজের এলাকাগুলোতে পাক হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসরদের পেট্রোলিং ছিল। তাদের দৃষ্টিকে এড়িয়ে রাতের অন্ধকারে, অগোচরে, নীরবে এই দুটি ব্রিজে এক্সপ্লোসিভ লাগানো প্রায় কয়েক ঘণ্টার কাজ এবং ঝুঁকিপুর্ণ হলেও পাইওয়নিয়ার প্লাটুন জীবন বাজি রেখে এই কাজটি করার দৃঢ় শপথ নেয়। আমি যেহেতু সেক্টর কমান্ডার, আমাকে অনেকে-বারণ করেছিল, শুধু একটি প্লাটুনের সাথে অপারেশনে না গিয়ে অন্য অফিসার পাঠানোর জন্য। আমি রাজি হলাম না। আমি বললাম "আমি নিজে তাদের সাথে যাবো।" এত করে তাদের সাহস ও উৎসাহ অনেকগুণ বৃদ্ধি পেল।

সম্ভবতঃ মে'র প্রথম সপ্তাহের কোনো একদিন হবে। আমরা রাতের অন্ধকারে হাই এক্সপ্লোসিভ ও অন্যান্য সরঞ্জাম নিয়ে কয়েক মাইল অতিক্রম করে ফুলগাজী ব্রিজের অদূরে একটি বাড়িতে এসে অবস্থান নিলাম। এখানে পৌছার পর পর শত্রু পক্ষের খবরাখবর নিলাম। ব্রিজের আশে-পাশে পাক বাহিনীর দোসর রাজাকার/আনসার/মোজাহিদ/আলবদরের সমন্বয়ে গঠিত পেট্রোল পার্টি কতক্ষণ পর পর আসে তা পর্যবেক্ষণ করলাম। আমাদের প্রটেকশনের জন্য ঐ বাড়ি এলাকায় এক প্লাটুন মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভান্স পার্টি হিসেবে আমরা পৌছার কয়েক ঘণ্টা আগেই পাঠানো হয়েছিল। দেখলাম প্রায় এক দেড় ঘণ্টা পর পর তারা ব্রিজ পর্যন্ত এসে বাজারের দিকে ফিরে যায়।

আমরা পাইওয়নিয়ার প্লাটুনকে আগেই কয়েকভাগে ভাগ করেছিলাম। শত্রপক্ষ (প্রেট্রোল পার্টি) যখন ব্রীজে এসে ফিরে যেত আমরা সে সময়ের মধ্যে গ্রুপে গ্রুপে গিয়ে এক্সপ্লোসিভ লাগানোর কাজ অব্যাহত রাখি। এছাড়া আমাদের সাথে ছিল শক্তিশালী প্রটেকশন পার্টি। তাদেরকে বিভিন্ন পয়েন্টে পাইওয়নিয়ার প্লাটুনের প্রটেকশনে অবস্থান নিতে বলি। প্রায় দুই কি আড়াই ঘণ্টার মধ্যে আমরা শত্রু পক্ষের অগোচরে এক্সপ্লোসিভ লাগানোর কাজ সম্পন্ন করি। এখন শুধু বাকি বিদ্যুতের একটি দিয়াশলাইয়ের কাঠি দ্বারা সেপটি ফিউজের মুখে আগুন লাগানো। এই সেপটি ফিউজকে আমরা ব্রিজ থেকে প্রায় ১০০ গজ দূর পর্যন্ত সম্প্রসারণ করেছিলাম। সেপটি ফিউজের মুখে আগুন লাগিয়েই আমরা ব্রিজের অদূরে যে বাড়িতে অবস্থান নিয়েছিলাম সেখান থেকে আরেকটু দূরে ফুলগাজী মাদ্রাসার সামনের বাড়িগুলোতে দৌড়ে গিয়ে সবাই শুয়ে পড়লাম। কারণ এই সেপটি ফিউজ থেকে কর্ডেস এর মাধ্যমে এক্সপ্লোসিভ পর্যন্ত এ আগুন যেতে সময় লাগবে মাত্র কয়েক মিনিট। আর যখন ব্রিজ এক্সপ্লোসিভের শিকার হবে তখন ব্রিজের লোহার টুকরোগুলো কয়েকশো গজ দূরে এসে পড়তে পারে। তাই আগের অবস্থান থেকে আরও দূরে অবস্থান নিয়েছিলাম। তখন গ্রামের লোকজন ফজরের

নামাজ পড়ে মসজিদ থেকে বেরিয়ে আসছে। ঠিক সেই মুহূর্তে এক বিকট আওয়াজে পুরো এলাকা প্রকম্পিত হয়ে উঠল। আমরা সাথে সাথে উল্লাসে মেতে উঠলাম এবং ধাবিত হলাম ফুলগাজীর শ্রীপুর গ্রামের দিকে। ঐ গ্রাম হয়ে আমরা চলে গেলাম আমাদের অবস্থানে। এই বিকট আওয়াজের পর পরই আমরা যখন সামনের দিকে এগুচ্ছিলাম তখন পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ফুলগাজী রেল ব্রিজ আর নেই। ক্ষেতে খামারে যে কয়েকজন কাজে এসেছিল এবং মসজিদে যারা নামাজ পড়তে এসেছিল এবং যাদের কানে এক্সপ্লোসিভের আওয়াজ পৌঁছেছিল তারা সবাই সেই মুহূর্তে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে দিক বিদিক ছুটাছুটি করছিল। আমরা সামনে চলার পথে অনেককে সান্ত্বনা দিলাম এই বলে যে, "ভয়ের কোনো কারণ নেই, এটা পাকিস্তানি আর্মির কোনো আর্টিলারি সেলিং নয়, এটা মুক্তিবাহিনী কর্তৃক ফুলগাজী ব্রিজ অপারেশনের আওয়াজ।" কারো মুখে কোনো কথা নেই। সবাই কত তাড়াতাড়ি নিজ বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নেবে সবার মধ্যে ছিল তার একটা প্রতিযোগিতা। কারণ এই আওয়াজের পর মুহূর্তেই পাক-হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসরেরা আশপাশের গ্রামগুলোতে আক্রমণ চালাতে পারে– এই আশঙ্কা তারা করছিল। অসহায় মানুষের এমন ভয় করারই কথা। আমরা ঐ অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামে আগে থেকে আমাদের মুক্তিবাহিনীর সংঘবদ্ধ দলকে এ ধরনের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য প্রস্তুত রেখেছিলাম। এছাড়া মুন্সিরহাট ডিফেন্সের কাজও অব্যাহত ছিল। তাই তাৎক্ষণিক ঐ অঞ্চলে শত্রু পক্ষের হঠাৎ আক্রমণ সম্ভব ছিল না। একই প্রক্রিয়ায় আমরা মে'র প্রথম সপ্তাহে ফেনী–বিলোনিয়া রেল লাইনের উপর বন্ধুয়া ব্রিজও ধ্বংস করি।

মুন্সিরহাটে আমাদের ডিফেন্সে পজিশন ছিল ফেনী শহরের দিকে মুখ করে। পাক হানাদার বাহিনীর পজিশন ছিল ফেনী শহরের বাইরে আনন্দপুর ইউনিয়ন ও কালির বাজার এলাকায়। ফেনী শহরে ছিল তাদের হেড কোয়ার্টার। আমাদের মুন্সিরহাট ডিফেন্স ও তাদের অবস্থানের মধ্যে ব্যবধান ছিল প্রায় এক/ দেড় মাইল। যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ মে মাসের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত তারা ফেনী শহর থেকে অপারেশন/আক্রমণ পরিচালনা করছিল। কখনো ঝটিকা আক্রমণ এবং সার্বক্ষণিক আমাদের ডিফেন্স পজিশনের উপরে তাদের আর্টিলারি আক্রমণ অব্যাহত ছিল। তাদের এই বিচ্ছিন্ন আক্রমণের মাধ্যমে তাদের মূলত উদ্দেশ্য ছিল আমাদের শক্তি সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং আমাদেরকে সংগঠিত হতে না দেওয়া। মে মাসের শেষ সপ্তাহে আমাদের ডিফেন্স থেকে প্রায় ১ মাইল ব্যবধানে কালির বাজার এলাকা জুড়ে তারা তাদের ডিফেন্সশিপ পজিশন গ্রহণ করে। ইতোমধ্যে কিন্তু আমরা আমাদের ডিফেন্সশিপ পজিশন এর সামনে খুব ঘন একটি পারসোনাল মাইন ফিল্ড সৃষ্টি করলাম এবং ফেনী বিলোনিয়ার রাস্তায় ও বিভিন্ন

রাস্তায় আমরা এনিট ট্যাংক মাইন পুঁতে রাখি। উদ্দেশ্য ছিল, পাক হানাদার বাহিনী যেন হঠাৎ করে সরাসরি আমাদের ডিফেন্সশিপ পজিশনের উপর আক্রমণ চালাতে না পারে। আমাদের এই ডিফেন্সশিপ পজিশন ডানে ভারত সীমান্ত থেকে বামে অর্থাৎ পূর্বে মহুরী নদীর শনিরহাট পর্যন্ত প্রায় ৫ মাইল প্রশস্ত ও বিস্তৃত ছিল। এ ডিফেন্সের পজিশন এ অধিনায়ক হিসেবে আমার অবস্থান ছিল ডিফেন্সের মাঝামাঝি স্থান মুক্তার বাড়ির পুকুর পাড়ে, যার সংলগ্ন ছিল ফেনী-বিলোনিয়ার সড়ক ও রেল লাইন। সামরিক নিয়ম অনুযায়ী আমাকে সেক্টর কমান্ডার খালেদ মোশাররফ সাহেব ও আমার অনেক সহকর্মী অফিসার ডিফেন্স থেকে কয়েকশো গজ পিছনে হেড কোয়ার্টার স্থাপন করে যুদ্ধ পরিচালনার পরামর্শ দিয়েছিলেন। ডিফেন্সের ফ্রন্ট লাইনে আমার বাংকার অর্থাৎ কমান্ড পোস্ট স্থাপনে সেদিন সবার মনোবল ও সাহস অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। আমি সাব সেক্টর-২ এর মুক্তিযোদ্ধা (প্রায় ২ কোম্পানির সৈনিক ও মুক্তিযোদ্ধাদেরকে নিয়ে একটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পাইওনিয়ার প্লাটুন- সার্বক্ষণিক মাইন পোঁতা ও ব্রিজ উড়ানো ছিল যাদের কাজ), সরাসরি আমার নিয়ন্ত্রণে রেখে সম্মুখে কমান্ড পোস্টের দুই পাশে ডিফেন্সশিপ পজিশনকে সুদৃঢ় ও বিস্তৃত করি। এদের ডানে অর্থাৎ পশ্চিম পার্শ্বে সীমান্ত পর্যন্ত ক্যাপ্টেন শহীদকে ১ কোম্পানির অধীন সৈনিকসহ ডিফেন্সশিপ পজিশন গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। তিনি তাই করলেন। কমান্ড পোস্টের বাম পাশে অর্থাৎ কমান্ড পোস্টের নিয়ন্ত্রিত ডিফেন্সশিপ পজিশনের পর থেকে পূর্বে মহুরী নদীর পাড় তথা শনিরহাট পর্যন্ত ডিফেন্সশিপ পজিশনের দায়িত্ব দেওয়া হয় প্রায় ২ কোম্পানির অধিক সৈন্যসহ লেঃ ইমামুজ্জামান বীর বিক্রমকে (বর্তমানে মেজর জেনারেল)। আমার ফিল্ড পোস্টে আমার সাথে ফেনী কলেজের প্রাক্তন প্রিন্সিপাল অনারারি ক্যাপ্টেন মজিবুর রহমান ছিলেন। এছাড়া টেলিফোনের মাধ্যমে আমি সার্বক্ষণিক লেঃ ইমামুজ্জামান ও ক্যাপ্টেন শহীদের সাথে যোগাযোগে ছিলাম। এই ডিফেন্সশিপ পজিশনের প্রায় আধ মাইল দূরে পিছনে নতুন মুন্সিরহাটে অবস্থান নিয়েছিলেন প্রায় ২ কোম্পানির মতো প্রাক্তন বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং ইপিআর ও সৈনিকসহ ক্যাপ্টেন গাফফার বীর উত্তম। তাকে মূলত ২ নং সেক্টর কমান্ডার খালেদ মোশাররফ পাঠিয়েছিলেন আমাদের ডিফেন্সের শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য এবং আমাদের ডিফেন্সের পিছনে রিয়ার গার্ড হিসেবে কাজ করার জন্য যেন গোপনে শত্রুপক্ষ আমাদের ডিফেন্সের পিছন দিক থেকে আক্রমণ করতে না পারে। মুহুরী নদীর পশ্চিম পাড় যেখানে লেঃ ইমামুজ্জামান অবস্থান নিয়েছিলেন সেই মুহুরী নদীর অপর পাড়ে অর্থাৎ শুভপুর ও ছাগলনাইয়া এলাকায় ১ নং সেক্টর কমান্ডার জিয়াউর রহমান বীর উত্তমের অধীনে মুক্তিযোদ্ধারা অবস্থান নিয়েছিলেন। তার সাথে ছিলেন ক্যাঃ মাহফুজ ও ক্যাঃ অলি। আমি তার সাথে ঐ এলাকায় গিয়ে

সরাসরি যোগাযোগ করি যাতে তাদের অবস্থানকে পাশ কাটিয়ে শত্রুপক্ষ আমাদের ডিফেন্স এর লেঃ ইমামুজ্জামানের অবস্থানের উপর অথবা পিছনে ক্যাঃ গাফফারের অবস্থানের উপর আক্রমণ না করতে পারে। তিনি আমাকে সম্পূর্ণ আশ্বস্ত করলেন এবং আমাকে আমাদের অবস্থান সুদৃঢ় করে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করলেন। এ অঞ্চলে এই ডিফেন্সের সুদৃঢ় বাংকার গড়ে তুলতে এবং ডিফেন্সশিপ পজিশনে খাওয়া দাওয়ার রসত সামগ্রী সরবরাহ করতে এ অঞ্চলের জনগণ আমাদেরকে সব সময় সহযোগিতা দিয়ে আসছিল। এই যুদ্ধে পাক হানাদার বাহিনী অবিরাম গতিতে দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমাদের ডিফেন্সের উপর আর্টিলারি ফায়ার অব্যাহত রেখেছিল। আর্টিলারি ফায়ারের সেলগুলো শুধু আমাদের ডিফেন্সশিপ পজিশনের উপরে আঘাত হানেনি, লক্ষ্যভ্রষ্ট আর্টিলারি সেল এ অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামের বাড়িতে, ধান ক্ষেতে, বাজারের দোকান পাটের উপরে, এমনকি বিভিন্ন মসজিদ, মন্দির ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর বিচ্ছিন্নভাবে আঘাত হেনেছিল এবং এ সেলের কারণে এ অঞ্চলের জান-মালের ব্যাপক ক্ষতি সাধন হয়েছিল যার পুরো হিসাব আজও আমাদের অনেকেরই অজানা। এই সেলিং এর বিকট আওয়াজে পুরো অঞ্চল প্রকম্পিত হয়ে উঠত। তখন আমরা ডিফেন্সে বসে আশপাশের গ্রামের মা-বোন-শিশুদের আর্ত চিৎকার শুনতাম। শুধু আমাদের ডিফেন্সশিপ পজিশনের মুক্তিযোদ্ধারাই নয় এই অঞ্চলের সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ সবাই নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ছোটাছুটি করত এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এই সেলিং অব্যাহত থাকত ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই নিরাপদ আশ্রয়ে থাকার চেষ্টা করত। তখন পুরো এলাকাকে মনে হতো জন মানব শূন্য। যেন এই দশটা ইউনিয়নের গ্রামগুলোতে কেউ বসবাস করে না। বিভিন্ন ক্ষেতে-খামারে যে সব গরু ছাগল থাকত, তারাও রশি ছিঁড়ে দিক বিদিক পালিয়ে যাওয়ার জন্য দিশেহারা হয়ে পড়ত। পুরো অঞ্চলে বিরাজ করত এক চরম আতংক। আমরা তখন বাংকারে বসে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতাম সম্মুখের দিকে শত্রুর অবস্থানের প্রতি। অপেক্ষা করতাম কখন সেলিং বন্ধ হবে এবং আমাদের উপর শত্রুর পদাতিক বাহিনীর আক্রমণ শুরু হবে। এই সেলিং এর ছত্র ছায়ায় তারা আমাদের দিকে আক্রমণের জন্য অগ্রসর হচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখতাম। তাদেরকে প্রতিহত করার জন্য আমাদের প্রস্তুতি ছিল ব্যাপক। মে মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে জুলাই '৭১ এর শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত শত্রুপক্ষ কয়েক দফা আমাদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে এক ব্যাটালিয়ন প্লাস সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হয়েছিল। কিন্তু আমাদের ডিফেন্সশিপ পজিশনের সম্মুখে প্রায় ১ মাইল এলাকা জুড়ে বিস্তৃত ঘন এন্টি পারশোনাল মাইন থাকায় আমাদের ডিফেন্সের ৩/৪ শো গজের মধ্যে তারা অগ্রসর হওয়ার পরেই শুরু হতো আমাদের লুকিয়ে রাখা মাইন এর বিস্ফোরণ।

তারা যতই সম্মুখের দিকে আসছিল ততই ঘন মাইনফিল্ডের ফাঁদে পড়ছিল এবং এসব আক্রমণে তাদের অসংখ্য সৈন্যকে হতাহত অবস্থায় আমরা বাংকারে বসে কাতরাতে দেখেছি। তারা কোনো সময়ই আমাদের সম্মুখের তিনশো গজের ঘন মাইন ফিল্ড অতিক্রম করতে সমর্থ হয়নি। যতবার তাদের এই আক্রমণ প্রতিহত হয়েছিল, তারাও ততবার পিছনে হটে যেতে বাধ্য হয়েছিল। শত্রু পক্ষ যখন আমাদের মাইন ফিল্ডের শিকার হচ্ছিল তখন চলছিল দুই পক্ষের তরফ থেকে ব্যাপক আর্টিলারি সেলিং (ভারতীয় সেনাবাহিনীর আর্টিলারি আমাদের সহযোগিতা করেছিল)। সেই মুহূর্তে গর্জে উঠেলি আমাদের ডিফেন্সের বাংকার থেকে এ.এম.জি ও এম.এম.জির ফায়ার এবং ৩ ইঞ্চি মর্টার ফায়ার। তারা যেহেতু ৩শো গজের মধ্যে কখনো পৌঁছতে পারেনি সেজন্য আমি স্মল আর্মস এর ফায়ারের নির্দেশ দেইনি। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ফায়ার শক্তির দৃষ্টিকোন থেকে আমাদেরও ১টি ব্যাটালিয়ান প্লাস সামরিক বাহিনীর যা অস্ত্র থাকা প্রয়োজন তা থেকেও বেশিই ছিল। এ ছাড়া আমার ডানে ক্যাঃ শহীদ (পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একজন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত অফিসার) আমার পূর্ব পরিকল্পনা ও নির্দেশ মোতাবেক তার অধীনস্ত সৈনিকদেরকে সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণে রেখে যুদ্ধ পরিচালনা করছিলেন। আমার বামে লেঃ ইমামুজ্জামান পাক সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত পদাতিক বাহিনী একজন দক্ষ অফিসার ছিলেন। স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণের আগ মুহূর্তে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে পাক হানাদার বাহিনীর হাতে বন্দী অবস্থায় ছিলেন। সেখান থেকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পালিয়ে আসার সময় তিনি গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন। তার উপর ছিল আমার অগাধ বিশ্বাস ও আস্থা। তাই তাকে আমি বামে অর্থাৎ মুহুরী নদীর সীমানা পর্যন্ত দায়িত্ব দিয়েছিলাম। কারণ পাক হানাদার বাহিনী আমাদের ডিফেন্সের সেই অংশে সরাসরি আক্রমণ করতে পারত ও মুহুরী নদী দিয়ে এসেও আক্রমণ করতে পারত। এমনকি মুহুরী নদী পাশ কাটিয়ে মুহুরী নদীর অপর পাড় দিয়ে তার পেছনেও আক্রমণ করার সুযোগ ছিল। এই অফিসার এ ব্যাপারে সর্বদা সজাগ ও সতর্ক ছিলেন। আমি তাকে বলেছিলাম, ডিফেন্সের সম্মুখে যেহেতু ঘন মাইন ফিল্ড রয়েছে নদী পথে শত্রুর আক্রমণ সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলাম মুহুরী নদীর যে বাঁধটি তার ডিফেন্সের সম্মুখে কয়েকশো গজ দূরে রয়েছে সে বাঁধ ভেঙে দিতে। তখন নদী ছিল ভরপুর, স্রোত ছিল তীব্র। এই বাঁধ ভেঙে দেওয়ার কারণে নদীর নিচের দিকে অর্থাৎ সম্মুখের দিকে স্রোত আরো তীব্রতর হয়ে যায়। নদী পথে শত্রু পক্ষের আক্রমণ করার আর কোনো সুযোগ থাকল না। পাক হানাদার বাহিনী ইতোমধ্যে ব্যাপক ক্ষতির শিকার হয়ে যায় এবং তারা একটি ব্যাপক ও বড় আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিল বলে আমাদের ধারণা। কারণ তারা যেহেতু কয়েক দফা আক্রমণ পরিচালনা করে

ব্যর্থ হয়েছে এখন স্বাভাবিক কারণেই তারা তাদের রণকৌশল পরিবর্তন করবে। তাই হলো।

সম্ভবত ১৭ই জুলাই বা জুলাইয়ের ৩য় সপ্তাহের অন্য কোনো দিন হবে, ঐদিন সকাল থেকে মাগরিব পর্যন্ত তারা ১৫/২০ মিনিট পর পর তাদের হালকা ও ভারী আর্টিলারি সেলিং অব্যাহত রাখে। সেলিং এর বিকট আওয়াজে তারা এক তাণ্ডব লীলা শুরু করেছিল। সেদিন সকাল ১০টার দিকে আর্টিলারির একটি সেল আমার কমান্ড পোস্টের ঠিক পিছনে পুকুরের অপর পাড়ে মুক্তার বাড়ির কাচারি ঘরে আঘাত হানে। হাবিলদার নুরুল ইসলাম তার কিছুক্ষণ আগ মুহূর্তে বাংকার থেকে কাচারি ঘরে গিয়েছিল। সম্ভবত অনেকদিন ধরে ব্যবহৃত তার পরনের লুঙ্গি গেঞ্জি পরিবর্তন করার জন্য। আর্টিলারির একটি সেল নুরুল ইসলামের উপর সরাসরি আঘাত হানে। সেলে ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত অবস্থায় নুরুল ইসলামের আর্ত চিৎকার সেই মুহূর্তে শত্রু পক্ষের আর্টিলারি সেলিং এর বিকট আওয়াজকেও যেন হার মানাচ্ছিল এবং তার এই আর্ত চিৎকার সেদিন দুই পক্ষের সেলিং এর আওয়াজের সাথে একাকার হয়ে গেল। রক্তাক্ত শরীর নিয়ে তিনি কাচারি ঘর থেকে বের হয়ে চিৎকার করেন "স্যার আমাকে বাঁচান, বাঁচান" বলে দিশেহারা হয়ে পুকুরের ঘাটে নেমে পড়ে। সেদিন পুকুরের পানি লাল বর্ণ ধারণ করে। রক্তাক্ত হাবিলদার নুরুল ইসলামকে চিকিৎসার জন্য আমাদের কয়েকজন পাশের বাংকারে নিয়ে আসে। আমি তাকে দেখতে ঐ বাংকারে গিয়েছিলাম। সে আমাকে দেখে বলেছিলেন "স্যার আমি হয়তো এদেশের স্বাধীনতা ও আমাদের চূড়ান্ত বিজয় দেখে যেতে পারব না। আমার অন্তিম অনুরোধ থাকবে, স্যার আপনারা যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন। ইনশাল্লাহ, বিজয় আমাদের হবেই।" আমি তাকে শান্ত হতে বলে আশ্বস্ত করতে চেয়েছিলাম যে, "আপনার কিছুই হবে না ইনশাল্লাহ।" বলতে বলতে নুরুল ইসলাম আমাদের ছেড়ে চির বিদায় নিল। এই শহীদ নুরুল ইসলামকে আমরা ঐদিনই আমাদের ডিফেন্সের পিছনে একটি মসজিদের পাশে সমাধিস্থ করি। হাঃ নুরুল ইসলাম এই ডিফেন্সে থাকাকালীন বিভিন্ন সামরিক অপারেশনে সাহসিকতার সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এমনকি তিনি কয়েক মাইল দীর্ঘ এ ডিফেন্সের বিভিন্ন পয়েন্টে আমার পক্ষ থেকে বিভিন্ন পরামর্শ, নির্দেশ ও প্রয়োজনীয় রসত সামগ্রী সরবরাহে তত্ত্বাবধান করেছিলেন। পুকুর পাড়ের কমান্ডপোস্টের নিকট বাংকারের ১টি এল.এম.জি পোস্ট এর পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন এই হাবিলদার নুরুল ইসলাম। পাক হানাদার বাহিনী আমাদের ডিফেন্সের উপরে মাইন ফিল্ড অতিক্রম করে যতবার আক্রমণ করতে চেষ্টা করেছিল ততবারই রণাঙ্গনের অন্যান্য এল.এম.জি ও এম.এ.জিগুলোর সাথে গর্জে উঠত হাঃ নুরুল ইসলামের এল.এম.জিটি। যেহেতু তার এল.এম.জি পোস্টটি

ছিল ফেনী বিলোনিয়া সড়কের পাশে, সেজন্য শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে এই এল.এম.জি পোস্টটির ভূমিকা ছিল মুখ্য। তৎকালীন পাক সেনাবাহিনীতে ১ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের ১ম নম্বর বক্সার হিসেবে তার সুখ্যাতি ছিল। সেদিন পুরো দিনভর অবিরাম সেলিং ও কাউন্টার সেলিং এর কারণে এলাকার সাধারণ মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল। আতংকগ্রস্ত হয়ে জনগণ পরিবার পরিজন নিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে চলে গিয়েছিল। এমনিতে আগেও অনেক পরিবার এই অঞ্চল থেকে ভারত সীমান্তে বিভিন্ন শরণার্থী ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়েছিল। আমরা সেদিন সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত না খেয়ে ছিলাম। সন্ধ্যার পর যখন কালো অন্ধকার নেমে আসল তখনও বিচ্ছিন্নভাবে তারা আর্টিলারি সেলিং চালিয়ে যাচ্ছিল। এই সেলিং ছাড়া পুরো এলাকায় নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল। আমরাও সবাই শত্রুর মোকাবেলার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে সতর্ক অবস্থায় ছিলাম। ফিল্ড টেলিফোনে আমি লেঃ ইমামুজ্জামান, ক্যাঃ শহীদ ও পিছনের ফোর্সের সাথে যোগাযোগ করে যাচ্ছিলাম। সম্ভবত সন্ধ্যা ৭/৮ টা হবে। টিপ টিপ করে একটু একটু বৃষ্টি হচ্ছিল। হঠাৎ দেখি কয়েকটি হেলিকপ্টার থেকে পাক বাহিনী তাদের কমান্ডো ছত্রী বাহিনী নামাচ্ছে। এভাবে কয়েকবার হেলিকপ্টার যাওয়া আসা করল। কিছুক্ষণ পর আমাদের পিছনে ক্যাঃ গাফফারের পজিশনের উপরে ফায়ারিং এর আওয়াজ শুনলাম। খবর নিয়ে জানলাম এগুলো শত্রু বাহিনীর ফায়ারিং। আমাদের ডিফেন্সের সম্মুখে যেখানে মাইন ফিল্ড শেষ হয়েছে, প্রায় ১ মাইল দূরে কালির বাজারে তাদের অবস্থানে ফেনী থেকে আরো সৈন্য আসছে এবং তাদের পজিশনকে জোরদার করে সুইসাইটাল অ্যাটাকের মতো একটি প্রস্তুতি গ্রহণ করছে বলে আমাদের ধারণা হচ্ছিল। আমরা ডিফেন্সে বসে তাদের ট্যাংকের মুভমেন্টের আওয়াজ এবং ফেনী থেকে ট্রাকে বাড়তি সৈন্য নিয়ে আসার আওয়াজ শুনছিলাম। এমনকি তাদের পজিশন থেকেও কিছু ট্যাংক মুভমেন্টের আওয়াজ আমরা উপলব্ধি করলাম। আমাদের কাছে সময় সময় মনে হচ্ছিল ট্যাংকের আওয়াজগুলো রেকর্ডকৃত মাইকে শুনানো হচ্ছে। পুরো ব্যাপারটা নিস্তব্ধ রাতের অন্ধকারে হচ্ছিল। তাদের আরেকটি বড় পদাতিক বাহিনী আমাদের বামের ডিফেন্সের মুহুরী নদীর অপর পাড় দিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল বলে খবর পেলাম। ইন্ডিয়ান ব্রিগেডিয়ার আনান সরূপ আমাকে জানালেন যে, আমরা চারদিক থেকে ঘেরাও হতে চলেছি। এমতাবস্থায় তিনি আমাদেরকে উইথড্র করে পিছনে এসে নতুন জায়গায় টেকনিক্যাল পজিশন গ্রহণ করার জন্য পরামর্শ দেন।

আমি তখন আমার ডিফেন্সের বামে লেঃ ইমামুজ্জামান ও ডানে ক্যাঃ শহীদের সাথে ফিল্ড টেলিফোনে যোগাযোগ করে সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করি। তারা আমাকে পরিস্থিতি শত্রু পক্ষের আগের আক্রমণগুলোর তুলনায় একটু

ব্যতিক্রম ধর্মী বলে আভাস দিলেন। তাদের ডিফেন্সের সামনেও ব্যাপক শত্রুর মুভমেন্টের খবর জানালেন। হেলিকপ্টার ও পিছনে শত্রু পক্ষের ফায়ারিং এর আওয়াজ সম্পর্কে তখন আমরা ফিল্ড টেলিফোনে আলোচনার মাধ্যমে একটি অভিন্ন মতামতে উপনীত হলাম যে, আমাদের ডিফেন্সের পিছনে পাক বাহিনী পর্যায়ক্রমে হেলিকপ্টার দিয়ে ছত্রী সেনা নামাচ্ছে এবং ডিফেন্স থেকে আমাদের পিছনে যাওয়ার সমস্ত গ্যাপগুলোতে তাদের অবস্থান জোরদার করে আমাদের ডিফেন্সের চারদিকে একটি অবরোধ সৃষ্টি করার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আমাদের মূল ডিফেন্সের পেছনে ক্যাঃ গাফফারের নেতৃত্বে ছিল আমাদের রিয়ার ডিফেন্সশিপ পজিশন। সেই রিয়ার ডিফেন্সশিপ অবস্থানের পেছনে ছত্রী সেনারা আস্তে আস্তে অবস্থান জোরদার করছিল। তাই আমাদের বিকল্প অবস্থান নেওয়া উচিত।

আমাদের ডিফেন্সের সামনে শত্রু পক্ষের ব্যাপক মুভমেন্টের খবর পাচ্ছিলাম। আমি লেঃ ইমামুজ্জামান, ক্যাঃ শহীদ ও ক্যাঃ গাফফারকে পুরো পরিস্থিতি অবহিত করলাম এবং আরো জানালাম, ব্রিগেডিয়ার আনান সরূপ খবর পাঠিয়েছেন যে আমরা চারদিকে থেকে অবরুদ্ধ হতে চলেছি। আমরা যেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বর্তমান ডিফেন্সসিপ পজিশন থেকে সরে এসে পিছনে বিকল্প জায়গায় নতুন অবস্থান গ্রহণ করি। তখন রাত প্রায় সাড়ে ৯টা কি ১০ টা হবে। আমি আমার সহযোগী অফিসারদের আরো বললাম যে যতই সময় গড়াবে ততই শত্রু পক্ষ তাদের পরিকল্পনায় এগিয়ে যাবে। তখন আমাদের সামরিক মুভমেন্টের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হবে। আর তা কাটিয়ে উঠা আমাদের জন্য একটি কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। পরবর্তী পরিস্থিতিতে আমাদের সামরিক অভিযান শুধু ডিফেন্সের সম্মুখে শত্রু পক্ষকে প্রতিহত করতে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না, আমাদেরকে শত্রু মোকাবেলা করতে হবে ডিফেন্সের সম্মুখে, ডিফেন্সের দুইপাশে এবং ডিফেন্সের পেছনে, অর্থাৎ শত্রু পক্ষের চতুর্মুখী আক্রমণ আমাদেরকে সর্বশক্তি দিয়ে মোকাবিলা করতে হবে। সে অবস্থায় যদি আমাদেরকে প্রয়োজনে পিছনে সরে যেতে হয় তখন সেটা আমাদের জন্য শুধু কঠিনই হবে না বরং আমাদেরকে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হতে হবে। আমরা ফিল্ড টেলিফোনে ও অন্যান্য যোগযোগের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আরো কয়েক ঘণ্টা অর্থাৎ রাত ২-৩ টা পর্যন্ত অবস্থানে থেকে শত্রুর মোকাবেলা করব। যদি এর মধ্যে শত্রু পক্ষের চারদিক থেকে আক্রমণের চাপ বৃদ্ধি পায় তাহলে আমরা ব্রিগেডিয়ার আনান সরূপের পরামর্শ অনুযায়ী পিছনে সরে গিয়ে বিকল্প জায়গায় অবস্থান করব। এই সিদ্ধান্তে সেদিন আমরা এক বিরাট ঝুঁকি ও চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলাম। শত্রু পক্ষ রাত ৮টা থেকে প্রায় ১-২টা পর্যন্ত আমাদের অবস্থানের চারদিকে

তাদের আক্রমণের প্রস্তুতি অব্যাহত রাখে। তবে কোনো সরাসরি আক্রমণ পরিচালনা করেনি। শুধু চারদিকে আমরা তাদের অবস্থান জোরদার করার খবরাখবর পাচ্ছিলাম এবং থেমে থেমে চারদিক থেকে আমাদের অবস্থানের দিকে ফায়ারিং এর আওয়াজ শুনছিলাম। সম্ভবত তারা তাদের পরিকল্পনা অর্থাৎ তাদের সার্বিক প্রস্তুতি সম্পন্ন না করে আক্রমণ পরিচালনা করতে ভয় পাচ্ছিল। রাত প্রায় ২টার দিকে আমরা নিশ্চিত হলাম যে, পাক বাহিনী ভোর হওয়ার আগেই তাদের প্রস্তুতি সম্পন্ন করবে এবং ভোর হওয়ার মুহূর্তেই বড় ধরনের আক্রমণ চারদিকে থেকে পরিচালনা করবে। আমরা তখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম যে, তারা তাদের চূড়ান্ত আক্রমণ পরিচালনা করার আগেই আমরা পিছনে বিকল্প জায়গায় সরে যাব। যেহেতু আমাদের পিছনের ডিফেন্স তিন দিক দিয়ে ভারতীয় সীমানা দ্বারা পরিবেষ্টিত। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, যারা ক্যাঃ শহীদের নেতৃত্বে ডানে অবস্থান গ্রহণ করছিল তারা ডান দিক দিয়ে ভারতীয় সীমান্ত হয়ে পিছনে চলে যাবে। আর বামে যারা লেঃ ইমামুজ্জামানের নেতৃত্বে অবস্থান নিয়েছিল তারা বাম দিক হয়ে পিছনের দিকে চলে আসবে। ডিফেন্সের মাঝামাঝি অবস্থানে অর্থাৎ যারা আমার নিয়ন্ত্রণে ছিল তাদেরকে নিয়ে ডিফেন্সের পিছনে ক্যাঃ গাফফারের সাথে যোগ দিয়ে আমরা সরাসরি পিছনে বিকল্প অবস্থানে যাব। আমাদের এও সিদ্ধান্ত ছিল যে, এই উইথড্রল এর সময় যদি শত্রুর সাথে এনকাউন্টার হয়, তার জন্য আমাদের সবাইকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

বিলম্বে হলেও ব্রিগেডিয়ার আনান সরূপের পরার্মশ অনুযায়ী আমরা শত্রু পক্ষের এনকাউন্টার এড়িয়ে কোনো ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই পিছনে বিকল্প অবস্থানে যেতে সক্ষম হই। যেহেতু আমাদের মধ্যে যোগাযোগের জন্য কোনো ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন ছিল না সেহেতু আমরা এই উইথড্রলের সময় শেষ মুহূর্তে নিজেদের মধ্যে সঠিকভাবে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারিনি। সে কারণে উইথড্রল যদিও সফল হয়েছিল কিন্তু এই ব্যাপক ডিফেন্সের বিভিন্ন অঞ্চলের অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ রাতের অন্ধকারে কিছু সময়ের জন্য একে অন্য থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। সকালে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আবার আমরা নিজদের মধ্যে যোগাযোগ করি এবং পরবর্তী অবস্থানের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করি। এই উইথড্রলের প্রয়োজনীয়তা ও রণকৌশল নিয়ে বিভিন্ন মহলে ও দেশ বিদেশের কয়েকটি সামরিক কলেজ ও একাডেমিতে ভিন্ন ভিন্ন মূল্যায়ন রয়েছে। তাই এই উইথড্রলের গুরুত্ব সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করতে চাই। প্রথমত, সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করলে দেখা যাবে যে এই উইথড্রলের বিকল্প আমাদের কাছে আর কিছুই ছিল না। আমরা মুন্সিরহাটে প্রায় ৪ মাইল বিস্তৃত ডিফেন্সের সম্মুখে ঘন মাইন ফিল্ড সৃষ্টি করে পর্যাপ্ত ফায়ার পাওয়ার ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সৈনিক

ও মুক্তিযোদ্ধাদেরকে নিয়ে ফেনীর দিকে মুখ করে যে শক্তিশালী ডিফেন্স গড়ে তুলেছিলাম এবং এই ডিফেন্স থেকে কয়েক দফা শত্রুর সম্মুখ আক্রমণকে প্রতিহত করেছিলাম তার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল ডিফেন্স থেকে তাদেরকে প্রতিহত করা। সম্মুখযুদ্ধে বার বার ব্যর্থ হওয়ার পর তারা তাদের রণকৌশল পরিবর্তন করে অর্থাৎ চারদিকে থেকে আক্রমণ পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেয়। ঝুঁকিপূর্ণ বৃহত্তম সামরিক অপারেশনের জন্য তাদের ছিল অত্যাধুনিক অস্ত্র, আধুনিক ওয়্যারলেস এর মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা। সর্বোপরি প্রয়োজনে বাড়তি সৈন্য ফেনী থেকে রেনফোর্স করার ক্ষমতা। এছাড়া অন কল আর্টিলারি ও বিমান বাহিনীর জঙ্গি বিমান (যা ফেনী শহর ও বিলোনিয়া যুদ্ধে তারা প্রায় ব্যবহার করেছিল) হামলার প্রস্তুতি ছিল সার্বক্ষণিক। পক্ষান্তরে আমাদের এই সব সুযোগ সুবিধার ঘাটতি ছিল। তবে তাদের উল্লেখিত সব সুবিধা থাকা সত্ত্বেও সম্মুখযুদ্ধে আমাদেরকে পরাজিত করে আমাদের ডিফেন্সস অতিক্রম করার ক্ষমতা তাদের ছিল না, তা আমরা বার বার প্রমাণ করেছি। শত্রু পক্ষের রণকৌশল পরিবর্তন এবং তা মোকাবেলায় আমাদের ঘাটতি ছিল উইথড্রলের মূল কারণ। তার পরও বলব আমরা এই ত্রিমুখী আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য মরণপণ যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারতাম। তাতে দুই পক্ষের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হতো। তাদের ক্ষয়ক্ষতি, বাড়তি সৈন্য, অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ও রসত সামগ্রী ফেনী থেকে এনে ঘাটতি পূরণ করতে পারত। এমনকি তারা যখন দেখদ যে, ভোরে তিন দিক থেকে অ্যাটাক করেও আমাদের ডিফেন্স এরিয়া দখল করতে পারছে না তখন কিছুটা সময় নিয়ে তারা আমাদের উপর ব্যাপক আর্টিলারি ও বিমান হামলা চালিয়ে আবার আক্রমণ পরিচালনা করত। এতে আমাদের কোনো পাল্টা ব্যবস্থা ছিল না। এমনকি আক্রমণ চলাকালীন সময়ে আমরা তাদের মতো প্রয়োজনীয় আর্টিলারি ও বিমান হামলার সহযোগিতা পেতাম না। তখন আমাদের মধ্যে যোগাযোগের জন্য ওয়্যারলেস সেটও ছিল না। ভারত থেকে তখন পর্যন্ত সব ধরনের সাহায্যের আশ্বাস পাওয়া যায়নি। আমরা ভারত থেকে যুদ্ধের এই প্রথম লগ্নে পাচ্ছিলাম আর্মস, অ্যাম্যুনেশন ও সীমিত আর্টিলারি সমর্থন। তাছাড়া পাচ্ছিলাম বিভিন্ন ধরনের মাইন ও শত্রু পক্ষের মুভমেন্টের বিভিন্ন খবরাখবর অর্থাৎ আমরা ভারত থেকে পরোক্ষভাবে সীমিত সাহায্য পাচ্ছিলাম। যদিও পরবর্তীতে এই সাহায্য ছিল ব্যাপক এবং বিভিন্ন অপারেশনে তাদের ছিল প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ। মুক্তিযুদ্ধের সেই প্রস্তুতি লগ্নে আমাদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি যদি হতো, পরবর্তীতে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া আমাদের জন্য কষ্টকর হয়ে দাঁড়াত। সার্বিকভাবে সামরিক ও তৎকালীন পরিস্থিতি মূল্যায়নে সেই উইথড্রল ছিল একটি রণকৌশল। সামরিক অপারেশনগুলোর মধ্যে উইথড্রলও একটি অপারেশন হিসেবে আজও স্বীকৃত।

এই উইথড্রলের পর পর আমরা বিকল্প স্থানে শুধু নতুন ডিফেন্সশিপ নিয়েই ক্ষান্ত ছিলাম না, পাশাপাশি নতুন মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং দিতাম। পরবর্তীতে এই রণাঙ্গনে ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট প্রতিষ্ঠা করে বিলোনিয়া ও বৃহত্তম নোয়াখালীতে আমাদের গেরিলা ও সামরিক অভিযান অব্যাহত রাখি। এই অভিযান চালিয়ে যাওয়া ছাড়াও প্রত্যেক মুহূর্তে পরিকল্পিতভাবে শক্তি বৃদ্ধির প্রয়াস অব্যাহত রাখাও ছিল আমাদের আরেকটি লক্ষ্য। কারণ তখন এই মুক্তিযুদ্ধের মেয়াদ কতদিন হতে পারে সেই সঠিক ধারণা আমাদের কারো সেদিন জানা ছিল না। আমাদের নেতৃত্বে ও পরিচালনায় বিভিন্ন সীমান্তে ট্রেনিং ক্যাম্পগুলো ছাড়াও ভারতীয় সেনা বাহিনীর বিভিন্ন ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে সেদিন অনেক বাঙালি ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক ও গ্রামের যুবক সামরিক ও গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিং নিয়েছিল। পাক হানাদার বাহিনী এই বিলোনিয়ার পকেটে ঢুকে মুন্সিরহাট, ফুলগাজী, চিথলিয়া ও পরশুরাম বাজার এলাকাগুলোতে তাদের অবস্থান গ্রহণ করে। আমরা উইথড্রলের পরে কিছুদিনের মধ্যে সবাইকে আবার রি-অরগেনাইজ করে চন্দনা পরশুরাম এলাকায় মুহুরী নদীর অপর পাড় পর্যন্ত গ্রামগুলোতে অবস্থান গ্রহণ করি এবং ভারত সীমান্ত হয়ে ফুলগাজী থানার নীলক্ষিগ্রাম দিয়ে ফুলগাজী বাজারে পাক বাহিনীর অবস্থানের উপর চাপ সৃষ্টি করি। এছাড়া এই বাজার থেকে তারা যাতে এই ইউনিয়নের ১০টি গ্রামে না ঢুকতে পারে সেজন্য আমরা সামরিক অভিযানের পাশাপাশি গেরিলা তৎপরতা অব্যাহত রাখি। জুলাই '৭১ এ মুন্সিরহাট ডিফেন্স উইথড্রলের পর থেকে অক্টোবর '৭১ পর্যন্ত আমাদের অপারেশন তখন শুধু বিলোনিয়া পকেটে সীমাবদ্ধ ছিল না অপারেশন এর ব্যাপকতা ছড়িয়ে পড়ল বৃহত্তম নোয়াখালীর বিভিন্ন অঞ্চলে এবং এটা সম্ভব হয়েছিল মুন্সিরহাট ডিফেন্স থেকে সফল উইথড্রল এর পর আমাদের শক্তি ইনটেক্ট রেখে আরো শক্তি সঞ্চয়ের অব্যাহত প্রক্রিয়ার কারণে। যদি মুন্সিরহাট ডিফেন্সে ব্যাপক ক্ষতির শিকার হতাম তাহলে আমরা আমাদের শক্তি আরো বৃদ্ধি করতে পারতাম না। এবং পরবর্তীতে যে সব গেরিলা ও সামরিক অভিযানে আমরা পাক-হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সফল হয়েছিলাম তা হয়তো সম্ভবপর হতো না। সামরিক ও গেরিলা অভিযান চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি আমরা সেদিন ভারতে রাজনগর ও বড় কাসারীতে দু'টি ট্রেনিং ক্যাম্প পরিচালনা করতাম নতুন মুক্তি যোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য। আমাদের ২নং সাব সেক্টরে মুন্সিরহাট ডিফেন্সের তুলনায় মুক্তিযোদ্ধা সংখ্যায় প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেল। এছাড়া প্রাক্তন বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর, পুলিশ ও রেল পুলিশের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকল। সাব সেক্টর-২ এর পাশাপাশি মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বয়ে এদেরকে নিয়ে গড়ে উঠল আরেকটি রেগুলোর বাহিনী। এ রেগুলোর বাহিনীকে সংঘবদ্ধ করে আমার সেক্টর কমান্ডার খালেদ মোশাররফের

নির্দেশে আমি অক্টোবরে গঠন করলাম বিলোনিয়ার রণাঙ্গনে ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট। এই ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রতিষ্ঠাতা অধিনায়ক হিসেবে আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তখন আমি সাব সেক্টর-২ এর মাধ্যমে বৃহত্তম নোয়াখালী জেলাতে অপারেশন পরিচালনা আরো ব্যাপক ও জোরদার করি। এবং ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে সামরিক অভিযান পরিচালনায় দায়িত্ব রাখলাম। আমাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় '৭১ এর অক্টোবর/নভেম্বরে এগিয়ে আসল ভারতীয় সেনাবাহিনীর রাজপুত্র ও গুরখা রেজিমেন্ট। ভারতীয় সেনাবাহিনীর আর্টিলারিও ছিল আমাদের অনুকূল অর্থাৎ যখন আমরা যে অবস্থানের উপরে আর্টিলারি সেলিং করতে বলতাম সেই মুহূর্তে তারা আর্টিলারি সেলিং অব্যাহত রাখত।

মুন্সিরহাট ডিফেন্স উইথড্রল এর পর '৭১ এর জুলাইয়ের মাঝামঝি সময় থেকে অক্টোবর পর্যন্ত আমাদের প্রশিক্ষণ ক্যাম্পগুলো চালু রেখে আমাদের শক্তি বৃদ্ধির প্রক্রিয়া, ১০ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি নভেম্বরের ১ম সপ্তাহে পাকহানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে সর্বশেষ সামরিক অভিযান পরিচালনার আগ মুহূর্তে পর্যন্ত এ সাড়ে তিন মাস সময় আমরা বৃহত্তম নোয়াখালীতে আমাদের সামরিক ও গেরিলা অভিযান আরো জোরদার করি। এ সময় মুজিব বাহিনী ও বিভিন্ন গ্রুপের তৎপরতাও বৃদ্ধি পায়। এ ছাড়া আমরা নভেম্বরে পরশুরাম ও চিথলিয়ায় পাক-হানাদার বাহিনীর মজবুত ঘাঁটিগুলোর উপর আক্রমণ করা পর্যন্ত প্রায় তিন মাস বিলোনিয়ার পকেটে পরশুরাম ও চিথলিয়ায় তাদের অবস্থানের দিকে মুখ করে মির্জানগর ইউনিয়ন থেকে পরশুরামের মুহুরী নদীর পাড় পর্যন্ত আমাদের ডিফেন্সিব অবস্থান রাখি। আমাদের ডিফেন্সের উদ্দেশ্য ছিল শত্রু পক্ষ পরশুরাম ও চিথলিয়া এই দুটি বাজারে তাদের যে মজবুত ঘাঁটি করেছিল সেখান থেকে বেরিয়ে গ্রামের সাধারণ মানুষের উপর যেন অত্যাচার নির্যাতন না করতে পারে এবং ফুলগাজী, চিথলিয়া ও পরশুরাম এই তিনটি বাজারেই যেন তাদের অবস্থান সীমাবদ্ধ থাকে, বাইরের ব্যাপক অঞ্চল যেন আমাদের মুক্তিবাহিনীর সরাসরি নিয়ন্ত্রণে "মুক্ত এলাকা" হিসেবে চিহ্নিত থাকে। মুন্সিরহাট ডিফেন্স সফল উইথড্রলের পরে আমাদের চূড়ান্ত বিজয় অর্জন পর্যন্ত আমরা শত্রুদের ঐ অবস্থানগুলোর বাইরে এই ১০ ইউনিয়নের ব্যাপক অঞ্চলটি স্বাধীন বাংলার মুক্ত এলাকা হিসেবে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হয়েছিলাম। অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত এই মুক্ত এলাকা থেকে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের গেরিলা তৎপরতা অব্যাহত ছিল এবং অনেক সামরিক অভিযানও পরিচালিত হয়েছিল। এগুলোর মধ্যে মুক্তিবাহিনীর নোয়াপুর বি.ও.পি আক্রমণ, প্রায় প্রত্যেক রাতে ঘাঁটিগুলো আশপাশে তাদের পেট্রোল পার্টির সাথে আমাদের

মুক্তিবাহিনীর সংঘর্ষ, ছাগলনাইয়া বাজারে মুক্তিবাহিনীর থানা আক্রমণ, প্রায় প্রত্যেক দিন আমাদের ডিফেন্স ও তাদের অবস্থান থেকে দুই পক্ষের ফায়ারিং ও সেলিং অব্যাহত ছিল। আমাদের মজবুত ও আক্রমাণত্মক ডিফেন্সের মাধ্যমে আমরা শত্রু পক্ষকে চিথলিয়া ও পরশুরামে তাদের এই দুই অবস্থানের বাইরে এমনকি এই দুই অবস্থানের মধ্যে তাদের মুভমেন্টও প্রায় বন্ধ রাখতে সক্ষম হয়েছিলাম। তাদেরকে চিথলিয়া ও পরশুরামে কোণঠাসা অবস্থানে রেখে চিথলিয়ার পিছনে ফুলগাজীতে তাদের যে হেড কোয়ার্টার ও মজবুত ঘাঁটি ছিল আমরা ভারতীয় সেনাবাহিনীর রাজপুত ও গুরখা ব্যাটেলিয়নের সহযোগিতায় (আমাদের ডিফেন্সশিপ অবস্থান ঠিক রেখে) আমার তত্ত্বাবধানে ১০ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে সদ্য ভারতীয় মিলিটারি একাডেমি থেকে ট্রেনিংপ্রাপ্ত লেঃ দিদার ও লেঃ মিজানের নেতৃত্বে দুই কোম্পানি সৈন্য ও ভারতের রাজপুত্র ও গুরখা রেজিমেন্টের দুই কোম্পানি সৈন্যসহ যৌথভাবে ফুলগাজীর নীলক্ষী গ্রাম হয়ে অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে ফুলগাজীতে তাদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করি। সন্ধ্যার দিকে এই আক্রমণে দুই পক্ষের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। এই আক্রমণ ও কাউন্টার আক্রমণ ফুলগাজী বাজারে তাদের অবস্থান থেকে নিয়ে নীলক্ষী গ্রাম পর্যন্ত এবং নীলক্ষী গ্রামে আমাদের অবস্থান থেকে নিয়ে তাদের অবস্থান পর্যন্ত উভয় পক্ষের মাঝামাঝি প্রায় ১ মাইল এলাকা জুড়ে দুই পক্ষের মুখোমুখি সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়েছিল। দুইপক্ষের এই আক্রমণ পরিচালনার প্রাক্কালে উভয় দিক থেকে বৃষ্টির মতো আর্টিলারি সেলিং অব্যাহত ছিল। যার জন্য কারো পক্ষে সম্মুখে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়নি। ভারতীয় সেনাবাহিনীর আর্টিলারি ফুলগাজীতে আমাদের আক্রমণের পূর্ব মুহূর্তে পর্যন্ত এমনকি আক্রমণ চলাকালীন সময়ও সেলিং অব্যাহত ছিল। পাক হানাদার বাহিনীর আর্টিলারি সেলগুলো আকাশে শূন্যে বিস্ফোরিত হচ্ছিল এবং সেলর টুকরোগুলো আঘাত হানছিল সরাসরি উপর থেকে নিচে আমাদের খোলা অবস্থানের উপরে। এ অপারেশনে সেদিন আমাদের প্রায় ৫০/৬০ জন শহীদ হয়েছিল। এর মধ্যে ৫০/৫৫ জন ভারতীয় সেনাবাহিনীর ও কচি আইয়ুব আলীসহ আমাদের ৫ জন শহীদ হয়েছিল। এই অপারেশনে শত্রুপক্ষের প্রায় দুই শতাধিক সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছিল অর্থাৎ আমাদের তুলনায় শত্রুপক্ষের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল ব্যাপক। যদিও আমরা তাদের ফুলগাজী ঘাঁটি দখলে আনতে পারিনি তবুও আমাদের নীলক্ষীর অবস্থান থেকে নীলক্ষীর অদূরে ফেনী বিলোনিয়ার রাস্তায় তাদের মুভমেন্টের উপর আমাদের অব্যাহত সামরিক ও গেরিলা আক্রমণ ফেনী থেকে ফুলগাজীতে তাদের বাড়তি সৈন্য আনতে বাধা সৃষ্টি করে এবং ফুলগাজীতে তাদের অবস্থানকে কোণঠাস অবস্থায় রাখতে সফল হই। ফুলগাজীতে ১৫ বেলুচ ও ২৪ এফ এফসহ প্রায় দুই

রেজিমেন্টের অধিক সৈন্য পাক বাহিনীর ছিল। পরশুরাম, চিথলিয়া ও ফুলগাজীতে, তাদের অবস্থানগুলোকে কোণঠাসা অবস্থায় রেখে আমরা এখন বড় আক্রমণের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি গ্রহণ করি। ইতোমধ্যে আমার সেক্টর কমান্ডার খালেদ মোশাররফ কয়েক দফা সুয়াররবাজারে আমাদের ডিফেন্সশিপ এলাকা, বড়কাচারি ও রাজনগরে আমাদের প্রশিক্ষণ শিবিরগুলো এবং নীলক্ষী ও বিলোনিয়াতে আমাদের অবস্থান পরিদর্শন করেন এবং শত্রুপক্ষকে চূড়ান্ত আক্রমণের জন্যে আমাদের প্রস্তুতি নিতে বলেন।

যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে প্রায় প্রত্যেক মাসে খালেদ মোশাররফ কমপক্ষে দু'বার আমাদের এই রণাঙ্গনে আসতেন। যদিও তিনি স্বল্প সময়ের জন্য রণাঙ্গনে আসতেন তথাপি তাকে পেয়ে আমাদের সবার সাহস ও মনোবল অনেক গুণ বৃদ্ধি পেত। তিনি সব সময় আমার জন্য এক কার্টুন ইন্ডিয়ান কিংস নিয়ে আসতেন। আর বলতেন, "আগামীতে আসতে যদি আমার কয়েকদিন বিলম্বও হয় তোমার ইন্ডিয়ান কিংস কার্টুন সময় মতো পৌঁছে যাবে।" তাঁর সাথে আমার ছিল খুব ঘনিষ্ঠতা, তিনি ছিলেন একজন সাহসী কমান্ডার, শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিত্ব ও তার ছিল অগাধ দেশপ্রেম। আমরা যখন পাক হানাদার বাহিনীরবিরুদ্ধে চূড়ান্ত আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম ঠিক সেই মুহূর্তে বৃহত্তম নোয়াখালীতে সুবেদার লুৎফর রহমান, শ্রমিক নেতা রুহল আমিন, বেলায়েত, মুস্তাফিজ, ফজলে এলাহী এদের নেতৃত্বে পাক হানাদার বাহিনীর সঙ্গে প্রচণ্ড মুখোমুখি সংঘর্ষ চলছিল পুরো বৃহত্তম নোয়াখালী জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে।

আমি অবশ্যই স্বীকার করব, সেদিন বৃহত্তম নোয়াখালী জেলার আওয়ামী লীগের প্রত্যেকটি নেতা এবং কর্মী ও আওয়ামী লীগের তৎকালীন এমপিগণ বৃহত্তম নোয়াখালী জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের মুক্তিযোদ্ধাদেরকে অমূল্য সহযোগিতা প্রদান করেছিলেন এবং ভারতের প্রশিক্ষণ ক্যাম্পগুলোতেও আমাদের সহযোগিতা প্রদানে তাদের ছিল সক্রিয় ভূমিকা।

অক্টোবরের শেষ দিকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর জেনারেল হীরা আমাকে ২ নং সেক্টরের মাধ্যমে খবর পাঠালেন তার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য। আমি আগরতলা অদূরে ভারতীয় একটি সেনা শিবিরে গিয়ে তার সাথে সাক্ষাৎ করি। তিনি আমাকে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে পাক হানাদার বাহিনীর পরশুরাম ও চিথলিয়া ঘাঁটির মাঝ দিয়ে রাতের অন্ধকারে অনুপ্রবেশ করে দুটি ঘাঁটিকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে পৃথক পৃথকভাবে এই দুটি ঘাঁটির চারদিকে ভোর হওয়ার আগেই ডিফেন্সশিপ অবস্থান গ্রহণ করে সময় সুযোগ বুঝে পরবর্তীতে আক্রমণ পরিচালনার সম্ভাবনার কথা জানান। আমি তাকে কিছু শর্ত সাপেক্ষে আশ্বস্ত করেছিলাম যে, এটা যদিও বড়

ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ সামরিক অভিযান তবুও এটা অবশ্যই সম্ভব এবং আরো বললাম এটা খুবই চাঞ্চল্যকর হবে।

তিনি এ অপারেশনের ব্যাপারে ইতোমধ্যেই আমার সেক্টর কমান্ডার খালেদ মোশাররফের সাথে আলাপ করেছেন বলে জানালেন এবং আমাকে শর্তগুলো কী তা জিজ্ঞেস করলেন। আমি তাকে "আসলে কোনো শর্ত নয়, এ অপারেশন সফল করার জন্য কিছু প্রত্যক্ষ সহযোগিতা প্রয়োজন" বলে উল্লেখ করলাম এবং আমি জেনারেল হীরাকে জানালাম যে, "আমাদের ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সহযোগিতায় আপনাদের রাজপুত ও তরঘা ব্যাটেলিয়ান সহযোগী শক্তি হিসেবে থাকবে এবং মুক্তিযুদ্ধের অন্য কোনো সেক্টর থেকে এক কোম্পানির সমপরিমাণ বেঙ্গল রেজিমেন্টে সৈন্য ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের শক্তি আরো বৃদ্ধি করার জন্য পাঠাতে হবে। এ ছাড়া আমাদের মধ্যে যোগযোগের জন্য ওয়্যারলেস সেট, অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে এম.এম.জিও আর.আর. সরবরাহ করতে হবে। সর্বোপরি ভারতীয় আর্টিলারির সহযোগিতা আরো ব্যাপক করতে হবে এবং প্রয়োজনে তাদের বিমান বাহিনীকেও আক্রমণে রাখতে হবে। তিনি সাথে সাথে সহাস্যে উত্তর দিলেন "Everything done।" আমাকে আগামী তিন দিনের মধ্যে আমার ব্যাটেলিয়ন অফিসারদেরকে নিয়ে আবার তাঁর ক্যাম্পে আসতে বললেন। আরো বললেন "সেদিন আমরা এই অপারেশনের উপরে একটি Sand model discussion করব" এবং সাথে সাথে তিনি আমার অনুরোধ মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তার অধীনস্ত সংশ্লিষ্ট অফিসারদের নির্দেশ প্রদান করলেন। পরের দিন মেজর শফিউল্লার (বর্তমান অবঃপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল ও প্রাক্তন সেনা প্রধান) সেক্টর থেকে ক্যাপ্টেন হেলাল মোর্শেদের নেতৃত্বে ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের এক কোম্পানি সৈন্য ১০ম ইস্ট বেঙ্গলের সহযোগিতায় পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন। তিনদিন পরে আমি আমার অফিসারদেরকে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলাম। আমার সাথে ছিল ক্যাপ্টেন হেলাল মোরশেদ, লেঃ ইমামুজ্জামান, ক্যাপ্টেন শহীদ, লেঃ দিদার, লেঃ মিজান, ক্যাপ্টেন গোলাম মোর্শেদ আর সেক্টর থেকে এসেছিলেন সেক্টর কমান্ডার খালেদ মোশাররফ ও অন্য অফিসারেরা। আমাদেরকে একটি প্রশস্থ হল রুমের ভিতরে নিয়ে যাওয়া হয়। হল রুমের ভিতরে চারদিকে গ্যালারি, মাঝে একটি Sand Model সাজানো ছিল। এই Sand Model টিতে বিভিন্ন রং এর বালি, খেলনার আকারে ছোট ছোট আকৃতির গাছপালা, বাড়ি ঘর এবং এলাকার নদী-নালা, রাস্তা-ঘাট, পুল-কালভার্ট ইত্যাদির চিত্র সুন্দরভাবে তুলে ধরা হলো অর্থাৎ যুদ্ধ ক্ষেত্রের একটি সম্প্রসারিত ম্যাপ Model আকারে সেদিন আমাদের সবার মাঝে তুলে ধরা হলো চারপাশের গ্যালারিতে আমরা ও ভারতীয় অফিসাররা উপবিষ্ট ছিলাম। প্রথমে জেনারেল হীরা

এই Sand Model সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করেন এবং একটু পরে তার কয়েকজন উর্ধ্বতন অফিসার হাতে লম্বা চিকন কাঠের লাঠি দিয়ে আমাদের এই Model অপারেশনের বিভিন্ন সুবিধা অসুবিধা ও সার্বিক রণকৌশল তুলে ধরেন। একটি সংক্ষিপ্ত কৌশল সম্পর্কে কিছু আলোচনা করলেন। তখন তাদের একটা ধারণা হচ্ছিল যে আমরা মুক্তিবাহিনীর অফিসাররা এ ধরনের Model হয়তো অতীতে কখনো দেখিনি বা দেখে থাকলেও হয়তো এ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান সীমিত। ভারতীয় সেনাবাহিনীর অফিসারদের Model টি আলোচনার পরে আমাকে ডাকা হলো এই Model এর উপরে আলোচনার মাধ্যমে উল্লেখিত অপারেশনের কৌশল তুলে ধরার জন্য। আমি Model টি বিশ্লেষণ শুরু করার আগে আমার সেক্টর কমান্ডার খালেদ মোশাররফ আমার পরিচয় দিলেন। তিনি বললেন "জাফর ইমাম পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমি থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন পদাতিক বাহিনীর অফিসার এবং পাকিস্তানের মিলিটারি একাডেমি ছাড়াও তিনি পদাতিক যুদ্ধের রণকৌশলের উপরে পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে অনেকগুলো কোর্স সমাপ্ত করেছেন। এ ছাড়া তিনি পাকিস্তানি পদাতিক বাহিনীর ২৪-এফ এফ রেজিমেন্টের Adjutant ছিলেন। আজকের এই Model সম্পর্কেও তার একটি সম্যক ভালো ধারণা রয়েছে এ জন্য যে বিলোনিয়ার পকেটে তার বাড়ি, এই অঞ্চলের রাস্তাঘাটগুলোর সাথে তার পরিচয় অনেক দিনের।" খালেদ মোশাররফও Model এর উপর যুদ্ধের রণকৌশল সংক্ষেপে তুলে ধরলেন–মনে হচ্ছিল যেন একজন জেনারেল তার বক্তব্য রাখছেন। গর্বে আমাদের সবার বুক ভরে গেল। খালেদ মোশারফের বক্তব্যের পর পরই আমি Model discription শুরু করলাম। আমি সামরিক পদ্ধতিতে এই Model এর উপর যুদ্ধের রণকৌশলের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে সর্বশেষে আমার পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করলাম। model বিশ্লেষণ শেষে জেনারেল হীরা সবার সামনে আমার প্রশংসা করে বললেন, "আমি আশাবাদী, এই অপারেশন সফল হবেই।" তার প্রশংসা করার মধ্যে সেদিন আমাদের চূড়ান্ত বিজয় ও সফলতার ব্যাপারে তার আবেগ পরিলক্ষিত হয়েছিল। ঐখান থেকে আমরা আবার ফিরে আসলাম আমাদের অবস্থানে। আমরা ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও মুক্তিবাহিনীর বিভিন্ন স্তরের সংশ্লিষ্ট অফিসার ও কামান্ডারদের নিয়ে যুদ্ধের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করলাম এবং সবাইকে নিয়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকলাম। পরের দিন জেনারেল হীরা বিলোনিয়াতে আমাদের অবস্থানে আসেন এবং তার পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। আমরা এখন সম্পূর্ণভাবে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পরশুরাম ও চিথলিয়া ঘাঁটি দুটির মাঝ দিয়ে অনুপ্রবেশ করে ভোর হওয়ার আগে এই দুটি ঘাঁটির চারদিকে আমরা যে

ডিফেন্সশিপ পজিশন গ্রহণ করব- সেই ডিফেন্স এর বাম দিকে অর্থাৎ ছাগলনাইয়ার শুভপুর পর্যন্ত এলাকার দায়িত্বে ছিলেন ১নং সেক্টর কমান্ডার ক্যাপঃ রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম। আমাকে জানানো হলো যে, আমার বাম দিক দিয়ে ছাগলনাইয়া হয়ে শত্রু পক্ষ যেন আমাদের অবস্থানের উপর আক্রমণ না করতে পারে সেজন্য ১নং সেক্টর কমান্ডার ক্যাপঃ রফিকের ফোর্সকে সতর্ক অবস্থায় রাখা হয়েছে। আমিও ক্যাপঃ রফিকের সাথে যোগাযোগ করি তিনি জানালেন ছাগলনাইয়া থেকে আমাদের বামের ডিফেন্সের শেষ সীমানা পর্যন্ত তিনি তার অধীনস্ত মুক্তি যোদ্ধাদেরকে অবস্থানে রাখবেন।

পরবর্তীতে আমরা যখন অপারেশন শুরু করি তখন আমাদের ডিফেন্সের শেষ সীমানা থেকে ছাগলনাইয়া হতে শুভপুর পর্যন্ত ক্যাপঃ রফিকের নেতৃত্বে ১নং সেক্টরের মুক্তি বাহিনীরা মজবুত অবস্থানে থেকে ঐ অঞ্চলে তাদের তৎপরতা বৃদ্ধি করে যেন ছাগলনাইয়া হয়ে আমাদের অবস্থানের উপর শত্রুপক্ষ কোনো অবস্থাতেই আক্রমণ পরিচালনা করতে না পারে। ক্যাঃ রফিক যোগ্যতার সাথেই সফলভাবে সেই দায়িত্ব পলন করেছিলেন।

আমরা যখন পরশুরাম ও চিথলিয়ায় অনুপ্রবেশ করে চারদিকে অবস্থান গ্রহণ করি এবং পরবর্তীতে যখন তাদের সাথে আমাদের সম্মুখ যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় এবং আমাদের অবস্থানের উপরে শত্রুপক্ষের ঘন ঘন বিমান হামলার তীব্রতা বৃদ্ধি পায়, ঠিক সেই মুহূর্তে আমাদের অবস্থানে সমন্বয় করার জন্য আসলেন ক্যাপঃ রফিক বীর উত্তম। আমি ও ক্যাপঃ রফিক সেই সময় যুদ্ধের অবস্থা এবং পরবর্তীতে যুদ্ধের রণকৌশল নিয়ে আলোচনা করি এবং এই যুদ্ধের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমাদের দুই পক্ষ নিজেদের মধ্যে সমন্বয় ও সম্পর্ক সব সময় অটুট রেখে ছিলাম।

পরশুরাম ও বেলোনিয়ার পকেট থেকে শত্রুদের হটানোর ব্যাপারে মিত্র বাহিনীর জেনারেল হীরা আমাকে চ্যালেঞ্জ করল। আমি দৃঢ়ভাবে এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম এবং বললাম- অতি সুনিপুণভাবে এ অভিযানকে সফল করে তুলবই। এই দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় নিয়ে সামরিক কৌশলের অন্যতম কৌশল হিসেবে গোপন অনুপ্রবেশ দ্বারা গোপনে শত্রুদের অবরোধ করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

এখানে একটা কথা উল্লেখযোগ্য যে আমরা যে বাহিনী দ্বারা এ অভিযান শুরু করেছিলাম তারা পুরোপুরিভাবে সব দিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। এই অভিযানের ১০ম বেঙ্গল ও ২য় বেঙ্গলের শতকরা ৮০ জন সৈন্যই ছিল পুরনো বেঙ্গল রেজিমেন্টের ও প্রাক্তন ইপিআর বর্তমান বি.ডি.আর এবং বাকি শতকরা ২০ জন সদস্য ছিল ট্রেনিংপ্রাপ্ত। তাছাড়া মিত্র বাহিনী আমাদের এ অভিযানে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সক্রিয় সহযোগিতা করেছিল। রাতের অন্ধকারেই আমরা গোপন অনুপ্রবেশের

কাজ শেষ করে ভোর হবার আগেই ওদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি নিলাম।

নভেম্বরের অন্ধকার শীতের রাত। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। হিমেল হাওয়ায় গাছের পাতায় যেন একটি অশরীরী শব্দ সৃষ্টি করছিল। মনে হচ্ছিল সমস্ত রাতটা যেন কিছুর প্রতীক্ষায় আছে। রাত আনুমানিক ১০-৩০ মিনেট। আমাদের অনুপ্রবেশের কাজ শুরু করলাম। আমরা এমন একটা এলাকা ঘেরাও করার অভিযানে নেমেছি যার তিন দিকই ছিল ভারত সীমান্ত দ্বারা বেষ্টিত। আমরা তাই ভারতের এক প্রান্তের সীমান্ত থেকে পরশুরাম-চিথলিয়ার মাঝ দিয়ে অগ্রসর হয়ে ভারত সীমান্তের অপর প্রান্ত পর্যন্ত অবরোধ করার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমাদের এ অবরোধ যদি সফল হয় তবে শত্রুরা সহজেই ফাঁদে আঁটকা পড়বে।

অবরোধের কাজ শুরু হলো। অন্ধকার রাতে মুহুরী নদী ও ছিলনীয়া নদীর কোথাও বুক পানি, কোথাও কোমর পানি, কোথাও বা পিচ্ছিল রাস্তার বাধা পেরিয়ে এগিয়ে চলছিল সবাই। সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। অন্ধকার রাত। সামান্য কাছের লোককেও ভালো করে দেখা যাচ্ছিল না। কমান্ডার হিসেবে সবাইকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত করে আমাদের নির্ধারিত গন্তব্যস্থানে পৌঁছানো সত্যই কষ্টকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তবুও সব বাধাকে তুচ্ছ করে আমরা এগিয়ে চললাম এবং সেই সঙ্গে আমি আমার দলের অন্যান্য অফিসারদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চললাম। প্রথমে মুহুরী নদী অতিক্রম করল লেঃ মিজানের রহমানের নেতৃত্বে B. Company ও লেঃ দিদারের নেতৃত্বে D. Company. এই দুই কোম্পানির পরে ১০ম ইস্ট বেঙ্গলের হেডকোয়ার্টার কোম্পানি ও ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট থেকে আগত ক্যাপ্টেন হেলাল মোরশেদের নেতৃত্বে আর একটি কোম্পানিসহ আমি নদী অতিক্রম করে সবাই পূর্ব নির্ধারিত এলাকায় অবস্থান গ্রহণের উদ্দেশ্যে যাত্রা অব্যাহত রাখি। ঐ দিকে লে. অ্যান্ড ইমামুজ্জামান ও লেঃ মোকলেসুর রহমানের নেতৃত্বে যথাক্রমে A. Company ও C. Company চিথলিয়া ঘাঁটি বরাবর রেজিমেন্টের B./D.HQ ও ২য় ইস্ট বেঙ্গলের কোম্পানির সাথে সময়ের তাল মিলিয়ে পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রসর হতে থাকে। নিঃশব্দ হয়ে সবাই অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পথ চলছি। কারো মুখে কোনো কথা নাই। শত্রুরা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারল না যে ওদেরকে জালে আটক করার জন্য আমরা এগিয়ে আসছি। শত্রুরা যদি আমাদের এ অনুপ্রবেশ টের পায় তবে আমাদের সমস্ত পরিকল্পনাই বানচাল হয়ে যাবে কারণ যুদ্ধক্ষেত্রে গোপন অনুপ্রবেশ যদি অপরপক্ষ টের পায় তবে পরিকল্পিত অভিযান সফল করা সম্ভব হয় না। আমরা আরো অনেক পথ এগিয়ে এলাম। আমাদের এ কাজে বেশ সময় লাগছিল। কারণ অন্ধকার রাতে নির্ভুল পথে এগিয়ে যাওয়া সত্যিই বেশ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার ছিল।

এছাড়া আরো একটা ভয়ের সম্ভাবনা ছিল। শত্রুপক্ষের লোকেরা রাতে বিভিন্ন জায়গায় পেট্রোলিং-এ ছিল। তাদের খপ্পরে পড়াও বিচিত্র ছিল না। সে ভয় আমাদের অমূলক ছিল না। আমরা যখন রেলওয়ে ও কাঁচা রাস্তার কাছাকাছি এগিয়ে এলাম তখনই দেখলাম শত্রুপক্ষের ডিউটিরত একটি দল রেললাইন ধরে সামনের দিকে এগিয়ে আসছে। আমরা টুপ করে লুকিয়ে গেলাম– কেউবা রাস্তার আড়ালে, কেউবা জমিনের আড়ালে। ওরা কিছুই টের পেল না। নিশ্চিন্ত মনে গল্প করতে করতে চলে গেল। বিপদ কেটে গেল। এদিকে রাত বাড়ছে। আমি তাড়াতাড়ি আমার কোম্পানি কমান্ডারদের সাথে যোগাযোগ করলাম। ওরা জানাল সব ঠিক আছে। ওরা নিরাপদেই অবরোধের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ভোর হবার বেশি বাকি নেই। আমরা আমাদের নির্ধারিত স্থানে হাজির হলাম এবং এর ফলে শত্রুদের পরশুরাম ও চিথলিয়া ঘাঁটি পুরোপুরি আমাদের অবরোধের মাঝে আটকা পড়ল।

শত্রুদের চিথলিয়া ঘাঁটির দিক থেকে যাতে কোনো প্রকার আক্রমণ না আসতে পারে তার জন্য আমরা প্রতিরোধ গড়ে তুললাম। ভোর হয়ে আসছিল। আমরা প্রতিরোধের সকল ব্যবস্থা শেষ করতে লাগলাম। বাঙ্কার খোঁড়ার কাজ শুরু হলো এবং অন্যান্য সব ব্যবস্থাও করতে লাগল। পথশ্রমে ও ক্ষুধার তাড়নায় সবাই ক্লান্ত। তবুও বিশ্রামের সময় নেই। ভোরের আলো ফুটবার আগেই প্রতিরোধের কাজ শেষ করতে হবে, তাই প্রাণপণে সবাই কাজ করতে লাগলাম। ভোর হলো। আমরাও সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে গেলাম। শত্রুরা আমাদের অবরোধের মাঝে। এ সফলতার খবরটা জেনারেল হীরাকে জানাতে ইচ্ছে হলো। ওয়ারলেসে হীরাকে জানালাম যে শত্রুদের আমরা পুরোপুরি জালে আটকিয়েছি। খবরটা শুনে জেনারেল হীরা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। ধন্যবাদ দেবার সময় খুশিতে তার কথা আটকে যাচ্ছিল। আমি আমার চ্যালেঞ্জে জিতেছি বললে জেঃ হীরা ব্যক্তিগতভাবেও আমাকে প্রচুর ধন্যবাদ জানালেন। এদিকে ভোরের আলোয় চারদিক আলোকিত হয়ে উঠছিল। ভোরের আলোয় চারদিকে ভালো করে দেখতে লাগলাম। তারপর বুঝতে চেষ্টা করলাম যে শত্রুরা আমাদের অনুপ্রবেশ টের পেয়েছে কিনা। কিন্তু না, তা বোঝার কোনো উপায় নেই, চারদিক নীরব, কোথাও মানুষের কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল না।

বিলোনিয়া থেকে রেল লাইনের সাথে সমান্তরালভাবে কাঁচা রাস্তাও চলে এসেছে ফেনী পর্যন্ত। এই রাস্তার পাশেও আমাদের বেশ কিছু বাঙ্কার গড়ে উঠেছে। বাঙ্কারে বসে সবাই সামনের দিকে চেয়ে আছি। বেশ কিছু সময় কেটে গেল। হঠাৎ দূর থেকে একটা ট্রলির আওয়াজ অস্পষ্ট শুনতে পেলাম। শব্দটা চিথলিয়ার দিকেই আসছে বলে মনে হলো। রেললাইন ও রোডের কাছের বাঙ্কারে

যারা ডিউটিতে ছিল তাদের মধ্যে নায়েক সুবেদার এয়ার আহমদ ছিলেন খুবই সাহসী। যুদ্ধের প্রথম থেকেই তিনি আমার সাথে থেকে নির্ভীকতার সঙ্গে লড়াই করে আসছিলেন।

ট্রলিটা এগিয়ে আসছে। সবাই প্রতীক্ষায় বসে রইল। আস্তে আস্তে ট্রলির শব্দটা আরো কাছে এগিয়ে আসছে। আমরা পরিষ্কারভাবে দেখতে পেলাম, কয়েকজন সৈন্য বেশ কিছু অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে এগিয়ে আসছে। ওরা নিশ্চিত মনে আসছে। ওরা বুঝতেও পারেনি যে ওদের শত্রু এত কাছে রয়েছে।

এক, দুই, তিন, সেকেন্ডের কাঁটা ঘুরতে লাগল। ট্রলিটা একেবারে কাছে এসে গেল। এয়ার আহমদ ও তার সঙ্গীদের হাতের অস্ত্রগুলো এক সঙ্গে গর্জে উঠল। মুহূর্তের মধ্যে জায়গাটা ধোঁয়ায় ঢেকে গেল। অনবরত ফায়ারিং-এর শব্দে চারদিকে মুখরিত হয়ে উঠল। শত্রুরা অনেকেই পালাতে চাইল, কিন্তু তা সম্ভব হতে আমরা দিলাম না। একজন শত্রুও প্রাণে বাঁচতে পারল না। আনন্দে এয়ার আহমেদ ও তার সঙ্গীরা "জয় বাংলা" ধ্বনি দিয়ে চিৎকার করে উঠল। উত্তেজনায় ও আনন্দে ওদের সারা শরীর কাঁপছিল।

ফায়ারিং-এর শব্দ শুনে চিথলিয়া ও পরশুরাম ঘাঁটির শত্রুরা মনে করল, তাদের ট্রলিটা হয়তো বা কোনো মুক্তিবাহিনীর গেরিলা দলের হাতে পড়েছে। প্রকৃত অবস্থাটা তারা কিন্তু তখনও বুঝতে পারেনি। তখন দুদিকে থেকেই শত্রুরা আক্রমণ শুরু করল।

এদিকে এয়ার আহমদ আনন্দে বাঙ্কার ছেড়ে উঠে দৌড়ে গেলেন অদূরে পড়ে থাকা শত্রুদের মৃত অফিসারটির কাছে। গোলাগুলির কথা তিনি যেন মুহূর্তের জন্য ভুলে গেলেন। অফিসারের পকেট থেকে তিনি পিস্তলটি উঠিয়ে নিলেন। তারপর তাকে টেনে নিয়ে আসতে লাগলেন নিজ বাঙ্কারের দিকে। ঠিক তখনই শত্রুদের চিথলিয়া ঘাঁটির দিক থেকে একটি বুলেট এসে বিঁধল এয়ার আহমদের মাথায়। চোখের সামনেই দেখতে পেলাম ওর শরীরটা যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেল। ঢলে পড়ল বাঙ্কারের মুখে। রক্তে ঢেকে গেল ওর জয়ের আনন্দে উদ্দীপ্ত মুখটা। নিজের জান দিয়ে এয়ার আহমদ শত্রুদের ঘায়েল করেছেন। কিন্তু এর মেশ দেখে যাওয়া তার কপালে রইল না।

৯ই নভেম্বর। সেদিন ওকে হারিয়ে বেদনায় মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলাম। একজন বীরকে হারিয়ে মর্মাহত হয়ে পড়েছিলাম ঠিকই তবুও কর্তব্যের ডাকে সাড়া দিয়ে এয়ার আহমদের রক্তের বদলা নেবার জন্য শত্রুদের হামলার যোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়ে চললাম, শত্রুর আক্রমণের দাঁতভাঙা জবাব দিয়ে চললাম। শত্রুরা সারাদিন ধরে আমাদের বিভিন্ন পজিশনের উপর তুমুলভাবে আক্রমণ চালাল।

সারাদিন কেটে গেল। বৃষ্টির মতো আর্টিলারি আর শেলিং-এর শব্দে আশপাশের নীরব এলাকা কেঁপে উঠতে লাগল। ক্রমে রাত হয়ে এল। অন্ধকার রাত। শত্রুরা এবার পরশুরাম ঘাঁটি থেকে আমাদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করল। আমাদের জোয়ানরা তার পাল্টা জবাব দিয়ে চলল। পরশুরাম থেকে এ আক্রমণের আকার ছিল অতি ভয়ংকর। ওরা এমনভাবে আমাদের জালে আটকা পড়েছে যে বের হওয়ার কোনো পথ নেই। ওরা বুঝতে পারল, এটা ওদের জীবন মরণ সমস্যা। তাই তারা প্রাণপণে লড়ে যেতে লাগল, কিন্তু ওদেরকে আমাদের জাল ছেড়ে বের হতে দিলাম না। আমরা তাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ করে দিতে লাগলাম।

বেলোনিয়া ও পরশুরাম ঘাঁটিতে যেসব শত্রু ছিল তারা শুধু একটু সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিল। যে করেই হোক ওরা চিথলিয়া থেকে সাহায্য পাওয়ার জন্য চেষ্টা করতে লাগল কিন্তু আমরা তা ব্যর্থ করে দিলাম। ওদের এই প্রাণপণ লড়াইয়ের জবাব দিয়ে আমরা শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করি।

তারপর ভোর হলো। ওরা আমাদের উপর অনবরত শেলিং ও ফায়ারিং করতে লাগল। আমরা উচিত জবাব দিয়ে চললাম।

সেদিন বেলা ৪টার সময় হঠাৎ শত্রুরা আমাদের উপর বিমান হামলা শুরু করল। কিন্তু ওরা এতে আমাদের বিশেষ কোনো ক্ষতি করতে পারল না। এবার আমরা আরো সতর্কতা অবলম্বন করলাম।

সেদিন গেল। তার পরের দিনও আগের দিনের মতোই ফায়ারিং ও শেলিং চলল। দুপক্ষ থেকেই সমানে আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণ চলল। ওদের শুধু একটিই উদ্দেশ্য, হয় চিথলিয়ার সাথে যোগাযোগ, না হয় পালানো। কিন্তু সে মুহূর্তে পালানো ছাড়া তাদের আর কোনো পথ আসলেই ছিল না। শুধু ফায়ারিং ও শেলিং-এর শব্দে মাঝে মাঝে সে এলাকার প্রকৃতি আর গাছ-পালা যেন কেঁপে কেঁপে উঠছিল। অনেক সময় এক মিনিটও বিরাম ছিল না। শব্দের জন্য অতি কাছের লোকের কথাও শোনা যেত না।

সেদিন বেলা ৩-৫০ মিনিট। হঠাৎ দেখলাম তিনটা বিমান আমাদের এলাকায় উড়ে আসছে। এসেই ওরা সে এলাকার উপর বোম্বিং করতে শুরু করল। অনেক ঘরবাড়ি পুড়ে যেতে লাগল। চারদিকে দাউ দাউ করে বাড়িঘরে আগুন জ্বলছে। ওরা বেশ নিচু হয়েই বোম্বিং করছিল। যদিও আমাদের কাছে অস্ত্রশস্ত্র বহু ছিল কিন্তু বিমান বিধ্বংসী কামান আমাদের ছিল না। যেহেতু ওরা জানত আমাদের কোনো বিমান বিধ্বংসী কামান নেই, তাই নিশ্চিন্ত হয়ে নিচু দিয়ে বিমান চালাচ্ছিল।

সবাই অপেক্ষায় আছি। কখন আমাদের এম.এম.জি'র আওতায় বিমানগুলো আসে। আর দেরি হলো না। এম.এম.জি থেকে উৎগীরিত হতে থাকল তপ্ত বুলেট। দুটি বিমান উড়ে চলে গেল ওদের সীমানায়। আর একটি ফিরে যেতে পারল না। বহুদূর গিয়ে শূন্যে ঘুরপাক খেয়ে ছিটকে পড়ল মাটিতে। জোয়ানরা চেঁচিয়ে উঠল উল্লাসে। সেদিন ছিল নিঃসন্দেহে ১০ম ও ২য় বেঙ্গলের সংগ্রামী দিনগুলোর একটি স্মরণীয় দিন। কোনো যুদ্ধের ইতিহাসে হয়তো বা এর আগে এম.এম.জি দিয়ে কোনো বিমানকে ভূপাতিত করা হয়নি আমরা তাই করতে পেরেছি। গর্বে সবার বুক ভরে উঠল। এই কৃতিত্বপূর্ণ ঘটনাটা সে এলাকার জনসাধারণের মনে রেখাপাত করেছিল বেশি। তাদের মুখে মুখে ফিরতে লাগল একথা। আমাদের জন্য ওরাও যেন গর্বিত।

সেদিনই মিত্রবাহিনীর জেনারেল হীরা ওয়্যারলেসে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানান। সেদিন রাতে আমরা মিত্রবাহিনীর সক্রিয় ও গোলন্দাজ বাহিনীর সহযোগিতায় শত্রুদের বিলোনিয়া ও পরশুরাম ঘাঁটির ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালালাম। ওরা আমাদের এ হামলার মুখে বেশিক্ষণ টিকতে পারল না। ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল ওরা। শত্রুদের বেশির ভাগ সৈন্যই আমাদের আক্রমণে প্রাণ দিল। রাতের মধ্যেই আমরা পরশুরাম ও বিলোনিয়া দখল করতে সক্ষম হলাম।

অভাবনীয় ও অবর্ণনীয় এক দৃশ্য দেখলাম ওদের পরিত্যক্ত ঘাঁটিতে গিয়ে। চারদিকে বিক্ষিপ্ত অবস্থানে পড়ে আছে অসংখ্য লাশ। ধানক্ষেতে বাঙ্কারে; বাঙ্কারের অদূরে, খালের পানিতে কোথাও ফাঁক নেই। যারা আহত হয়েও পালাতে চেয়েছিল তারা শরীরের অসমর্থতার জন্য পারেনি। অসহায়ভাবে কাতরাচ্ছিল বাঁচার আশায়। আহত এসব সৈন্যদের চিকিৎসা করা আমাদের কর্তব্য। তাড়াতাড়ি তার ব্যবস্থা করতে বললাম। কিন্তু ওদের মাঝে বেশির ভাগ সৈন্য মারা গেল। মাত্র ৩/৪ জন বাঁচতে পারল। আমরা সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় প্রচুর গোলাবারুদ ও অস্ত্রশস্ত্রসহ ৭২ জনকে বন্দী করতে সক্ষম হয়েছিলাম। তাদের বন্দী করা হলো। পরশুরাম ও বিলোনিয়া ঘাঁটির এ মর্মান্তিক পরিণতিতে চিথলিয়া ঘাঁটির শত্রুরা ভেঙে পড়ল।

আমরা আস্তে আস্তে আরো এগিয়ে আসতে লাগলাম এবং তাদের প্রকৃত অবস্থাটা বুঝে আরো কিছু কায়দা বের করতে চাইলাম। এবারে আমরা অবস্থা বুঝে পুরনো কায়দা হিসেবে আবার গোপন অনুপ্রবেশ করার পরিকল্পনা নিলাম। আমরা নীলক্ষীকে ঘাঁটি করে ওদের ফুলগাজী ঘাঁটির উপর চাপ সৃষ্টি করব। তাতে ওরা দুর্বল হয়ে পালাতে বাধ্য হবে হয়তো। নীলক্ষীতে আমরা মজবুত ঘাঁটি করে বসলাম। ওরা আমাদের পরিকল্পনাটা টের পেল মনে হয়। তাই ওরা চিথলিয়ার ঘাঁটি ছেড়ে সবাই ফুলগাজীতে এসে মিলল। আমরা তখন সরাসরি ফুলগাজীর

উপর চাপ সৃষ্টি করলাম। ওরা অবস্থা বুঝতে পারল, ব্যাপারটা ওদের জন্য সুবিধার নয়। ওরা একেবারে সব ঘাঁটি ছেড়ে বন্দুয়া রেল স্টেশনের কাছে এসে ঘাঁটি স্থাপন করল।

আমরা আরো এগিয়ে আসলাম। কালিহাট ও পাঠাননগর থেকে আমরা শত্রুদের মুখোমুখি হয়ে ঘাঁটি স্থাপন করলাম। আমাদের দক্ষিণ দিকে ছিল সোনাগাজী। সেখানে আমরা আগেই গেরিলা বাহিনী পাঠিয়ে সব ঠিক করে রেখেছিলাম। ওরা এখন আমাদের দ্বারা তিনদিক দিয়েই চাপের মধ্যে পড়েছে। তখন বাধ্য হয়ে যেহেতু তারা সোনাগাজী দিয়ে পালাতে চাইবে, সেহেতু আমরা সে পথ ওদের জন্য ইচ্ছা করে মুক্ত রেখেছি আর গেরিলা বাহিনী রেখেছি গোপনে, যাতে তারা পালাতে গেলেই ওদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হবে। কিন্তু বাস্তবে তা হলো না। ওরা আমাদের প্রচণ্ড চাপ সহ্য করতে না পেরে নোয়াখালী-বেগমগঞ্জ হয়ে লাকসামে চলে গেল এবং এতে ওদের অধিক সংখ্যক সেনাই পালাতে সক্ষম হলো।

চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টের পতন ও মুক্ত স্বদেশ

৬ই ডিসেম্বর আমরা ফেনী মুক্ত করলাম। ফেনীর এতদিনকার গুমোট ও ধোঁয়াটে আকাশে স্বাধীনতার পতাকা উড়ল। অগণিত মানুষ শ্লোগানে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলল। দীর্ঘ ৮ মাস পরে মুক্ত বাতাসে সবাই দাঁড়িয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। ফুলের মালা আর জনতার বরণ ডালার আতিশয্যে আমরা সেদিন অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। দু'চোখ শুধু বারে বারে পানিতে ভরে উঠছিল। মাথায় বাংলা মায়ের অশ্রুভেজা আশীর্বাদ নিয়ে বাংলাদেশের সবুজ প্রকৃতির মাঝে সূর্য আঁকা পতাকা ছুঁয়ে শহীদ এয়ার আহমদের মতো লাখো লাখো বীর শহীদদের আমরা অবনতচিত্তে স্মরণ করলাম। আরো অনেক কাজ বাকি; অভিভূত হয়ে বসে থাকার সময় তখন নয়।

আর দেরি করলাম না। সবাই আমরা মার্চ করে নোয়াখালীর দিকে রওয়ানা দিলাম। নোয়াখালীর সদর মুক্ত করতে যেয়ে আমরা সেদিন বাঁধাপ্রাপ্ত হয়েছিলাম প্রচুর। কিন্তু তা যদি পাক সৈন্যদের দ্বারা হতো তবে বোধ হয় সান্ত্বনা পেতাম। তারা ছিল বর্বর আর ঘৃণ্য রাজাকার আর আলবদরের দল। ওরা নানাভাবে আমাদের বাধা দিয়েছে, কিন্তু আমাদের তারা রুদ্ধ করতে পারেনি। আমরা তাদের সব বাধা ডিঙিয়ে ওদের সমূলে ধ্বংস করে ৯ই ডিসেম্বর নোয়াখালীর সদর মুক্ত করলাম।

আমরা ক্ষমা করিনি সেই ঘৃণ্য আলবদর আর রাজাকারদের। তারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে দেশের সাথে, নিজের মায়ের সাথে। অস্বীকার করেছে

নিজের রক্তকে। তাই ওদের হত্যা করতে কারো এতটুকু বুক কাঁপেনি। কারণ ওরা ক্ষমার যোগ্য নয়। নিজের মায়ের বুকফাটা কান্নায় হৃদয় টলেনি যাদের, নিজের বোনের নির্যাতনে মানবতার সামান্য উদাহরণ দেখাতে পারেনি যারা, নিজের ভাইকে হত্যা করতে হাত কাঁপেনি যাদের এতটুকু-ওদের ক্ষমা করা যায় না। দেশের সাথে, নিজের অস্তিত্বের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে ওরা, তবুও বিবেকের দংশনে জ্বলেপুড়ে মরেনি। ওরা কি মানুষ? পলাশীর যুদ্ধে মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতার মতো বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের আবার তার পুনরাবৃত্তি ঘটাল তারা।

৯ ডিসেম্বর আমরা নোয়াখালী মুক্ত করলাম। নোয়াখালীর মুক্ত নীল আকাশে রক্ত-সূর্য আঁকা পতাকায় আমরা বিশ্বের স্বাধীনতাকামী মানুষদের সালাম জানালাম। সে সময়কার আনন্দ আর অনুভূতি ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। সফলতার আনন্দে আর দেশমুক্তির আনন্দে সবাই শুধু কেঁদেছিল। দলে-দলে জনতা ফুলের মালা হাতে 'জয় বাংলা' বলে ভিড় জমাল শুধু একনজর আমাদের দেখার আশায়। সেদিন আমরা সবাই শুধু বাঙালি, এই পরিচয়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। আমি শুধু অবাক হয়ে ভাবছিলাম, এই আমার দেশবাসী। এরা কত ভালোবাসে আমাদের। তাই তো ওদের জন্য, আমাদের জন্য, দেশ মুক্ত করার জন্য সংগ্রামে নেমেছি আমরা। এরা আমার ভাই, আমার বাবা, আমার মা-বোন। এদের আনন্দে আমরা মিশে গেলাম একাত্ম হয়ে। সেদিন আমি জেনেছি, আমার একটিই পরিচয়। আমি বাঙালি, এই বাংলাদেশ আমার, এরা সবাই আমার আপন। একই স্নেহ-ভালোবাসা, একই সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও সভ্যতার বাঁধনে আমরা বন্দী। কাউকে কেউ অস্বীকার করতে পারি না। ওদের মতো আমিও দেশের মাটিকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি, ভালোবাসি দেশের এই দুর্ভাগা মানুষগুলোকে।

৬ ডিসেম্বর ফেনী মুক্ত হলো, তারপর নোয়াখালী সদর-এলাকা শত্রুমুক্ত করলাম ৯ ডিসেম্বর। কিন্তু বিশ্রামের অবকাশ হলো না। ইতোমধ্যে আদেশ এল চট্টগ্রামের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য। চট্টগ্রাম শত্রুমুক্ত করতেই হবে। আমার কাছে যখন এ আদেশ এল তখন আমি ফেনীতে। চিটাগাং ফেনী থেকে প্রায় ৬৫ মাইল দূরে। তখন চিটাগাং এবং তার পার্শ্ববর্তী প্রায় সমস্ত এলাকাই শত্রুদের কবলে ছিল। এসব স্থানে তারা বেশ মজবুত ঘাঁটি করে বসেছিল। সংখ্যায় ও শক্তিতে তারা বেশ শক্তিশালী হয়েই আছে। সেদিনই চট্টগ্রাম অভিমুখে রওনা দেবার সমস্ত কাজ সমাপ্ত করলাম। দেরি করার আর সময় ছিল না। প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে আমরা সেদিন দুপুর নাগাদ রওনা দিলাম চট্টগ্রাম অভিমুখে। পিচঢালা একটানা পথ চলে গেছে সম্মুখ বরাবর। আমাদের এ অভিযানে ১০ম ইস্ট বেঙ্গলের জওয়ানরা ছাড়াও মিত্রবাহিনীর জওয়ানদের পূর্ণ ও

সক্রিয় সহযোগিতা ছিল, যদিও সমস্ত কিছু পরিচালনা করার দায়িত্ব আমরাই নিয়েছিলাম। অবশ্য এর কারণ ছিল এই যে, বাংলাদেশের সমস্ত পথঘাট ও প্রয়োজনীয় অনেক কিছুই আমাদের জানা।

বেলা বাড়ছে। আমরা সবাই এগিয়ে যাচ্ছি। নিশ্চিন্তে চলার অবকাশ ছিল না। পথে দুশমনের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে অভিযান বিলম্বিত হচ্ছিল। আমরা এতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হলাম না। সব বাধা-প্রতিরোধ ডিঙিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলাম গন্তব্যস্থল অভিমুখে। থেমে থাকলে চলবে না।অভিযান সফল করতেই হবে।

১৩ ডিসেম্বর। আমরা তখনও গন্তব্যস্থানের অনেক দূরে। আর ৪ মাইল দূরেই কুমিরা। এখানেও শত্রুরা বেশ শক্তিশালী ঘাঁটি করেছিল। আমরা বেলা প্রায় ১২টায় কুমিরার অদূরে পৌঁছলাম। এরপর আর সামনে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হলো না। কুমিরায় অবস্থিত শত্রুদের ঘাঁটি থেকে আমাদের উপর প্রবল আক্রমণ শুরু হলো। আমরাও প্রবলভাবে ওদের এ আক্রমণের জবাব দিয়ে চললাম। কিন্তু সামনে অগ্রসর হওয়া সমীচীন মনে করলাম না। তখন মিত্রবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার আনন্দ সরূপের তরফ থেকে আমার কাছে আর একটি বিকল্প আদেশ এল। আনন্দ সরূপ আমাকে বললেন, "তুমি ১০ম ইস্ট বেঙ্গলের 'সি' কোম্পানি ও মিত্রবাহিনীর দলকে রেখে কুমিরা পাহাড় পার হয়ে হাটহাজারী অভিমুখে রওনা হয়ে যাও।"

আমি সেই অনুযায়ী ১০ম ইস্ট বেঙ্গরের 'সি' কোম্পানি লে. দিদারের অধীনে রেখে এবং মিত্রবাহিনীর কোনো সহযোগিতা ছাড়া আমার ১০ম ইস্ট বেঙ্গল নিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারেই কাজ শুরু করতে মনস্থ করলাম।

আমরা যখন ফেনী থেকে চট্টগ্রাম অভিমুখে রওনা হয়েছিলাম যে সময়েই ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের একটি দল ক্যাপ্টেন গাফ্‌ফারের অধীনে পরিচালিত হয়ে রাঙ্গামাটি-চিটাগাং রোড ধরে হাটহাজারী অভিমুখে রওনা হয়ে গিয়েছিল। আমরা কুমিরা পাহাড় পার হয়ে গোপনে হাটহাজারী আক্রমণের পরিকল্পনা নিলাম। সন্ধ্যার সাথে সাথে আমরা সব ঠিক করে রওনা দিলাম। ডিসেম্বরের শীতের সন্ধ্যা। অন্ধকার হওয়ার সাথে সাথে শীতের মাত্রাও যেন বাড়ছিল। কিন্তু সেসব ভাববার অবকাশ ছিল না। এ রাতের অন্ধকারেই, শীতের সাথে মিতালি পাতিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। পাড়ি দিতে হবে অচেনা অজানা পথ। এ পথে আমরা একেবারেই নতুন। পাহাড়ি বন্ধুর পথ। কোথাও ঢালু, কোথাও উঁচু-নিচু, কোথাওবা ছোট ছোট খাল। চারদিকে গাছগাছালির ভিড়। অন্ধকার যেন তাই আরও নিবিড় লাগছিল। সাথে আমাদের ভারী অস্ত্রশস্ত্র। নিজেদের চলতেই কষ্ট হচ্ছিল। তার উপর এসব ভারী বোঝা নিয়ে চলা বড়ই দুঃসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু এসব তবুও অতিক্রম করতেই হবে আমাদের।

আমরা তাই পথ চলছি অতি কষ্টে, নিঃশব্দে। চারদিকে অন্ধকার। ঝিঁঝি পোকার একটানা ডাক। মাঝে মাঝে পথ ভুলে যাচ্ছিলাম। আমার পিছিয়ে এসে চলছি সঠিক পথে। এই পাহাড়ি পথে কোথাও তেমন মানুষজনের সাড়া পেলাম না। শুধু মাঝে মাঝে দু-একটা পাহাড়ি কুটিরে কিছু লোকের দেখা পেলাম। তাদের কাছ থেকে পথ চিনে নিয়ে পথ চলতে লাগলাম। ক্রমশ রাত বাড়ছে। ঠিক কতটা তা জানি না। ক্ষুধায়, পথশ্রমে সবাই ক্লান্ত। কিন্তু অন্ধকারে অচেনা, অজানা স্থানে কোথায় নেব বিশ্রাম? তা ছাড়া এখন সময় নেই বিশ্রামের।

রাত শেষ হলো। চারদিকে ভোরের আলো ফুটছে। গাছগাছালির পাতার ফাঁকে ফাঁকে ভোরের সূর্যের আলো পরশ বুলিয়ে যাচ্ছিল। ভোরের পাখিদের কলতানে বনাঞ্চল মুখরিত হয়ে উঠছিল। দিনের আলোয় সবাই যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। পথঘাট চলতে আর চিনতে কিছুটা সুবিধা হবে হয়তো এবার। তাই মিনিট দশেক সবাই একটু বিশ্রাম নিলাম। তারপর...। আবার যাত্রা শুরু হলো। বেলা বাড়ছে। মাথার উপর সূর্যের তাপ ক্রমশ বাড়ছে। আমরা প্রায় পাহাড়ের শেষপ্রান্তে। আর একটু এগুলেই বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা।

দুপুর ১২টা বেজে ৫ মিনিট। আমরা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পৌঁছে গেলাম। শত্রুরা তখন হাটহাজারী পুলিশ স্টেশনে ছিল। আমরা এখানে পৌঁছেই শত্রুদের প্রকৃত অবস্থান জানতে তৎপর হলাম। ওরা কী পরিমাণে, কোথায়, কী ধরনের শক্তি নিয়ে আছে সর্বাগ্রে তা আমাদের জানা দরকার। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সেটা জানতে চেষ্টা করা ঠিক হবে না। তাই চুপচাপ নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করতে লাগলাম। আমরা সেখানে বাঙ্কার করে পজিশন নিয়ে বসতে শুরু করলাম। ইতোপূর্বে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের যে দল রাঙ্গামাটি-চিটাগাং রোড ধরে হাটহাজারী অভিমুখে রওনা হয়েছিল। তারা কোথায় কতদূর অগ্রসর হয়েছে তা জানার জন্য আমি তিনজন লোকের একটা দল গোপনে সে রাস্তা ধরে পাঠালাম। বেশিক্ষণ লাগল না। খবর পেয়ে গেলাম। ওরাও হাটহাজারীর প্রায় ৩/৪ মাইল দূরে ঘাঁটি ফেলেছে। আমি তখন ওদের সাথে যোগাযোগ কলাম এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি পরস্পরের সাথে আদান-প্রদান করলাম। ক্রমে রাত হয়ে আসছিল। আমরা চুপচাপ রাতটা কাটানো মনস্থ করলাম। বুঝতে পারলাম, শত্রুরা আমাদের অবস্থা সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারেনি। ১৪ ডিসেম্বর রাত কেটে গেল। আমরা সকাল হওয়ার সাথে সাথেই শত্রুদের উপর আক্রমণ শুরু করলাম। তখন ওদের তরফ থেকে বেশ শক্তিশালীভাবেই আক্রমণের প্রতি উত্তর আসল। বোঝা গেল, ওরা বেশ মজবুতভাবেই হাটহাজারীতে ঘাঁটি করেছে। আমরাও তাই দুপুর নাগাদ ওদের উপর আবার আক্রমণ চালালাম। ওরা আমাদের আক্রমণের প্রচণ্ড চাপ সহ্য করতে না পেরে আত্মসমর্পণ করতে রাজি হলো। ২৪ এফএফ-এর 'বি'

কোম্পানির মেজর হাদীসহ সবাই আমাদের কাছে আত্মসর্মপণ করল। আমরা তখন হাটহাজারী ছাড়িয়ে গিয়ে নতুনপাড়া (চট্টগ্রাম সেনানিবাস) ক্যান্টমেন্টের উপর প্রচণ্ড চাপ দিতে লাগলাম। ইতোমধ্যে ক্যাপ্টেন গাফ্ফারের অধীনে পরিচালিত ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের দলটিও আমাদের সাথে এসে মিলিত হলো। ওদিকে মিত্রবাহিনী ও লে. দিদারের অধীনে ১০ম বেঙ্গলের যে 'সি' কোম্পানি ছিল তারা ১৫ ডিসেম্বর কুমিরার উপর প্রচণ্ড হামলা চালায়। কুমিরার রাস্তায় এ আক্রমণের মুখে পাকবাহিনী বেশিক্ষণ টিকতে পারল না। তারা পালিয়ে তাদের পরবর্তী ঘাঁটি ফৌজদারহাট গিয়ে মিলিত হলো। আমাদের 'সি' কোম্পানি ও মিত্রবাহিনী আরও এগিয়ে গেল। আমাদের মতো তারাও ফৌজদারহাটের শত্রুদের উপর প্রচণ্ড চাপ দিতে থাকে। তখন সময়টা ছিল ১৫ ডিসেম্বরের রাত। আমরা যেভাবে নতুনপাড়া ক্যান্টনমেন্টের উপর চাপ দিতে লাগলাম, তেমনি কুমিরা থেকেও আমাদের 'সি' কোম্পানি ও মিত্রবাহিনী ফৌজদারহাটের উপর চাপ সৃষ্টি করতে লাগল। বারবার তাদের আত্মসমর্পণ করার জন্য ঘোষণা করতে লাগলাম। তারা আত্মসমর্পণ করতে রাজি হলো না। কিন্তু আমরা জানতাম আত্মসমর্পণ ওদের করতেই হবে। এছাড়া ওদের কোনো পথই নেই।

১৬ ডিসেম্বর সকাল। নিয়াজিকে নির্দিষ্ট সময় দেয়া হলো আত্মসমর্পণের। আমরাও বারবার শত্রুদের নির্দেশ দিয়ে চললাম আত্মসমর্পণের জন্য। নির্দিষ্ট সময়ের বেশ কিছু পরে নিয়াজি আত্মসমর্পণ করলেন। চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশের প্রত্যক রণাঙ্গনেই মিত্র ও আমাদের মুক্তিবাহিনীর অধিনায়কদের হাতে পাকসেনারা আত্মসমর্পণ করল। জাতির জীবনে গর্বে ও গৌরবে উদ্দীপ্ত হওয়ার মতো একটা সফল মুক্তিযুদ্ধ সমাপ্ত হলো। বিজয়ের এই ধারাবাহিকতায় ১৬ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম মুক্ত হওয়ার পর সম্ভবত ১৮ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম রেডিও থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশে আমি ভাষণ দিয়েছিলাম। চট্টগ্রামে অবস্থানকালে চট্টগ্রাম সেনানিবাসে আমি পাকিস্তান আর্মিতে থাকাকালীন আমার সর্বশেষ ইউনিট ২৪ এফএফ পরিদর্শন করি। তারা তখন সবাই বন্দী অবস্থায়। যখন শুনল আমি দেখা করতে আসছি, সবাই ইউনিফরম পরিধান করে সাক্ষাতের জন্য তৈরি হচ্ছিল। সাক্ষাতে দেখলাম, সবাই অত্যন্ত বিষণ্ন ও হতাশাগ্রস্থ এবং চরম ভয়ভীতির মধ্যে রয়েছে। আমি স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কুশল বিনিময় করলাম। হঠাৎ দেখি আমার ব্যাটম্যান সিপাহি কফিল আমার সুটকেস নিয়ে দৌড়ে আসছে। এসে বলল, "স্যার, আপনার অপেক্ষায় অনেক দিন ছিলাম। আপনার জিনিসপত্র ও ইউনিফরম ভর্তি সুটকেসটি ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টারের স্টোরে ছিল। আমার মন বলছিল, একদিন এটা আমি আপনাকে ফেরত দিতে পারব। কামনা করি, ভালো থাকুন। স্যার, আমাকে ভুলবেন না।" আমি আবেগপ্রবণ হয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলাম। এই

ব্যাটম্যান সিপাহি আমাকে দীর্ঘ এক বছরেরও অধিককাল সেবা করেছে। আমি বিদায় নিয়ে আসার সময় বন্দী অবস্থায় নিরীহ এতিমের মতো দাঁড়িয়ে আমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল ব্যাটালিয়ন অফিসার মেজর আসিফ, মেজর হাদী, ক্যাপ্টেন খাঘওয়ানী ও অন্যরা। আমি জিপে উঠে হাত নেড়ে বিদায় জানালাম। তারাও হাত নেড়ে অত্যন্ত করুণভাবে আমাকে জানালেন আখেরি বিদায়।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও ভারত

একাত্তরের ২৬ মার্চের সেই ভয়াল রাত। হানাদার পাকবাহিনীর হিংস্র পশুগুলো হায়নার আক্রোশ নিয়ে রাতের আঁধারে ঝাঁপিয়ে পড়ল এদেশের ঘুমন্ত নিরস্ত্র সাধারণ মানুষগুলোর উপর। শুরু করল হত্যা, লুণ্ঠন আর নির্বিচার নারীধর্ষণ। দস্যুদের উন্মাদনার আগুনে দাউদাউ করে জ্বলে উঠল বাংলার নগর, বন্দর, গ্রাম। জালেমের অস্ত্রের গর্জন ছাপিয়ে আকাশ-বাতাস ভারী করে তুলল নারী-পুরুষ, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার করুণ আর্তনাদ। সে এক বিভীষিকাময় রাত! রাতের মাঝেই বাংলাদেশের সবগুলো জেলাশহরসহ সবকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা দখলে নেওয়ার প্রয়াস পেল পাক হানাদাররা। স্থানে স্থানে বীর জনতার ব্যারিকেড আর খণ্ড খণ্ড প্রতিরোধের মুখে পূর্ণতা পেল না দস্যুদের প্রাথমিক প্রয়াস। সীমিত অস্ত্র ও গোলাবারুদ সত্ত্বেও হিমালয়ের দৃঢ়তা আর আকাশপ্রমাণ দেশপ্রেম বুকে নিয়ে বীর জনতা রুখে দাঁড়াল অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত একটি বিশাল বাহিনীর গতিপথ। বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশে মার্চ-এপ্রিলে বীর জনতার এ প্রতিরোধ যুদ্ধ আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। ২৬ মার্চের রাত পোহানোর সাথে সাথে সীমান্তের শহর বন্দর জনপদ থেকে জনতার স্রোত বন্যায় ঢেউয়ের ন্যায় ছুটে চলল ভারতীয় সীমানার দিকে। এপ্রিলের শেষ নাগাদ বিপুল জনস্রোত এমনি ধারায় চলতে থাকল ভারতের দিকে, যেন নদ-নদীর বিপুল জলরাশি প্রবল ধারায় ধাবমান সাগরপানে। স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগদানের জন্যে কিংবা নিরাপদ আশ্রয়ের এমনি ধারা চলতে থাকল এপ্রিলের পরেও, যদিও স্রোতের তীব্রতা কিছুটা হ্রাস পেল আগের চাইতে।

ভারতের সীমান্ত-শহরগুলো, উপকণ্ঠে কোথাও কোথাও ভারত-সীমান্তসংলগ্ন গ্রামগুলোতে এমনকি ভারত-সীমান্তের পাহাড় ও বনাঞ্চলে ভারত সরকারের ঐসব অঞ্চলের ভারতীয় জনগণের সক্রিয় সহযোগিতায় গড়ে উঠল অসংখ্য আশ্রয়-শিবির। এদের খাওয়া-দাওয়া স্বাস্থ্যরক্ষা থেকে নিয়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ভারত সরকারের সহযোগিতা সেদিন পুরো বিশ্বে মানবতার সেবায় ভারতের অবদান শুধু ইতিহাসই সৃষ্টি করেনি, উপরন্তু বিশ্ববাসীর কাছে আমাদের স্বাধীনতার দাবিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল।

Red Crossmn বিভিন্ন সংগঠন এগিয়ে এসেছিল এসব শরণার্থীর সাহায্যে। রণাঙ্গন থেকে এ ধরনের দু-একটি আশ্রয়কেন্দ্র পরিদর্শনের সুযোগ হয়েছিল আমার।

বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন শ্রেণী তথা মধ্যবিত্ত থেকে দিনমজুর ঠাঁই পেয়েছিল একই কেন্দ্রে। তখন তাদের মাঝে ছিল না কোনো ভেদাভেদ। অনেকে আবার সীমান্তসংলগ্ন শহর উপ-শহরগুলোতে বাসা ভাড়া নিয়েও ছিল। এইসব অঞ্চলের হাটবাজার, চায়ের দোকানগুলো সবসময় ছিল খুব সরগরম। এইসব আশ্রয়কেন্দ্র এবং কেন্দ্রের বাইরে অবস্থারত বাংলাদেশিদের সাথে কথা বলে এবং খোঁজ-খবর নিয়ে সেদিন আমরা অত্যন্ত খুশি হয়েছিলাম জেনে যে কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। যুদ্ধের শেষদিকে আমার পরিবারের সদস্যরা ফিরে এসেছিল ভারতের বিলোনিয়া শহরে। সেখানে এক ঠাকুরবাড়িতে আমি তাদেরকে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম, এমনকি ভারতীয়রা কয়েকজনকে মন্দিরেও থাকতে অনুমতি দিয়েছিল। আমাদের স্বাধীনতার জন্যে ভারতীয় নাগরিকদের মধ্যে শুধু উৎসাহ নয়, তাদের অবদানও আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করি। যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় বাংলাদেশের সীমিত কিছু জায়গায় ও প্রতিষ্ঠানে স্বাধীনতার প্রত্যাশায় উৎসাহ-উদ্দীপনা কম পরিলক্ষিত হয়েছিল। যেমন ১৬ ডিসেম্বরের দু'একদিন আগ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চালু ছিল।

লক্ষণীয় ছিল এ অঞ্চলগুলোর ভারতীয়দের মনমানসিকতা। প্রত্যেকটি আশ্রয়কেন্দ্র এবং সীমান্ত সংলগ্ন এলাকাগুলোতে হাজার হাজার বাংলাদেশির চাপে তাদের নাগরিক জীবন অনেকটা বিপন্ন হওয়া সত্ত্বেও সাহায্য-সহযোগিতায় তাদের যে আগ্রহ, সর্বোপরি আমাদের স্বাধীনতার জন্যে তাদের যে সমর্থন ও দরদ তা আমাদের নতুন স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে থাকার ও লড়ে যাওয়ার জন্যে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছিল। সেসব সাধারণ ভারতীয় নাগরিকের চাওয়া-পাওয়ার কিছুই ছিল না। রাজনৈতিকভাবে অনেকে মূল্যায়ন করে এই বলে যে, আমরা স্বাধীন হলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তে ভারত যে প্রায় ৪ ডিভিশন সৈন্য মোতায়েন করে সেটা আর লাগবে না এবং আমাদের অর্থাৎ বাংলাদেশের একটি বড় বাজার পাবে তারা। আসলে তখন ভারতীয় জনগণের মধ্যে এ ধরনের চিন্তা-ভাবনা মোটেও ছিল না। আমরা স্বাধীনতা পাব এতে তাদের ৪ ডিভিশন বাড়তি সৈন্য তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান বর্তমান পাকিস্তান-সীমান্তে ভারত মোতায়েন করবে এতে আমাদের কী লাভ-ক্ষতি। পাশাপাশি মুক্তবাজার অর্থনীতিতে আমাদের বাজার ভারতের নিয়ন্ত্রণে থাকবে বা অন্য কোনো রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থাকবে সেটা মুক্তবাজার অর্থনীতিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারত যদি টিকে থাকে এতে আমাদের কোনো ক্ষতি নেই। আসলে আমাদের সাধারণ মানুষের একটি অংশের মধ্যে ভীতি

ছিল ভারত যেভাবে আমাদেরকে কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করছে, ভারত যেহেতু সব দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক শক্তিশালী রাষ্ট্র স্বাধীনতার পর হয়তো আমাদের অর্থনীতি, সংস্কৃতি এমনকি পরোক্ষভাবে সরকার নিয়ন্ত্রণ করবে। যেসব হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্য তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে নিজ ভিটাবাড়ি বিক্রি করে বা ভারতীয় মুসলমান অথবা এদেশের নাগরিকদের সাথে বিনিময় করে দেশত্যাগ করেছে আবার নতুনভাবে সেসব সম্পত্তির দাবি নিয়ে জটিলতা দেখা দিতে পারে এবং সব কিছুর ঊর্ধ্বে আমাদের ধর্মের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ বিস্তার লাভ করবে। স্বাধীনতার পর ১০ জানুয়ারি '৭২ সালে শেখ সাহেব দেশে ফিরে আসলেন তখন ভারতীয় সেনাবাহিনী আমাদের দেশের মাটিতে। বেসামরিক প্রশাসনে ও ভারত সরকারের সহযোগিতা ছিল আমাদের কাঠামোকে ঢেলে সাজানোর ব্যাপারে। বাংলাদেশে অনেকে চিন্তা করছিল এরা হয়তো সহজে দেশত্যাগ করবে না। এদের শর্ত থাকতে পারে। কিন্তু আমরা দেখলাম সম্পূর্ণ বিপরীত। বঙ্গবন্ধুর অনুরোধে স্বল্পতম সময়ে সবাই ফিরে গেল নিজ দেশ ভারতে, রেখে গেল রণাঙ্গনে তাদের স্মৃতিটুকু। স্বাধীনতা পরবর্তী বছরগুলোতে ঐসব আশঙ্কা আর জনমনে ছিল না। সব অপপ্রচারের অবসান ঘটল।

পাক হানাদার বাহিনীকে বন্দী অবস্থায় প্রথমে ভারতে পরবর্তীতে পাকিস্তানে ফেরত পাঠানো হলো। অনেকের শুধু আপত্তি ছিল বন্দী পাকবাহিনীর বিপুলসংখ্যক অস্ত্রগুলো কেন বন্দীদের সাথে ভারতে নেওয়া হলো। সেগুলো ফেরত পাওয়া যাবে কি না আজও সেই প্রশ্নের সীমাংসা হয়নি।

আমাদের স্বাধীনতার যুদ্ধে বিশ্ব জনমত গড়ে তুলতে স্বাধীন বাংলা সরকারের প্রতিনিধিদেরকে বিভিন্ন রাষ্ট্রে পাঠানো এবং তাদের নিজস্ব রাষ্ট্রদূতদের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাকিস্তানের অত্যাচার নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরে মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট ও রণাঙ্গনে মুক্তিযোদ্ধাদের ভূমিকা, সর্বোপরি প্রতিবেশী হিসেবে আমাদের উপর পাকবাহিনী তথা পাকিস্তান সরকারের হিংসাত্মক ষড়যন্ত্র ভারত প্রচার করছিল।

সীমান্তে লাখ লাখ বাংলাদেশীর আশ্রয় দেয়া ছাড়াও উদয়পুর, আগরতলা, কলকাতাসহ বিভিন্ন শহরে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে আশ্রয় দিয়ে স্বাধীনতার পক্ষে দেশে বিদেশে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছিল। রাজনীতিবিদ ছাড়াও আমাদের সাংবাদিক, শিল্পী, ক্রীড়াবিদসহ নানা পেশাজীবী যারা ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল তারাও স্বাধীনতার পক্ষে নিজ আঙ্গিকে লেখনী ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার করেছিল। স্বাধীন বাংলা বেতারে সাংবাদিক মুকুল ভাইয়ের চরমপত্র শুধু দেশে-বিদেশে সাড়াই জাগায়নি, রণাঙ্গনে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছিল বাড়তি অনুপ্রেরণ। আমার পরিবার বাবা-মা,

ভাই-বোন সবাই ছিল উদয়পুর শহরে। এক দিঘির পাড়ে একটি ভাড়া বাসায়। ঐ দিঘির অন্য পাশে ছিলেন মালেক উকিল ও চট্টগ্রামের এমপি আবদুল্লাহ আল হারুন। ৯ মাস যুদ্ধে একদিন শুধু আমি গিয়েছিলাম উদয়পুরে হারুন ভাইয়ের কাছে। দেখলাম তারা সবাই খুব ব্যস্ত দীর্ঘ পরিকল্পনা নিয়ে। ৯ মাসে দেশ স্বাধীন হবে তখনও কিন্তু আমাদের ধারণা ছিল নয়। হারুন ভাইয়ের বাসায় উদয়পুরের শত শত যুবক ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ আমাকে দেখতে এসেছিলেন। তাদের মাঝে আমাদের স্বাধীনতার জন্যে অনেক উৎসাহ দেখলাম। বুঝলাম এদের আন্তরিকতায় ঘাটতি নেই। সবাই আমার দিকে তাকিয়ে আছে, দেখছে মুক্তিযোদ্ধা আসলে দেখতে কীরকম। জীবনবাজি রেখে মাতৃভূমির জন্যে লড়ছে এ যেন তাদের মনের কথা। আমি তাদেরকে রণাঙ্গনে বাংলার দামাল ছেলেদের আপসহীন লড়াইয়ের কথা উল্লেখ করে তাদের সহযোগিতা ও সমর্থনের জন্যে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম। কয়েকটি যুবক আমার Autograph সংগ্রহ করে খুব গর্ববোধ করছিল। আমি অনুপ্রাণিত হলাম। আমাদের বাংলাদেশি কয়েকজন একান্তে আমাকে বললেন, ভারতীয় মুসলমানদের একটি অংশ কিন্তু মনেপ্রাণে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে নেই, তবে তা প্রকাশ করে না। যুদ্ধের প্রথমদিকে এপ্রিল, মে, জুন মাস পর্যন্ত ভারতের BSF মুক্তিযোদ্ধাদেরকে আশ্রয় দেওয়া, সংগঠিত করা, সর্বপ্রকার সাহায্য করার ব্যাপারে খুবই প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করছে। পরবর্তীতে BSFসহ ভারতীয় সেনাবাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ ও সংগঠিত করার পাশাপাশি অস্ত্র ও গোলাবারুদ দিয়ে ডিসেম্বরে যুদ্ধ ঘোষণা পর্যন্ত প্রয়োজনীয় সাহায্য করে আসছিল। নভেম্বর-ডিসেম্বরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতা আসে যুদ্ধঘোষণার পর ৩ ডিসেম্বর থেকে। সেক্টর কমান্ডগুলো ও ভারতীয় আঞ্চলিক কমান্ডগুলো এক হয়ে কমান্ড কাঠামো ঢেলে সাজানো হয়।

বাংলাদেশের বিভিন্ন রণাঙ্গনে যুদ্ধের শেষ লগ্নে ভারতীয় সেনাবাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর যৌথ কমান্ডে পাকহানাদার বাহিনীর সাথে চূড়ান্ত মরণপণ সম্মুখযুদ্ধ চলছিল। বিজয় অর্জনের এই শেষ লড়াইয়ে হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হয়েছিলেন; পাশাপাশি ভারত সেনাবাহিনীরও অসংখ্য সৈনিক ও অফিসার শহীদ হয়েছিলেন। এইসব শহীদের অনেক আত্মীয়-স্বজন আজও বাংলাদেশে এসে ঐসব শহীদের রণাঙ্গন পরিদর্শন করেন। খুঁজে বেড়ান ঐসব রণাঙ্গনে একটি স্মৃতিচিহ্ন। হতাশ হয়ে তারা দেশে ফিরে যান। এদেশে ভারতীয় শহীদের কোনো তালিকা বা কোনো চিহ্ন নেই। অথচ এরা আমাদের স্বাধীনতার জন্যে তাদের বুকের তাজা রক্ত ঝরিয়েছিলেন আমাদের মাটিতে। তাদের আত্মা আজও রণাঙ্গনে ঘুরে বেড়ায়, আর্তনাদ করে। তাদেরকে ভুলে বসে আছি আমরা সবাই। এমনকি ভারতেও তাদের মর্যাদা নেই। ভারত সরকার তাদের পরিবার-পরিজনকে

স্বাভাবিক নিয়মের ঊর্ধ্বে বাড়তি হয়তো কিছুই দিচ্ছে না। স্বাধীনতা যুদ্ধের সঠিক ইতিহাস যেন বিকৃত না হয় সেই লক্ষ্যে পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে এদের অবদানেরও একটি অধ্যায় সংযোজন প্রয়োজন।

বিভিন্ন রণাঙ্গনে অনেক ভারতীয় সেনা আমাদের সম্মুখেই শাহাদৎ বরণ করেছিলেন। আজ সেগুলো শুধু আমাদের স্মৃতিতে ভাস্বর হয়ে আছে।

সম্ভবত ১৭ ডিসেম্বর হবে, ভারতীয় সেনাবাহিনীর গাড়ির একটি বহর চট্টগ্রাম থেকে পাঁচলাইশ হয়ে হাটহাজারী অভিমুখে ভারতের উদ্দেশে যাচ্ছিল। এই কনভয়টি ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের পাঁচলাইশ চেকপোস্টে থামানোর সংকেত দিলে কনভয়টি রাস্তার পাশে থামানো হয়। প্রায় ১৫/২০ টি ট্রাক হবে। ট্রাকগুলো থামলে ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কর্তব্যরত সৈনিকেরা ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাথে কুশলবিনিময় করে এবং কৌশলে ট্রাকগুলোর মধ্যে কী আছে এক এক করে এমনভাবে দেখতে থাকে যেন ট্রাকগুলো তারা যে তল্লাশি করছে ভারতীয় সেনাবাহিনী এ ধারণা পোষণ না করে। ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কর্তব্যরত সৈন্যরা মনে করেছিল, ঐ ট্রাকে করে বাংলাদেশ থেকে মূল্যবান মালামাল ভারতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। প্রথম যে-কয়টি ট্রাক আমাদের সৈনিকেরা উৎসুক হয়ে দেখেছিল সেগুলোর মধ্যে ছিল ভারতীয় সেনাবাহিনীর সৈনিকদের মৃত লাশের অনেকগুলো কফিন বক্স। ভারতীয় সেনাবাহিনী জানালেন, বাকি ট্রাকগুলোতেও কফিন বক্স রয়েছে। আমরা সবাই একথা শুনে তাদেরকে সমবেদনা জনাবার ভাষা হারিয়ে ফেলেছিলাম। শুধু বলেছিলাম, আমাদের অনেকে শহীদ হয়েছে এবং অনেকে আহত হয়ে চিকিৎসাধানী রয়েছে। তবে ভারতীয় বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আমাদের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না। তারাও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছিল। আমরা আগ্রহ প্রকাশ করলাম বাকি লাশগুলো দেখার জন্যে। তারা আমাদেরকে কফিন বক্স খুলে অনেকগুলো মৃতদেহ দেখালেন। দেখলাম এই মৃতদেহেগুলোর বেশির ভাগই সাদা কাপড়ে ঢাকা এবং ফিতা দিয়ে বাঁধা। ফিতার বাঁধন তারা খুললেন না। আমরাও মুখ দেখার অনুরোধ করলাম না। কারণ রণাঙ্গনে অনেকের মুখ সেলের আঘাতে বিকৃত রূপ ধারণ করেছিল। সাদা কাপড়ে ঢাকা সেইসব অচেনা শহীদদের দেখার সময়ে শুধু নীরবে নিজের মনকে প্রশ্ন করেছিলাম– আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি, আমাদের যারা শহীদ হয়েছেন তারাও আমাদেরকে তাদের বর্তমানকে উৎসর্গ করে এই স্বাধীনতা উপহার দিয়েছে, দিয়েছেন আমাদেরকে একটি ভবিষ্যৎ গড়ার মহান দায়িত্ব। কিন্তু তারা কী পেলেন? এদের পরিবার পরিজনদেরও একই প্রশ্ন থাকবে আমরা কী পেলাম?

পরিশিষ্ট

GARY J BASS-এর লিখা বিশ্ব সমৃদ্ধ 'The Blood Telegram' বইটি আমি কয়েকবার পড়েছি। আমার লেখার বিভিন্ন বিবরণ ও যুক্তির সমর্থনে তার বইয়ের উক্তিগুলো অনেক যায়গায় তুলে ধরেছি যা আমার লেখার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এছাড়াও তার লেখা বইতে ২৫ মার্চ, ১৪ দিনের যুদ্ধ এবং আত্মসমর্পণ এই তিনটি অধ্যায় GARY J BASS এর নিজস্ব বক্তব্য হুবহু আমার বইয়ের শেষ অংশে তুলে ধরা হয়েছে। যদিও আমার বই এ এই বিষয় গুলো পৃথক-পৃথকভাবে ব্যাখ্যা সহকারে উল্লেখ রয়েছে। এর কাছে আমার ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। THE BLOOD TELEGRAM এই বইটি আমাদের বাংলাদেশে পাকগণহত্যা সহ-Nixon/Kissing-এর ষড়যন্ত্রে ও একটি বিবরণ রয়েছে।

এ বই সম্বন্ধে উক্তি করতে গিয়ে 'Peter Backer' বলেন, "Bass takes us inside the Oval Office to reveal the scandalous role America played in the 1971 Slaughter in what is now Bangladesh. Largely unknown here, the story combines the human tragedy of Darfur, the superpower geopolitics of the cuban mirrile crisis and the illegal shen anginas of Iran, Contra....[A] harrowing tale."

The Fourteen Days War

Major General Jacob-Farj-Rafael Jacob, The Chief of Staff of the Indian army's Eastern Command, had been preparing for war for months, and a bit longer too. The son of a prominent Sephardic Jewish family from West Bengal, he had learned how to box and shoot as a schoolboy in Calcutta. He liked it.

Jake Jacob was a stocky, robust bull of a man with heavy-lidded eyes. When Nazi Germany stepped up its persecution of European Jews, with Jacob's family sheltering refugees who had fled as far as Calcutta, he decided there was an enemy that had to be defeated. So in 1941 he enrolled in the British army, he says, "to fight the Nazis." His regiment got cut to pieces fighting off German troops in Libya, and Jacob was wounded in hellish swamp conditions in Burma, but he survived to enlist in an independent India's army. After serving in the 1965 war against Pakistan, he rocketed up through the senior ranks.

Jacob is the rare person who speaks fondly of Indira Gandhi, who charmed him with kindly questions about India's Jews (her favorite musical, he says, was *Fiddler on the Roof*) and stories about her children. "I liked her very much, " he says. "I don't care what other people say.

Jacob savors the fact that three of the Indian generals fighting against Pakistan were a Parsi, a Sikh, and a Jew. General Sam Manekshaw, India's topmost army commander-a dashing and jovial Parsi veteran of World War II who sported an outsized bristling mustache was, like Jacob, confident of victory.

The Indian generals knew they had an overwhelming military advantage in East Pakistan. The CIA estimated that India's army had 1.1 million soldiers overall, dwarfing Pakistan's three hundred thousand. India had built up and modernized its war machine, and had planned coordinated efforts from its army air force, and navy. In East Pakistan, the Indians had the enthusiastic support of much of the Bengali populace, as well as a local fighting partner in the Mukti Bahini, which pinned down the Pakistan army and offered deep knowledge of the terrain. Pakistan's eastern troops were outnumbered, demoralized, and exhausted from trying to quash the Bengali citizenry and rebels. Archer Blood had always known East Pakistan was a military liability: "They could never defend it against India because it is surrounded virtually by India and separated by over a thousand miles."

India's war plans bore this out. In the east, the Indians seem to have chosen a daring strategy, which Jacob says he proposed: "You go straight for Dacca. Ignore the subsidiary towns." Several other generals hashed out the plan of attack, but they agreed on the core concept. As Jacob explains, "Dacca is the center of gravity; the geopolitical heart of East Pakistan. Unless you take Dacca, the war cannot be completed."

It is a measure of how well the war went that India's generals have squabbled about credit ever since. According to Jacob, when they discussed the plan back in August, Manekshaw and other generals had wanted to take the other two main cities, Chittagong and Khulna, which would make Dacca fall. Jacob says, "I said, 'No way Chittagong is peripheral. It has no bearing on the war." He said, 'Sweetie, don't"–the endearment being Manekshaw's way of prefacing a rebuke.

Pakistan Strikes

December 3, 1971, was a quiet political day in Delhi. Indira Gandhi was off in Calcutta, and her senior cabinet was scattered. A little before 6 p.m., air-raid sirens howled in the capital.

"We were going to attack on December 4, " says Vice Admiral Mihir Roy, India's director of naval intelligence. "They guessed it, I suppose." Gandhi had reportedly approved General Manekshaw's plans to attack on December 4, taking advantage of a full moon. According to K.F. Rustamji of the Border Security Force, he had instructions from the army for when war came. Their task was to force the Pakistani troops out of their bases and scatter them, and to fight skirmishes at the border. The rest would be handled by the army.

But Pakistan struck first. At 5:30 p.m on December 3, Pakistan's air force launched coordinated surprise attacks on India's major airfields in the north, in cities in Punjab, Rajasthan, and Uttar Pradesh. Soon after, the Pakistan army began heavily shelling Indian army positions all along the western border, opening up a wide front in Punjab and Kashmir. In Kashmir, United Nations military observers reported an attack by Pakistani troops at Poonch. According to a Pakistani postwar judicial commission, Yahya had on November 29 decided on the assault, without knowing about India's own plans to strike.

In Calcutta, Gandhi–who had been addressing an immense rally of as many as a million people–privately said, "Thank God, they've attacked us." She had wanted Pakistan to get the blame. Now it would. The prime minister showed no visible emotion when she got the news, but later that night as she winged back to Delhi, she was nervous that Pakistan's air force might try to blow her airplane out of the sky. She met with her chiefs of staff, raced to the map room to take stock of the military situation, and then consulted with parliamentary leaders. She was in a gloweringly bad mood. One of her top aides remembered her "almighty rage" at an under whelming speech her staff had hastily written for her. Atal Bihari Vajpayee, the hawkish Jana Sangh politician, remembered her as "a picture of worry and concern."

The prime minister directed India's armed forces to fight back. General Manekshaw later said that, with the prime minister and defense

minister away; he had to decide to retaliate, and to have that decision approved later by the cabinet. After midnight on the night of December 3–4, Gandhi told Indians by radio, in a slow and grave voice, "Today the war in Bangla Desh has become a war on India." On December 4, Yahya–having made his last big mistake–declared that Pakistan was at war with India.

Yahya's attack gave India the high moral ground. "We meet as a fighting Parliament, " Gandhi stormed before the Lok Sabha. "A war has been forced upon us, a war we did not seek and did our utmost to prevent." She justified the war not merely as self-defense, but invoked liberty and human rights in Bangladesh. Writing to Richard Nixon, she condemned Pakistan's aggression as well as its "repressive, brutal and colonial policy" which "culminated in genocide."

Arundhati Ghose, the Indian diplomat posted in Calcutta, remembers, "We thought, now they're going to hit Calcutta. It's jammed with people. Even a firecracker would kill people." In Delhi, people jumped at air-raid alarms in the dead of night and the sounds of jet aircraft overhead. But the country rallied behind the war. For all the theatrics–the government imposed a nightly blackout and encouraged civilians to dig trenches–the fighting was far away from the population centers, leaving most civilians feeling safe enough to enjoy the government's reports of uninterrupted martial triumph. Despite his past criticisms even Jayaprakash Narayan proclaimed his full support for Gandhi arguing that there was no time for factionalism in this national emergency. One Indian activist wrote, "I wish to thank God, in whom I do not believe, that a strong, determined and fearless person like Indira Gandhi is our Prime Minister at this time of crisis." P.N. Haksar worked hard at using the governments pronouncements to drive home "the why and wherefore" of the war to India's citizenry."

Sydney Schanberg of the *New York Times* recalls, "Jacob was delighted that night. Now we'll show you what an army is." Jacob's superior was just as confident. "Don't look so scared, sweetie General Manekshaw told the anxious officer who informed him of Pakistan's attack "Do I look worried.

Surrender

An exhausted group of Mukti Bahini fighters were ecstatic—and relievecl—to hear that Pakistan was about to yield. They found abandoned buses and loaded them up with jubilant rebels bound for Dacca. People packed the streets and rooftops, chanting, "Joi Bangla" Coming into the city, hearing the crowds, a rebel later wrote, "We felt liberated at last." With the first column of Indian troops about to enter Dacca, the chumminess of elite South Asian officers was not to be disturbed by the minor matter of a War. An Indian commander sent a note to General Niazi, whom he knew personally: "My dear Abdullah, I am here. The game is up. I suggest you give yourself up to me, and I will look after you."

On December 16, Niazi, emphasizing the "paramount considerations of saving human lives" offered his surrender on the eastern front. Manekshaw dispatched General Jacob, the chief of staff of the Eastern Command, by helicopter to Dacca, to negotiate a swift capitulation.

Jacob remembers that India actually had only three thousand troops outside of Dacca, while Pakistan still had over twenty-six thousand in the city "Just go and get a surrender, " Manekshaw told Jacob. He rushed onto a helicopter, joined by the wife of his superior, Lieutenant General Jagjit Singh Aurora, the general officer commanding- in-chief of the Eastern Command, who said that her place was with her husband. When they landed in Dacca, Jacob remembers, there was still fighting going on between the Mukti Bahini and Pakistani troops. As insurgents shot at his car, he jumped up to show them his olive green Indian army uniform, which stopped their firing. Once he got to Pakistani headquarters, Jacob remembers, General Niazi said, "Who said I'm surrendering? I only came here for a cease-fire." Alone and acutely aware of how outnumbered the Indians really were at the moment, he took Niazi aside. Jacob recalls, "I said, 'You surrender, we take care of you, your families, and ethnic minorities. If you don't, what can I do? I wash my hands.' He said I blackmailed him, to have him bayoneted. I said, 'I'll give you thirty minutes, and if you don't agree, I'll order the resumption of hostilities

and the bombing of Dacca."' As Jacob walked out, "I thought, my God, I have nothing in my hand." But Niazi, surely knowing how many more Indian troops were following the tip of the spear outside Dacca, yielded.

With battalions of the Indian army and Mukti Bahini guerrillas crowding into the city the short eastern war came to an abrupt end. On the afternoon of December 16, General Niazi tearfully surrendered to General Aurora at the Dacca Race Course, surrounded by Hindu neighborhoods that had been destroyed by some of the Pakistan army back in the spring. Preserving the Pakistanis' dignity Jacob says, they set up solemn ceremonies at the Race Course. Niazi handed a pistol to Aurora. When Sydney Schanberg, covering it for the *New York Times*, told Jacob that the surrender of a Pakistani general to a Jewish Indian general made one hell of a story, Jacob indignantly told him not to write it. General Aurora, beaming, was hoisted aloft by crowds of leaping, cheering Bengalis. While street skirmishes continued, crowds thronged into the streets shouting "Joi Bangla' and shooting bullets into the skies."

General Manekshaw telephoned Indira Gandhi with the welcome tidings. She ran into the Lok Sabha, exuberant. She informed the Parliament of the unconditional surrender of Pakistan's forces in the east. "Dacca is now the free capital of a free country" she declared with satisfaction. "We hail the people of Bangla Desh in their hour of triumph."

Gandhi got big cheers when she praised India's military and the Mukti Bahini, and when she said that Indian forces were under orders to treat Pakistani prisoners of war according to the Geneva Conventions, and that the Bangladesh government would do the same. "Our objectives were limited-to assist the gallant people of Bangla Desh and their Mukti Bahini to liberate their country from a reign of terror and to resist aggression on our own land." There was exuberant jubilation throughout the chamber, with lawmakers giving her thunderous standing ovations and throwing papers and hats into the air.

Yet there was also an uglier side to the surrender. General Aurora was bound by India's promise of protection for West Pakistanis and ethnic minorities. "If we don't protect the Pakistanis and their collabora- tors, " an Indian officer told Schanberg, "the Mukti Bahini

will butcher them nicely and properly " Indian soldiers kept surrendering Pakistanis off the roads lest they be attacked. Aurora even allowed thousands of Pakistani troops who had surrendered to keep their weapons for protection against vengeful Bengalis."

But the Indian army could not stop an awful wave of revenge killings, Gandhi admitted that her generals—although officially in command of the Bangladeshi forces-could not meaningfully promise that there would be no reprisals against loyalists. In Dacca, a *Los Angeles Times* reporter saw five civilians lying dead in the street, executed as collaborators. The CIA noted "blood-chilling reports of atrocities being perpetrated by revenge~seeking Bengalis in Dacca." Still, India Worked to disarm guerrillas roaming Dacca, and detained one Mukti Bahini leader who whipped up a crowd to torture and murder four men at a public rally. After a few horrific days of bloodshed, the CIA reported that the situation had calmed down.

Meanwhile In The West, There Were Still Tank Battles Going On. This was the moment of truth for India's war goals. India could declare victory in Bangladesh and go home, or launch a new and more aggressive phase, trying to capture land and cities in West Pakistan.

The hawks were in full cry Pakistan was in chaos and vulnerable, and there were some indications that Indian troops were gaining the upper hand in the west. But Manekshaw, as he later claimed, told the prime minister that a unilateral cease-fire in the west was "the right thing to do." Haksar agreed. "I must order a cease-fire on the western front also, " Gandhi told an aide, wary of the country's euphoric mood. "If I don't do it today I shall not be able to do it tomorrow." According to her closest friend, Gandhi heard discussions from the army's chief and her top advisers about the feasibility of seizing one of Pakistan's cities. The military said that such a battle against Pakistan's welltrained soldiers would cost roughly thirty thousand casualties. She sat silently for a while. She knew that the United States and China would have to react. She decided it was time to end the war.

The same day that Pakistan surrendered in the east, Gandhi declared, "India has no territorial ambitions. Now that the Pakistani Armed Forces have surrendered in Bangla Desh and Bangla Desh is free, it is pointless in our view to continue the present conflict." She

unilaterally ordered India's armed forces to cease fire all along the western front as of 8 p.m. on December 17.

The guns fell silent. India said that 2, 307 of its warfighters had been killed, 6, 163 wounded, and 2, 163 were missing. The death toll was slightly higher in the west, where 1, 206 Indians had been killed, against 1, 021 in the east. And Pakistan's losses were presumably worse.

These were terrible human losses. Even so, vastly more Bangladeshi civilians died than Indian and Pakistani soldiers combined. A senior Indian official put the Bengali death toll at three hundred thousand, while Sydney Schanberg, who had excellent sources, noted in the *New York Times* that diplomats in Dacca thought that hundreds of thousands of Bengalis—may be even a million or morehad been killed since the crackdown started on March 25. Even the lowest credible Pakistani estimates are in the tens of thousands, while India sought vindication with bigger numbers: Swaran Singh quickly claimed that a million people had been killed in Bangladesh. A few days before the end of the war, Gita Mehta, an Indian journalist working for NBC, showed Indira Gandhi a film on the Bengali refugees. The prime minister, watching with her son Rajiv Gandhi, wept as she saw the images of young and old refugees.

General Jacob, when asked about violating Pakistan's sovereignty explodes in anger. "If you knew what was happening there, " he thunders. "You know the rape and massacres that were taking place there? When we get ten million refugees, what do we do with them?" In Bangladesh, he had picked up a diary and read about Bengalis being bayoneted. He is convinced it was an "awful genocide, " although "I didn't think it was like what the Nazis did." His fury unabated, Jacob continues hostly, "They had raped, they had killed, several hundred thousand. I was listening to Dacca University on the twenty-fifth-twenty-sixth March night. They slaughtered the students. So we should keep quiet? So I have no problem." Finally cooling down, he finishes, "I have no second thoughts on it. I'm proud of it."

Soon after the surrender, Schanberg took a trip across the traumatized new country of Bangladesh. Everywhere the *New York Times* 'reporter went, people showed him "all the killing grounds" where people were lined up and shot. "You could see the bones in the

river, because it was a killing place." In Dacca, he went to a hillside burial place. "There were shrubs and bushes, and there was a little boy may be twelve or thirteen, he was on his hands and knees, scratching the earth, looking for things. He looked disturbted. He was looking for his father, who he said was buried there. If you scratched enough there it was shallow graves-you'd find a skull or bones. There were cemeteries everywhere. There was no doubt in mind, evil done."

The Blood Telegram

Both Richard Nixon And Archer Blood Were Keenly Aware of a disquieting fact: Pakistan's military, now at war with its own people, had been heavily armed by the United States.

The ongoing assault required a formidable amount of military resources, including perhaps four Pakistan army divisions equipped with armor, as well as the Pakistan Air Force. In this, Pakistan was relying on lots of U.S. weaponry and equipment-everything from ammunition and the spare parts that keep armed forces operating, to major items like tanks and the massive C-130 transport airplanes that shuttled soldiers from West Pakistan to East Pakistan.

As the crackdown began, Bengalis begged U.S. diplomats not to allow American-supplied weapons to be used for "mass murder." The Nixon administration made no move against Pakistan's use of U.S. weaponry; instead, the State Department, ducking embarrassing press questions, tried to avoid headlines about U.S. small arms and aircraft dealing out death in Pakistan.

'Soon before the shooting started, Kissinger had sat in a Situation Room meeting where senior U.S. officials were informed about Pakistan's evident use of C-130s to reinforce its troops in East Pakistan. Once the killing began, Blood's officials snooping around the Dacca airport could see those planes in operation. They witnessed frequent flights bringing in Pakistani troops, with one C-130 seemingly constantly coming and going from Dacca.

Blood's team also saw the Pakistan Air Force using F-86 Sabres., U.S. jet fighters famed for their performance in the Korean War Blood reported daily sorties flown by an F-S6 squadron at Dacca's heavily fortified airfield, in flights of two or four. Two F-865 were seen taking off from Dacca to crush Bengali resistance in a nearby town. Another time, a *Hindustan Times* reporter in East Pakistan got a terrifyingly close view as two F-865 bombed and strafed all around him. And according to two eyewitnesses, in one rebel-controlled town, F-86s fired rockets and machine guns at the market area, the main mosque, and a local college, with many casualties.

U.S. weaponry was equally noticeable on the ground. On the first day of the killing, one of Blood`s officials had seen three U.S.-made M-24 Chaffee light tanks rolling through the streets of Dacca, one of which fired off a machine-gun burst. In the next ten days, many of Blood's staffers saw what appeared to be U.S. Jeeps bearing U.S. 50-caliber machine guns, sometimes opening fire as they patrolled the city Blood later noted at least eight M-24 tanks deployed around Dacca. In Chittagong, not long after, a U.S. official would see three of the tanks, evidently getting ready to fight Bengali rebels. British military officials also saw M-24s and F-86s in action in Dacca and Chittagong, as well as Jeeps.

This was known at the highest levels. As Harold Saunders and Samuel Hoskinson, Kissinger's staff at the White House, informed him, "There is evidence that U.S.-supplied equipment is being utilized extensively including planes (F-86s and C-130s), tanks and light arms." Kenneth Keating, the ambassador to India, urged cutting off the U.S. arms supply to Pakistan. He was appalled to find there were ongoing negotiations about new U.S. supplies of aircraft and armored personnel carriers to Pakistan despite "clear and growing evidence of West Pakistani military massacres."

Nixon always understood that such weapons could be used for domestic repression; he had recently told another brutal anticommunist strongman, Suharto of Indonesia, that "sufficient military strength is essential also for internal security." The Nixon administration never asked Pakistan to avoid using U.S. arms and supplies against Bengali civilians. As a U.S. diplomat acknowledged to Pakistan, their arms deals did not forbid using U.S. weapons for "internal security purposes"-something that Pakistan could only take as a green light.

Dacca grew dangerous for the roughly five hundred American citizens there. Blood was startled into ordering an evacuation by "berserk, anti foreign action by Pak military". He later told the State Department that it was "a minor miracle that no American was killed or injured by trigger-happy Pak troops fresh from killing and looting." Blood had his own family to worry about. Meg Blood did not feel safe in their official residence. "We had had shots into the house," she recalls.

Pakistan provided a daily commercial Pakistan International Airlines flight loaded up with Americans, bound for safety in Tehran or Bangkok. Yahya later reminded Nixon about this, implying that the United States owed him. Joseph Farland, the ambassador in Islamabad, admonished Blood to make sure that his evacuated staffers kept their mouths shut around the press.

For the departing Americans, many of whom had lost Bengali friends and were almost all horrified by the crackdown, their exit from Dacca was a shocking moment. Each day between three and ten PIA airplanes, under the aegis of the Pakistan Air Force, landed in Dacca from West Pakistan, loaded with fresh troops in civilian clothes, who marched into an adjacent hangar to change into military uniforms. Then the Americans, after watching the soldiers debark, were ushered onto one of the same planes. They realized they were paying for some of the cost of reinforcing the Pakistan army Blood cabled, "To many Americans, whose close friends had been killed, were missing, or in hiding, this situation made it impossible to leave East Pakistan with even the semblance of self-respect."

One of the grief stricken evacuees was Meg Blood, with their little boy who took the last flight out, packed onto a PIA plane bound first for Karachi and then Tehran. "It was a strange time in life, " she remembers with quiet outrage. "When Arch decided that the entire American community should leave, and they accepted from the Pakistanis who were behind all of this, the airplanes came complete with men dressed in mufti, who marched off as little brigades, before they turned the so called rescue planes to us to fly out.

Blood Was Left Alone, Howling Into The Wind. "The Silence From Washington was deafening, " he remembered later, "suggesting to us that less credence was being given to our reporting than to the Pakistani claims that little more was involved than a police action to round up some 'miscreants' led astray by India."

Blood would always have preferred a united Pakistan, but these atrocities had doomed that. He cabled with disgust, "A reign of terror began and thousands were slaughtered, innocent along with allegedly guilty And all in the name of preserving the unity of the country". Those Bengali moderates who wanted to remain Within Pakistan were now discredited by the "continuing orgy of violence, " which had "terrorized populace today but radicalized political leaderships for tomorrow." Bengalis would turn to guerrilla warfare to win total independence from West Pakistan. The military, he wrote, had destroyed the country: "guardians of nation's honor and integrity have struck the sharpest blow conceivable against the raison d'etre of Pakistan.

Many.sorrowful Pakistanis agreed. One of Yahya's ministers went to East Pakistan to see the devastation himself. "I went to Dacca, " he later wrote, "and it was the worst experience of my life. Everywhere I went, I heard the same story: one person had lost a son; another a husband; many villages were burnt." To no avail, he confronted Yahya over "the Army's atrocities." Lieutenant General A. A. K. Niazi, who soon became the military commander in East Pakistan, would later frankly write of "the killing of civilians and a scorched earth policy" condemning "a display of stark cruelty more merciless than the massacres. by Changez [Genghis] Khan or at Jallianwala Bagh by the British General Dyer.

As a secret Pakistani postwar judicial commission later noted, many Pakistani military officers complained about "excessive force" unrelated to any threat, as well as "wanton acts of loot, arson and rape, " General Niazi admitted the "indiscriminate use of force" that "earned for the military leaders names such as, 'Changez Khan' and 'Butcher of East Pakistan."' While blaming Bengali nationalists for cruelly provoking the Pakistan army, this judicial inquiry included the testimony of senior Pakistani officers decrying the vengeful attack on Dacca University the execution of Bengalis by firing squads, mass

sweeps in which innocent people were killed, and massacres of hundreds of people. According to a Pakistani brigadier, one general asked his soldiers, "how many Bengalis have you shot".

Blood Redoubled His Reporting, Relaying A Stream Of "Horror stories of varying reliability" to Washington. He reported an "atmosphere of terror" meant to cow the Bengalis into quiescence. There were ongoing shootings in Dacca and the surrounding areas, with newly killed corpses being loaded onto a truck. Blood found the few East Pakistani officials who dared come to work "stunned with grief and grim in their denunciation of Pak military brutality" with one of them sobbing. American priests in Old Dacca told Blood that the Pakistan army facing no provocation worse than putting up barricades, would set houses on fire and then shoot people as they ran out. The priests thought Hindus had been particular targets. Other Bengalis had witnessed six people gunned down in a shantytown, with the "army going after Hindus with vengeance." The army was also shooting police, who were seen as Bengali nationalist sympathizers. One police, man told a U.S. official, "Pray for us".

Shahudul Haque, the young Bengali who had befriended Archer Blood's family during his first tour in Dacca, was now twenty-one years old, an engineering student, who had joined in leftist campus protests against Pakistan and briefly been arrested. On the night of March 25, he had been taken completely by surprise by the unfamiliar heavy clatter of machine guns, the tracer bullets arcing across the sky; and the red hue of burning buildings. Rushing out to Dacca University two days later, he had been jolted at the sight of dead bodies, blood, and gore. As the crackdown continued, Haque often visited Blood in the evenings, telling him stark stories about members of his family who had fled to India or joined the rebellion. The consul replied that he and his staff were trying to inform people in the United States about what was happening. "I could feel his frustration that he wasn't getting what he wanted, " Haque remembers. "But he was very diplomatic. he would not give any details."

Blood's team could hear sporadic gunshots at night across the city "Wanton acts of violence by military are continuing in Dacca," he cabled. He reported evidence of ethnic targeting, which bolstered his accusation of genocide: "Hindus undeniably special focus of army

brutality." There were large fires and the sound of shots in Hindu neighborhoods. The army was rounding up remaining activists. "Atrocity tales rampant, " Blood cabled, from trusted eyewitnesses. Truckloads of Bengali prisoners went into a Pakistani camp, and one of Blood staffers then heard the continuous firing of 180 shots in half an hour.

Despite the military authorities' panicked assertions that Dacca was returning to normal, the city was a ghost town, with as much as three quarters of the population having fled. One eyewitness was stunned at the areas in Dacca burned by the army: he had seen many bombed-out towns during World War II, but the devastation here seemed far more thorough. Americans saw the Pakistan army moving into a Bengali village, bombing huts, rounding up the men, and finally taking half a dozen away There was a heavy bombardment on Dacca's outskirts, from what Blood reckoned to be hundreds of rounds of high explosives. Another U.S. official in Dacca cabled that witnesses saw Pakistani troops using tanks, bazookas, and machine guns on two villages made up of thatched-roof hutsrumored to be hideouts for deserters from the police and army"

The consulate emphasized how Hindus were targeted. One of Blood's senior staffers privately noted "evidence of selective singling out of Hindu professors for elimination, burning of Hindu settlements including 24 square block areas on edges of Old Dacca and village built around temple...Also attack night of March 26 on Hindu dormitory at Dacca University resulting in at least 25 deaths." Although Pakistani forces had concentrated on Awami League activists, "Hindus seem to bear brunt of general reign of terror." Beyond Dacca, the situation looked equally grim. One of Blood's officials saw total devastation in a nearby town. Blood noted reports of the Pakistan army unleashing bombs and napalm in a town outside of Dacca, while the military launched reprisals on another nearby village. After a week of delay, the Pakistani authorities flew some of Blood's officials into the devastated city of Chittagong, which was in flames, with many residential neighborhoods burned out. Although the Pakistani military held their fire while the diplomats toured, American citizens there had witnessed "numerous incidents of cold-blooded murder of unarmed Bengalis by Pak military"— The Americans in Chittagong told of a Pakistani cover-

up campaign to get rid of civilian corpses before the consular officials arrived. These reporting trips were often dangerous, with the Americans dodging mortars and hearing gunfire. Desaix Myers, a brash young development official, says, "I was running around Chittagong in my white car. going up to military guys, saying, 'I've heard rumors about your guys violating women, and I know that you as a disciplined officer would not want that to get out to the international press.' We felt we had diplomatic immunity. It just didn't seem that risky at the time."

Myers wrote a desolate letter home to his friends lamenting what he had seen in a small, impoverished Hindu village in the countryside. The army had "lined up people from their houses, shot down the lines, killing close to six hundred." The people in nearby villages heard the gunfire and fled. The rice mills were burned to charcoal, the rice to ash. The handful of villagers who had returned told their stories through sobs. A tall, frail Bengali man took Myers to his scorched house: "a room with a rice ash heap and charcoaled bed stead, nothing remained to show us that his three children and wife had lived there, died there. Another old man, pan stained teeth, mucus glazed eyes, (glaucoma or tears?), whimpered the loss of his family" Some of the wounded had escapedto a Christian village, over two hours way by boat. They lay on 'a concrete floor. Most have been hit in the hand, or arm; one women with gangrene has left a man with an abdominal wound died; a girl of eleven, with a bullet hole through her frontal lobe, passing out her right temple, lies quietly looking at her hand she is silent but, miraculously alive. The overall death toll was hard to calculate precisely "The whole objective of the West Pak army apparently was and is to hit hard and terrorize population into submission," Blood wrote., Although unsure how many people had perished in Chittagong and elsewhere, he estimated that as many as six thousand had been killed in less than a week in Dacca alone. At The White House, Kissinger's Aides Were Shaken By Blood's reporting. "It was a brutal crackdown," says Winston Lord, Kissinger's special assistant, who says he read some of the cables. "In retrospect, he did a pretty good reporting job," says Samuel Hoskinson, about Blood. "He was telling power in Washington what power in Washing- ton didn't want to hear."

So, increasingly was Hoskinson. He was shocked and saddened by the violence, which was unlike anything he had tracked before. While loyal to Kissinger and eager to please him, he was frustrated by the national security advisor's lack of response to his warnings. He recalls, "It's going over there, and there's no sign of it. " He complained to Alexander Haig, Kissinger's deputy national security advisor, that nobody was listening to him. "My old friend Al Haig is advising me, be careful, be careful. He didn't want to get him too riled up."

Hoskinson says, "I began to feel a little bit more passionate about this-about the reporting we were getting from the Dacca consulate." He was mystified. "I really didn't understand why they were leaning so much toward West Pakistan". Hoskinson knew the depth of Bengali nationalism, and saw a tragedy in the making. Trusting his own regional expertise, hetried to educate 'Kissinger abouta brewing revolution, to no avail. He says, Why doesn't Kissinger understand? Why doesn't he understand the realities there and adjust policy accordingly? We don't understand 'why they don't'understand what we understand."

Harold Saunders, the senior White House official on South Asia, channeled Hoskinson's emotion into a tentative approach to Kissinger, gingerly asking him to reconsider their policy Saunders and Hoskinson used Bloods cables to put the lie to Nixon and Kissinger's hopes for a quick Pakistani military success: "the Pakistan army has failed to achieve its initial objective of cowing the Bengalis quickly with a ruthless campaign of terror. " Kissinger's staffers dared not flour a powerful' boss whose view- point was perfectly clear. Using Blood and Keating to give them cover, the White House aides suggested that the United States use its lever- age from Pakistan's dependence on U.S. military and economic aid to limit the bloodshed. After all, the country seemed doomed to break up, and the Nixon administration would face "criticism at home and abroad that We are supporting a military terror campaign against the self-determination of a group that won a majority fairly in a national election." They asked if "in Ambassador Keating's terms, whether this is a time when 'principles make the best politics.'" Kissinger ignored them.

Nixon And Kissinger Would Have Been Angry Enough In Blood's secret cables had only been read Within the administration. But despite the State Department's energetic efforts to limit official access to

Blood's "Selective Genocide" cable, it leaked to the press in a matter of days. Someone also fed some of Blood's cables to Senator Edward Kennedy; a Democratic rival whom Nixon particularly loathed. Based on these cables, Kennedy promptly gave a passionate speech denouncing the use of U.S. Weaponry and urging the Nixon administration to stop the killing. Blood was not the type to leak, and was chagrined about the revelations. Joseph Farland, the ambassador in Pakistan, suspected that Blood was feeding classified information to Sydney Schanberg of the New York Times, although Schanberg--who says he never even met Blood-vehemently denies this. Still, any number of people at the State Department could have clone it, or someone in the Dacca consulate, or many overseas posts. Kissinger became convinced that the culprit was Kenneth Keating, the troublemaking ambassador in Delhi. A little later, Kissinger told Nixon that Keating had "divulged the contents of the Blood cables" to the New York Times. (Schanberg also denies this.) Eric Griffel, the head development official, thinks it was someone in the Dacca consulate, although he refuses to say who. He says that the leaker would only have had to go into the cable room, make a copy, and send it by mail."

Desaix Myers, who was a fiery critic of Nixon's policies in Vietnam, Cambodia, and Laos, says that it could have been almost any one in the Dacca consulate, " We were trying to get the word out to the world, " he remembers. While he says he did not leak the cables, he urgently Wanted press coverage of the slaughter, hoping this might stop the Pakistan army He wrote up a long letter describing the suffering of Hindu villagers and sent it around to friends back home in the United States. He asked that it be shown around discreetly, to be used as the basis for letters to Kennedy, other influential Democratic senators, and Nixon. "Anything that would get to the press with name, source attached would probably mean I'd haye to leave, " he wrote, "and I don't want to leave right now."

কথিত আছে জেনারেল মীর শওকতের নির্দেশে বীরউত্তম খালেদকে গুলি করে হত্যা করা হয়

পীর হাবিবুর রহমান

রক্তাক্ত নভেম্বর নিয়ে আলাপচারিতায় কর্নেল (অব.) জাফর ইমাম বীরবিক্রম বলেছেন, কথিত আছে জেনারেল মীর শওকত আলীর নির্দেশে ক্যান্টনমেন্ট থেকে ফোর্স শেরে বাংলানগর ১০ম রেজিমেন্টে বীর উত্তমকে বের করে এনে গুলি করে হত্যা করে। তাই শওকতকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেই জানা যাবে খালেদের প্রকৃত খুনি কে? তিনি সরকারের কাছে মুক্তিযুদ্ধের কে ফোর্সের অধিনায়ক জেনারেল খালেদ মোশাররফ হত্যার বিচার দাবি করেন। ৭ নভেম্বর ভোররাতে খালেদের সঙ্গে মেজর হায়দার ও কর্নেল হুদাকেও নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

কর্নেল জাফর ইমাম ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর জেনারেল খালেদ মোশাররফের নের্তৃত্বে সংগঠিত সেনাঅভ্যুত্থানে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। এছাড়া '৭১ সালে খালেদের নের্তৃত্বে বৃহত্তর ঢাকা, ফরিদপুর, কুমিল্লা ও নোয়াখালীর বিস্তীর্ণ অঞ্চলজুড়ে যে যুদ্ধে হয়েছে তাতে মেজর হায়দার ঢাকা, কর্নেল শওকত আলী (বর্তমানে ডেপুটি স্পিকার) ফরিদপুর, কর্নেল গাফফার, সালেক, মেজর ইমাম কুমিল্লা ও কর্নেল জাফর ইমাম নোয়াখালীর সাব-সেক্টর কমান্ডার ছিলেন।

জাফর ইমাম বলেন '৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর ৩ নভেম্বর অভ্যুত্থান না হলে খুনি মুশতাকের টুপির রাজনীতি চালু হতো। আওয়ামী লীগ আরো কঠিন এবং করুণ পরিস্থিতির মুখোমুখি হতো। খালেদের রাজনীতির টার্নিং পয়েন্ট হয়েছিল। কিন্তু দুঃখজনক, কেউ আজ জাতীয় বীর খালেদ হত্যার বিচার করে না এবং গভীর শ্রদ্ধা তাকে স্মরণও করা হয় না। তিনি বলেন, কর্নেল তাহের এবং জাসদের [illegible] ৭ নভেম্বর জিয়া এবং বিএনপির আবির্ভাবই ঘটায়নি অনেক অফিসার ও জওয়ানের রক্ত ঝরিয়েছিল বিনা অপরাধে। তার ভাষায়– যারা ভাবেন ৩ নভেম্বরের পাল্টা অভ্যুত্থান ছিল ৭ নভেম্বর তারা ভুল করছেন। ৭ নভেম্বরের প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা

ছিল দীর্ঘদিনের। তারা ছিল সময়ের অপেক্ষায়। দীর্ঘদিন থেকেই তাহের ও জাসদ গোপনে সেনাবাহিনীতে সৈনিক সংস্থা লালন করেছিল। এমনকি ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যা না হলেও জাসদ অভ্যুত্থান ঘটাত।

৩ নভেম্বর অভ্যুত্থানের পর ৪৮ ঘণ্টারও বেশি সময় রেডিও-টিভি বন্ধ রাখা, জাতিকে অন্ধকার আতঙ্কে ঠেলে দেয়া, মুশতাক গংদের হাতে ৪ নেতা হত্যা, জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে খালেদের সিদ্ধান্তহীনতা-সব মিলিয়ে দেশে তৈরি হওয়া শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থার সুযোগে তাহের ৭ নভেম্বর হটকারী অভ্যুত্থান ঘটায়। কিন্তু তাদের অভ্যুত্থানে অফিসারে-জাওয়ানের রক্ত ঝরলেও তারা ৭ নভেম্বর দিনটিই পার করতে পারেনি।

সকালে জিয়া মুক্ত হয়ে জাসদকে সহযোগিতার আশ্বাস, দুপুরের মধ্যে জলিল-রবকে মুক্তির নির্দেশ ও বিকাল ৩টায় শহিদ মিনার থেকে জাসদের লংমার্চে যোগদানের ঘোষণাও দিলেন। কিন্তু দুপুর না গড়াতেই জিয়ার চোখ-কান খুলে গেল। দেখলেন ক্যান্টনমেন্টের বাইরে সৈনিকদের গাড়িতে মুশতাককে দেখা গেলেও রাজপথে জাসদের জনবল নেই। অন্যদিকে ক্যান্টমেন্টে জিয়ার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে। তাই জিয়া তাহেরের সঙ্গে সম্পাদিত প্রেমের চুক্তিনামা ছুড়ে ফেলে দুই ট্রাক সৈন্য পাঠিয়ে শহিদ মিনারে লংমার্চে আসা জাসদ কর্মীদের লাঠিপেটা করে ছত্রভঙ্গ করে দিলেন। অদূরে মুশতাকের ছবি নিয়ে যারা এসেছিল তারাও তাড়া খেল। তাই জাসদ জিয়াকে বিশ্বাসঘাতক বলতেই পারে। কিন্তু সেনা ও জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন না হতে জিয়ার সামনে বিকল্পই বা কী হতে পারে? সে কারণে দিনটিকে বিপ্লব ও সংহতি দিবস বলেন। প্রকৃত মূল্যায়ন ইতিহাস করবে।

জাফর ইমাম বলেন, ৩ নভেম্বর বঙ্গভবনে অভ্যুত্থানের নায়ক খালেদ খুনি মুশতাকের সঙ্গে দর-কষাকষি করছিলেন। সেদিন মুশতাক যখন কেবিনেট বৈঠক করছিলেন তখন কর্নেল শাফায়াত জামিলের নের্তৃত্বে তারা ভিতরে ঢুকে পড়েন। মুশতাক দুই পা রাষ্ট্রপতির চেয়ারে তুলে বসে ছিলেন। তিনি মুশতাকের দিকে এগিয়ে যান এই বলে– ইউ হ্যাভ সিন ডালিম, ইউ হ্যাভ নট সিন দ্য ফাদার অব ডালিম।

মুশতাককে এসকট করে দোতলায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেদিন জেলহত্যার জবানবন্দি নিলে মুশতাক তার সংশ্লিষ্টতার কথা এমনকি জেলগেটে ঘাতকদের প্রবেশে টেলিফোনে নির্দেশের কথা স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু খালেদ তখনকার পরিস্থিতিতে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ এড়াতে ঘাতকদের এবং তাদের সমর্থক গোষ্ঠীর চাপে দেশ ছেড়ে রেঙ্গুন চলে যাওয়ার অনুমতি দেন। এটা সঠিক ছিল কিনা জানি না। তবে জেলহত্যার প্রতিবাদে সেদিন বাইরে কোথাও প্রতিবাদ মিছিল হলো না। ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যার পর আওয়ামী লীগ নের্তৃত্ব সারাদেশে প্রতিবাদ করতে

ব্যর্থ হয়েছিল। সেদিন আমি সেনাদের চোখে অশ্রু দেখেছি। গোটা সেনাবাহিনী নেয়নি। সেনানিবাস আক্রান্তের আশঙ্কায় নিরাপত্তা নেয়া হয়েছিল।

সেদিন প্রতিবাদের ঝড় উঠলে ডালিমের কাছে শফিউল্লাহকে আত্মসমর্পণ করে মুশতাকের প্রতি আনুগত্য দেখাতে হতো না। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু ও জিয়াকে নিয়ে বিতর্ক অহেতুক ও অমূলক। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ, হিমালয়সম ভাবমূর্তি, নের্তৃত্ব ও অভিভাবকত্ব বাঙালি জাতিকে এমন বন্ধনে আবদ্ধ করেছিল যে, তার প্রতি আবেগ ও অনুভূতিকে প্রেরণা ও শক্তি হিসেবে নিয়ে সবাই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে মরণপণ লড়েছে। তাকে নিয়ে দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছে। বঙ্গবন্ধুকে বাদ দিয়ে যেমন মুক্তিযুদ্ধের সাফল্য দেখা যায় না তেমনি ইন্দিরা গান্ধী তথা ভারতবাসীর ভূমিকা না থাকলে যুদ্ধ কতদিন হতো, পরিস্থিতি কী দাঁড়াত বলা যায় না। আমাদের মাতৃভূমির জন্য ভারতের সৈনিকদের জীবনদান গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করা প্রয়োজন। '৭২ সালে বঙ্গবন্ধু ফিরে না এলে ক্ষমতার ভাগাভাগি নিয়ে যেমন মুক্তিযোদ্ধাদের লড়াই হতো তেমনি ভারতীয় সৈন্য এত দ্রুত চলে যেত না।

আমাদের সময়
২ নভেম্বর ২০১০

আ লো ক চি ত্র

১৬ ডিসেম্বর ২০১৩ কর্নেল জাফর ইমাম, বীর বিক্রমকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন
তৎকালীন ইস্টার্ন কমান্ডার (বর্তমান ভারতীয় সেনা প্রধান) জেনারেল দালবীর সিং

মেজর জেনারেল আর. ডি. হিরা কে ১০ রেজিমেন্ট অফিসারদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন
১০ম রেজিমেন্টের যুদ্ধকালীন অধিনায়ক, বিলোনিয়া যুদ্ধের ফোর্সেস কমান্ডার লেফটেনেন্ট কর্নেল জাফর ইমাম (১৭ ডিসেম্বর ১৯৭১)
বা থেকে ডানে (দ্বিতীয় থেকে) ক্যা. মোখলেস, লে. ইমামুজ্জামান, লে. দিদার এবং লে. মিজান

কর্নেল জাফর ইমাম, সেনা প্রধানের সহধর্মিনী, জেনারেল জ্যাকব, মিসেস জাফর ইমাম কলকাতা ফোর্ট ইউলিয়াম স্টেডিয়ামে

জেনারেল ভি. কে. সিংহ ২০১২ সালে ক্রেস্ট প্রদান করছেন তার সহযোদ্ধা ('৭১ যুদ্ধকালীন) কর্নেল জাফর ইমাম, বীর বিক্রম কে

জ্যাকব ও ভারতীয় ওয়ার ভেটার্নদের সাথে লেখক ও জাতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে ড. কামাল হোসেন, তোফায়েল আহম্মেদ, আব্দুর রাজ্জাক প্রমুখ

কলকাতা ফোর্ট উইলিয়াম সেনানীবাস স্টেডিয়ামে এক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ভারতীয় কণ্ঠশিল্পী উষা'কে পুরস্কার দিচ্ছেন লেখক ও তাঁর সহধর্মীনি। পাশে রয়েছেন তৎকালীন ভারতীয় ইস্টার্ন কমান্ডার (বর্তমান সেনাপ্রধান) জেনারেল দালবীর সিং এবং তাঁর সহধর্মীনি নম্রতা সিং

প্রাক্তন ভারতীয় সেনাপ্রধান জেনারেল ভি. কে সিং-এর সাথে যুদ্ধকালীন সহযোদ্ধাবৃন্দ। লেফটেনেন্ট কামরুল হাসান ভূইয়া, ক্যাপ্টেন হেলাল মোর্শেদ (বীর বিক্রম) লেফটেনেন্ট ভি. কে. সিং, মেজর জাফর ইমাম, বীর বিক্রম, লেফটেনেন্ট ইমাম-উজ-জামান, বীর বিক্রম, লেফটেনেন্ট মিজান ও মুক্তিযোদ্ধা গোলাম মোস্তফা

প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাত (পিএলও)-এর সাথে লেখক

রাজীব গান্ধীর সাথে লেখক

সাদ্দাম হোসেনের সাথে লেখক

২ নং সেক্টর ও কে ফোর্স কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররক, বীর উত্তম
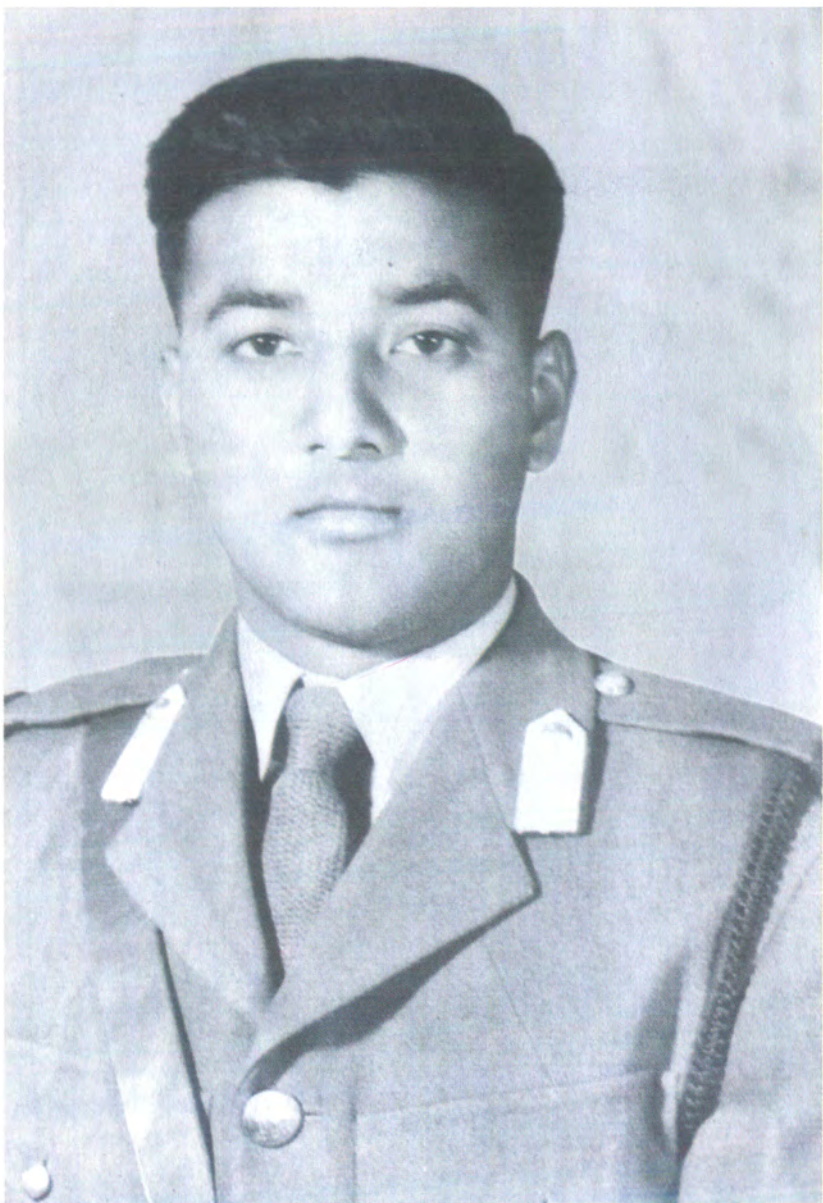
মেজর আবদুস সালেক চৌধুরী, বীর উত্তম
২২ অক্টোবর লে. কর্নেল খালেদ মোশাররফ আহত হবার পর থেকে ফোর্সের কমান্ডার